


[^0]

জন্ম ২২ অক্টোবর ১৯৫১, কলকাতায়। স্কুলের পড়াশোনা ঃ হিন্দু স্কুল। সান্মানিক পদার্থবিজ্ঞানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে বি. টেক., এম.টেক. ও পিএইচ.ডি.। পেয়েছ্েেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি স্বর্ণপদক ও একটি রোপ্যপদক।
 বিশ্ষবিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে লেকচারার। ১৯৯০ থেকে ওই বিভাগেই রিডার, আর ১৯৯৮ থেকে প্রফেসার। লেখালেখির শুরু ১৯৬৮-তে, অধুনালুপ্ত 'মাসিক রহস্য পত্রিকা’য়। পত্র ভারতী প্রকাশিত বই তেইশ ঘণ্টা যাট মিনিট, যাট মিনিট তেইশ ঘঞ্টা, দেখা যায় না শোনা যায়, বারোটি রহস্য উপন্যাস, পাঁচটি রহস্য উপন্যাস, ভয়পাতাল, অন্তরে পাপ ছিল, কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র, বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূত্তের গল্প, ভৌণিক অল্লেকিক, আমি পিশাচ, মার্ডার ডট কম, সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র, বিজ্ঞানের হরেকরকম, সহজ কথায় ইন্টারনেট, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, রোমাঞ্চকর ধূমকেতু ইত্যাদি।
পুরস্কার ঃ প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৮) ও ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ জাতীয় পুরস্কার (১৯৯৯)।
সম্পাদনা করেছেন অল্পকালজীবী কয়েকটি মাসিক পত্রিকা ও বিমল করের ‘গল্পপত্র’ পত্রিকার বিশেষ কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা।
www.banglabookpdf.blogspot.com

WWNW: banglabookpdir blogspotacom
www.banglabookpdf.blogspot.com

www.banglabookpdf.blogspot.com

WWNW: banglabookpdir blogspotacom
www.banglabookpdf.blogspot.com
অনীশ দেব


# www.banglabookpdf.blogspot.com 

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৪

SHAT MINIT TEISH GHONTA<br>by<br>Anish Deb

ISBN 978-81-8374-265-8

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ<br>সুদীপ্ত দত্ত

## WWMW, banglabookpdif blogspotacom মূল্য <br> ২৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 9830806799
e-mail patrabharati@gmail.com
visit us at www.facebook.com/ Patra Bharati
website www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 250.00

[^1]www.facebook.com/groups/banglabookpdf

## www.banglabookpdf.blogspot.com

## লেখকের অন্যান্য বই

তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট<br>ষাট মিনিট তেইশ ঘণ্টা<br>কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

ভয়পাতাল
হিমশীতল
আমি পিশাচ
VNVNV, Da
দুঃখী রাজকুমার
রোমঞ্চকর ধূমকেতু
সহজ কথায় রোবট
সহজ কথায় ইন্টারনেট
সহজ কথায় টেলিভিশন
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
বিজ্ঞানের হরেকরকম
ভৌতিক অলৌকিক
অন্তরে পাপ ছিল
পাঁচটি রহন্য উপন্যাস
সেরা কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিশ্বের সেরা ভয়ক্কর ভূতের গক্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২ (সম্পাদিত)
শতবর্ষের সেরা রহন্য উপন্যাস ৩ (সম্পাদিত)
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প (সম্পাদিত)

# ‘ধরা যাক, জभলে মুদোমুথি দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বাঘ এবং একজন মানুষ। মানুষটির <br> হাতে রাই<েল থাকলেও এটা ভাবার কোন <br> কারণ নেই বে, বাঘ হচ্ছে শিকার, আর মানুষ <br> NNNW, Deহ 

থিয়োরি অফ গেম : হান্টার অ্যাড দ্য হান্টে
লেখক জেম্স ডি. প্যাটারসন
প্রকাশক ফিউচার টেখ, প্রকাশকাল ২৩১১
www.banglabookpdf.blogspot.com

WWNW: banglabookpdir blogspotacom

## www.banglabookpdf.blogspot.com

## এক মিনিট—আপনাকে বলছি!

২০০৪ সালে ‘কিশোর ভারতী’ পত্রিকর পুজো সংখ্যার পাতায় শৃরু হয়েছিল ‘তেইশ ঘন্টা যাট মিনিট’। প্রথম পর্ব প্রকাশের পর যা-যা হয়েছিল সে সবই आাপনারা জানেন। ‘তেইশ ঘণ্টা যাট মিনিট’ বইয়ের শরুুতে তার ফিরিস্তি দিয়েছি। তথ্যের জন্য শুধু এটুকু आবার জানাই বে, ‘ক্কিশোর ভারতী’-র পরপর চারটি পুজো সংখ্যায় উপন্যাসটির চারটি পর্ব প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যা|্যের সিদ্ধান্তে লেখাটি ২০০৯-এর জানুয়ারি থেকে পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিক্ডারে প্রকাশিত হতে থাকে। ২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে প্রথম থতে ইতি টানি। এবং

 তেইশ ঘণ্ট’। ঊনচন্নিশ কিস্তিতে সেই লেখাটি শেয হয়ে এখন বইয়ের চেছোরায় आাপনার হাতে। নায়ক জিশানকে নিয়ে লেখা আমার ‘তেইশ ঘণ্টা যাট মিনিট’ ফিউতারিস্টিক থ্রিলারের এইখানেই ইতি।

উপন্যাসটির প্রথম খঙ্ড বখন পত্রিকার পাতায় পর্বে-পর্বে প্রকাশিত হচ্ছিল তখন আমি পাঠক ও সস্পাদকের কাছে আবেদন জানিল্যেছিলাম বে, এই একটি লেখা আমি মনের মতো করে শেষ করতে চাই। আমার আরেদেনে দু-পক্ষই অাঙ্তরিক সাড়া দিয়েছেন। এ ছাড়া ‘কিশোর ভারতী’-তে ধারাবাহিকডাবে প্রকাশের সময় বহ পাঠক উৎসাহ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন। অনেকে ফোন করেছেন, কেউ-বা ই-মেলে মতামত জানিয়েছেন। তাঁদের সকলকে ধনাবাদ জানই। বছর দেড়েক আরে জনৈক বয়ক্ক প্রাes পাঠক সাক্ষতে আমাকে উপন্যাসটি শেষ করে দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। সম্পাদকের দপ্রে বসে মোটামুটি যে-ক্থাঙলো তিনি বলেছিলেন সেণেো এইরকম : ‘এবারে ওটা শেষ করে দিন। আর টানার দরকার নেই।’ সেই সময়ে হাসি পেলেও সৌ্জন্যের খাতিরে হাসি চেপে রেরেখিনাম। লেখা যে ঘুড়ি নয়, ইচ্মেমতো ‘টানা’ বা ‘ছাড়া’ যায় না, সে-ক্থা ওই প্রাঙ মানুষটিকে শেখাতে আমার সৌজন্যে বেধেেছিল। সুতরাং, এই কথাঢই বলতে

## www.banglabookpdf.blogspot.com

চাই যে, দু-খণ্ডের এই উপন্যাসটি আমি স্বধধীনভাবে লিখেছি-সবসময় সরস্বতীর ‘চাকর’ হয়ে থেকেছি। তাই এর সময় ভুল-ত্রুটি-ব্যর্থতার দায় পুরোপুরি আমার।

আর একজন উৎসাহী পাঠকের কথা খুব বলতে ইচ্ছে করছে। তিনি সোনারপুরের দেবসেনা নন্দী। উপন্যাসটির ধারাবাহিক প্রকাশের সময় তিনি নিয়মিত ফোন কিংবা এস.এম.এস. করে ওঁর কৌতূহল এবং ভালো जাগা প্রকাশ করেছেন। দেবসেনা এবং আরও অন্যান্য পাঠকের উৎসাহ আমাকে প্রতি মুহূর্তে ভেতর থেকে ভালো, এবং আরও ভালো, লিখতে চাওয়ার শক্তি জুগিয়েছে।

গত মে মাসে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমাকে নার্সিং হোমে ভারতি হতে হয়, দুরূহ অপারেশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তখন শরীর আর মন খুবই ভেঙে পড়েছিল। দু-মাস লেখালিখি পুরোপুরি বন্ধ রাখতে হয়েছিল। উপন্যাসটা কীভাবে শেষ করব সেই দুশ্চিস্তায় আর শরীরের যম্ত্রণায় রাততের ঘুম উবে গগঁয়েছিল। কিন্তু তখনও পাঠকদের পাশে পেয়েছি। আর পেয়েছি একইসঙ্গে বন্ধু এবং ‘কিশোর ভারতী’-র সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়রে। সেই কারণ্েই উপন্যাসটি শ্নেষ পর্যস্ত শেষ হয়েছে এবং বই
 বোঝাতে পারব না।

সব শেষে বলি একজনের কথা—আমার স্ত্রী শর্মিলা। একজন মৃতপ্রায় মানুযকে ডানা দিয়ে আগলে প্রতিটি মুহূর্তে যত্ন নিয়ে কীভাবে তিলতিল করে ‘বাঁচিয়ে’ তুলতে হয় সেটা ও দেথিয়েছে। ওকে ধন্যবাদ বা কৃতষ্ঞতা জানানোর কোনঞ মানে হয় না। ইতি-

ডিসেম্বর ২০১৩
ফলিত পদার্থবিজ্জন বিভাগ রাজাবাজার বিজ্ঞান কনেজ


কলকাতা বিশ্ধবিদ্যানয় কলককা ৭০০ ০০৯

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## www.banglabookpdf.blogspot.com

জিপিসির গেস্টহাউস থেকে নীচে নেমে এল জিশান। তিনজন গার্ডের সঙ্গে পা ফেলে এগির্যে গেল একটা কিউ-মোবাইলের দিকে।
গাড়িতে একজন পাইনট স্টিয়ারিং-এর সামনে বসেছিল। তার পাশে জিশানকে বসিয়ে একজন গার্ড জিশানের াাঁ-পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর বাকি দুজন পিছনে। ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ির চারটে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ি চলতে শরু করল।

জিপিসি-র ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরিয়ে কিউ-মোবাইল ছুটে চলল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডের ইলেকট্র্রনিক প্যানেলের দিকে তাকাল জিশান। ডিজ্টিাল ঘড়িতে দুঢো দশ। তার পােেই বসানো ছোট টিভির পরদায় রক ব্যাণ্ডের লাইভ শো দেখানো হচ্ছে।

গন্তব্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ার পর জিশান বিল্ডিংটাকে চিনতে

 কাজ হয়।

গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে সিভ্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে এগোল ওরা। রাতের বাতাস কেটে শিসের শব্দ শুনতে পেল জিশান। মাথা তুলে ওপরে তাকাল।

দুটো শুটার বাঁক নিয়ে ছুটে গেল আকাশে। বোধহয় রাতে ওরা নিউ সিটির আকাশে টহল দেয়। নজরদারির কাজ রুরে। হয়তো ওই তটার থেকেই কোন টহলদার গার্ড জিশানের নাইট সাফারির কথা জানতে পেরেছে-তারপর শ্রীধর পাট্টাকে খবর দিয়েছে।

বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকে পড়ততই শীতততপ পরিবেশে উষ্ণতা বেশ কত্যেক ডিপ্রি নেমে গেল। অথচ গ্রানাইট, কাচ, প্পাস্টিক আর ল্টেইনলেস স্টিল দিয়ে তৈরি আধুনিক্তম সব ঘর আর বারান্দার নকশা। অথচ চারপালে তাকালে কেমন যেন নিপ্প্রাণ যান্ত্রিক ভাব।

জিশান লক্ত করল, করিডরে লোক চলাচল দিনের তুলনায় বেশ কম। তবে যে-ক’জন গার্ডকে নজরে পড়ল তারা সকলৌই একইরকম ম্মার্ট এবং ওদের কোমরে ঝোলানো শকার একইরকম সক্রিয়।

প্রথমম ভার্টিকলল এলিভেটর। তারপর হরাইজন্টাল এলিভেটর। তাতে

ওঠার পর একজন গার্ড ডিজিটাল প্যানেনে কো-অর্ডিনেট পাঞ্চ করল। এক্সওয়াই স্থানাক্ক পাওয়ামাত্রই মসৃণ এলিভেটর নিঃশব্দে গত্তব্যে ছুটে চলল।

জিশান কোনও কথা বলছিল না। গার্ড তিনজনও চুপচাপ। ঠিক যেন কারও মৃত্যুশেকে নীরবতা পালন চলছে। বোধহয় শোকের ঘটনার আগৌ স্মরণসভা గুরু হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত জিশানকে যেখানে নিয়ে আসা হল বেশ বড় মাপের একটা দরজার সামনে। গার্ড তিনজন দরজায় দাঁড়িয়ে পড়ন। ইশারায় জিশানকে ভেতরে पুকতে বলল।

কপালে-যা-থাকে-থাক ভেবে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল জিশান।
একটা বিশাল হলঘর। ঘরের একপ্রন্তে অড্ভুত জ্যামিতিক চেহারার একটা কনফরেেস টেবিল। তাকে ঘিরে পাঁচটা চেয়ার।

একটা চেয়ারে বসে আছেন অবশ্ই শ্রীধর পাট্ট। পরনে ধবধবে সাদা পোশাক। সোনালি বোতাম। বুকপরেটের ওপরে জূলজূলে নীল হল্লো্রাম।

এই রাত আড়াইটের সময়েও মানুযটার শরীর চাবুকের মতো টান-টান, গিরগিটির মতো সজাগ।

জিশানকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে
 লোকটার ফরসা মসৃণ মুখ দেখ্ে মনে হচ্ছিল সাদা মার্বেল পাথরে থোদই করা এক কুৎসিত ভাস্কর্য।

শ্রীধরের দুপাশের দুটো চেয়ারে বসেছিল দুজন পুরুষ। ডানদিকে যে বসেছিল তার বয়েস পঞ্চাশ-টঞ্চাশ গোছের হবে। তামাটে রং, মাথায় টাক, চোথে চশমা, ভাঙা চোয়াল, থুতনিতে সামান্য দাড়ি।

আর শ্রীধর পাট্টার বাঁ-দিকের লোকটির বয়েস প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। মাঝারি রং, অসম্ভব রোগা, মাথার সাদা দুলতুলো এলোলেলো—দেখে মনে হয় চিরুনির সল্গে ওদের বহৃকাল দেখা নেই। লম্বা খাড়া নাক, চোেে সরু <্রেমের চশমা, নাকের নীচে পাতলা সাদা গোঁফ।

দুজন মানুযকে দুরকম দেখতে হলেও ওদের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেল জিশান : দুজনের চোখ্খই ঘুম-ঘুম ভাব।

হঠাৎই হাততালি দিলেন শ্রীধর-পরপর দুবার। হাসলেন। ছড়া কেটে বললেন, ‘এসো, জিশান—খুড বয়/করো এদের সঙ্গে পরিচয়।’

হতত্তালির শব্রেই শ্রীধরের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল জিশান। শ্রীধর নাকমাথা লোকটির দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, ‘গণপত আচারিয়া। আমাদের সিভ্ডিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট। গ্রেট ইনভেন্টর। তবে...' এবার বাঁ-

দিকের মানুষঢর দিকে ইশারা করে : ইনি হলেন আমাদ্রর এক নম্বর
 বিজ্ঞানদেবতা।
‘‘ই দूজনের কাడ్, জিশান, সবরকম কোশ্চেনের আনসার রভ্রেছে। তই

 आनসার পাওয়া যায়। ঢই সংক্কেপে ওঁদ্রু आমি "কি৬" আর "a" বনে ডाকি... ${ }^{\text {p }}$

কক়্েক সেকেড থামলেন শ্রীষর। তারপর একনা নস্বা শ্মাস টেলে বনলেন,



চশমার কাচর পিছন থেকে দু-জোড়া চোখ জিশানকে দেখতে লাগন।


কিউ উџ্ঠ দঁড়ালেন চেয়ার ছো়ে, বনলেন, 'হই, জিশান।'

এ একবার হই ঢুনলেন। তারপর বলস-বলেই বললেন, 'নাইস দু মিট E-


 কথা বনােেন। তরপর অপেক্ণা করতে লাগলেন।

অপেক্ষার একমিনিটও বোধহ্য় পুরোপুরি কাটেনি, হনঘরের অনপ্রান্ঠ
 হাতে শকার—আ|্पরক্প কিংবা আক্রম্ণে জন্য ঢৈরি।

যাদ্রের জিশান ‘লোক’ বলে ভাবঘিন जারা বে প্রায় সক্লেই ওর চেনা

 কেটে গিক্রে রক্ত গড়িয়ে পড়াহ।

রূ্তের দাগ-ঢাগ থাকা সজ্গে জিশান প্রথল্ম সেই অফিস্সারকক চিনতে
 আর্ক কম্পিউটার ক্ত্রিন্র সাম্ে बে বলেছিল। মাথায় তার কাচাপাক মুল।




দ্বিতীয়জন আনমোল। জিশানের কাল রাতের মেকাপম্যান। ওর ভুরুর কছে অনেকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। তাই জিশানের ওকে চিনতে একইু বেশি সময় লেগেছে।

আনমোলের চোে শুন্য দৃষ্টি। স্থিরভাবে ঘরের একটা আলোর ফিক্সচারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

তৃতীয়জনকে চিনতে পারার পরই একটা জোরাল ধাক্কা খেল। পাভা। ওর ঠোটটের বাঁ-দিকটা ফুলে আছে। কালচে হয়ে রক্ত জমে আছে। ডানরোখটার অবস্থাও একইরকম। ফুলে উঠে চোখটা প্রায় বুজে গেছে। চোেের ওপরটা আর পাশটা নীল হয়ে আ巨ে।

মুখে এতরকম ‘কারুকাজ’ থাকা সত্ত্তে পাডাকে জিশানের চিনতে ততটা সময় লাগেনি। কারণ, মানুষটা চঞ্চলভাবে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল। জিশানকে লক্ষ করামাত্রই ও জিশানের দিকে অনেকক্ষণ স্থির নজরে তাকিয়ে থেকেছে। তারপর ঠোঁট জোর করে টেনে লম্বা করে সামান্য হাসি ফুটিয়ে তোলারও চেষ্টা করেছে।

আশর্য মানুয বটে! সামনে খোদ শ্রীষর পাট্টা হজির-তবুও কোনও ভয়ডর নেই।

ওরা তিনজন ছাড়াও একজন আহু যূবক ওদের সল্মে ছিল। জিশান


হঠাৎই পাভা খসে পড়ে গেল মেঝেতে।
সঙ্গে-সঙ্গে দুজন গার্ড ঝুঁকে পড়ে ওকে ঝটটকা মেরে টেনে তুলল। আবার দাঁড় করির্যে দিল।

পান্ড দাঁড়িয়ে রইল বটে, কিন্তু ওর দেহটা সামান্য নড়ত্ লাগল।
অন্য সময় হলে জিশান ভাবত পান্ডা নেশা করেছে। কিন্তু এখন ওর মনে হল, পিস ফের্সের গার্ডরা পাডাকে অসস্তব মারধোর করেছে। তাই ও ঠিকভাবে দাঁড়াতেও পারছে না।
‘জিশান—!’ হঠাৎই চেচচিচ্যে ডেকে উঠলেন শ্রীধর পাট্টা।
ডাকটা শোনামাত্রই গার্ডরা কেমন যেন অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে চলে গেল। কিক্তু জিশান শুধু স্নো মোশানে চোথ ফেরাল টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মার্শালের দিকে।
‘জিশান, কাল রাতে তুমি ক্যাম্পাস ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছিলে, তাই না?’
প্রশ্নটা ওুনে জিশানের হঠাৎই মনে হল, শ্রীখর এখনও এই প্রশ্নটার সুনিশ্চিত উত্তর পাননি। এই চারজন মননুেের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে শ্রীধর यদি এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেন তা হলে জিশানকে আর এই প্রল্নের মুত্েে দাঁড় করাত্ন না। সুতরাং জিশান বুঝতে পারল ওর উত্তর कী

## www.banglabofef patf.tifogspot.com

হওয়া উচিত।
একইসঙ্গে ও ভেবে দেখল, শ্রীধর কতঢা খবর পেয়েছেন বা পাননি তার ওপরে ওর উত্তরটা নির্ভর করছে না। ও যদি বলে, হাঁা, ও কাল রাতে জিপিসি ছেড়ে বেরিয়েছিল তা হলে আনমোল, পান্ডদের ওপরে টরচার আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। বরং উলটো উত্তরটাই সঠিক উত্তব ঃ না, ও ক্যাম্পাস ছেড়ে বেরোয়নি। শ্রীধরের নলেজ বেসের স্টেটাসের সস্দে এই উত্তরটার নড়চড় হওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

জিশান জবাব দিল, 'না, আমি ক্যাম্পাস থেকে বেরোইনি।'
ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে মিহি গলায় হেসে উঠলেন শ্রীধর। তারপর মুখ নামিয়ে তাকালেন জিশানের দিকে। ভুরু উঁচিয়ে ব্যঙ্গের সুরে জিগ্যেস করলেন, 'তাই? বেরোওনি? লঙ্ম্মীছেলে হয়ে ছিলে? ঘুমু-ঘুমু করছিলে?’

জিশান চুপ করে রইইল। ভাবতে চেষ্টা করল, এরপর শ্রীধর কোন পদক্ষেপ নেবেন।

শ্রীধর পাট্টা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানের দিকে একবার দেখলেন, তারপর তাকালেন পান্ডাদের দিকে। চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, ‘এই চারটে লক্ষ্মীছাড়া জানোয়ারও একই কথা বলছে। অথচ এদের একজনের ছবি ই-ল্যাড্ডের ক্লোজড সার্কিট টিভির ফুট্টেজ্জে ধরা পডেছে। তা ছাডা কাল
 সাডেনলি ডি-অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। আপনারা কী বলেন, এ এবং কিউ?’ মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে শেষ প্রশ্নটা করলেন শ্রীধর পাট্টা।

ふঁরা দুজনে একইসঙ্গে বলে উঠলেন, 'অফ কোর্স গোলমেলেসাসপিশাস।'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। পান্ডাদের দিকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। জিশানের দিকে একবার ফিরে তাকালেন। তারপর আবার এগোলেন। একেবারে পান্ডার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। এবং কোনওরকম ভূমিকা ছাড়াই পান্ডার গালে সপাটে এক থাপ্রড় কষালেন।

বিকট শব্দ হল। পান্ডা ছিটকে পড়ে গেল মার্বেলের মেঝেতে। কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনও যন্ত্রণার শব্দ বেরোল না।

শ্রীধরের হাতে বোধহয় রক্ত-টক্ত লেগে গিয়েছিল। তাই সামনে দাঁড়ানো একজন গার্ডের য়ুনিফর্মে হাতটা ঘষে-ঘষে মুছলেন। বললেন, ‘এক্ষুনি গিয়ে য়ুनিফর্মটা পালটে নাও—।

সঙ্গে-সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন করে গার্ড চলে গেল।
পান্ডা তখনও মেঝেতে পড়ে ছিল। গালে আলতো করে হাত বোলাচ্ছিল।

আর ঠাল্ডা চোথে তাকিয়ে ছিল শ্রীধরের দিকে। শুধু শ্রীধরেরই দিকে।
শ্রীধর সেই ঠান্ডা দৃষ্টি সহ্য করতে পারলেন না। একটা নোংরা গালাগাল দিয়ে বুটের এক লাথি কষিয়ে দিলেন পাঙ্ডার পঁজরে।

সংঘর্ষের শদ্দ হল। পাভার শরীরটা ভাঁজ খেয়ে গেল আঘাতে। কিন্তু না—এত সর্ত্রে ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কুঁকড়ে যাওয়া শরীরটকে খানিকটা সোজা করে ও আবার তাকিয়ে রইল শ্রীধরের দিকে।

সেই অভিব্যক্তিইীন ঠাল্ডা দৃষ্টির সামনে পড়লে কেমন যেন অস্বস্তি হয়। জিশান দেখল, শ্রীষর পাট্টা চোখ সরিয়ে নিলেন পাভ্ডার দিক থেকে।

এই ছোটখাো দুর্বল মাতাল মননুষটার কী অবিচল নিঃশশ্দ প্রতিরোধ! ওর দৃষ্টিতে জিশান যেন একইসঙ্গে দেখতে পেল ঘৃণা আর প্রতিবাদ।

সত্যি, জিশানকে ওরা কীভবে আগলে রেথেছে! দু-ছাতের তালুর আড়ালে নিশ্চিষ্তে স্থির হয়ে থাকা জৃনত্ত প্রদীপের শিখার মতে।। হাত দুটো আঘাতে-আঘাতে ক্রতবিক্ষত হয়ে গেলেও তাদের আড়ালে প্রদীপের শিখা অবিচল, অমলিন।

মনে-মনে পাল্ডাদের সেলাম জানাল জিশান। মানুষগুলো এত সয়েছে ওর জন্য! এত!

শ্রীখর পকেট থেকে ছোট শিশি বেরু করুলেন। ওপরদিক্কে ম্য তুলে


জোরে-জেরে শ্বাস টনলেন শ্রীধর। জিভের ডগাটা দু-ঠোঁটের ফাঁকে চট করে এপাশ-ওপাশ নাড়লেন। তারপর কাঁধে একটা «াঁকুনি দিয়ে নতুন তেজে ফিরে এলেন জিশানের কছে।
‘জিশান, তুমি সত্যি কথা বলছ কি না সেটার জন্যে আমি একটা ছোট্ট এক্সপেরিম্মেট করব। এই এক্সপেরিম্মেন্টা কিউ অ্যাড্ড এ-র ডিজাইন। মানে, ওই...’ হাত তুলে দুই বিজ্ঞানীর দিকে দেখালেন শ্রীধর ঃ ‘...আচারিয়া আর চক্রপাণির ইনভেনশান। এই এক্সপেরিমেন্টার মজা হচ্ছে এতে তোমার কোনও ফিজিক্যাল পেইন হবে না। য়ু ওন্ট বি হার্ট। য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেলথআ্যান্ড ইন ওয়ান পিস। কিন্তু...নাঃ, থাক-বলব না। সে তুমি দেখতেই পাবে। এই "কিন্তু’ঢই এক্সপেরিমেন্ট। নাউ গেট রেডি অ্যাড্ড বি স্টেডি...।' মোলায়েম হেসে কথা শেষ করলেন ত্রীষর পাট্ট।

তারপরই চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তাকালেন পাভাদের দিকে। একজন গার্ডকক ইশারা করে বললেন, ‘ওদের নিয়ে যাও-যার-यার ডিউটি করার জন্যে ছেড়ে দাও। আর ওদের ওপর নজরদারি বাড়িয়ে দাও। আমি তোমার বসকে ক্বিয়ারেল কোড জানিয়ে দিচ্ছি...।'

পকেট থেকে আবার স্যাটেলাইট ভিডিয়োফোন বের করলেন। অন করে

কার সঙ্গে যেন কথা বললেন। তারপর গার্ডদের দিকে ইশারা করে মাথা নাড়তেই ওরা পাভা, আনমোলদের র্রুক্ষভাবে টেনে-হিচড়ে নিয়ে চলে গেল।

জিশান লক্ষ করল, ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত পান্ডা জিশনের চোথে তাকিয়ে রইল।

বিষ্ঞেনী দুজন জিশান্রে কাছাকাছি এগিয়ে এলেন। নিজেলের মধ্যে চাপ্; গলায় কীসব আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীধর ফোনে আবার কথা বলছিলেন। সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষু উচ্চারণে কাউকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। নির্দেশ দেওয়া শেষ হওয়ার মিনিট তিন-চারেকেরই মধ্যেই ঘরে ছ'জন গার্ড ব্যস্ঠভাবে ঢুকে পড়ল। তাদের পিছন-পিছন চারজন লোক—তারা একটা বড়সড় ভারী মেটাল টপ কাঠের টেবিলকে শূন্যে ভাসিয়ে বয়ে নিয়ে আসছে।

টেবিলটা ঘরের একপ্রাষ্ঠ মাঝামাঝি রাখা হল। টেবিল থেকে ঘরের তিনটে দেওয়ালেরই দূরত্ব অন্তত দশফুট।

চারজন টেবিল-বাহক ঘর ছেড়ে চলে গেল। ছ'জন গার্ড টেবিলটাকে অর্ধচন্দ্রের ঢঙ্ে ঘিরে দাঁড়াল। কোমর থেকক শকার খুুে তরোয়ালের মতো উঁচিত্যে ধরল।

জিশান্নে মনে হুচ্ছিল, কোনও একটা নাট্কের শোয়ের জন্যু স্টেজ তৈরি
 পড়াটাই বাকি।
$এ$ এবং কিউ তখন নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞানের জটিল কোনও বিষয় নিয়ে হাত-মুখ-ঢোখ নেড়ে গভীর আলোচনা করছেন। এবং মােে-মাবেই হাই তুলছছেন।

শ্রীধর পাট্টা ওঁর বাঁ-ছাতের নখ খুঁটিয়ে পরীক্মা করছিলেন। সেই অবস্থাতই বললেন, ‘জিশান, এবার তোমকে টি-শাট্টা খুলে ফেলতে হবে।’

জিশান চমকে উঠে শ্রীধরের দিকে তাকাল। এ কী বলছেন শ্রীধর? গায়ের জামা খুলে ফেলতে হবে?

শ্রীধর হাসলেন, ছন্দবাণীতে বললেন, ‘খোলো, খোলো। এবার তোমার শো হবে সোলো—’’

শ্রীধর বে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন সেটা বোঝা গেল ওঁর কথা বলার ভঙ্গি তে। কারণ জিশানকে লক্ষ্য করে শব্ধগুলো উচ্চারণ করার সময় তিনি ডানহাতের দু-আiুলে টুসকি দেওয়ার চটাচটট শব্দ করলেন।

জিশান অবাক চোেে ওঁর দিকে তাকিয়ে পোলো নেক টি-শার্টটা খুলতে শুরু করল।

শ্রীধর এবার বিষ্ঞনী দুজনের দিকে তাকালেন। ভুরু উঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনারা দুজন কি তৈরি?’

## www.banglabiofek past.tilogspot.com

'ইয়েস, স্যার। চটপট জবাব দিলেন চক্রপাণি। আচারিয়ার দিকে তাকালেন। এবং ঘুম তাড়াতে আঙুল দিয়ে দু-চোখ রগড়ে নিলেন।

আচারিয়া সাদ--কালো চেকশার্ট পরেছিলেন। সঙ্গে চকোলেট রঙের ঢোলা ট্বাউজার্স। তারই পকেটে ব্যস্তভাবে হাত ঢোকাত-ঢেকাতে বললেন, ‘হাঁা, স্যার, আমরা তৈরি-P'

জিশানের খারাপ লাগল। বাবার কথা মনে পড়ল। শ্রীধর পাট্টার মতে নিউ সিটির এক নম্বর এবং দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট যথাক্রম্মে একনম্বর এবং দু-নম্বর চাকরের মতো আচরণ করছে! শিক্ষা-দীক্ষ বিষ্ঞান এঁদের মধ্যে মর্যাদাবোধ তৈরি করতে পারেনি।

গণপত আচারিয়া পকেট থেকে একটা কৌটো বের করে নিলেন। তারপর সেটা উঁচিয়ে ধরে শ্রীষরকে দেখালেন। জিশানও সেটা দেখল।

দুই কি আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের একটা স্বচ্হ প্লাস্টিকের কৌটে। উচ্চতায় ইঞ্চি চারেক হবে। কৌটোর ভেতরে চকচকে অথচ স্বচ্ছ একাা তরল। আলো পড়ে ধাতুর মতো ঝিকমিক করছে। অথচ পারদ নয়—তার তুলনায় ঘনত্ব অনেক কম। কোনও তরলের এরকম রং জিশান আগে কখনও দেখ্েেি।

ওর টি-শার্ট থোলা হয়ে গিয়েছিন। সেটা মেঝেতে ফেলে দিল। খালি

 কে জনে! ওর কর্ডের প্যান্টটার ভাগ্যেও কি টি-শাটেঁর পরিণতি লেখা আছে?

সেটা বোঝা গেল কয়েক সেকেডের মধ্যেই।
শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। জিশানের শরীর পরখ করছিলেন। ফরসা, সুঠাম দেহ। বুকের মাঝখানটা সামন্য লোমশ। কিন্তু তার জন্য উদ্ধত পেশিঔলো দেখতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে, এদেহ অনেক লড়াই দেবে।

শ্রীধরের মনে-মনে নেওয়া ‘পরীক্ষ’য় জিশান বোধহয়ে পাশ করল। কারণ, শ্রীধর ছেট্ট করে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন এবং হাসলেন।

তারপরই বললেন, ‘এবার কর্ডের প্যান্টের পালা। খোলো, জিশান!’ বারদুয়েক শ্বাস নিয়ে বিপ্লবের জিগির দেওয়ার ঢঙে বললেন, ‘কর্ডের প্যান্ট, দুর হঠে!’

জিশান মনে-মনে নিজেকে বলল, ‘ধৈর্য হারালে চলবে না। শান্ত হও। শান্ত থাকে।। এখনও ধৈর্য হারানোর সময় আসেনি। ধৈর্য তুমি তখনই হারাবে

যখন প্রতিপক্ষকে অনেক-অনেক লড়াই দিতে পারবে...।'
জিশান মুখের ভাব সংযত রেথে প্যান্টের বোতামে হাত দিল। তখনই লক্ষ করল, চক্রপাণি পকেট থেকে একজোড়া হালকা নীল রঙের গাভ্স বের করে নিলেন। স্বচ্ছ। রাবার লেটেক্স-এর তৈরি। জিশানের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে গ্নাভ্স পরে নিতে লাগলেন। দুবার হাই তুললেন।

জিশানের ভেতরে হেনস্থর ঘৃণা অসংখ্য বুদ্দুদ হয়ে উথলে উঠতে লাগল। কিন্তু ও চোয়াল শক্ত করে প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগল।

শ্রীধর ডানহাত শূন্যে তুলে ম্যাজ্রিশিয়ানদের মতো একটা ইশারা করলেন। বোঝা গেল ইশারাটা টেবিল ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদ্রে জন্য। ওদের চারজন পলকে গতিশীল হল। এগিয়ে আসতে লাগল জিশানের দিকে।

বাকি দুজন গার্ড টেবিলের গয়ে লাগনো লুকোেো কোনও বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে চারটে স্টেইইলেেস স্টিলের ব্যাড টেবিলের মেটাল টপ ফুঁড়ে গজিয়ে উঠল। ব্যান্ডণুলো দেখতে ওলটনো ইউ’ অক্রের মতো।

জিশান কর্ডের প্যান্টট। খুলে মেরেরেত ছুড়ে দিল। খানিকটা অবাক চোথে টেবিলের চারটট স্টিল ব্যান্ডকে দেখত়ে লাগল। ওর শরীরের সঙ্গে এই বিশেয টেবিলটার সম্পর্ক ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

জিশানের জাঙ্গিয়া পর্স লম্বা দেছটার দ্যিক কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেল
 জিশানকে ঘিরে থাকা চারজন গা্ডও।

खীর্র হাসলেন। চাপা গলায় বললেন, 'স্টার্ট অপারেশান—’’
সঙ্গে-সজ্গে চারজন গার্ড একরকম ছিটটে চলে এল জিশানের কাছে। নিমেষের মধ্যে দুজন ঙর হাত চেপপ ধরল। আর বাকি দুজন মেঝেতে থেবড়ে বসে পড়ে ওর পা শক্ত মুঠায় চেপে ধরল।

জিশান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইইল। গার্ডদের বাঁধন ছাড়ানোর এতটুকুও চেষ্টা করল না। প্রথমত, ও দেখতত চাইছিল বাযাপারটা কতদূর গড়ায়। দ্বিতীয়ত, ও গার্ডদের কোমরে বোলানো শকারগুলোর কথা ভোলেনি।

দু-গতের কবজিতে এবং দু-পায়ের গোড়ালির গাঁটের ঠিক ওপরে জিশান গার্ডদের মুঠোর চাপ অনুভব করছিল। ৫ তাকিক্যে ছিল এ আর কিউ-র দিকে। দেখল, কিউ-র হাতের ঝিকিমিকি তরলের স্বচ্হ কৌটোটা চালান হয়ে গেন এর গ্ধাভ্স পরা হাত। এ কৌটোটা শূন্যে উঁচিত্রে ধরে চোখ সরু করে কী যেন পরখ করতে লাগলেন। কৌটোর তরলটা মাঝো-মাঝে নাড়ছিলেন, এবং আপনমনেই বিড়বিড় করে কীসব বলছিলেন।

শ্রীধর পাট্টা কোমরে দু-গাত রেথে ঠোটে সামান্য তেরছা হসি ফুটিয়ে জিশানকে দেখছিলেন। এ-র দিকে নজর ফিরিয়ে মিহি অথচ রুক্ষ গলায় বললেন,
'সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করুন—।'
এ চমকে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, ‘করছি, স্যার, করছছ—P

এ কৌটোট গাতে করে কিউ-কে সল্গে নিয়ে চলে এলেন জিশনের ঠিক পিছনে। জিশান ওঁদের আর দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টাও করল ना।

কৌটোর ঢাকনা খুনলেন এ। কৌটো কতত করে খানিকটা তরল গ্লাভ্স পরা হাতে ঢেলে নিলেন। কৌটো আর ঢককা কিউ-র হাতে ধরিয়ে দিলেন। তারপর হাতের তরল তেন মাখানোর মতো.করে জিশানের পিঠে মেথে দিতে লাগলেন।

জিশান অবাক হলেও চুপ করে রইল। পিঠে মাখির্রে দেওয়া তেলটা যে বেশ ঠাডা সেটা অনুভবে টের পেল।

ঘরে কোনও শব্দ নেই। ুধু জিশানের নগ্ন পিঠে দস্তানা পরা একটা शাতে তেল মাখান্নের চাপড়ের শব্দ।

শ্রীধর পাট্টা পাথরের মূর্তির মতো স্থিরভবে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ব্যাপারঢা লক্ষ করছিলেন আর কোনও কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষ করছিলেন।

জিশানের ঘাড়, পিঠ, কোমরের পিছছ্র জাঙ্গিয়ার সীমারেখা পর্য্্ত
 কিউ-র দিকে।

ওঁদের মধ্যে নীরবে কী কথা হল। কিউ তরলের কৌটো এবং ঢককা এ-র হাতে তুলে দিলেন। তারপর নিজের পরেট থেকে একজোড়া নীলচে গ্লাভ্স বের করে হাতে পরে নিলেন। এ-র কাছ থেকে তরল ঢেলে নিলেন হাতে। এবং মেঝেেে উবু হয়ে বসে জিশানের পায়ের পিছনদিকটায় মাখাতে লাগলেন।

তেল মাখানোর সুবিধের জন্য জিশানের পা ধরে থাকা দুজন গার্ড তাদের হাতের বাঁধন সরিয়ে নিল।

জিশানের অস্বস্তি হচ্ছিল। একজন নামি বিজ্ঞানী, সিভিকেটের দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট, ওর পায়ে এভাবে ‘তেল’ মাখাচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণেইই ওর মনে হল গণপত আচারিয়া দু-নম্বর সায়েন্টিস্ট নয়, ‘দু-নপ্বরি’ সায়েন্টিস্ট। সেইজনাই শ্রীধর পাট্টার পায়ে উনি তেল মাখান-দিন-রাত। জিশানের পা শ্রীধরের চেয়ে এমন কিছু খারাপ নয়! সুতরাং জিশান কেন অস্বস্টি পবে?

কিন্তু মনে-মনে যতই যুক্তি খাড়া করুক না কেন, জিশান কিছুতেই পুরোপুরি সহজ হতে পারছিল না।

তরল মাখানোর কাজ শেষ হলে কিউ সোজা হয়ে দাঁ়ালেন। এ আর কিউ জিশানের কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গেলেন। তারপর ওঁরা তকালেন

## ২২ <br> www.banglaboesk platf.tölogspot.com

শ্রীধর পাট্টার দিকে। যে-দৃষ্টির অর্থ, আমাদের কাজ শেষ।
‘থ্যাংক য়ু-' বললেন শ্রীধর এবং আঙুলে তুড়ি মেরে গার্ডদের ইশারা করলেন।

ঢারজন গার্ডের একজন জিশানের খুব কাছে এসে ছোট্ট করে বলল, ‘ওই টেবিলটায় গিয়ে শুয়ে পড়ো...’ তারপরই ফিসফিস করে বলল, ‘্লিজ...।’

জিশান চমকে চোখ ফেরাল গার্ডের চোখে। ও কি ভুল শুনছে? লোকটা বলছে, ‘প্লিজ...!

গার্ডের চোথে একচিলতে ‘বন্ধু’র ছোয়া। তার সঙ্গে সামান্য শ্রদ্ধাও কি টের পাওয়া यাচ্ছে না?

জিশান একইরকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। তারপর চটপট পা ফেলে বাধ্য ছেলের মতো বিশাল টেবিলটার ওপরে গিয়ে শয়ে পড়ল। তখনই ও লক্ষ করল, এ এবং কিউ ঘন-ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। ঢারজন গার্ড টেবিলের চারদিক থেকে এগিয়ে এল। कী এক কায়দায় চারটে স্টিল ব্যান্ড জিশানের হাতে-পায়ে এ̃টে দিল। জিশান লক্ষ করল, ওই চারজন গার্ডও কখন যেন এ এবং কিউ-র মতো হাতে লেটেত্স-এর দস্তানা পরে নিয়েছে।

 কারুকাজ দেখতে লাগল। উজ্জূল আলোর আধুনিক জরিপ করতে লাগল।

এইসব লৌখিন ঘর আর তার আধুনিক সরজ্জাম ওন্ড সিটির অভাবী মানুষগুলোর কল্পনার বাইরে। বস্তির ওই ঘরে মিনি ছোট্ট শানুরে নিয়ে কী কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! মিনিকে ও গত সপ্তাহেই ওর প্রাইজ মানি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছে। সিভিকেট টাকা পাঠানোর সব বন্দোবস্ত করে দিত্যেছে। কিল্তু..

সঙ্গে-সল্গে মনোহর সিং-এর কথা মনে পড়ল। হাসিখুশি সরল লোকটা এই দুনিয়ায় একা ছিল। না কোই আগে, না কোই পিছে/উপর আস্মা, ধরতী নীচে। এখানে এসে জিশান, গোকন ওদের সঙ্গে লোকটার বক্ধুত্ব হয়ে গেল। আর হয়ে গেল বলেই জিশানরা এখন মনে-মনে এত কষ্ট পাচ্ছে। ওই গর্তের ভেতরে শেষ নিশ্বাস ফেলার সময় মনোহরেরও নিশ্য়ই খুব কষ্ট হয়েছে।

জিশান নানান চিত্তায় বিভোর ছিল। হঠাৎই থেয়াল করল, এ আর কিউ দ্ত্তানা পরা গাতে ওর বুকে তেল মাখচ্ছেন।

কিন্তু কেন?
এই তেলের কী এমন গুণ? এই তেন कী এমন শাস্তি দিতে পারে? শ্রীধর বলছেন, এই শাস্তিতে কোনও ব্যথা লাগবে না, জিশানের কেটে-ছড়ে যাবে না, ‘য়ু উইল রিমেইন ইন গুড হেল্থ—অ্যাডড ইন ওয়ান পিস।’ তা

## হলে শাস্তিটা হবে কেমন করে?

জিশান অবাক হয়ে এইসব ভাবছিল আর দুই বিষ্ঞানী জিশানের বুকে, গাতে, পা়্যে তেল মাখাচ্ছিলেন।

শ্রীধর কৌতুকের চোেে বাপারস্যাপার লক্ষ করছিলেন। দুটো হাত বুকের কহে আড়াআড়িভাবে রেথে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। জিশানের অবাক ভাবটা বেশ আন্তরিকভবে উপভোগ করছিলেন।

তেল মাখানো শেষ হয়ে গেল মিনিট পাচেকের মধ্যেই। তেলের কৌটোটা দস্তানা পরা একজন গার্ডের হাতে ধরা ছিল। সেটা চেয়ে নিলেন আচারিয়া। তারপর তিনি আর চক্রপাণি জিশানের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। আচারিয়া শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাদ্র কাজ শেষ, স্যার...।'
'গুড। ওড-' বিষ্ঞানী দুজনের দিকে দু-পা এগিয়ে এলেন শ্রীধর। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে আচারিয়ার দিকে নজর ফেরালেন। চোখ নাচিয়ে জিগ্যেস করলেন, ‘সিনেমা তরু হতে আর কতক্ষণ লাগবে?’

তেলের কৌটো পকেটে রেখে আচারিয়া টাকে আলতো করে হাত বোলালেন। নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে বললেন, ‘বড়জোর দশ মিনিট...।’
‘আর স্থ শিয়োর’’ ভুরু ক্চঁকে জান্রে মাইলেন। VVMN (

শ্রীখর ছোট্ট করে ‘্ছঁ’ শব্দ করলেন। তারপর এদিক-ওদিক পায়চারি করতে শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন গভীর কোনও চিত্তায় ডুবে आছেন।

কিউ এবং এ ওঁদের চেয়ারের কাছে ফিরে গেলেন, বসে পড়লেন। চক্রপাণি চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেললেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে চশমার কাচ ঘবে-ঘবে মুছতে লাগলেন। এবং পরপর তিনবার হাই তুললেন।

আচারিয়া চক্রপাণির হাই তোলা দেখছিলেন এবং নিজের হাই ওঠার ब্রোকটটা প্রাপণে চাপতে চেষ্টা করছিলেন।

হাই তুলতে-তুলতে মিহি জড়ানো গলায় এ কিউ-কে বললেন, 'সাবজেক্টের রিঅ্যাকশানগুলো নোট করে নিন। সলিউশানটার ইমপ্রুভমেন্টে কজে লাগবে।’
‘য়ু আর রাইট।’ বলে কিউ জামার বুকপকেট থেকে ছোট নোটব্ই আর পেন বের করে তৈরি হয়ে বসলেন।

সময় খুব 丹ীরে-ষীরে কাটছিল। ঘরে কোনও শব্দ নেই। শুধু বুকের ভেতরে হৃৎপিতের ধকধক শব্দটা জিশানের কানে ঘড়ির কাঁটার শব্দ বলে মনে হচ্ছিল। গণপত আচারিয়ার দশ মিনিট’ কথাট জিশান শুনতে পেয়েছিল। তাই

ও ধৈর্য ধরে সময়ের এক-একটা স্তর ডিঙোত লাগল।
সাড়ে ন’ মিনিটের মতো সময় পেরোতেই শ্রীষর পাট্টা জিশানের টেবিলের কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এলেন। চিত হয়ে থাকা অসহায় জিশানের দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হেসে বললেন, ‘সিনেমাটা আমি ভালো করে পুরোটা দেখতে চাই। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দু মিস ইভ্ন আ সিঙ্গল মোমেন্ট অফ দ্য শো-।'

জিশান কোনও উত্তর দিল না। ওধ্রু স্থির চোখে শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে রইই। ওর চোখ জ্রালা করছিল। ক্লান্তিতে হাই উঠতে চাইছিল।

কিছুক্ষ পর ব্যাপারটা হঠাৎ করেই শুরু হল।
জিশানের মনে হল, অণু-পরমাণু মাপের সূক্ম্ম পিপড়ে—অসংখ্য পিপড়ে —ওকে সূক্ষ্ম কামড়ের एল ফোটাত ऊুরু করেছে। বলতে গেলে হালকা দুলকুনির মতো হয়ে ব্যাপারট শরু হল।

প্রথম-প্রথম জিশানের আরাম লাগছিল, কিন্তু দশ-পনেরো সেকেড্ড পার হতেই চিড়বিড়ে চুলকুনি জিশানকে অস্থির করে তুলল। কিন্তু তা সত্ত্রে ও দাঁতে দাঁত চেপে ওই অড্ভুত চूলকুনি সহ করতে লাগল।

ব্যাপারটা ক্রমেই তীব্রতায় বাড়তে লাগল। মিষ্টি এবং তীব্র দুলকুনি। তাতে কোনও জালা নেই, কোনও यস্তণণ নেই। কিন্তু জায়গাট দৃলেকোহ না পারার
 হাত-পায়ের বাঁধন ছাড়াতে চাইল। তাত যা হওয়ার তাই হল। স্টিল ব্যান্ডের সঙ্গে ঘষটানিতে ওর কবজি এবং গোড়ালির গাঁট ছড়ে যেতে লাগল।

শ্রীধর পাথরের মৃর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জিশানের দশাবিপর্যয় লক্ষ করছিলেন আর মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

জিশানের দেহটা ধনুকের মতো বেঁকে গিয়ে শূন্যে উঠছিল আর শব্দ করে মসৃণ টেবিলে আছড়ে পড়ছিল। একইসক্গে ও মাথা ঝাঁকাচ্ছিল এপাশওপাশ। আর ওর হাতের আঙ্লুলুলো বারবার বাতাস आঁকড়ে ধরছিল। মনে হচ্ছিল, ও বাতাসের মধ্যে ডুনে যাচ্ছে, আপ্রাণ বাঁচত্তে চেষ্টা করছে।

জিশান পাগলের মজো ছটফ্ট করছিল বটে কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও আর্ত শব্দ করতত চাইছিল না। কারণ, শ্রীধর পাটার সামনে এই প্রায-উলজ্গ অবস্থায় অসহায়ভবে চিৎকার করাটা প্রায় প্রাণভিক্ষার কাতর অনুনয়ের মতো লোনাতে পরে। সেটা জিশান কিছুতেই করতে চায় না। তাই ও প্রাণপণে আা্মসম্মান রক্ষর চেষ্টা করছিল।

কিন্তু তা সত্ত্রে চাপা গোঙানির মতো একটা শব্দ জিশানের গলার ভেতর থেকে উথলে উঠছিল।

বিছুটিপাতা গায়ে ঘযলে কীরকম চুলকোয় জিশান জানে না। কিন্তু ও

নিশ্চিতভাবে বলতে পারে, এই ঝিকিমিকি তরলের ক্ষমতা বিছুটিপাতার চেয়েও অনেক বেশি। কারণ জিশানের সর্ব অঙ্গে চুলকুনির এমনই ফুলঝুরি ছুটছিল যে, ওর মস্তিষ্ক ঠিক-ঠিকভাবে চিস্তা করতে পারছিল না।

তবুও জিশান মিনি আর শানুর কথা ভাবতে লাগল।
শ্রীধর পাট্টা ওকে জিগ্যেস করলেন, 'বাবু জিশান, কাল রাতে তুমি জিপিসির বাইরে বেরিয়েছিলে?

যে-চিৎকার জিশান এতক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেপে রেখেছিল সেটাই শ্রীধরের প্রশ্নের উত্তর হয়ে আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের মতো ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল : 'না! না! না! ना! ना!’

শ্রীধর চওড়া হাসলেন ঃ 'তুমি তা হলে কাল রাতে তোমার কোয়ার্টার ছেড়ে বেরোওনি?'

আবার ছিটকে বেরোল সেই লাভাস্রোত : 'না-না-না-না-না!’
জিশান পান্ডার কথা ভাবছিল। ওর সেই অভিব্যক্তিছীন ঠান্ডা দৃষ্টি। যেদৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞা ঝিলিক মারছিল। অথচ ওর শরীর তখন অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত।

জিশান হিমশীতল চোখে শ্রীধরের দিকে তাকাল। মনে-মনে ভাবল, ও যেন বেরিয়ে এসেছে নিজ্গের দেহের বাইরো শূূন্য ভেসে বেডারে-বেডাতে ও
 ওঁর ক্ষমতা আর প্রভুত্ব মেশানো বেপরোয়া অভিব্যক্তি।

নিজের অনুভূতির সুইচ অফ করে দিল জিশান। অন্তত অফ করে দিতে চেষ্টা করল। মনে-মনে ভাবল, আর কতক্ষণ এই অমানুষিক অবস্থা চলবে কে জানে!

দূরের টেবিলে বসে গণপত আচারিয়া জিশানের প্রতিটি প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে লক্ষ করছিলেন আর নোট নিচ্ছিলেন। মাঝে-মাঝে চক্রপাণির সঙ্গে চাপা গলায় কীসব আলোচনা করছিলেন।

চক্রপাণি হ্ঠাৎই এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন। একটা দীর্ঘশ্ধাস ফেলে বললেন, 'অ্যামেজিং এনডিয়োর্যান্স! আর কেউ এতটা সহ্য করতে পারত না...।' আচারিয়া বললেন, 'তা হলে কি আমদের কেমিক্যালটা ততটা স্ট্রং হয়নি ? কিন্তু আমরা নরম্যাল কোনও মানুষকে যে-অ্যামাউন্টের কেমিক্যাল অ্যাপ্লাই করে রেজাল্ট পাই জিশানকে তার অ্যাপ্রক্সমমেটলি থ্রি টাইম্স অ্যাপ্লাই করেছিলাম। তাতেও তো দেখছি...।'
‘এখন এসব ডিসকাশন থাক—’ আচারিয়াকে থামিয়ে দিলেন চক্রপাণি। চাপা গলায় বললেন, 'মার্শাল এসব কথা তুনলে প্রবলেম হতে পারে। বরং আমরা এই কনক্লশানই জানাব যে, জিশান পালচৌধুরী নরম্যাল মানুষ নয়-

ওর এনডিয়োরানান্স ফ্যাক্টর অ্যাবনরম্যালি হাই। জিশান ইজ আ্যান একসেপ্শান...।' চক্রপাণির কথায় সায় দিয়ে আচারিয়া চুপ করে গেলেন। তারপর কবজির ঘড়ির দিকে তাকালেন। ছোট করে বললেন, 'টাইম ইজ আপ-।

এ-কথা বলার দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্ধেই জিশানের চুলকুনি কমতে লাগল। ও চোখ বুজে হাপাতে লাগল। ওর বুক ওঠা-নামা করতে লাগল। হাপরের শব্দ বেরোতে লাগল মুখ দিয়ে।

শ্রীধর পাট্টার মুঢ্খের সূর্যোদয়ের মুচকি হাসি মিলিয়ে গিল্যেছিল। তার বদলে সূর্যাস্ত নেমে আসছিল। হিমশীতল ইস্পাতের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ছিল মুথের ওপরে।

হারতে শ্রীধরের ভালো লাগে না। কিন্তু নিতান্তই যদি হারতে হয় তা হলে পরমুহূর্ত থেকেই পরের লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতেও জনেন তিনি।

সুতরাং শ্রীধর চোয়াল শক্ত করলেন। দাঁড়িয়ে থাকা গার্ডদের দিকে ইশারা করলেন। বললেন জিশানের বাঁধন খুলে দিতে। তারপর ধীরে-ধীরে পা ফেলে আচারিয়া আর চত্রপাণির টেবিলের কাছে ফিরে গেলেন।

স্টিল ব্যান্ডের বাঁधন খুলে যেতেই জিশান টেবিলে উঠে বসল। মাথা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগল। ওর শরীরে সামান্য জ্বালা-জ্বালা ভাব চিড়বিড় করছিল।

 হাত চেপে শও্রষযা করতে চাইল। তারপর পাছায় ভর দিয়ে শরীরটাকে নব্বই ডিগ্রি ঘুরিয়ে টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল। লক্ষ করল, ওর ফরসা শরীর বেশ লালচে হয়ে গেছে।

জিশান শ্রীধরকে লেখছিল। লোকটা বোধহয় স্যাডিস্ট প্রকৃতির। কিস্তু আজ জিশান ওঁকে জেতার ছৃপ্তি দেয়নি। লোকটার দিকে তাকিয়ে জিশানের ঘেন্নায় থুতু ফেলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও তা করল না। বরং ঠোটেের কেণে একচিলতে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে শ্রীধরকে দেখতে লাগল। যেন বলতে চাইল, 'তুমি কতদূর যেতে চাও? আমি তার চেয়েও বেশি দূর যাওয়ার ক্ষমতা রাথি।’

শ্রীধরের চোেে চোখ রেখে মেঝেতে পড়ে থাকা প্যান্ট আর টি-শার্টের
 তারপর শ্রীধরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ঠোটে সেই হাসির ছোয়া।

শ্রীধরের জায়গায় অন্য কেউ হলে হয়জো জিশানের হাসি দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতত, জিশানকে চড়-থাপ্রড় মেরে হেনস্থা করে প্রতিশোধ নিত। কিন্তু শ্রীধর আশ্চর্য ধাতুতে গড়া।

জিশানের কাছে এগিয়ে এসে ডানহাত বাড়িয়ে দিলেন। ওর সঙ্গে

হান্ডশেক করে বললেন, ‘থ্যাংক য়ু ফর ইয়োর নাইস কোজপরেশান। যু মে লিভ নাউ—।

জিশান ঠোঁটের হাসিট আরও একটু ছড়িয়ে দিয়ে বলল, ‘়্ু আর ওয়েলকাম...।'

শ্রীধর দুজন গার্ডকে ইশারা করলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানের দুপাশে গির্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা জিশানকে এসকর্ট করে জিপিসি-র কোয়ার্টরে পৌঁঁছে দেবে।

এতক্ষণ পর ঘুম্রে টান আর ক্লান্তিতে জিশান একটা হাই তুলল।

সাইকোলজিক্যাল প্রোফইলিং কাজা বড় সহজ নয়। কম্পিউটারের মনিটরের দিকে তাকিয়ে ট্রাই-ডাইম হলোগ্রাম ইম্মেগুলো দেখতে-দেখতে এই কথাটই বারবার রঙ্গ্রকাশের মনে হচ্ছিল।

নিউ সিটিতে জিশান পাল টৌুরী আসার পর থেকে ওর যত ভিডিয়ো ফটো আর হলোগ্রাম ইম্মে তোলা হয়েছে তার সবটাই একটা ট্রাই-ডাইম মইক্রোসিডি-তে রাইট করে সুপারগেম্স কপ্পোরেশন রহ্গপ্রকাশকে দিত্যেছে। রঙ্গ
 সাইকোলজিক্যাল প্রোফইল তৈরি করা।

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্ধাস নিউ সিটির বিখ্যাত সাইকোআ্যানালিস্ট। নিউ সিটির ‘সাইকোঅ্যানালিসিস সেন্টার’-এর চিফ সাইকেেলজিস্ট। নিউ সিটির সিস্টেমের বিরুদ্ধে যারা সরাসরি কিংবা আড়ালে আওয়াজ তেলে তদের সাইকেপ্রোব করাটা রঙ্গকাশের প্রধান কজের তালিকার মধ্যে পড়ে। সিভিকেটের ‘ক্রাইম কন্ট্রোল’ ডিভিশন প্রয়়ই রর্গ্রকাশের সাহাযা চায়। এবং রর্গপ্রকাশ সাহায্য করেও থাকেন।

গত দু-সপ্তাহ ধরে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফইলিং-এর কাজে ব্যু তিনি। কম্পিউটারের পরদায় ওর ছবি বারবার দেখছেন। দেখছেন টুডাইমেনশন্যাল এবং হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ। ভিডিয়ো ক্লিপগুলো কখনও ‘নরম্যাল’ স্পিডে দেখছেন, কখন আবার ‘স্লে’’ কিংবা ‘ভেরি স্লে’ মোডে দেখছেন। ইচ্ছেমতো কোনও «্রেমকে ‘ক্রোজ-আপ’ মোডে দেখছেন কিংবা বেশ কয়েক গুণ মাগনিফাই করে জিশানের চোের কোেের ভাঁজ অথবা রোমকূপ পর্যষ্ত পরখ করে নিচ্ছেন। আর সেই ভিডিয্যোর মিছিল থেকে দরকার মতো ছবি ক্লিপ করে নতুন-নতুন ফাইলে স্টোর করে নিচ্ছেন।

তারপর সেই ফাইলের ছবি ও কথা আবার স্টাডি করছেন এবং কখনও-

এইসব তথ্যের সঙ্গে নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিবেচনা কাজে লাগির্যে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফইলের রিপোর্ট তৈরি করছিলেন রঙ্গক্রকাশ। রিপোর্ট শেষ হলৌই সেটা ‘কনফিডেনশিয়াল’ খামে ভরে তুলে দিতে হবে শ্রীধর পাট্টার হাতে। ওটা কিল গেমের প্রেনোশনাল ভিডিয়ো ট্রেলার-এ ব্যবহার করা হবে। কিংবা হয়তো আরও কোনও কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে—সেটা একমাত্র শ্রীধর পাট্টাই ভালো করে জানেন।

ক্লান্তিতে ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল রঙ্গপ্রকাশের। অথচ দুশ্চিন্তায় ঘুম আসছিল না। দুশ্চিন্তার পেন্ডুলামটা মাথার ভেতরে দুলছিল। আর শব্দ হচ্ছিল, ঢং-ছং।’ সেই শব্দ রঙ্গপ্রকাশ ছাড়া আর কেউ শনতে পাচ্ছিল না।

দুশ্চিন্তার কারণটা এখনও ন্ত্রীকে খুলে বলেননি। আর ছেলে সিমানকে বলার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না! যেহেহু আজ, এই মুহূর্তে, যে-সংকটের মুখ্যেমুখি রঙ্গপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রয়েছেন তার উৎসে রয়েছে সিমান।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। দু-চোখ বুজে মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে দিলেন। একটা বড় শ্বাস ছাড়লেন : ‘আ-আ-আঃ!’

ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্ধাস নিউ সিটির কদরদান বিষ্ঞানী। ডক্টর মনসুখ চক্রপালি আর ডক্টুর গণপত আচারিয়া তাঁদূর অবিষ্কার এবং গর্বেষণার জন্য
 নয়। তার কারণ, রস্গপাশের কাজের ধরনটা একটু অন্যরকম।

চক্রপাণি এবং আচারিয়া যেসব গবেষণা করেন বা আবিষ্কার করেন তার দরকার বাইরের পার্থিব জগতের জন্য। সেগুলো চোে দেখা যায়। তার ফল পাওয়া যায় হাতেনতে-অন্তত এখন না হলেও ভবিষ্যতে। তাই ব্যাপারটা প্রচারের আলোয় চলে আসে চটপট।

রঙপ্রক্শেের কাজ অন্তঃসলিলা। মানুষ্ের মন নিয়ে ఆঁর কাজ। বেশিরভাগ সময়েই ওঁকে কোনও মানুভের ফটোগ্রাফ দেখে কিংবা ভিডিয়ো ফুটেজ দেখে তার মানসিক গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিতে হয়। সেইসব মতামত থেকে শ্রীধর পাট্টা, সিন্ডিকেট, কিংবা সুপারগেম্স কর্পোরেশন অতীত বহ্বার লাভবান হয়েছে। কিন্ত তাতে বাইরে কোনও ইইচই হয়নি। শ্ধু শ্রীধর পাট্টা বা সিন্ডিকেট রঙ্গপ্রকাশবে. বাহবা দিয়েছে। তার সঙ্গে আর্থিক পুরস্কারও জুটে গেছে কপালে। কিন্তু প্রচারের আলোর বৃত্তে ঢুকতে পারেননি। কারণ, ওঁর কাজের ধরনটাই গোপন-একান্ত গোপন।

এসব ছাড়া রর্গপ্রকাশ নিয়মিতভাবে আরও একটা দায়িত্ব পালন করেন : তিনি শ্রীধর পাটার পার্সোনাল থেরাপিস্ট। এই একটিমাত্র ক্ষেত্রে তিনি কোনও পেশেন্টের সঙ্গে সরাসরি ইন্টারঅ্যাক্ট করে সাইকিয়াদ্রিস্টের প্রথাগত ভূমিকা

নেন। এবং এই কাজটা করেন অত্তন্ত গোপনে। ডাক্তার এবং পেশেন্ট ছাড়া আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তি এই নিয়মিত থেরাপির কথা জানে না। আর-কেউ যে জানবে না, সেটটই শ্রীধরের নির্দেশ-সুতরাং সেটাই আলটিমেট কোড অফ কনডাক্ট'।

রঙ্গপ্রকশের এই বিশেষ দায়িত্বটা বলতে গেলে একধরনের গোপন সম্মান। শ্রীধরের মনের অলিগলির ণ্খাঁজখবর শ্রীধরের চেয়ে অনেক বেশি জানেন রহ্গপ্রকাশ। শ্রীধর পাট্টাকে তিনি ভেতর-বাইরে দেখতে পান। আর দেখতে পান বনৌই ওঁকে ভয় পান। অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভয় পান।

কিক্তু এখন সিমানের তৈরি করা দুশ্চিন্তা ওঁকে শ্রীধরের ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বলতে গেলে সিমানই ঠিক করে দেবে ওঁদের আগামীদিনের জীবন কীরকম হবে।

অড্ডুত এক বেদনায় রঙ্গপ্রকশের চোথে জল এসে গেল। চোখ বুজে থাকা অব্থাতেই কষ্টটা অনুভব করতে লাগলেন। মনের জোরে সেটাকে কমাতে চাইলেন। একদু পরে ভিজে চোখ খুলে সামনের খোলা জানলার দিকে তাকালেন।

জানলায় ফোোর্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। কিন্তু জননলার দিকে তাকিয়ে সেটার অস্তিত্ব বোঝার কোনও উপায় নেই। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই প্রকুতিকে ছোয়া যাব্। অথ巨 বাইরের সৃক্ষ ধৃলিকণা বা জীবাণা জানनা
 সুরক্ষিত।

কিন্তু সত্তিই কি সুরক্ষিত?
থোলা জানলায় অতিস্বচ্ছ ন্যানোপলিমার প্লেট অদৃশ্য মায়া তৈরি করেছে। সেই মায়ার ঘেরাটোপে বসে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবছেন রগ্গপ্রকাশ।

বাড়িতে এখন কেউ নেই। স্ত্রী পর্ণমালা মিটিং-এ গেছে। নিউ সিটির ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট কাউন্সিলের ও সেক্রেটারি। আজ নতুন একটা ইমপোর্ট পলিসি নিয়ে সাংঘাতিক জরুরি একটা মিটিং আছে। মিটিং শেষ হতে সময় লাগবে।

ছেলে সিমানও বাড়িতে নেইই এখন। রোজ বিকেলে যেমন বন্ধুবাক্ধব নিয়ে বেরোয় তেমনই বেরিয়েছে। রাত বারোটর আগে ও ফিরবে না। আঠেরো বছর বয়েলেই সিমান জীবন্নে ‘আসল’ মানে জেনে গেছে: জীবন মানে ফুর্তি আর বাজি। অর্থাৎ, ই-ল্যাল্ডে গির্যে ফুর্তি করো, আর বিভিন্ন গেমে বেপরোয়া বাজি ধরো।

ওরা কেউ বাড়িতে নেই। তাই রঙ্গপ্রকাশ প্রাণ খুলে কাঁদতে পারছিলেন।
নিউ সিটির বৈভবের জীবনটা शীরে-বীরে এরকম ফাঁপা হয়ে যাক তিনি কখনও চাননি। অথচ...।

রঙ্গপ্রকাশের কম্পিউটার-রুমটা মপপে বিশাল।

## www.banglabroek pact.tbiogspot.com

তিরিশ বাই কুড়ি মপেের ঘরটা আধুনিক পেশাদার অফিসের মতো করে সাজানো। ঘরে পাশাপাশি তিনটে টেবিলে তিনটে প্লাজ্মা কম্পিউটার। তিনটে মেশিনই রঙ্গপ্রকাশ একা ব্যবহার করেন। এ ছাড়া রয়েছে একটা বড় অফিসটেব্ল। তাতে নানান কাগজপত্র, ট্রাই-ডাইম মইক্রোসিডি, পেন, বই, মোবাইল ফোন এলোমেলোভাবে ছড়ানো। এই ছন্নছাড়া টেবিলটা দেখে বোঝা যায় বে, রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস বিজ্ঞানী। যদিও পর্ণমালা এবং সিমানের ধারণা, সাইকিয়াট্রিস্টকে ঠिক বিজ্ঞানী বলা যায় না।

ওদের কথা ওনে রঙ্গপ্রকাশ মনে-মনে হাসেন। ওঁর মনে পড়ে যায় কয়েকশো বছর আগের একজন বিষ্ঞানী সিগমুড্ড ফয়েডের কথা। যাঁর হাতে মনোবিষ্ঞান সঠিক চেহারা পেয়েছিল, একটা দিশা খুঁজে পেয়েছিল। ওুয়েড বলেছিলেন, অনেকেরই ধারণা সাইকোলজি বিষয়টা তাঁরা বেশ ভালোই বোঝেন-কারণ, চাঁরা প্রত্যেকেই একটা করে মনের মালিক।’

রঙ্গক্রকাশ জানেন, মনের ওপর মালিকানা থাকলেই তাকে বোঝা যায় এমনটা কখনওই নয়। তাই যদি হত তা হলে শ্রীষর পাট্টা মোটেই রঙ্সপ্রকাশের কাছে নিয়মিত ‘সিটি’’ দিতেন না।

চোখের জল মুছে রঙ্গপ্রকাশ ঘরটাকে জরিপ করতে খুু করলেন। ভাবঢে চাইলেন, তিনি য্যেন এক অচেনা অপপন্ত্রক-इঠাৎ করে এই ঘরটায়


ঘরের সব ফার্নিচারই সেমি-ট্রান্সপারেন্ট-গ্গাস পার্টিক্ন ইম্প্রেগনেটেড পলিমরের তৈরি। ফলে বাইরে থেকে আসা বিকেলের আলো আর ঘরের সাদা আলো মিলেমিশে ঢুকে পড়ছে ফার্নিচারের অন্দরমহলের আনাচেকানাচে। ছোটবড় নানান মপপের আলোর টুকরো দিয়ে এক রহস্যময় নকশা তৈরি করেছে।

ঘরে পাশাপাশি দাঁড় করানো চারটে সুদৃশ্য বুককেস। তাতে সাইকেলজিির প্রচুর বই আর মাইজ্রোসিডির বাক্স ঠাসা। ডানদিকের দেওয়ালে ফোেোঅ্যাকটিভেটেড একটা জায়ান্ট সাইজের প্লেট টিভি। টিভির মুটোমুখি আর-এক দেওয়াল ঘেঁষে একটা সুন্দর ছাঁদের লম্বা সোফা। তার গদি-বালিশ সবই স্বচ্ছ পলিমারের আবরণে বন্দি রঙিন বাতাস দিয়ে তৈরি। ওই আবরণের ভেতরে বিভিন্ন রঙের স্রোত অত্যন্ত ধীরে খুশিমতো ভেসে বেড়াচ্ছে। রঙ্গপ্রকাশ জানেন, ইমপোব্তেড এই জিনিসগুলোতে ডায়ানামিক ডেনসিটি গ্র্যাডিয়েন্ট আর স্ট্যাটিক চার্জ টেকন্নোলজি ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘরের ভেতরে একটা হালকা সুগন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছিল। বিষ্ঞানীর মুড ঠিক করার জন্য এই রুম <্রেশনারের ব্যবস্থা। এ ছাড়া খুব নীু গ্রামে হালকা মিউজিক বাজছিল। ভললো করে থেয়াল করলে তবেই সেই মিউজিকের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। বিষ্ঞনীীর ক্রিয়েটিভিটিকে উসকে দেওয়ার এই ব্যবস্থা রঙ্গ

প্রকাশের খুব পজিটিভ বলে মনে হয়।
কিক্তু এই মুহূর্তে সবই কেমন নেগেটিভ লাগছিল।
জানলার বাইরে তাকিয়ে, রঙ্গপ্রকাশ দেখছিলেন লতানে গাছ। গাছে ছোটছোট বর্ণালি ফুল। দূরে, রাস্তার ওপারে, সুন্দর ছোট-বড় বাড়ি। সব বাড়িরই চেহারায় আকর্ষণীয় জ্যামিতি। শুধু চোখে দেত্থেই বোঝা যায়, নিউ সিটির আর্কিটেক্চার কত আধুনিক।

আधুনিক এই শহর ছেড়ে যেতে চান না তিনি। কিন্তু হয়তো যেতে হবে। কারণ, আজ সকালেই ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভিতে সিভ্ডিকেটের ওয়ানিিং পেয়েছেন।

এই ওয়ার্নিং-এর পিছনে কে আছে তিনি জানেন-শ্রীধর পাট্টা। কিন্তু শ্রীধরকে ঠিক দায়ী করা যায় না। কারণ, নিউ সিটির বরাবরের নিয়ম এটাই। ই-আই—মানে, ইকনমিক ইনডেক্সই এখানে প্রথম-এবং শেষ কথা।

ওয়ার্নিং-चা যে আসতে চলেছে মাসখানেক আগে থেকেই সেটা অনুমান করতে পেরেছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এবং আজ সকালে সেটা এসে গেছে।

ওয়ান্নি-টার কথা পর্ণমালাকে এখনও বলেননি। সিমানকেও নয়।
এই ওয়ার্নিং পাওয়ার পর সিন্ডিকেট মাত্র তিনমাস সময় দেয়। সেই



বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। এত বছর ধরে নিউ সিটির মনোরম বিলাসী জীবনयাত্রায় অভস্তস হয়ে তারপর হঠাৎ করে এস্মপাল্শান! ত্যাজ্যপুত্রের মতো রর্গ্রকাশরা হয়ে যাবেন ‘ত্যাজ্য-নাগরিক’। ওঁদের গিয়ে থাকতে হবে ওই জঘन্য ক্রেদাক্ত হিত্র্র ওন্ড সিটিতে!

টিভিতে ওল্ড সিটির চেহারা দেখে আর নানান খবর দেখে শিউরে ওঠেন রঙ্গপ্রকাশ। আইন-শৃ্্ললার কোনও বালাই নেই-

সর্বন্র ‘ফ্রি ফর অল’।’সেখানে রহ্গপ্রকাশরা বাঁচবেন কেমন করে!
হিং্র্রতা অবশ্য নিউ সিট্তিত আছে-‘শৃ্ঘলাবদ্ধ’ হিজ্রতত। অভিনব সব মরণখেলা। সেগুলোকে ব্যবহার করে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকার ব্যাবসা। এইসব ‘খেলা’-র লাইভ টেলিকাস্ট রাইট গোটা পৃথিবী জুড়ে বিক্রি করে সিভ্ডিকেট। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেটিং আর বিজ্ঞাপনের রমরমা বাজার।

না, এই ‘শ্খফ্ঘলাবদ্ধ’ হিি্র্রতাও রঙ্গপ্রকাশ পছন্দ করেন না। একটুও না। শুधুমাত্র বিষ্ঞান নিয়ে গবেষণার সবরকম আধুনিক সুযোগ এখানে আছে বলে তিনি এখনও নিউ সিটি ছেড়ে যাননি।

जा ছাড়া যাবেনই বা কোথায়? ওই ওন্ড সিট্তিতে ? যেখানে প্রতিটি মুহূর্তু মানুষ আক্রন্ত?
‘আর এখানে যে মনুষ্যত্ব আক্রান্ত!’ রঙ্গ্রকাশের বুকের নিউক্লিয়াস থেকে চিৎকার করে কে যেন বলে উঠল। বুকের ডেতরের ওই অজনা-অচেনা লোকানা প্রয়ইই এরকম পাগলের মতো চিৎকার করে। সে-চিৎকার রঙ্গপ্রকাশ শু একা শুনতে পান। পর্ণমালা বা সিমান শুনতে পায় না।

কিন্তু এখন? এখন তো ওয়ার্নিং এসে গেছে। তিনটে মাস রঙ্গপ্রকাশকে প্রাণপণে লড়তে হবে। ই-আই-কে আপগ্রেড করতে হবে-‘ক্রিটিক্যাল ড্যালু’র ওপরে যেতে হবে।

না, এখন পর্ণমালাকে ব্যাপারটা জানাবেন না। জনালে হয়তো পর্ণমালা পগগল হয়ে যাবে। সিমানের ওপরে ক্ষিপুু হয়ে উঠবে। তার চেয়ে বরং আরও সাত-দশদিন যাক—তারপর...।

হঠাৎই মাথা ঝাঁকিয়ে দুশ্চিন্তার বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কম্পিউটারের টাচ-ক্ক্রিনে আডুল ছুইয়ে মেশিন শাট-ডাউন করে দিলেন।

হালকা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়াচাড়া দিলেন রঙপ্রকাশ। কপালে ছাত বোলালেন ‘কয়েকবার। আবার মাথা ঝাঁাকালেন এপাশ-ওপাশ।

যন্ত্রণা। যন্ত্রণ।। জালা।। জালা।

হিরের মতো ঝকঝকে আয়নায় এ কাকে দেখছেন! ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্ধাস? নিউ সিট্তিতে যিনি অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজির ‘দেবতত’!

ছোট-ছোট করে ছাটা কাঁচাপাকা চুল। ভাঙা গাল। কপালে বলিরেখা। চশমার পলিমার লেল্সের পিছনে নিষ্প্রভ দুটি চোখ। মুটে ল্রোঁচা-্খাঁচা দাড়ি।

সব মিनিয়ে হতাশায় উদল্রান্ত একজন মানুষ।
অথচ গতকালই ওঁর গাল দুটো এতটা ভাঙা মনে হয়নি। কপালে বলিরেখার সংখ্যা আরও কম ছিল। চোথের মণি ছিল উজ্জূল। সেখান থেকে আপ্মবিশ্ধসের জ্যোতি বেরোচ্ছিল।

को করবেন এখন? কী করা উচিত?
প্রশ্ন দুটোর উত্তর ভেবে ওঠার আগেই টেবিলে পড়ে থাকা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা হিমম্রোত বয়ে গেন বুকের ভেতরে।
শ্রীধর পাট্।। একমাত্র শ্রীধর ফোন করলেই রহ্গপ্রকাশের ফোন এই বিশেষ সুরে বেজে ওঠ১। এই মিউজিকটা তৈরি করা হয়েছে অসংখ্য প্রজাপতির ডানা নাড়ার শব্দ দিয়ে। শব্দগুলোকে একহাজার গুণ অ্যামপ্লিফাই করে একটার সঙ্গে আর-একটা মিশিয়ে ডিজিটাল প্রসেসিং করে ফিলটার করে তৈরি হয়েছে এই

কপিরাইট রিং টোন। নিউ সিটির হাত গোনা কয়েকজন লৌখিন মানুষ এই রিং টোন ব্যবহার করে। তার মধ্যে রঙ্গপ্রকাশ একজন।

অফিস-টেব্লের কাছে এগিয়ে গেলেন। মোবাইল ফোন হাতে তুলে নিলেন। বুকের ডেতরে একটা গুমগম শব্দ শুরু হয়ে গেল।
'शালো—।'
'মার্শাল স্পিকিং-।'
'ইয়েস, স্যার।' গলার স্বরটা যাতে কেঁপে না যায় তার জন্য বেশ সতর্ক হয়ে কথাগুলো বললেন।

৬৬ক্টর বিশ্বাস, আই নিড য়ু। ইমর্জেন্সি। আপনি একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন। আজ বিকেল পাঁচটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমার সিকিওরিটি কেড হল ফোর ওয়ান জিরো জিরো টু এ-সি-এঙ্স। আজ সিটিং-এর পর জরুরি কথা আছে। জিশান পাল চৌধুরীর প্রোফইল নিয়ে আর আপনার ই-আই নিয়ে। একাু থামলেন শ্রীধর। তারপর : ‘আপনাকে কঁা নাগাদ আমি এশ্সপেক্ট করব, ডক্টু?'

কানে ফোন ধরে হাতঘড়ির দিকে তাকালেন রঙ্গক্রকাশ। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখান থেকে শ্রীধরের বাড়ি একঘণ্টার ড্রাইভ। আর সিকিওরিটির ঝামেলা পেরোত আরও দশমিনিট। স্ততরা...।

जí Ch
'ও.কে. দেন। সামনে এলে কথা হবে।'
ফোন কেটে গেল।
শ্রীধরের গেওয়া সিকিওরিটি কোডটা শোনামাত্রই মনে গেঁথে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। এখন সেটা মোবাইলে স্টোর করে নিলেন।

শ্রীধরের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেকেে ঢোকার জন্য আজ বিকেলে পাঁচ ঘট্টার জন্য এই সিকিওরিটি কোডটা অ্যাকট্টেট করা আছে। শ্রীধর নিজের সুবিধেেরো এই কোডটা পালটে দেন। ওঁর বাড়ির কমপ্লের্সের মেইন গেটে ভিজিটরের জন্য সিকিওরিটি কোড প্যানেল রয়েছে। ওই প্যানেলে সংখ্যা এবং ইংরেজি হরফের বোতাম রয়েছে। সিকিওরিটি কোড জানা থাকলে তবেই সঠিক বোতাম টিপে কমপ্লের্সের মেইন গেট পেরোনো সম্তব। তারপর রয়েছে সিকিওরিটি চেকের আরও দুটো স্তর। প্রথম স্তরে চারজন আর্মড গার্ড অতিথিকে সার্চ করে। সার্চ করে তারা সন্তুষ্ট হলে তবেই অতিথি যেতে পারবেন দ্বিতীয় স্তরে। সেখানে কোনও মনুষ নেই। একটা অড্ডুত চেহারার গেটের মধ্যে দিয়ে অতিথিকে হেঁটে যেতে হয়। হেঁটে যাওয়ার সময় একটা সय্ট এক্স রে স্কাানার আ্যাক্টিভেটেড হয়। স্ক্যানারের আউটপুট কম্পিউটারে প্রসেস করে ডিজিটাল উত্তর বেরোযঃ ‘হাঁা’, অথবা 'না’। তার ওপর নির্ভর করে অতিথির চোখের

সামনে ডিজিটাল প্যানেলে সবুজ রঙে ফুটে ওঠে : ‘প্লিজ এন্টার।’ অথবা, উজ্জূল লাল আলোয় ফুটে ওঠঠ : ‘ফর ইয়োর সেফটি, ডু নট এট্টার’

এই নির্দেশ পালন না করলে অতিথির বিপদ। সিকিওরিটি ইউনিট রুম্ম আলারার্ম বেজে উঠবে আর তার ঠিক এক মিনিট পর হাই এনার্জি পার্টিক্ন রেডিয়েশান অতিথিকে «াঁঝরা করে দেবে।

অর্থাৎ শ্রীধর পাট্টা না চাইলে ওঁর সঙ্গে কারও দেখা করার উপায় নেই।
মোবাইন ফোন পকেটে রেথে দেওয়ার পরেও বেশ কয়েক মিনিট ধরে নিজের বুকের ধুকপুকুনি তনতে পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। চুপাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছু একটা ভাবতে চইছিলেন কিন্তু কিছুতেই ভাবনার পরম্পরা সঠিকভাবে সাজাত পারছিলেন না।

কিছুদ্ষণ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিলেন। একটা লম্বা শ্বাস ফেলে কম্পিউটারের কাহে এগিয়ে গেলেন। টেবিল থেকে একটা গোলাপি প্লাস্টিক ফোল্ডার তুলে নিয়ে জিশানের কয়েকটা কালার প্রিন্ট-আউট তার মধ্যে ভরে নিলেন। প্রিন্টারের পাশে এলোমেলোভাবে খসড়া রিপোর্টের কয়েকটা পৃষ্ঠা পড়ে ছিল। সেগুলোও ফোল্ডারে ঢুকিত্যে নিলেন। শ্রীধরের সঙ্গে জিশানের সাইকোলজিক্যান প্রোফাইল নিয়ে আলোচনার সময় এই ফটো আর রিপোর্টের পাতাগেো কাজে লাগতু পারে।
 মিনি অটোেটিক এলিভেটরে চড়ে নীচে নেমে এলেন। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে সদর দরজাটা সফ্ট্ওয়্যার লক করে দিলেন। পর্ণমালা আর সিমান দুজনেই আনলক করার কোডটা জানে। তাই বাড়িতে খুশিমতো ঢুকতে ওদের কোনও অসুবিধে হবে না।

বাইরের লনের পাশে রহ্গপ্রকাশের জি-মোবাইল দাঁড়িয়ে ছিল। নিউ সিট্তিতে সিভিলিয়ানরা বেশিরভাগই এই লাল রঙের জি-মোবাইল ব্যবহার করে। এই গাড়ির যারা মালিক তাদের সিট্জিন কোড নম্বরই হল গাড়ির নম্বর। তবে তার সঙ্গে একটা ইংরেজি ‘সি’ হরফ যোগ করা আছে।

পকেট থেকে সিটিজেন্’স আই-ডি স্মার্ট কার্ড বের করলেন। গাড়ির কাছে গিয়ে দরজার স্লটে কার্ডতা ঢুকিয়ে সোয়াইপ করলেন।

গাড়ির দরজা খুলে গেল।
ড্রাইভিং সিটে বসলেন রঙ্গপ্রকাশ। সুইচ অন করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ড্যাশবোর্ডের ব্যাক-লাইটেড এল-সি-ডি প্যানেলে নিউ সিটির ম্যাপ ফুটে উঠল। অ্যাকট্ভিটেডে হয়ে গেল ‘সারফ্সে নেভিগেটর’ সফ্ট্ওয়্যার।

ম্যাপে নিজের বাড়ির লোকেশানে আডুল হোঁযালেন। তারপর শ্রীধর পাট্টার বাড়ির জায়গায় তজর্নি রাখলেন। মানচিত্রে দুটো নীল রঙের বিন্দু দপদপ

করতে লাগল—সোর্স আর ডেস্টিনেশান। তখন মুথ্ে বললেন, 'শর্টেস্ট রুট’। অডিয়ো অ্যাকটিভেটেড সিস্টেম চোখের পলকে রঙিন মানচ্ত্রের ওপরে একটা লাল রঙের রেখা এঁকে দুটো নীল বিন্দুকে জুড়ে দিল।

গাড়ি স্টার্ট করতেই অটেেমেটিক নেভিগেটর গাড়ি চালানোর দায়িত্ন নিয়ে নিল। রঙ্গপ্রকাশ অলসভাবে বসে গাড়ির জানলা দিয়ে ওঁর পছন্দের শহরটাকে দেখতে লাগলেন।

ওঁর বুকের শব্দটা এখন আগের চেয়ে অনেক কমে এসেছে।

গাড়ি বে নিউ সিটির রাস্তা ধরে ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটার বেগে ছুঁছিল সেটা রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন না। কারণ, তিনি চোখ বুজেছিলেন। গাড়ির স্বয়ংক্রিয় শীতততপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রঙ্গপ্রকাশের ‘কমফোঁ্ট কেশোন্ট’ অনুযায়ী নির্ভুলভাবে কাজ করছিল। রঙ্গপ্রকশের শরীর প্রতিটি রোমকূপ দিত্যে সেই শীতল আরামটুকু ব্বটিং পেপারের মতো শুষে নিচ্ছিল। পিছনদিকে ছুটে চলে যাওয়া রাজপথ, মেটাল ফ্লাইওভার, হাইরাইজ স্ট্রাকচার, আধুনিক বাড়ি-
 গঠे उुকে Cকनন জি-মোবাইল-এর আধুনিক প্রযুক্তিওও অবদান ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ধীরে-৭ীরে শান্ত হচ্ছিলেন। বুকের বাড়তি শক্দের ঢেউ এখন প্রায় মিলিয়ে গেছে। টেনশান কমাতে শরীর আর মনকে মনে-মনে শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। চোখ মেলে জি-মোবাইল-এর জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

এবদু আগের বিকেলটা এখন হামাগড়ি দিত্যে সন্ধের ঘেরাটোপে ঢুকে পড়হে। পশ্চিমের আকাশে লাল-হলুদ আর কমলা রঙের খেলা। সূর্य চলে যাচ্ছে-কাল সকালে ফিরে আসার জন্য।

এই সূর্য দেখা যাচ্ছে ওল্ড সিটি থেকেও। ভাবলেন রঙ্গক্রকাশ। এমনকী ওই বে সিলুত্রেট পাখির মিছিল কমলা রঙের পটভূমিতে ‘শ্লো মোশান’-এ উড়ে यাচ্ছে, সেটাও হয়ত্ত দেখা যাচ্ছে ওন্ড সিটি থেকে।

রাস্তার দুপাশে সুন্দর সারিতে লাগানো রয়েছে বিশাল উচ্চতার বিদেশি পাতাবাহার গাছ। তার বড়-বড় পাতায় যেন রামধনু-রঙের ছোপ। জি-মোবাইলএর ভেতর থেকে স্পষ্ট দেখত্ পাচ্ছিলেন, সেই রঙিন পাতাগুলো বাতলে উড়ছে।

তৃপ্তির দৃষ্টিতে এসব দেখতে-দেখতে কোথা থেকে যেন চোেে জল এসে গেল। যে সুন্দর সে স্বর্গেও সুন্দর, নরকেও সুন্দর। এই ডুবে যাওয়া সূর্যের

আলো এই মুহূর্ত্র ওন্ড সিট্কেও ছুঁয়ে আছে। ওই পাখির দল অনায়াসে উড়ে চলে যেতে পারে নিউ সিটির সীমানা ছাড়িয়ে। পিস ফের্সের সমস্ত প্রতিরোধ সেখানে অকেজো। ওই যে গাছের পাতা নিয়ে থেলা করছে যে-অস্থির বাতাস, তাকেও কেউ রুখতে পারবে না। শুধু মানুভেরই সীমানা ডিঙোনোর কোনও অধিকার নেই।

হাতের পিঠ দিয়ে চোেের জল মুহুলেন রঙ্গপ্রকাশ। বদ্ধ গাড়ির ভেতরে থেকেও তীব্র শিসের শব্দ শুনতে পেলেন। চোথ তুললেন আকাশের দিকে। ঢারটে ইস্পাতের পাখি উড়ে যাচ্ছে। চারটে শটার। ওদের নজরদারির কাজে ক্ষপ্তি নেই, ক্লান্তি নেই। জিয়োগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশান সিস্টেমের অতি আধুনিক সফ্ট্ওয়্যার এ-কাজে ওদের সাহায্য করছে।

সারফেস নেভিগেটরের পরদার দিকে তাকালেন। জি-মোবাইল গন্তব্যে প্রায় পৌঁছে গেছে।

আর সাত সেকেন্ডের মধ্যেই ওঁর পেশেন্টের রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেলেন রঙ্গপ্রকাশ। টের পেলেন বুকের ভেতরের শব্দটা আবার শুু হয়ে গেছে।

সন্ধে নেমেছে। কমপ্লেক্সের মেইন গেটের বাইরে অসংখ্য আলোর বন্যা। সেই আলো গায়ে মেলে দূজন সিকিওরিটি গার্ড দাঁড়িয়ে ছিল্গ। রহ্গপ্রকাশ
 রঙপ্রকাশ আগে বহৃবার এখানে ‘অতিথি’ হয়ে এসেছেন-তাই নিয়মকানুন সব জনেন। তা সত্ত্রে একজন গার্ড ইশারায় ওঁকে কার পার্কিং জোনটা দেখাল। ততক্ষণে রঙ্গপ্রকাশ পার্কিং জোন লক্ষ্য করে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছেন।

পার্কিং জোনটা ইস্পাতের তৈরি। সেখানে গাড়ির মাপে অনেকগুলো আয়তক্ষেত্র পাশাপাশি आঁক।। দূরের এরকমই একটি আয়তাকার স্লটে হালকা মেরুন রঙের একটা কিউ-মোবাইল দাঁড়িয়ে আছে। রঙ্গপ্রকাশ ওঁর গাড়িটা একটা স্নটে দাঁড় করালেন। গাড়ি থেকে নেমে সরে আসার পরইই দেখলেন গাড়িটা যেখানে পার্ক করেছেন সেই আয়তাকার অংশটা ఫীরে-ীীরে নীচে নামতে তুরু করল। গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রায় ফুট্যানেক নীচে নামার পর অংশটা স্থির रल।

এই হাইড্রলিক সিকিওরিটি সিস্টেম রঙপ্রকাশের খুব চেনা। এখন ওঁর গাড়িটা ফুটখানেক গভীর গর্ত্রের মধ্যে বন্দি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করনেই রঙ্গপ্রকাশ খুশিমতো গাড়ি চালিয়ে চলে যেতে পারবেন না। যখন এখানকার সিকিওরিটি সিস্টেম ওঁকে চনে যাওয়ার ছাড়পত্র দেবে তখনই ওঁর গাড়ির চাকা আবার ধীরে-ষীরে গ্রাউল্ড লেভেলে উঠে আসবে।

যে-মননষ যত ভয় পায় তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা তত বেশি। শ্রীধর পাট্টা

আসলে একজন ভিতু মানুষ। প্রাণভয়ে সবসময় কাঁটা হয়ে আছেন। আর ভয় পান বলেই, নিরাপত্তার অভাববোধ থেকে, অন্যকে আক্রমণ করতে ভালোবালেন।

এইসব কথা ভাবতে-ডাবতে ডক্ট্টর রঙ্গপ্রকাশ শ্রীধরের কমপ্লেক্সের মেইন গেটের কাছে পৌছে গেলেন। সিকিওরিটি কোড প্যানেলে আডুন ছুইঁয়ে পকেট থেকে মোবাইল ফেন বের করলেন। মোবাইলের বোতাম টিপে-টিপে ওপেন করলেন নির্দিষ্ট উইন্ডে।। সেখানে স্টোর করা কারেন্ট সিকিওরিটি কোডটা দেখা গেল। সেটা সিকিউরিটি কোড প্যানেলে পাঞ্চ করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা মেটাল প্লেট পাশে সরে গিয়ে গেট খুলে গেল। দু-ফুট চওড়া একটা পথ তৈরি হল—যার ভেতর দিয়ে মাত্র একজন মানুয যেতে পারে।

প্রথম নিরাপত্তার স্তর পেরিয়ে রঙ্গপ্রকাশ ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তিনি জনেন, এই পথের দুপাশের দেওয়ানে লাগানো রয়েছে অপটিক্যাল ডিভাইস। ক’জন মানুষ গেট পেরিয়ে ঢুকল এই यন্ত্র তার হিসেব রাথে। যেহেতু এখন একজন ঢোকার কথা তাই রঙ্গপ্রকাশ অপটিক্যাল সেস্সরের নজরদারি পেরোতেই মেইন গেটের মেটাল প্লেট ‘ক্র্যাক’ শব্দ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জায়গামরো ফিরে গিত্যে এঁটে গেল।



একসময় রঙ্গপ্রকাশ প্পাঁছে গেলেন বাড়ির সদর দরজায়।
ভারী কাঠের দরজায় রঙিন কাচ আর কাঠখোদাইয়ের কারুকাজ।
হাতघড়ির দিকে তাকালেন। প্পেনে সাতটা বাজতে মোটামুটি দেড়মিনিট বাকি। পকেট থেকে মোবাইন ফোন বের করে শ্রীধরের নম্বর ডায়াল করলেন। একবার রিং হওয়ার পরই দরজা. খুলে গেল। চোথে পড়ল একটা হলঘর। একটা লুরোনো স্পিকারে শ্রীধরের সংক্ষিপু আবাহন শোনা গেল : ‘ওয়েলকাম, पক্ঠর।

রঙ্গকাশের সামনে কেউ নেই। কেউ ওঁকে রিসিভ করতে আসেনি। এতে রঙ্গকাশ মোটেই অবাক হলেন না। কারণ, এই অপরূপ সুন্দর, হাইলি অটোমেটেড এবং ল্যাভিশ্লি ফারনিশড্ তিনতলা বাড়িটায় শ্রীধর পাট্টা সম্পূর্ণ একা থাকেন। নিরাপত্তার কারণণই কাউকে তিনি বিশ্বাস করেন না। খুবই স্বাভাবিক। কারণ, শ্রীধরের মধ্যে তিনি সোশিয়োপ্যাথিক ডিসঅর্ডার ছাড়াও প্যারানয়েড পারসোনালিটির হদিস পেয়েছেন। প্যারানয়েড পারসোনালিটির মানুষ হাইপারসেনসিটিভ আর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হয়।

রঙ্গপ্রকাশ হলঘরে ঢুকতেই ওঁর পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হওয়ার শব্দের ফাঁপা প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

হলঘরের মাねখান থেকে একটা স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি অড্রুত ছন্দে পাক থেয়ে উঠে গেছে দোতলায়। তারপর পাকের ব্যাসার্ধ বাড়িয়ে সেটা ঘরের দেওয়ালে সেঁটে গিয়ে একটা অড্ভুত ব্যালকনি তৈরি করে ফেলেছে। ঘরের উজ্জ্রল সাদা আলোয় সিঁড়ি আর ব্যালকনি ঝকঝক করছে।

সেই ব্যালকনির এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাট্টা। গায়ে ফুলহাতা কালো টি-শার্ট আর পায়ে কালো প্যান্ট। দেখে মনে হচ্ছে, টানটান ঋজু ভঙ্গি তে একটা কালো পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি জনেন, রঙ্গপ্রকাশকে কোনওরকম নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

থমথমে নিস্তক্ধতার মধ্যে হলঘরের কার্পেটের ওপরে পা ফেলে এগোলেন ডক্টর। কার্পেটের ডিজাইনটা নিউ সিটির রঙিন ম্যাপ। এই কার্প্ট বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরি। এবং এই কাপ্পেট মাত্র একপিসই তৈরি করা হয়েছে।

হলঘরের দেওয়ালে আট-দশটা হলোগ্রাম পেইন্টিং। গত পাঁচশো বছরের নামি শিল্পীদের বিখ্যাত সব পেইন্টিং-এর হলোগ্রাফিক রিপ্রোডাকশন। তার মধ্যে ভ্যান গঘ, সালভাদোর দালি, রবীন্দ্রনাথ, বিকাশ ভট্টাচার্य, মকবুল ফিদা হুসেনও রয়েছেন।

ছবি-টবি সব সাজিয়্যেছ্ছে বটে, কিন্ত్య শিল্রী এবং শিল্মের कजण नाधैन अन्मिर जाए ?

এ-কথা ভাবতে ভাবতে স্টেইনলেস স্টিলের সিঁড়ি বেয়ে উঠতত শুরু করলেন রহ্গ্রকাশ। শ্রীধর একইভাবে দাঁড়িয়ে ওঁকে লক্ষ করতে লাগলেন।

রঙ্গপ্রকাশ যখন শ্রীধরের খুব কাছাকাছি চলে এলেন তখন শ্রীধর কথা বললেন, 'চলুন-কনফারেন্স রুম ওয়ানে গিয়ে বসি।' এবং সেদিক লক্ষ্য করে शঁটা দিলেন।

শ্রীধরের বাড়িতে তিনটে কনফারেল রুম আছে। তাদের নম্বর ওয়ান, টু এবং থ্রি। রুম নম্বর ওয়ানটা মাপে সবচেয়ে ছোট। বড়জোর পাচজন মানুষ সেখানে বসে আলোচনা করতে পারে। দু-নম্বর ঘরঢা পনেরোজনের জন্য। আর শেষ কনফারেন রুমটায় তিরিশজন বসতে পারে।

শ্রীধরের বাড়ির সমস্ত দরজা এবং জানলার কাচণুলো আসলে মামুলি কাচ নয়—ফোটোর্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট। ওগুলো স্বচ্ছ তো বটেই, তার ওপর শ্যাটারপ্র্য এবং বুনেেট্রুফ। যদি কোনও স্নইপার বহৃদূরের কোনও হাইরাইজ বিল্ডিং থেকে হই পাওয়ার টেলিস্কোপিক রাইফেল কিংবা অটোকনভার্জিং ররেট লঞ্চার থেকে শ্রীধরের বাড়ির জানলা লক্ষ্য করে ফায়ার করে তবে সে ভীষণ হতাশ হবে।

আক্রমণকারীদের হতাশ করাই শ্রীখর পাট্টার একমাত্র মিশন।

## www.banglabrôek patf.tilogspot.com

কনফারেন্স রুম ওয়ানের কাচের দরজা ঠেলে ওঁরা দুজনে ঢুকে পড়লেন। ঘরটা ঠান্ডা। সেন্ট্রাল এসি সিস্টেম নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে।
ঘরের ডানদিকে কনফারেন্স টেবিল, আর পাচটটা মোটর অপারেটেড আরামের গদি-অঁঁা চেয়ার। চেয়ারগুলোর পায়ায় চাকা লাগানো। আর, ডানদিকের হাতলে ছোট কন্ট্রোল প্যানেল। প্যানেলের বোতাম টিপে চেয়ারগুলোকে খুশিমতো চালানো যায়।

ঘরের বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেওয়াল ঘেঁ<ে দাঁড়ি়়ে রয়েছে একটা বেঁটেখাটো ঢেহারার ডোমেস্টিক রোবট। তার মাথাটা বেটপ, হাতপাগুলো দৈর্ঘ্যে ছোট হলেও বেশ মোটােোট, মজবুত। রোবটটার বুকের কাছটায় একটা চৌেো গর্ত-সেটা কলো কাচে ঢাকা। রর্গ্রকাশ জানেন, ওটা রিমোট অ্যাক্টিভেশানের রিসেপ্টর। তার পাশে দুটো সবুজ আলো—একটা স্থিরভাবে জ্রলছে, অন্যটা দপদপ করছে।

ডোেস্টিক রোবটটার পাশেই দাঁড় করানো রয়েছে তিনটে অল-্মাস ভেভ্ডিং মেশিন। তাদের প্রথমটায় কফি, দ্বিতীয়টায় বিভারেজ আর তৃতীয়টায় স্ন্যাক্স সার্ভ করার ব্যবস্থা রয়েছে। দরকার পড়লে কনফারেন্েে আমন্ত্রিত অতিথিদের এই ডোেেস্টিক রোবটই কফি, বিভারেজ এবং স্ন্যাক্স সার্ভ করে।

घরের সবচেত্যে দার-প্রান্ত গাচ বাদামি রূের দাটে প্রোফা। তাদ্রর
 আরামের। বাদামি সোফা দুটির মাঝাখানে একটা কালচে বাদামি রঙের কফি টেব্ল। তার কাঠের পালিশ অক্ষত রাখার জন্য সিরামিক ল্যাকারের কোটিং দেওয়া রয়েছে।

টেবিলের ওপরে একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার খ্যেলা। তার পরদায় শ্রীধর পাট্টার মুত্থে ছবি। শ্রীধরের ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভার হিসেবে এর চেয়ে ভালো ছবি আর কী হতে পারে!

শ্রীখর ডক্টরকে ইশারা করলেন। তারপর দুটো সোফায় বসে পড়লেন দুজনে।

বড় করে একটা শ্বাস ছাড়লেন শ্রীধর। রঙ্গপ্রকাশকে খুঁটিত্রে দেখতে লাগলেন।
‘কী নেবেন বলুন, ডক্টর? হই, না কোন্ড?’
রঙ্গকাশ ল্যাপটপের স্ক্রিনসেভারের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। শ্রীধরের মধ্যে যে সামান্য মেগলোম্যানিয়ার লক্ষণ তিনি টের পেয়েছেন, বোধহয় সেটার কথাই ভাবছিলেন।

শ্রীধরের প্রশ্নে চমকে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, ‘কুকিজ। আর সফ্ট ড্রিংক।

শ্রীধর পকেট থেকে ছোট্ট একটা রিমোট কন্ট্রোল ইউনিট বের করলেন। পটাপট কয়েকটা বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ডোমেস্টিক রোবট সচল হল। ওটার পেটের কাছ থেকে একটা মেটাল ট্রে বেরিয়ে এল বাইরে। রোবটটা ভেডিং মেশিনের কাছে গিয়ে বোতাম টিপল। মেশিন থেকে সফ্ট ড্রিংক আর কুকিজ বেরিয়ে এল। রোবটটা স্গেলো ওর ট্রেতে সাজিয়ে নিল। তারপর কোমরের কাছে দুটো লুকোনো চেম্বারের দরজা খুলে দুটো ক্রিস্টালের গ্নাস বের করল। সফ্টট ড্রিণের বোতলের পাশে রাখল।

এবার রোবটটা ওর পা়্যের চাকা গড়িয়ে কফি-টেব্লের কছে এল। নিথুঁত দহ্ষতায় টেবিলে ওগুলো নামিয়ে সফ্ট ড্রিংক অর কুকিজ সার্ভ করল। তারপর নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। শুধু দপদপ করা সবুজ আলোটা জানিয়ে দিতে লাগল যে, ও এখনও আ্যাকটিভ।
'শেভ করেননি কেন?’
শীধরের আচমকা প্রল্ন রঙ্গপ্রকাশ কেমন হকচকিয়ে গেলেন। নিজের অজান্তেই গালে হাত চলে গেল। থেঁচা-ণেঁচা দাড়িতে আডুল বোলালেন। বললেন, ‘এমনি...।’

 নিয়ে পরে কথা বলব।’ সোফায় হেলান দিয়ে শরীরটাকে ডুবিয়ে দিলেন : ‘আগে আমার টেনশান নিয়ে কথা হোক...।

রঙ্গক্রকাশ নড়েচড়ে বসলেন। কুকিজ তুলে কামড় বসালেন। সফ্ট ড্রিংকের গ্গাসে মুমুক দিলেন। ঝাঁঝাঁ নাকে জ্রালা ধরাল। কিন্তু মিষ্টি তরনের ঠান্ডা ছোয়ায় কেমন যেন এক প্রশাত্তি খুঁজে পেলেন। দু-হাতে মুখ মুছলেন। ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে দুশ্চিস্তাগ্রস্ত নিউ সিটির একজন নাগ্রিককে পিছনে ঠেলে দিয়ে সাইকিয়ার্রিস্ট ডক্ট্র রঙ্গপ্রকাশ বিশ্পাসকে সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। গলায় পেশাদারি গাঙ্ীীর্য এনে প্রশ্ন করলেন, ‘এখন কেমন আছেন?’
'ভালো না।' ঠোঁট টিপে বললেন শ্রীধর। ফরসা মুতে অপ্রসন্ন ভাঁজ ফেললেন : ‘কতকগুলো স্বপ্ন বড় আমেলা করছে।’
‘‘্বপ্ন?’ অবাক হলেন রঙ্গপ্রকাশ।
'शাঁ, স্বপ্ন-' একটা দীর্ঘপ্পাস ফেনলেন। চোখ বুজে چীরে-পীরে বললেন, ‘এমনিতে স্বপ্নগুলো হয়তো তেমন খারাপ কিছু নয়...কিন্তু আমার কাছে ওগুলো সিম্প্লি নাইটমেয়ার—দুংপ্বপ্ন।'
‘কেন? কী দেখেছেন স্বপ্নে?’ ভুরুতে ভাঁজ ফেনলেন ডক্টর।
‘বেমন, একটা মরুভূমি। চারিদিকে শখধু হলদে বালি আর বালি। সেই
www.banglabookpdf.blogspot.com


বালি থেকে তাপ উঠছে। আমার পা পুড়ে যাচ্ছে...কিন্তু আমি হেঁটে চলেছি। ঢেউখেলানো বালির পাহাড় একের পর এক ডিঙিয়ে চলেছি-অথচ বালির শেষ নেই। বাতাসে বালির কণা উড়ছে—চোথে-মুখ্েে এসে লাগছে। মনে হচ্ছে ওণুলো আগুনের কণা... ${ }^{\prime}$

শ্রীধর চোখ বুজে কথা বলছিলেন। খুব ধীরে এক-একটা শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করহিলেন।

রঙপ্রকাশ বেশ বুঝতে পারছিলেন স্বপ্নের প্রতীক কী বলতে চাইছে, কীসের ইশারা করছে। দুর্ভিক্, অনাহার, মৃত্যু, জাতিদাঙ্গা, সম্পত্তির বিপুল ক্কয়ক্ষতি।

সোফায় শরীর এলিয়ে চোখ বুজে বসে থাকা এই নিষ্ঠুর মানুষটা এতদিন ধরে শুধু ভয় আর ক্ষ্য বিক্রি করে চলেছে। এবার কি ওর সেগুলো কেনার পালা? স্বপ্নটা কি সে-কথাই জানাতে চাইছে?

কিন্তু সেসব তো শ্রীধরকে বলা যাবে না। কারণ, সেই ভয় আর ক্ষয়।
তাই উত্তরটাকে মনে-মনে সাজিয়ে নিয়ে বারকয়েক রিহার্সান দিয়ে তারপর ডক্টুর বললেন, ‘এর অর্থ হচ্ছে, আপনি একা। একজন সেলফ্ম্মে ম্যান। আর...আপনার সামনে লড়াই—’

 একসময় রহ্গপ্রকাশ জিগ্যেস করনেন, 'আর কী স্বপ্ন দেখেন আপনি?’
চোখ বুজলেন শ্রীধর। আলতো করে বললেন, আয়নার স্বপ্ন দেথি। আয়নায় আমার...আমার মুখ দেখতে পাই...।’

## ‘্পষ্ট দেখত্র পান?’

‘গাঁ...’’ সফ্ট ড্রিংক সিপ করলেন শ্রীধর : ‘প্রায় স্পষ্টই বলা যায়, আয়নার সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার মুখে চাকা-চাকা দাগ। অনেকটা জলবসন্তের গুটির মতো। আর আয়নায় আমার মুখ্ের পেছনটা গা়় অন্ধকার। আমি খুব চেষ্টো করেও অন্ধকরের মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অথচ...অথচ আমার মনে হচ্ছে...মনে হচ্ছে, অন্ধকারঢা নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...।'

রঙ্গপ্রকাশ বুঝতে পারছিলেন। এই স্বপ্নের ব্যাপারটা যদি শ্রীধর ঠিকঠাক বলে থাকেন ত হলে এই স্বপ্নের অর্থ একটাই ঃ শ্রীখর খুব শিগগিরই রাঢ় এবং কঠিন বাস্তবের মুখোমুথি হতে যাচ্ছেন। শ্রীধরের দিক থেকে দেখলে সেই বাস্তব কুৎসিত-তাই ওঁর মুত্ে জলবসন্তের গুটির চাকা-চাকা দাগ। আর ওই

যে অন্ধকার, নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে-সেটা হল অজানা আশঙ্কা, ভয়।
কিন্তু শ্রীধর পাট্টাকে এর কতটুকু বলা যায়?
কিংবা আদ্দে কি বলা যায়?
এই লোকটা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কত মানুষের যে মৃত্যুর কারণ হয়েছে তার কোনও হিসেব নেই। অথচ লোকটার মধ্যে অপরাধবোধও নেই।

তার কারণ ওর অপরিণত বিবেক। সাইকেললজির ভাষায় যাকে বলে ‘আন্ডারডেভেলাপ্ড কনশান্স’। সোজা কথায় শ্রীধর পাট্টা একজন 'মরাল মোরন’। এই ধরনের অ্যান্টিসোশাল পারসোনালিটির মানুষরা মুখে সবসময় মূল্যবোধের কথা বলে, কিন্তু বিবেক অপরিণত হওয়ায় মূল্যবোধের বোধটাই থাকে না। এদের বুদ্ধি ক্ষুরধার, কিন্তু বিবেক ভোঁতা।

এখন সেইরকম একটা মানুষের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ফরসা তেলতেলে মুখ। মুখে কেমন একটা বাচ্চা-বাচ্চা ভাব।

অনেকক্ষণ চুপ করে রয়েছেন। এবার কিছু একটা বলা দরকার।
এ-কথা ভাবার সঙ্গে-সঙ্গেই শ্রীধর বলে উঠলেন, ডক্টর, কিছু বুঝতে পারলেন ?'

ঘোর থেকে জেগে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। টেবিল থেকে কুকিজ তুলে নিয়ে মুখ্যে দিলেন, সফট ড্রিংকের গ্লোসে চ্রমু দিক্যে লম্মা শ্বাস টৈনে বল্ণলেন 'স্যার,
 আপনার মুখের রিফ্রেকশানে ওইরকম...চাকা-চাকা দাগ।’ মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন। ঘাড়ে একবার হাত বোলালেন। তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে আলতো করে যোগ করলেন, 'আক্রমণ যেটা আসবে...মানে, শত্রুর দিক থেকে...সেটা হবে আনএক্সপেক্টেড। মানে, আপনি আগে থেকে গেস করতে পারবেন না। সেইজন্যেই ওরকম অন্ধকার দেখেছেন...নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে...জীবন্ত অন্ধকার।'

কে হতে পারে সেই অপ্রত্যাশিত শত্রু? কে হতে পারে সেই জীবন্ত অন্ধকার?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে নিজের অজান্তেই শ্রীধর পাট্টার কপালে ভাঁজ পড়েছিল। রঙ্গপ্রকাশ সেই দুশ্চিন্তাটাকেই যেন আরও তীব্র করতে প্রশ্ন করলেন, ‘এমন কোনও শত্রুর কথা কি আপনি ভাবতে পারছেন, স্যার? যাকে এখনও শত্রু বলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—অথচ যে আনএক্সপেক্টেড দিক থেকে সাডেন্লি অ্যাটাক করতে পারে?’

সফ্ট ড্রিংকে চুমুক দিয়ে মেঝের দিকে তাকালেন শ্রীধর। কয়েক সেকেন্ড মাথা ঝুঁকিয়ে থেকে ধীরে-ধীরে মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।
'না, এরকম এনিমি হিসেবে কাউকে এখন আইডেনটিফাই করতে পারছি না...।

সোফা এবং নিজের শরীরের মঝেে খাড়া করে দাঁড় করানো গোলাপি ফোন্ডারটার দিকে রঙ্গপ্রকশের চোখ গেল। জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে শ্রীধরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে সেসব কথা তুরু করার আগে থেরাপির ‘কিউ আ্যাড এ’ সেশানটা সেরে নেওয়া যাক।

একবার হাতघড়ির দিকে তাকালেন ডক্টর। তারপর বললেন, ‘যা-যা বললেন সে ছাড়া আর কোনও স্বপ্ন কি দেখেন আপনি?’
 ডিটেইলের একটু-আধটু রকমফের হয়।
'তা হলে কোয়েশ্েেন-আন্সার সেশান শুরু করি, স্যার?’
‘शाँ-করুন।
কথাটা বলৌই সোফায় শরীর এলিয়ে দিলেন শ্রীধর। সেই অবস্থাতেই পকেট থেকে স্যাটেলইট ফোন বের করে দেওয়ালের একটা কালো ফাইবার প্লেটের দিকে তাক করে বোতাম টিপলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওয়াল মাউন্টেড একটা অডিয়ো সিস্টেম ‘রেকর্ডিং অ্যাক্টিভ’ হয়ে গেল।

রঙ্গপ্রকােের সঙ্গে প্রতিটি সাইকোথোপি সেশান রেকর্ড করে নেন শ্রীধর। সেই রেকর্ডিং-এ দিন এবং সময় বসিয়ে নেয় অডিয়ো সিস্টেম নিজেই। রেকর্ড করা ল্সশানের একঁট কপি একটা মাইত্রোসিডিতে করে রঙ্গপ্রকাশকে
 আপডেটেড থাকেন। প্রয়োজনে কখনও সেণুলো নিয়ে নিজেরা আলোচনাও করতে পারেন।

পকেট থেকে ছোট একটা নোটবই আর পেন বের করে নিলেন ডক্ক্র। কারণ, সেশানের মাঝে-মাঝে কোনও-কোনও পয়েন্ট নোট করে নেওয়ার দরকার হয়। এই নোটুুলো ওঁর নিজের। এগুলো শ্রীধর পাট্টার জন্য নয়।

ঠোঁটের ওপর জিভ বুলিয়ে নিলেন রর্গপ্রকাশ। তারপর আচমকা শুরু করলেন।
‘ছোটবেলাতে আপনি ফিরে যেতে চান?’
'ना-ना।'
শ্রীধর চোখ বুজে ফেলেছিলেন। বোধহয় তীক্ষ্ মনঃসংবোগ তৈরি করতত চাইছিলেন। ওঁকে দ্যেে রস্গপ্রকাশের মনে এক বিচিত্র ভাব জেগে উঠল। তীব্র প্রতিশোধকামী যে-নিষ্ষুর মননষষাকে তিনি জেনে এসেছেন এখন তাকে দেখে অসহায় ঘুমষ্ত শিশ বলে মনে হচ্ছে।
‘ছোটবেলায় ফিরতে চান না কেন? অনেকেরইই তো ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে...।'
'না, আমার ছোটবেলায় ফিরতে ইচ্ছে করে না।’
‘ছোটবেলায় সবাই ফিরে যেতে চায় সিকিওরিটির জন্যে। কারণ, তখন চারপাশে বাবা-মা, আশীয়স্বজন—সব গুরুজনেরা থাকেন। তাঁরা ছোটবেলার নিরাপত্তার জোগান দেন। দে প্রোভাইড দ্য সেফ্টি ওয়াল্স...।'
'না, আমি ফিরব না। আমার কোনও সেফ্টি ওয়াল ছিল না।’
'তা হলে কী ছিল?'
‘কিছুই ছিল না। কেউ ছিল না। শুধু আমি ছিলাম। একা। একেবারে একা।'
‘একা থাকতে আপনার ভয় করত না?’
'না। ফিয়ার ওয়জ মাই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।'
নোটবইতে কয়েকটা পয়েন্ট টুকে নিলেন রঙ্গপ্রকাশ। অদ্ভুত মন্তব্য। ‘ফিয়ার ওয়জ মই ওনলি রিলেটিভ। ওনলি ফ্রেন্ড...।' ভয় আমার একমাত্র আサীয়। একমাত্র বন্ধু...।

ভভয় কীভাবে আপনার আশ্মীয় হল? বন্ধু হল?’
‘আমার চারপাশে ভয় ছিল। ভয় আমাকে ঘিরে থাকত। মাঝে-মাঝে মনে रতত, ইট ওয়জ মই সেফ্টি ওয়াল।'
‘আপনি কি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাইতেন? মনে হত, এই দুনিয়ার সঙ্গে ঠিকঠাক মোকবিলা করার জন্যে আপনার তড়াতাড়ি বড হয়ে ওঠা দরকার?’

‘আপনার তো বন্ধু ছিল না বললেন-তাই তো?’
‘হ্যা-।’
‘কোনও শত্রু ছিল?’
‘প্রচুর। আমার মনে হত, আমার চারপাশে শত্রু। কিলবিল করছে। ওদের আমি ঘেন্না করি। আই ডেসপাইজ দেম।’
‘কারা সেই শত্রু? দু-একজনের নাম বলতে পারেন?’
'নাম? নাম কী বলব! সবাই শত্রু। দ্য হোল সোসাইটি ওয়জ মাই এनিমি—।

শ্রীধরের উত্তর শুনতে-শুনতে নোট নিলেন ডক্টর। সোসাইটির প্রতি অ্যাপ্যাথি। সমাজ নাপসন্দ্। সেই থেকেই হয়তো সমাজকে দখল করে শাসন করার ইচ্ছেটা অবচেতনে দানা বেঁধেছে। এখন নিউ সিটিতে তিনি যেটা করছেন। শাসন। অতিশাসন। অপশাসন।
‘সবাই কেন শত্রু হবে?’ কোমল গলায় বললেন ডক্টর। তারপর কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘ছোটবেলায় কে আপনাকে দেখাশোনা করত ?’

শ্রীধরের যে বাবা-মা ছিল না সেটা আগের নানান থেরাপি সেশান থেকে রঙ্গপ্রকাশ জানেন। কিন্তু বাবা-মায়ের বদলে কারা ওঁকে ছোটবেলাটায় মানুষ

করেছেন সেটা এখনও জানা যায়নি। শ্রীষর সবসময় প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। আজ আবার কথায়-কথায় সেই একই প্রশ্ন এসে গেছে।

শ্রীধর চোখ বুজে ছিলেন। ওঁর ফরসা মুখে অপ্রসন্নতার কয়েকটা ঁাঁজ পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বললেন, ‘দেখাশোনা কেউ করত না। ভ্ঞান হয়ে থেকেই দেখ্খেছি আমি সবার ফাইফরমাশ খাটছি। আমকে যে-সে শাসন করছে—চড়-থাপ্রড় মারছে-গায়ে থুহু দিচ্ছে।’
‘বাবা-মায়ের ল্খেঁজ করেননি কখনও?’
‘প্রথম-প্রথম একে-তাকে জিগ্যেস করতাম...পরে আর করিনি।’
‘কেন, করেননি কেন?’
‘যারা ইচ্ছে করে লুকিত্যে পড়ে তাদের কখনও খুঁজে পাওয়া যায়! আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আমার মা-বাবা আমকে ফেলে পালিয়ে গেছে-লুকিয়ে পড়েছে—আর কখনও আমার সামনে আসবে না বলে...।
‘বাবা-মকে কাছে পাওয়ার জন্যে মন টানত না? কষ্ঠ হত না...কান্না পেত না?'
‘প্রথম-প্রথম মন টানত। আমার বয়েসি বাচ্চা-কাচ্চাগুো রাস্তার ধারের নোংরা ঝুপড়িতে থাকত। দু-বেলা ঠিকমতো খেতে পেত না। খাবারের থোজে

 হত। অসহ রাগ। সবার বাবা-মায়ের জন্যে আমার যেন্না হত।

নোট নিতে-নিতে মুখ তুললেন রঙ্গকাশ। শ্রীধরের দিকে তাকালেন। ওঁর মুখ্ে একটা লালচে আভা। আর তার সক্সে ঘৃণা আর উক্তেজনার ছাপ।
‘হাঁ--বুঝতে পারছি। কিন্তু..এএকটা কথা বলুন তো। ছোটবেলায় যেখানে আপনি থাকতেন-মানে, ওল্ড সিটিতে—সেখানে আপনার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না?'
‘ना, না, না-না-না!’ ख্রীধরের ঠোঁট চিরে হিসহিস শব্দে ‘না’-এর স্রোতটা বেরিয়ে এল। মুখের লালচে আভা আরও গা় হল।

কিচুদ্পণ অপেক্ষা করলেন ডক্টর। শ্রীষরের উত্তেজনার পারদকে খানিকটা নেমে আসার সময় দিলেন। তারপর ঃ ‘ওম্ড সিটিকে আপনার ভালো লাগে ना?'
‘ভালো লাগবে?’ অবাক সুরে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন : ‘কেন, ভালো লাগবে কেন ?’
‘আপনার জন্মভূমি—তাই...’’
'জন্মভূমি মই ফুট। আই হেট ওন্ড সিটি। ওন্ড সিটিকে আমি ঘেন্না করি। ওই নোংরা, অসুস্, ক্রেদাক্ত শহরটা আমাকে কী দিয়েছে? কিছুই না!

কিচ্মু না! ওই শহরটকে আমি হাতের মুঠোয় পিষে তঁড়ো করে ফেলতে চাই। আই ওয়ন্ট টু অ্যানিহিলেটট দ্যাট রট্ন হেল অ্যালংউইথ অল দ্য স্কাম ইন ইট।

শ্রীধর বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছিলেন। ওঁর ঠোট নড়ছিল। নিঃশব্দে কিছু একটা বিড়বিড় করছিলেন।

নোটবইয়ের পাতায় রঙ্গ্রকাশের পেন ব্স্তভাবে চলছিল। একইসঙ্গে ওঁর মনের ভেতরে শ্রীষর পাট্টার মনস্তাত্বিক মূন্যায়নও চলছিল। সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি হচ্ছিল।

ওল্ড সিটির প্রতি শ্রীধরের এই একরোখা ঘৃণার জনjই কি সুপারগেম্ম কর্পোরেশনের নানান হাই রিস্ক গেম্সের প্রতিযোগীী জোগাড় করা হয় শুধুমাত্র ওল্ড সিটি থেকে? এই কারণেই কি বড়লোক বানানোর লোভ দেখিয়ে ওন্ড সিটির গরিব ‘ছোটলোক’গুলোকে দোজখের দরজায় পোঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা इए??

এর সঙ্গে যোগ হয়েছে শ্রীধরের পরিচয়হীনতার ক্ষোভ। সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে সুস্থ সমজের প্রতি ওঁর আক্রোশ।

শ্রীখর পাট্টার মনের গঠনের মানচিত্র যেন অস্পষ্টভবেে দেখতে পাচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত একজন অতিমাত্রায় সংবেদনশীল মননুষ। ওঁর মধ্যে

 সবসময় অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপায়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে,অপরিণত বিবেক আর অপরিণত অপরাধবোধ।

সব মিলিয়ে একটা জটিল প্যারানয়েড পারসোনালিটি।
‘ওল্ড সিটি আপনি ছেড়ে এলেন কেমন করে?’ নোট নেওয়া শেষ করে প্রপ্পা করলেন রহ্গপ্রকাশ।
‘সেটা এক আশ্চর্য ঘটনা।' চোখ বুজেই ঠোঁটে হাসলেন শ্রীধর। তারপর এমনভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন স্नো মোশােে একটা সিনেমা দেখছেন এবং অশ্যুট স্বরে ঘীরে-ধীরে সেটার বর্ণনা করছেন।
‘আমার দাদা বলধর পাট্টা আমাকে ওন্ড সিটিতে হঠাৎই খুঁজে পায়। আমার গলার একাা চেন দ্খেে চিনতে পারে। আমার খুব ছোটবেলায় এই নিউ সিটিতে পিস ফের্সের একটা বিদ্রোহ হয়েছিল। শুনেছি তখন আমার বয়েস ছিল নাকি এক বছর দু-মাস। সেই বিদ্রোহের সময় পিস ফোর্সের ছ’জন বিদ্রোইী অফিসার আমাকে কিডন্যাপ করে ঔটারে চেপে ওন্ড সিটিতে পালিয়ে যায়। ওরা দাদাকে ঞ্রেট করে—বনে যে, কাউকে এই কিডন্যাপিং-এর কথা জানালে ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে। পরে দাদা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে সবক’ঢা বিদ্রোইীকে খুঁজে বের করে গুনে-গুনে খতম করে। কিন্তু আমকে আর খুঁজে

পায়নি। পেয়েছে তার অনেক বছর পরে—প্রায় তেরো বছর পরে। তখন দাদার কাছেই সব কথা শুনেছি—’’

এই গল্পটা শ্রীধর তৈরি করেননি—করেছিলেন বলধর পাট্টা। গল্পটা বানানো হলেও এর মধ্যে পিস ফোর্সের বিদ্রোহের অংশটা সত্যি। এই গল্পটা ћौর্ঘদিন ধরে সবাইকে বলে-বলে ব্যাপারটা এ্রখন এমন দাঁড়িয়ে গেছে যে, শ্রীধর নিজেও গল্পটট বিশ্ধস করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু গল্পটার মধ্যে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। এবং সেই ফাঁকের দিকে তাক করেই পরের প্রশ্নটা করলেন রঙ্গপ্রকাশ।
‘বলধর পাট্টার তো বাবা-মায়ের পরিচয় ছিল। তা হলে আপনি নিজেকে পরিচয়হীন বলছেন কেন?’

কিছুদ্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর জবাব দিলেন, ‘যখন একটা শিশুর বাবা-মা-কে ভীষণ প্রয়োজন তখন যদি তদের না পায় তা হলে সে কোন বিশ্পাস নিয়ে বড় হয়ে উঠবে? আমার এক বছর দু-মাস বয়েস থেকে প্রায় চোদ্দে বছর বয়েস পর্যন্ত আমি আবর্জনার মতো বড় হয়ে উঠলাম। বাবা-মা-কে সচেতনভবে কখনও চোেখই দেখলাম না। ঢাঁরা শুধু হলোগ্রামের ছবি হয়ে আমার কছে বেঁচে রইল। তা হলে আমার মনে হবে না কি যে, আমার
 ব্যবহার করেন। যেমন এখন ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাসের থেরাপির সময় ব্যবহার করছেন।

শ্রীধর ব্যাখ্যা দিলেও সাইকো্্যানালিস্ট রঙ্পপ্রকাশ তার মধ্যে একটু-আধটু ফাঁকফোকর দেখতে পাচ্ছিলেন। আসলে সাইকেথেরাপি সেশানের সময় ডক্টর এবং পেশেন্ট দুজনকেই কমিটেড হতে হয়। পেশেন্ট যখন নিজের সমস্যার কথা ডক্টরকে বলবে তখন তকে সৎ হতে হরে-কোন মিথ্যে কথা. বললে চলবে না। আর থেরাপিস্টকেও হতে হবে অবজেক্টিভ, প্রফেশনাল, সাপোর্টিভ-আর, সেশানের সব কথাই তাঁকে গোপন রাখতে হবে।

শ্রীধর পাট্টার সূক্ম্মাতিসূক্ম্ম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ লক্ষ করে রজপ্রকাশের মনে হচ্ছিল, শ্রীধর ওঁর সততার শর্ত পুরোপুরি পুরণ করতে পারছেন না।

ঘড়ির দিকে তাকালেন। প্রায় পঁঁযতাল্লিশ মিনিট পার হয়ে গেছে। থেরাপি সেশান এখানেই শেষ করা যাক। তাই টেপ-রেকর্ডারকে শোনানোর জন্য বললেন, ‘এন্ড অফ থেরাপি সেশান। থ্যাংক য়ু, স্যার।’

কথাগুলো শুনলেন শ্রীধরও। কিন্তু তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে বোঝা যাচ্ছিল না। একইরকমভাবে চোখ বুজে শরীর এলিয়ে শেয়ে আছেন। শুরু বুকা ওঠা-নামা করছে।

## 

নোটবই আর পেন পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন রঙ্গকাশ। একটা লম্বা শ্বাস ছাড়লেন। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের উষ্ণতা বোধহয় অনেকটা কমে গিয়ে থাকবে। কারণ, এখন বেশ শীত-শীত করছিল।

হঠাৎই ডক্টুরকে চমকে দিয়ে ম্প্রিং দেওয়া পুতুলের মতো ছিটকে সোজা হয়ে বসলেন শ্রীধর। চোখ খুললেন। ডক্টরের দিকে সরাসরি তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'ওয়েল, ডক্ট্যর, হোয়াট ডু য়ু থিংক?’

গোলাপি প্লস্টিকের ফোন্ডারটা কেলের ওপর তুলে নিয়েছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সেট নাড়াচাড়া করছিলেন। ত্রিধরের প্রশ্নের উত্তরে আলতো করে বললেন, 'আই থিংক ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্চিং, স্যার। আরও কয়েকটা সেশানের পর আমি হয়তো আপনাকে কিছু মেডিসিন নেওয়ার কথা বলব। তার আগে আমকে একজন সাইকোফার্মকোলজিস্টের সঙ্গে ডিসকাস করতে হবে...।'
'যত খুশি ডিসকাস করুন-শু মনে রাখবেন, আমার নাম যেন কেনওওাবেই মেন্শান্ড না হয়। যদি হয় তা হলে আই অ্যাম গোয়িং টু বি ইয়োর লাস্ট পেশেন্ট, ডক্টরন..।'

শেষ কথাটায় রস্গ্রকাশের গায়ে কাঁটা দিল। ফোল্ডারের ওপরে ওঁর হাতের আডুল অকারণেই দ্রুত নড়াচড়া করতে লাগল। প্রাপপণে তিনি স্বাভাবিক
 তে হাত দুটো কয়েকবার পাশে ছড়ালেন, ওপর-নীচ করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ হাতের ফোল্ডারটা খুললেন। আলতো করে বললেন, 'স্যার, এবার জিশান পালচৌধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল নিয়ে একটু কথা বলতে भारि?'
‘হাঁ-পারেন।’ অনুমতি দিলেন শ্রীষর এবং রঙ্গপ্রকাশের দিকে ঝুঁকে বসলেন।

হাঁ, জিশান পালচেধুরীর ভেতরটা তিনি এবার বুঝতে চান।

থেরাপি সেশান শেষ হওয়ার পর রঙ্গপ্রকাশের বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘপ্ধাস বেরিয়ে এল। মনে হন, এতক্ষণ ধরে ওঁর যেন দম-বন্ধ-করা অবস্থা চলছিল—এবং এই প্রথম স্বাধীনভাবে শ্মাস নিতে পারছেন।
‘স্যার, আগে এগুলো একবার দেখে নিন। এতে সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল সম্পর্কে বেশ কিছু ইম্পরট্যান্ট নোঢ্স আছে আর রেলিভ্যাট্ট কয়েকটা ফোটোগ্রাফ আছে।' কথাগুলো বলে থোলা ফোন্ডরটা শ্রীষর পাট্টার

দিকে এগিয়ে দিলেন।
শ্রীধর ফোল্ডারট নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুু করনেন। পাতার পর পাত ওলটাত লাগলেন। ফোটোগ্রাফগুলো খুঁটিয়ে লেখতে লাগলেন।

রঙ্গক্রাশ দেখছিলেন শ্রীধরের কপালে ভাঁজ তৈরি হয়েছে। পাতলা ঠোঁট মাঝে-মাঝে নিঃশব্দে নড়ছে। শ্রীধরের মনের মেশিনে জিশান পালচেেধুরীর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের মূন্যায়ন তৈরি হচ্ছে।

সৎ। স্পষ্ট। মানবিক মূল্যবোেের দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। বড় সহজে বন্ধুত্ব তৈরির চেষ্টো করে। শক্রুকেও বন্ধু বলে ভাবতে চায়।

জিশান সম্পর্কে এই কথাগুলোই শ্রীধর ভাবছিলেন।
কিন্তু ছেলেটের মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে। আছে পোটেনশিয়াল এনার্জি। জাব্বার সজ্সে পিট ফাইটের সময় সেই পোটেনশিয়াল এনার্জিকে শ্রীধর কইনেটিক এনার্জিতে বদলে যেতে দেখেছেন। তা ছাড়া এই ধরনের মানুষ পেশাদার নয় বলেই মূল্যবোেের হাতিয়ার নিয়ে মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীধর ভাবছিলেন। ওধু ভাবছিলেন।
জিশানের কিল গেম-এর তারিখ এবার ঠিক করত্ত হবে। এবং জেলখানা থেকে তিনজন কিলার-না, না...সুপারকিলার-কিংবা সুপারি কিলারও বলা

 টেলিকাস্ট দেখতু-দেখত্ সবার বন্ধ হয়ে আসবে দম। এবং জিশান খতম।

আপনমনে মাথা নাড়লেন শ্রীধর। সুপারহিরোকে শেষ করতে সুপারকিলারই দরকার। সুতরাং এই ‘খুনি’ বাছাইয়ের কজে এবার শ্রীখর নিজেই যাবেন। জেলে যতজন মারাঘ্ফক খুনি আছে তাদের সকলের ‘কারিকিউলাম ভিটৗ’ খুঁটিয়ে পরখ করে দেখবেন—বারবার। তারপর বেছে নেবেন তিনজনকে। যারা শয়তানিতে শয়তানকেও হারাত্ পারে।

জিশানের একটা ফোটোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন শ্রীষর। মনে হচ্ছিল এই জোয়ান ছেলেট এক-একটা খেলায় কোয়ালিফাই করে 凤ীরে-৭ীরে যেন কিল গেম-এর দিকে নয়-শ্রীধরের দিকে এগোচ্ছে। শ্রীধর পাট্টাকে নিঃশব্দে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে।

নাঃ, জিশান কিছুতুই কিল গেম-এ জিততে পারে না। যদি জেতেও, তা সত্তেও ওকে হারতেই হবে। শ্রীষর সে-ব্যবস্থা অবশাই করে রাখবেন। কারণ, জিশানকে জিততে দেওয়া যাবে না। জিশান यদি জেতে তা হলে সেটা হবে নিউ সিটির স্বাম্থের পক্ষে বিপজ্জনক।

শ্রীধরের চোয়াল শক্ত হন। ঠোটট টিপলেন। ছোট্ট করে মাথা দোলালেন। তারপর জিশানের মুথের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন—যেন ওর

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## সঙ্গে কথা বলছেন।

রঙ্গপ্রকাশ চুপ করে বসে নিজের পেশেন্টকে লক্ষ করছিলেন। ও জনে না ওর অপরাধবোধ অপরিণত, বিবেকেরও একই দশা। জানে না, ও একজন প্যারানয়েড পারসোনালিটির মননুষ, 'মরাল মোরন’। ও নিজে যে-পথে চলার কথা ভাবে সেটাই ওর কাছে একমাত্র সঠিক পথ।

শ্রীধরের পকেটের স্যাটেলইট ফোন বেজে উঠল। তটারের শিসের শব্দ, আর তার সঙ্গে মিশে আছে যুদ্ধ ঘোষণার ঝংকার তোলা ব্যাড্ড। এই কপিরাইট রিং টোন শুধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার জন্য তৈরি।

হাতের ফোল্ডার শব্দ করে বন্ধ করলেন শ্রীষর। রঙ্গপ্রকাশের ঢোেে চোখ রেথে বললেন, ‘রিপোট্টা তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করুন। আমাকে এর একটা সফ্ট কপি মইক্রোসিডিতে করে দেরেন—আর তার সঙ্গে একটা হার্ড কপি। একটা কথা মনে রাখবেন ঃ• आাপনার आ্যসেসমেন্ট যেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়। ওতে যেন কোনওরকম ঝাপসা মন্তব্য না থাকে। মানে সায়েন্টিফিক জারগন দিয়ে পাশ কাটাত চেষ্টা করবেন না...।

ফোন্ডারটা ফেরত পেলেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের ফোন তখনও বাজছিল।
উঠে দাঁড়ালেন। ফোন বের করে কানে দিলেন। বাঁ-গালে আঙুলের ডগা
ঘষলেন কয়েকববার।

'शালো—’’ ख्रীধর ঠাডা গলায় বললেন।
'মার্শাল, স্যার-' ওপাশ থেকে সিকিওরিটি চিফের গলা ভেসে এল : ‘আপনাকে ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু এইমত্র আমার দুই সাবর্ডিনেট স্টাফ ভীষণ ইম্পরট্যান্ট খবর নিয়ে এসেছে...।
‘শুছি...' নিরুতত্তাপ গলায় বললেন শ্রীখর। কারণ, সহজে উত্তেজিত হওয়া শ্রীধরের স্বভাব নয়। তা ছাড়া ওঁর সিকিওরিটি স্টাফ প্রায়ই নানান গোপন খবর ওঁর কাছে প্পেঁছে দেয়। যেহেতু কোনও সঠিক খবর পৌঁছে দিলে ভলোরকম ক্যাশ প্রাইজের ব্যবস্থা আছে, এবং খবরের গুরুত্ব বুৰ্েে প্রোমোশনও দ্রুত হয়ে যেতে পারে, সেহেহু খবর পোঁছে দেওয়ার জন্য সিকিওরিটি টিমের মধ্যে এক অज্রুত অদৃশ্য প্রতিযোগিতা আছে। শ্রীধর সেটা ভালো করেই জানেন এবং এই প্রতিয্যোগিতার মনোভাবটা তিনি জিইয়ে রাখত চান। কারণ, প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিদ্বন্দিতা আসে। আর সেখান থেকেই আসে অবিশ্বাস। পরস্পরের প্রতি।

এই অবিশ্বাসের সম্পর্কটা শ্রীধর জিইয়ে রাখতে চান। তাতে ওদের ওপরে শাসনের নিয়্র্রুটা সহজে কায়েম করা যায়। আর ওদের পরস্পরের প্রতি অবিশ্ধসের ছিদ্র পথে শ্রীধর অনেক গোপন খবর পান-পরস্পরবিরোধী গোপন

খবর। সেইসব খবরকণিকা থেকে তোলমোল করে শ্রীধর ছেঁকে বের করে নেন নির্যাসটুকু। তারপর নিজস্ব ঢঙে প্রতিরোধী ব্যবস্থা নেন।
'স্যার, ওদের আপনার কাছে নিয়ে আসছি। ওদের কোড নম্বর হল...' সিক্ওরিটি চিফ সেই দুজন সিক্কিরিটি স্টাফের কোড নম্বর বললেন।

রস্গপ্রকাশ দেখলেন শ্রীধর কোড নম্বরগুলো ত্বু তনে নিলেন-কোথাও ইুকে নিলেন না। না, ভুল হল। বরং বলা ভালো, শ্রীীধর পাটা নম্বরগুলো ওঁর মাথায় টুকে নিলেন। সত্যি, অমনুষ এই মনুষটার আশ্র্য মেমোরি! প্রাচীন যুগ হলে শ্রীধরকে অনায়াসে ‘ख্রুতিধর’ বলা যেত।
‘ঠিক আছে, ওদের নিয়ে আসুন। আমি আপনার আর ওদের কোড নম্বর পাঞ্চ করে ইন্টারনাল সিকিওরিটি ক্লিয়ারেন্স থ্রু করে রাখছি...।'

কথা বলা শেষ করে স্যাটেলাইট ফোনটা ঢোখের সামনে ধরলেন। সিকিওরিটি চিফ আর তার দুজন স্টাফের কোড নম্বর তিনটে দ্রুত পাঞ্চ করলেন। তারপর আরও কয়েকটা বোতাম টিপে দিলেন পরপর।

স্যাটেলইট ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে আড়চোথে রহ্গপ্রকাশের দিকে তাকালেন : ডক্টর, প্লিজ একাু ওয়েট করুন। পাশের ঘরে গিয়ে আমি একটা ইমর্জেন্সি বাপার চট করে সেরে আসছি। এসে আপনার ই. আই. নিয়ে কথা বলছছি। এক্সকিউজ্ট মি...'

ওঁর পা ফেলার ঢং থেকে আற্মবিশ্বালের বিকিরণ টের পেলেন ডক্ট্র। অবাক হয়ে ভাবলেন, মানুষটা কোথা থেকে কেেথায় এসে পৌঁছেছে! ওন্ড সিটির আবর্জনায় তেরো বছর কাটিয়ে শ্রীধর হয়তো দাঁত-নখের লড়াইটা শিখেছেন, কিন্তু লেখাপড়া?

উত্তরটা শ্রীষরের নানান থেরাপি সেশান থেকেই পেয়েছেন রঙ্গপ্রকাশ। বলধর পাট্টা ‘হারানো' ছোট ভাইকে খুঁজে পাওয়ার পর দশবছর ধরে তাকে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন-নানান বিষয়ে। তার মধ্যে প্রধান ছিল ইংরেজি শেখা আর ম্যানার্স শেখা। এ দুটো শেখার জন্য শ্রীধরকে দু-বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় রেখেছিলেন বলধর। সেখানে ওঁর জন্য স্পেশাল প্রাইভেট কোচিং-এর ব্যবস্থা ছিল।

তারপর এল জাপানের পালা। কিক বক্সিং আর সামুরাই সোর্ড। এই দুটো বিষয়ে শ্রীষরের আগ্রহ আর দক্ষতা বনরাম পাটাকে অবাক করেছিল। তিন বছর ট্রেনিং-এর পর শ্রীধর যেখানে প্পাঁছেছিলেন একজন প্রতিভাবান শিক্ষর্থী সাধারণত দশ বছরে সেখানে পৌঁছোতে পারে।

জাপান থেকে ফেরার পর বাড়িতে থেকেই শ্রীধর লেখাপড়া শিছ্খেছেন আর শরীরচর্চা করে গেছেন। দেশে-বিদেশে বিভিন্ন লড়াইয়ে শ্রীধর নাম

দিত্যেছেন। ওঁর সাকসেস রেট ছিল নাইন্টি ওয়ান পারসেন্ট।
বলরাম লক্ষ করেছিলেন, শ্রীধরের মধ্যে একটা সহজাত পশ-প্রবৃত্তি রয়েছে। সেটা হল, প্রতিপক্ষকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, খতম করা। এই আ্যানিম্যাল ইনস্টিংক্ট-ই শ্রীষরের মেজর অ্যাসেট।

শ্রীধরের লেখাপড়ার প্রায় পুরোটই ইন্টারনেটের মাধ্যম শেখা, অথবা বিদেশ থেকে আনা কাস্টম-বিল্ট মইক্রোসিডি কমপিউটারে চালিয়ে সেখান থেকে শিক্ষ নিয়েছেন। সবকিছু শেখার ব্যাপারে ওঁর অসাধারণ মেমোরি ওঁকে দুর্দাত্তভাবে সাহায্য করেছে। এবং সেই সময়ে শ্রীধর যতগুলো অন-লাইন টেস্ট দিয়েছেন তার সবগুলোতেই দারুণ রেজান্ট করেছেন।

শ্রীধরকে নিয়ে বলরাম পাট্যা খুব গর্ব অনুভব করতেন। একটা সময়ের পরে তিনি শ্রীধরকে সত্তি-সত্যি নিজের ভাই বলে ভাবতে ঔুু করেন। মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত ওঁর এই ভাবনা অাঁট ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ ছোট-ছেট পা ফেলে পায়চারি করহিলেন। কী এক কোতূহলে তিনি কনফারেন্স রুম ওয়ানের কচের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ানেন।

স্বচ্ছ দরজা ভেদ করে রহ্গপ্রকশের দৃষ্টি দূরে প্পাঁছে গেল।
একটা কাচের ঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। সেই ঘরের দরজায় হলোগ্রাম দিয়ে
 বোঝা যাচ্ছে, একটা চাপা অস্থিরতা ওঁর ভেতরে কাজ করছে। শরীরের ওজনটা বারবার এক পা থেকে আর-এক পায়ে নিচ্ছেন, থেকে-থেকেই তাকাচ্ছেন স্টেইনলেস স্টিলের প্যাঁচানো সিঁড়ির দিকে।

একটু পরেই কালো য়ুনিফর্ম পরা তিনজন লোক সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল। কাচের দেওয়ালে পেরিয়ে শ্রীধর পাট্টাকে দেখতে পেল। সুতরাং লক্ষ্য স্থির করে তিনজনে দম দেওয়া খেলনা পুতুলের মতো ‘ভিজিটর’ লেখা ঘরটার দিকে এগির্যে গেল।

শ্রীধর কাছে পৌঁছে ওরা মিলিটারি কায়দায় স্যালুট לুকল।
শ্রীধর একচিলতে হেসে ওদের অভিবাদন ফিরিয়ে দিলেন।
তিনজনের মধ্যে যার বয়েস একটু বেশি সে-ই বোধহয় সিকিওরিটি চিফ-কারণ, তার য়ুনিফর্ম্মের বুকের কাছে লাল ও নীল রঙের দুটো কাপড়ের স্ট্রিপ, আর তার ওপরে চারটে করে মেটাল স্টার।

বছর চল্লিশের মানুষটার লম্বাটে মুখ যেন তামাটে পাথরে খোদাই করা। ঢোখ দুটো ছোট-ছোট। দু-গাল এমন বসে গেছে যে, হঠাৎ করে প্রেত বলে মনে হয়।

মাথার টুপিতে আঙুল ছুঁইয়ে চিফ বলল, 'স্যার, এই যে—এরা দুজন-

কুশিয়া চতুব্বেীী আর নন্দরাম সরখখখ। ওরা একটা টেররিস্ট গ্রুপের কিছু টপ সিত্রেঁ ইনফরমমশান লাকিলি জানতে পেরেছে।... সেই...সেই ইয়েগেলো আপনাকে জানাতে চায়। ফার্স্ট ছান...।’

শ্রীধর কুশিয়া আর নন্দরামকে দেখলেন। শুধু দেখলেন না, ঠান্ডা দৃষ্টিতে মেপেও নিলেন। বয়েস খুব বেশি হলে চব্বিশ কি পঁচিশ। দুজনেরই মুথ্ে একটা ‘থোকা-থোক’’ ভাব। নিষ্পাপ চোখ, তেলতেলে মুখ, চওড়া গোঁফ।

সব মিলিয়ে মুখ দুটোয় বেশ মিল আছে।
বেশ কয়েক সেকেভ পর শ্রীধর চিফের দিকে তাকলেন। তারপর হাতের ইশারায় চিফকে ডিসমিস করে দিলেন, বললেন, 'আপনি এবার আসতে পরেন... !

ঘরের এক কোণে একটা বড় সোফা রাখা ছিল। সেটার দিকে ইশারা করে কুশিয়া আর নন্দরামকে বসতে বললেন শ্রীধর। ওরা বাধ্য ছাত্রের মতো ‘স্যার’-এর কথা শুনল। সোফার কাছে গিত্রে পাশাপাশি বসে পড়ল দুজনে।

নিউ সিটির টেররিস্ট গ্রুপ সত্যিই বেশ চিষ্তার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীধরের খুব ছোটবেলায় পিস ফের্সের বে-বিদ্রোহ হয়েছিল বলরাম পাট্টা তার আগুন নেভাতে পেরেছিলেন। বলরাম জানতেন, যদি একটা মানুষের জীবনযাপনের সব आরাম অকে উপহার ল্রেয়া যয় তা হুলে সে আর বিল্রো করবে না।
 নিথুঁতভবে তার নিয়মিত জোগান দেওয়া যায়, তা হলে কারও আর কোনও ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকবে না।

সেই পথই ধরেছেলেন বলরাম। পিস ফোর্সের গার্ডদ্রের কোনও অভাব রাখ্নননি, কিন্তু একইসঙ্গে তাদের ওপরে গোপন নজরদারির তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিয্রেছিলেন।

কিন্তু বলরাম পাট্টা আঞুন নেভালেও ছাই থেকে গিয়েছিল। আর সেই ছইই়্ের আড়ালে লুকিয়ে ছিল আগুনের কিছু কণা। সেই কণা থেকেই মাঝেমাঝে জূলে উঠত নতুন আগুন। ছোটখাটো অসন্তোষ, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ।

কেন এই অসন্তোষ, বিদ্রোহ, তা বলরাম বুঝতে পারতেন না। তার কারণ, বস্তুতান্ত্রিক চাহিদার বাইরেও যে মানুষের চাহিদা থাকে সেটা তিনি বোঝেননি। তাই শিকারির গুলিতে একটা পাখির মৃত্যু হলে অন্য একজন মানুষ কেন দুঃখ পাবে সেটা বলরাম বুঝতেন না। বুঝতে পারতেন না, কয়েকটা প্রজাপতি আগুনের आঁচে পুড়ে মরলে কেন মনুষ কষ্ট পাবে। সবসময় ভাবতেন, না, এর কোনও লজিক নেই। তেমনই ভাবতেন সুপারগেম্স কর্পোরেশনের ডিজাইন করা মনোহারী সব খেলায় কোনও পার্টিসিপ্যান্ট আহত কিংবা নিহত হলে নিউ সিটির কেউ কেন দুংখ পাবে। অচেনা, অজানা, অনাঘ্মীয় কোনও মানুষ মারা

গেলেও কারও দুঃখ পাওয়া উচিত নয়। এইসব ইল্লজিক্যাল বাাপারের কোনও মানে হয় না।

বলরাম পাট্টা নিজেকে যথেষ্ট লজিক্যাল মানুষ বলে মনে করতেন। তাই ওঁর यান্ত্রিক লজিকের কাঠামো দিয়ে এইসব ‘আলতু-ফালতু’ ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন-কিন্তু পারতেন না।

শ্রীষর পাট্টাকে বলরাম নিজের জেরক্স কপি তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেটা করতে গিয়ে দেখেছিলেন, শ্রীধর যেন আগে থেকেই বলরামের জুতোয় পা গলিয়ে বসে আছেন।

সুতরাং বলরামের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাতে তিনি বলতে গেলে দ্বিতীয় বলরাম পাট্টা তৈরি করে গিয়েছিলেন। নিজের জ্ঞান, অভিষ্ঞত, বুদ্ধি, ভাবনা—সবই তিনি শ্রীধরের মধ্যে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

তবে শ্রীষর কিন্তু দ্বিতীয় বলরাম হননি। বরং বলরামকে বেশ কয়েকণুণ ছপিয়ে গিয়েছেন। বলরাম পাট্টা যদি বেঁচে থাকতেন তা হলে এই ‘বেশ কয়েক গুণ’ বলরামকে দেখে খুশি হতেন। এবং, এটা মনে রাখতে হবে, বলরাম পাট্টাকে খুশি করা বেশ শক্ত কাজ ছিল।

বলরাম যেভাবে ছোটখাটো বিদ্রোহ বা বিক্সোভগুলোর মোকাবিলা করতেন, শ্রীখরও একইঅবে সেগুলো নিয়্ত্রপ আনার চেষ্টা করেন্ন। তিনি নিউ
 সন্ত্রাসবাদী। এরা অকারণে নির্বিচারে নিরীছ মানুষকে থুন করে। সেটা বোঝাতে গিয়ে শ্রীধর পাট্টা বেশ কয়েকজন নিরীহ মানুষকে গোপনে কোতল করে তার দায় বিদ্রোইীদের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তা ছাড়া সারা শহর জুড়ে গোপন নজরদারির কাজ আরও ব্যাপক, আরও শক্তিশালী করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্রেও...।

শ্রীধর চুপচাপ দাঁড়িয়ে কুশিয়া আর নন্দরামকে লক্ষ .করছিলেন। তারহ মধ্যে কখন যেন স্যাটেলাইট ফোনটা পকেট থেকে বের করে আবার হাতে তুলে নিয়েছেন।

একদু অপপক্ষ করার পর শ্রীধর বললেন, ‘কী বলবে বলো...।'
কুশিয়া তখন বনতে তরু করল, ‘স্যার...মার্শাল, স্যার...কী হয়েছে বনছি।’ কয়েকবার ঢোক গিলল কুশিয়া। তারপর : 'মার্শাল, স্যার, ডি, জি আর এম জোনে টেররিস্ট গ্রপপে বেশ কয়েকজন লোক আছে। ওদের কাছে আর্মসও আছে। আমি আর নন্দরাম...’ নন্দরামের দিকে তাকাল কুশিয়া : ‘গতকাল ওই তিনটে জোনে সিক্রেট প্যাট্রলে ছিলাম। ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এম জোনের పুয়েল্ভ কমা সেভেন্টি এইট কো-অর্ডিনেটে যাই। সেখানে একটা শপিং মলে ঢুকি। আমরা...আমরা ফুড প্লাজায় একটা টেবিল্ে বসে...আমরা খাবারের অর্ডার দেব বলে ভাবছিলাম। তখন পাশের টেবিলে বসা দুজন লোকের কথা আমাদের

কনে এল...।’ নন্দরামের দিকে তাকিয়ে কুশিয়া বলল, ‘এবার তুমি বলো...।’ নন্দরাম সোফায় বসার পর থেকেই উসখুস করছিল। এখন একাু নড়েচড়ে বসে ম্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'স্যার, ওদের কথার পক্যেন্ট্সুগো আমি লিতে এনেছি। কয়েকটা ফোন নাম্বারও টুকেছি। ডি আর জি জোনে ওদের কনট্যাক্ট আছে। এই দেখুন...’ বলে প্যান্টের পকেটে হতত जোকাল নন্দরাম।

তার পরের ঘটনাঙুলো শ্রীষর যেন স্লো মোশানে দেখতে পেলেন।
নন্দরাম ওর পকেট থেকে পয়েন্ট্স লেখা কাগজ বের করার বদলে একটা ০.২২ ক্যালিবরের হাড্গান বের করে নিয়েছে, এবং লেসার পয়েন্টার লাগানো ছোট্ট পিস্তুলা ধীরে-ষীরে উচিত্যে ধরছে শ্রীধরের দিকে।
‘ওয়ালথার টি-পি-এইচ স্টেইনলেস’ ডাব্ল অ্যাকশন হানডগান। ম্যাট ফিনিশ স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। ওজন মাত্র ৩৯৫ গ্রাম। ছ’রাউড্ড গুলি ছোড়া যায়। পিস্তলের হাতলটা কালো রঙের সিনথেটিক মেটিরিয়াল।

চেহোরায় ছোটখাটে কিন্তু বেশ কাজের এই হান্ডগান দিবি প্যান্টের পকেটে এঁটে যায়।

কুশিয়াও কিষ্তু বসে ছিল না। নন্দরামকে অনুকরণ করে সে-ও একটা


'আমরাই সেই টেররিস্ট, মার্শাল, স্যার—।' কুশিয়া দাতে দাঁত চেপে চাপা গলায় বলল।

এরকম সংকটের মুহূর্ত শ্রীষর পাট্টার জীবনে অনেক এসেছে। তিনি যখন চোদ্দ্র বছরের পিলটু তখন থেকেই। সুতরাং শ্রীধরকে কেউ চমকে দিতে পারে না, ওঁর কাছে ‘অপ্রত্যাশিত’ বলে কিছু নেই। আসলে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হওয়াটা বে কত বড় ‘বোগ্যতা’ শ্রীষর পাট্টা তার উজ্জূল প্রমাণ।

নন্দরাম এবং কুশিয়া যতই সিকিওরিটি ফের্সের সদস্য হোক ওরা কখনওই শ্রীধর পাট্টার কাছে সন্দেহের ওপরে ছিল না-বরং বলা যায়, সন্দেহের অনেকটা নীচ। আসলে শ্রীষরের কাছে—একমাত্র তিনি নিজে ছড়া—আর কেউই সন্দেহের ওপরে নয়।

সুতরাং ভাবনেশহীন শ্রীষর নিজম্ব অভিনব পদ্ধতিত্ত এই ‘গেরিলা’ আক্রমণের জন্য তৈরি ছিলেন। আর সেইজন্যুই স্যাটেলাইট ফোনটা তিনি হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। নন্দরাম পকেট থেকে জাডডগান বের করে নেওয়ামাত্রই

তিনি স্যাটেলাইট ফোনের একটি বিশেষ বোতাম টিপেছেন এবং তৎক্কণাৎ একটা জেরালো ইলেক্ট্রোমাগনেটিক ফোর্স ফিল্ড স্বচ্ছ দেওয়ালের মতো নন্দরামদের কাছ থেকে শ্রীষর পাট্টকে আলাদা করে দিয়েছে।

নন্দরাম ফায়ার করেছিল। তার কয়েক লহমা পরে কুশিয়াও। কিন্তু ফোর্স ফিল্ডের শিল্ড হাইস্পিড মেটাল বুলেটুুেোকে রুণ্খ দিল। ওদের কাইনেটিক এনার্জি বদলে গেল থার্মাল এনার্জিতে। হইই টেম্পারেচারে ওগুলো প্লাজমা হয়ে গেল। সেই প্লাজমাকে ফোর্স ফিল্ড ট্ব্যাপ করে নিল।

নন্দরাম আর কুশিয়া ফায়ার করেই যাচ্ছিল। ফোর্স ফিন্ড যেহেতু চোথে দেখা যায় না তাই ব্যাপারটা যে ঠিক কী হচ্ছে সেটা ওরা ঠাহর করতে পারছিল না। গুধু দেখছিল, ভাবলেশহীন পাথরের মুখ নিয়ে শ্রীধর পাট্টা একইভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এবং মরা মাছের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

প্রাথমিকভাবে ‘বিপ্লব’ অথবা ‘বিদ্দোহ’ শেষ হলে নন্দরাম আর কুশিয়া হকচকিয়ে গেল। শয়তানটা এখনও দু-পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, आँচড়হীন।

এরপর উত্তেজনা এবং বিদ্রোহের জোশ বিদ্রোহীদের দিয়ে যা করিয়ে থাকে নন্দরাম আর কুশিয়াও তই করল।

##  এল ख्री४রের मिকে।

এই ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সঙ্গে শ্রীধর ভীষণ পরিচিত। তা চমকানোর কোন প্রশ্নই উঠল না। ওধু হাতের মুঠোয় ধরা স্যাটেলাইট ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডের ইনটেন্সিটি কমিয়ে ‘স্টানিং’ লেভেলে নিয়ে এলেন। ফলে নন্দরাম-কুশিয়া ফিল্ডের দেওয়াল ছোওয়ামাত্রই শক খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তার চেয়ে বেশি কিছু হবে না।

এবং তাই হল। দুটো জোয়ান শরীর লুটিয়ে পড়ল ‘ভিজিটর’ রুমের মার্রেল পাথরের মেরেতে। ওরা এখন কমপক্ষে দু-ঘণ্টা অষ্ঞান হয়ে থাকবে।

এবার শ্রীষর একচিলতে হাসলেন। ফোনের বোতাম টিপে ফোর্স ফিল্ডকে ড-অ্যাক্টিভেট্ট করে দিলেন।

এই লোকদুটোকে জ্যাষ্ত রাখাট খুব জরুরি। কারণ, ওদের কাছে থেকে সিত্রেঁ টেররিস্ট গ্রুপপুলো সম্পর্কে অন্নে খবর পাওয়া যাবে। ফল পিশে যেভাবে ফলের রস বের করা হয় ঠিক সেইভাবে খবরগুলো ওদের ব্রেন থেকে বের করে নেওয়া হবে। তারপর ছিবড়ে ফেলে লেওয়া হবে নেক্রোসিটির কবরস্থনে।

এ ছাড়া আরও কিছু কাজ বাকি।
এই দুতো ছেলে—নন্দরাম আর কুশিয়া-গত সাতদিনেে যেসব লোকের

সঙ্গে সরাসরি কিংবা ফোনে যোগযোগ করেছে তদের তুলে নিয়ে আসতে হবে। এবং টপ লেভেন সিকিওরিটি গ্রিলিং দিতে হবে। এই সন্দেহভজনদের তালিকায় যদি কোনও সিক্ওরিটি স্টাফ থাকে তা হলে তারও কোনও রেহাই नেই।

একটা দীর্ঘশ্ধাস ফেললেন শ্রীষর। এই শোখিন বাঁড়িটার একটা সিত্রেট বলধর পাট্টা জননতেন-আর ওঁর কাছ থেকে জেনেছেন শ্রীধর পাট্টা। এ ছাড়া আর কেউ সেই গোপন খবরটা জানে না। সেটা হল, এই বাড়ির আনাচেকানাচে সাড়ে সাতষট্টি রকম মডার্ন অটোমেটেড সিকিওরিটির ব্যবহ্থ করা আছে। সেগুলোর বিজ্ঞান ও প্রयুক্তির বিশদ আলোচনা করে একটা টেকনিক্যাল বই লিখলে 'মডার্ন সিকিওরিটি সিস্টেম’-এর আডারগ্র্যাজুয়েট কোর্স প্রায় কাভার্ড হয়ে যাবে। সুতরাং নন্দরাম ও কুশিয়া জাতীয় এলিমেন্টরা যে নাস্তানাবুদ হবে এইটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তা ছাড়া ‘ভিজিটর’ রুমে গোপন সিকিওরিটির ব্যবস্থাটা একটু বেশি কড়া-লেভেল ফাইভ। এই লেভেল ফাইভ সিকিওরিটি আর আছে শ্রীধরের বেডরুম্ম।

মোবাইল ফেনের বোতাম টিপে সিকিওরিটি চিফের সঙ্গে কথা বললেন শ্রীধর।
 স্ক্যানিং করতে হবে। ছিয়ানব্রই ঘণ্টার মধ্যে আমার ফুল আ্যাডড ফাইনাল রিপোর্ট চাই। আন্ডারস্মুড?
'পারফেক্টলি আন্ডারস্সুড, মার্শাল, স্যার...।'
ফোন কেটে দিলেন শ্রীধর। কাচের দেওয়াল ভেদ করে কনফরেন্স রুম নাম্বার ওয়ানের দিকে নজর চলে গেল ওঁর। ডক্টর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস এদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। বোধহয় এই ঘরে ঘটে যাওয়া রোমাঞ্চকর ‘সিন্নো’ঢা পুরোটই দমবন্ধ করে দেখেছেন। অবশ্য দেখ্েে সবকিছু ঠিকঠাক বুঝতে পারেননি। যেহেতু ফোর্স ফিল্ড আর প্লাজমার ব্যাপারটা চোেে দেখা যায় না।

একমিনিটের মধ্যেই দুটো ম্যাগনেটিক মেটাল স্ট্রেচার নিয়ে চারজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড চলে এল। সঙ্গে সিকিওরিটি চিফ।

গার্ডদের হাত গাঢ় সবুজ চাদরের মতো দুটো মোটা কাপড় ছিল। সেণুলো দিয়ে ওরা অজ্ঞান নন্দরাম আর কুশিয়াকে কাঁধ থেকে কোমর পর্য্ত্ত জড়িয়ে দিল। ওদের হাতজোড়া চাদরের মধ্যে বন্দি হয়ে গেল। চাদরে জ্যাকেটের মতো জিপ টানার ব্যব্থা ছিল। গার্ডরা সেটা টেনে আটকে দিল। তারপর ওদের স্ট্রেচরে అইয়ে দিয়ে স্ট্রেচারের লুকোনো ইলেক্ট্রোম্যাগনেট অ্যাক্টিভেট করে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে সবুজ চাদরের ভেতরে লাগানো লোহার পাত চুম্বকের টানে স্ট্রেচারের

সঙ্গে আটকে গেল। এখন কারও সাহায্য ছাড়া নন্দরাম আর কুশিয়া স্ট্রেচার ছেড়ে পালাতে পারবে না।

স্ট্রেচার দুটো নিয়ে ওরা পাঁচজন চলে যেতেই স্যাটেলাইট ফোন পকেটে ঢোকলেন শ্রীধর। তারপর হাততালি দিয়ে হাত ঝাড়লেন। বেরিয়ে এলেন ‘ভিজিটর’ রুম ছেড়ে।

এবার রঙ্গপ্রকশেের সঙ্গে ওঁর ইকনমিক ইনডেক্স নিয়ে কথা বলতে হবে। কনফারেন্স রুম নাম্বার ওয়ানে শ্রীধর পাট্টা যখন এসে ঢুকলেন, তখন ওঁকে দেথে রঙ্গপ্রকশের মনে হল এতক্ষণ ‘ভিজিটর’ রুমে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শ্রীধরের জীবনে যেন ঘটেনি-তিনি এতটাই স্বাভাবিক।

শ্রীধরও রঙ্গপ্রকাশকে দেখছিলেন। দেথে বুঝতে চাইছিলেন, শ্রীধরের শত্রু প্রতিরোধের অদ্ভুত পদ্ধতির লাইভ ডেমনস্ট্রেশান রঙ্গপ্রকাশ ঠিকঠাক দেখেছেন कि নा।

রঙ্গপ্রকাশ যে সেটা দেখেছেন সেটা ওঁর মুখচোখের চেহারা দেখেই বুঝতে পারলেন শ্রীধর। কিন্তু সামান্য হেসে অত্যষ্ত স্বাভাবিক সুরে বললেন, আসুন, ডক্টর-বসুন। আমাদের বাকি আলোচনাইুু সেরে নিই। ওই যে, ইকনমিক ইনডেক্স...।'
 গায়ের কালো টি-শাঁ্ট থেকে কাষ্পনিক ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে শ্রীধর পাট্টা জিগ্যেস করলেন।

রঙ্গপ্রকাশ কিছুক্ষণ আমতা-আমতা করলেন। বোধহয় সঠিক উত্তর খুঁজতে চাইছিলেন। তারপর বললেন, ‘ভেবেছি...তবে ডেফিনিট পথ কিছু খুঁজে পাইনি। ভাবছি...ভাবছি কারও কাছে লোন নেব...।’
'যদি তাই মনে হয় তা হলে নিন।' ভুরু উঁচিয়ে বললেন শ্রীধর, 'কিস্তু দেখবেন, আপনাকে লোন দিতে গিয়ে তার ই-আই-টা যেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে না চলে যায়।'

ক্রিটিক্যাল ভ্যালু। কী সুন্দর কথা! সব জিনিসেরই বোধহয় একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থাকে। জীবনেরও। ভাবলেন ডক্টর।

যেমন শ্রীধরের মতে জিশানের দাম ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। না, ভুল ভেবেছেন রঙ্গপ্রকাশ। শ্রীধরের কাছে বোধহয় সবার জীবনের দামই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে। শুধু নিজের জীবনটা ছাড়া।
'না, স্যার।' শ্রীধরের মন্তব্যের জবাব দিলেন, 'সেটা আমি খেয়াল রাখব...।’

খেয়াল রাখবেন বটে, কিন্তু রঙ্গপ্রকাশ টাকা ধার নেবেন কার কাছে?

মনে-মনে বন্ধু এবং আা্ষীয়্বজনের তালিকার ওপরে অনুসন্ধানী নজর বুলিয়ে নিলেন।

নাঃ, সেরকম কেউ নেই। এমনকী শ্বশ্রবাড়ির কথাও ভাবলেন। সেখানেও সমাধান অমিল। কারণ, পর্ণমালাদের বাড়ির অবস্থা এমন যে, রঙ্গ প্রকাশকে ক্রিটিকাল ভ্যালুর ওপরে তুলতে গেলে ওদের ইকনমিক ইনডেঙ্স ক্রি刀িক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে যাবে।

এ ছাড়া, কারও কাছ থেকে লোন পেলেও রঙ্গপ্রকাশের আরও একটা সমস্যা রয়েছে। সিমানের যা লাইফস্টাইল তাভে ল্লান چেওয়া টাকা উড়িয়ে দিতে ও খুব বেশি সময় নেবে না। ই-ন্যালড আর কম্পিটিশানের গেমগেলোই ওর দফারফা করে দেবে।

একটা চাপা দীর্ঘপ্পাস বুক ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। আর মাত্র তিন মাস সময়। মানে নব্বই দিন। তার মধ্যে আজ একটা দিন পার হয়ে গেল। বাকি থাকবে উননব্বই দিন। তার মধ্যে যা হোক কিছু একটা করতে হবে।

শ্রীধর যেন ডক্টরের হিসেবটা মনে-মনে পড়ে ফেললেন। বললেন, ‘আজকের দিনটা বাদ দিলে আর মাত্র উননব্বই দিন...। কাউন্ট ডাউনটা খেয়াল রাখবেন, ডক্টর...।'

আচ্ছা, শ্রীধরকে কি সিমান্নে কথী বলা যায়? বना যায় উড়नচণী
 ‘একটা কথা বলব, স্যার?’
‘कী কथा?’ ভুরু কুঁচকে তাকালেন শ্রীধর ः ‘বলুন...।
শ্রীধর জনেন, রঙ্গপ্রকাশ কখনওই নিজের জন্য কেনও সুবিধে চান না। শ্রীধরের পার্সোনাল থেরাপিস্ট হওয়ার সুবাদ্রে তিনি শ্রীধরের অনেক কাছাকাছি আসার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে অনেক সুযোগ চাওয়ারও সুযোগ পেয়েছেনকিন্তু চাননি।

মানুষটার জন্যে শ্রীধরের করুণা হন। আশ্মসম্মান আর আশ্মমর্যাদা বড় জালা!সবসময় অন্তরে-অন্তরে জ্রালিয়ে মারে। দেথি মানুষটা কী বলতে চায়। ভাবলেন শ্রীধর। যদি কোনও সুযোগ চায় বা টাকা ধার চায় তা হলে শ্রীধর এককথায় দিয়ে দেবেন। আজ কেন যেন ডক্টর বিশ্বাসের প্রতি শ্রীধরের দক্ষিণ্যের একটা बোঁক চেপেছে।
‘আমার ছেলেকে ফেরানো যায় না?’ রঙ্গপ্রকাশের গলাটা সর্বহারার মতো শোনাল।

শ্রীধর পাট্টা কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। প্রপ্পটার অর্থ ওঁকে পাশ কাট্য়েরে গেল।
‘ফেরানো মানে?’

৬又 www．banglabo厄⿱⺈⿻⺕亅丷冖巾 pdf．biogspot．com
‘ফেরানো মানে．．．’ রঙ্গপ্রকাশ মরিয়া হয়ে বলত্ত শুরু করলেন। কার সামনে তিনি কী বলছেন সেটা ভুলে গেলেন ：‘িমান．．．মানে，আমার ছেলে．．．ও．．．ও খুব বাজে রাস্তায় চলে গেছে। ও নেশা করে। সুপারগেম্স কর্পোরেনের কম্পিটিটিভ গেমসগুলোয় পাগলের মতো বাজি ধরে। ওকে．．．ওকে দেখে মনে হয়．．．মনে হয়．．．ওটাই জীবন। এসব ছাড়া জীবনে আর কিছू নেই। ওর．．．ওর নেশার খিদ্র মেটাতে গিয়ে ．আমার সমস্ত সেভিংস তলানিতে এসে ঠেকেছে। আমার ই．আই．ক্রিটিক্যাन ভ্যালুর নীচ্ নেমে গেছে।＇দু－शাতে মাথা আঁকড়ে ধরলেন রঙ্গপ্রকাশ। কান্নার দমক ছিটকে বেরোতে চাইল গলা দিয়ে। ওঁর চোয়াল দুটো ব্যথা করছিল，চোখ জ্রালা করছিল। কান্না চেপে কোনওরকমে বললেন，＇স্যার，বিশ্বাস করুন．．．আমাদের তিনজনের জীবনটাই ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে গেছে। সিমানকে যদি ফেরাতে পারি তবেই আমি আর পর্ণমালা সবচেয়ে বেশি খুশি হব। বুঝব，আমাদের তিনজনের লাইফ ইনডেঙ্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর ওপরে উঠেছে। সেই জীবনগুলোকে নিয়ে বাঁচা যায়।’ মাথা থেকে গাত সরালেন রঙ্গপ্রকাশ। সজল চোে শ্রীধরের দিকে তাকালেন। স্থান－কাল－পাত্র ভুলে আচমকা আবেগে শ্রীধরের হাত দুটো চেপে ধরলেন ：‘স্যার，প্লিজ হেল্প করুন। আমার．．．আমার ছেলেটটকে ফেরানোর পথ বলুন। ওকে বাঁচান। প্লিজ，স্যার．．．।＇

 ছড়়িয়ে নিলেন। খানিকট্ট অবাক চোথে নিউ সিটির সাইকো অ্যানালিসিস সেন্টারের চিফ সাইকেলিজিস্টকে দেখতে লাগলেন। সন্তানের ভালোর জন্য পিতার আকুলিবিকুলির মূল তত্তু উপলক্কি করতে চাইছিলেন। কিন্তু ঠিকঠাক পারছিলেন না। কারণ，শ্রীধর পাট্টা সংসারে একাকী। ‘বাবা’ ডাকের মর্মস্পর্শিতা কিংবা অন্তর্ভেদী শক্তি－দুটোর কোনওটাই শ্রীধরের জানা নেই।，তাই নিথর নয়নে অসহায় মনুষটার দু－গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া জলের রেখার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

কিছুদ্ষণ চুপ করে থাকার পর শ্রীধর বললেন，ডক্ট্র，আই ফিল ফর য়ু। কিন্তু আপনি তো জানেন গেম শো হচ্ছে নিউ সিটির এক্সকুুিিভ ব্রাঙা বিন্েোদনকে আমরা যে－লেভেলে নিয়ে গেছি সেটা আর কোনও সিটি পরেনি। আমাদের শহরের শতকরা নব্বই ভাগ মানুষ ডিরেক্ষিলি কিংবা ইনডিরেক্টুলি এইসব মাইভ্ডর্রোয়িং গেম্লের সঙ্গে জড়িত। আমাদের শহরের স্ট্রং ইকনমি এইসব গেম্সের ওপরে দাডড়িয়ে আছে। আপ্পনি কি জানেন，পৃথিবীর কত শহর এই একটা কারণে আমাদের কীরকম ঈর্ষা করে！আমরাই দুনিয়ার এক নম্বর，ডক্টর বিশ্ধাস，এক নম্বর！আর সেই একনম্বর শহরের নাগরিক আপনি－অন্তত এখনও। য়ু শুড ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট．．．।

শ্রীধর থামলেন। ওঁর মুখ-ঢোখে লালচে আভা। আর তার সঙ্গে গর্বের ছढ।
‘কিন্তু আমার...আমার ছেলেটা?’
পকেট থেকে একটা ছোট শিশি বের করলেন শ্রীধর। শূন্যে মুখ উঁচিক়ে শিশি থেকে দু-<োঁটা তরল জিভে ঢাললেন। টাকরায় জিভ ঠেকিয়ে চটাস-চটাস শব্দ করলেন দুবার। মাথাট দুপালে ঝাঁকালেন। ঘন-ঘন শ্বাস ফেললেন ক<্রেকবার। তারপর হাঁটুতে ছোট্ট চাপড় মেরে বললেন, ‘কন্ট্রোল। কন্ট্রোলই হচ্ছে আসল। ভালো থাকার পাস়ওয়ার্ড। যে-কোনও ধরনের একাসাইটমেন্টই একটা নেশার মতো। সেটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে সেটাকে স্ট্রং রেসিস্ট্যাস্স দিয়ে কন্ট্রোেের মধ্যে রাখতে হয়...।

শ্রীধর আরও অনেক কথা বলছিলেন, কিন্তু তার একটি বর্ণও রঙ্গক্রকশের কানে ঢুকছিল না। মনে হচ্ছিল, শ্রীষর কেনও জ্ঞাগর্ভ প্রবন্ধের বই পড়ে শোনাচ্ছেন।

রঙ্গপ্রকাশের অন্তরে একটা হাহাকার ঢেউ তুলল। শ্রীধর কেতাবি জ্ঞান দিত্যে যাচ্ছেন আর ওঁর প্রাণের ছেলেটা ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। মাপে ছোট रয়ে याচ্ছে।
 গেল। গায়ে কাঁট দিল।

রস্গপ্রকাশ বুঝলেন, শ্রীধর পাট্টার কাছে বিনোদন এবং বৈভব হল দুই ‘‘্রদ্ধেয়’ দেবতা। আর হিংসা এবং নিষ্ঠুরতা তাঁদের বাহন।

একজন অসহায় আশঙ্কিত চুরমার পিত বসে-বসে ভাবতে লাগলেন, কী করে তাঁর একমাত্র ছেলেকে সঠিক পথে ফেরানো যায়।

ঘরের বাইরে গ্নো-সাইন দিয়ে লেখা ‘জয় রুম’। শুধু আনন্দের জন্য তৈরি ঘর।

ঘরের দেওয়ালগুলো সব কাচের তৈরি। কিন্তু সাধারণ কাচের নয়-আয়না-কাচ। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের সবকিছু আবছাভাবে দেখা গেলেও বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না-মনে হয় যেন আয়না।

বিশাল ঘরটার ভেতরে নানান রঙেে ধেঁঁয়া উড়ে বেড়াচ্ছিল। সুতোর তৈরি সাপের মতো সূশ্ম ধোঁয়ার রেখাতুলো দেথে মনে হয় যেন কেউ শূন্যে স্বপ্নের জাল বিছিয়ে দিয়েছে।

## $৬ 8$ www.banglabo解 patf.bitogspot.com

ঠিক স্বপ্ন না হলেও এই ধেঁয়়া স্বপ্ন তৈরি করে। কারণ, নানান ধরনের ড্রাগ থেকে তৈরি এই নেশার ধেঁযয়ায় ঘণ্টাখানেক কাটালে মাথা ঝিমঝিম করে, শরীরটা পাথির মতো হালকা মনে হয়। সচেতন মন আড়ালে চলে গিয়ে অবচেতন মন তখন রাজত্ব খরু করে। সে তখন দু-কাঁধে দুটো সুন্দর ডানা লাগিয়ে দেয়। তারপর আচমকা এক উড়ান দিয়ে আশর্য সব স্বপ্নের জগতে বেড়াতে নিয়ে যায়। ভাসতে থাকা শরীর আর ভাসতে থাকা মন তখন অপরূপ আনন্দের স্বাদ নিয়ে বেড়ায়।

সিমান সেই আনন্দের জগতেই ভেসে বেড়াচ্ছিন।
‘জয় রুম’-এ হালকা মিউজিক বাজছিন। আর সেই তালে-তালে ঘরের চার দেওয়ালে আলোয় অঁকা চঞ্চল ঝরনার ছবি রং পালটাচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমার রাতে অপরূপ এক জঙ্গলের মাঝে ঝরনা ঘেরা কোনও প্রাকতিক উদ্যানে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তিমিত মিউজিকের ফঁাকে-ফাঁকে ঝরনার কলরোল শোনা যাচ্ছিল। আর ঘরের ঠিক মাঝখানে এক ঝাঁক তরুণ-তরুনী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো এলোমেলো ছল্দে শরীরে ঝাঁাুনি তুলছিল।

ওদের বয়েস সততরো কি আঠেরো থেকে উনিশ-কুড়ির মধ্যে। পরনে আধুনিক রঙিন পোশাক। জিন্স, স্লিভলেস, কাপ্রি, কার্গো, হলটার, ভেস্ট,

 কৌশলে সেগুলো শরীরের চামড়ায় একেবারে জড়িয়ে গেছে।
‘জয় রুম’-টা মাপে বিশাল। কমপক্ষে তিরিশ যুট বাই পঞ্চাশ ফুট। তারই ঠিক মাঝখানটায় মিউজিক, আলো আর নাচের ব্যাপারটা চলছিল। সেখানে রঙিন ছায়া মাখা শরীর নিয়ে সিমান নাচছিন, আর ওপরদিকে নাক উঁচিয়ে ধরে বড়বড় শ্বাস টানছিল। তাত ওর নেশাটা আরও গা় হচ্ছিল।
‘জয় রুম’-এর মেঝেতে কৃত্রিম ঘাসের গালিচা পাঁত। তার রং আর ধরন এমন যে, আসল ঘাসও হার মানবে। নাচতে-নাচতে তরুণ-তরুণীদূর কেউকেউ—অথবা, কিশোর-কিশোরীদ্রর কেউ কেউ—সেই ঘাসের মেঝেতে শয়ে পড়ছিল। আবার একদু পরেই শরীর ভাঁজ করে ঝটকা মেরে উঠে পড়ছিল। তারপর নাচছিল।

হঠাৎই মিউজিক স্তিমিত হল। লুকোেো কোনও স্পিকার থেকে একটি মেয়ের মিষ্টি গলা শোনা গেল। গলাটা একইসঙ্গে মিষ্টি এবং নেশাতুর। ‘ফোক্স, নাউ উই স্টপ ডাা্স অ্যাড মিউজিক। নাচ আর বাজনা এবার শেষ। শুরু হবে হলেেগ্রাম ফাইট গেম। তোমাদের হট ফেবারিট শো...।' ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে খুশির হষ্লা শোনা গেল। ছায়া-ছায়া মানুযণুলো ‘জয় রুম’-এর মাঝাখান থেকে সরে গেল দেওয়ালের দিকে। ফলে মাঝখানটায় বেশ

## 

তারপর মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। রঙিন ধোঁয়ার সুতোগুলোর বেশিরভাগটাই কোনও লুকোনো সাকশান ফ্যান যেন মুহূর্তে গিলে নিল। এবং সেগুলো মিলিয়ে যেতেই ঘরের মেঝেতে দুটো আলোকিত শরীর জন্ম নিল।

লেসার দিয়ে তৈরি দুটো হলোগ্রাম শরীর। একটা লাল, অন্যটা নীল। দুটো শরীরই চাপ-চাপ পেশি দিয়ে তৈরি। ওদের পরনে শুধু ধপধপে সাদা দুটো জাঙ্গিয়া।

শরীর দুটোর মাঝে চার-পাঁচ হাতের দূরত্ব। ওরা লড়াইয়ের ভঙ্গিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রয়েছে।

স্কিন টাইট কালো পোশাক পরা আট-দশজন লোক ‘জয় রুম'-এ पুকে পড়ল। ওদের বুকে ‘জয় রুম’-এর ফ্লুওরেসেন্ট লোগো জ্বলজ্বল করছে। ওরা ইলেকট্রনিক প্যানেল বসানো চারটে কাউন্টার মূর্তি দুটোকে ঘিরে বসিয়ে দিল। ফলে লড়াকু দুজন যোদ্ধার জন্য একটি চৌকোনা এরিনা তৈরি হয়ে গেল। ঘরের হুল্লোড় করা ছেলেমেয়েগুলো ইলেকট্রনিক প্যানেলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

এখুনি হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হবে। শুরু হবে লাল আর নীলের লড়াই। র্যান্ডমাইজ করা সফ্টওয়্যার যোদ্ধা দুজনকে পরিচালনা করবে। দাবার চালের মতো লড়াইয়ের ছোট-ছোট চাল অ্যাক্টিভেট করবে। তবে কখন কোন


কিন্তু এর পরেও একটা মজা আছে।
লড়াই দেখতে-দেখতে যে-কোনও দর্শক কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে লড়াইয়ের কোনও একটা মুভ অ্যাক্টিভেট করতে পারে। এর ফলে সফ্টওয়্যার জেনারেটেড র্যান্ডম সিকোয়েন্সের ধরন বদলে যেতে পারে। এবং তখন লড়াইটা হয়ে উঠবে আরও আনপ্রেডিক্টেব্ল।

স্বাভাবিকভাবেই এই হলোগ্রাম যোদ্ধা দুজন কখনও ক্লান্ত হয় না। তবে ওরা হাঁপায়, ওদের শরীরে ঘাম দেখা দেয়। স্পেশাল টেকনিক দিয়ে এগুলো ডিজাইন করা হয়েছে ফইট গেমটাকে রিয়েলিস্টিক করার জন্য।

এই লড়াই চলবে ঠিক এক ঘণ্টা। তাতে যে-হলোগ্রাম ফাইটার পয়েন্টে জিতবে তার শরীরটা এরিনার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যজন শুয়ে পড়বে মেঝেতে। উইনারের হয়ে যারা ইলেকট্রনিক প্যানেলে বোতাম টিপে লড়াইয়ের মুভ অ্যাক্টিভেট করেছে তাদের প্রাইজ দেওয়া হবে। তাদের চিনে নেওয়া হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অটো-ম্যাচ টেকনিকের মাধ্যমে।

এ ছাড়া এই দুজন ফইটারকে নিয়ে বাজি ধরায় কোনও বাধা নেই। হলোগ্রাম ফাইট গেম শুরু হল। তার সঙ্গে মানানসই সাউন্ড এফেক্ট।

সঙ্গে-সঙ্গে নেশাতুর মানুষণুলো হাত-পা ছুড়ে চিৎকার শুু করল। ‘রেড! রেড!
'ब্লু! ㅈू!'
একইসজ্গে দর্শকদের অনেকেই কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপে ‘রেড’ আর ‘র্ু’’র জন্য লড়াইয়ের নানানরকম মুভ আ্যাক্টিতেট করছিল। আর কালো পোশাক পরা লোকগুলোর কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে বাজি ধরছিল।

সিমানও চুপ করে ছিল না। উত্তেজনা আর আগ্রহ নিয়ে যুযুধান ফাইটার দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। আর থেকে থেকেই উল্মাসের চিৎকার করে কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টিপছিল। ওর চোেে হলোগ্রাম ফাইটারদ্রে লাল-নীল ছায়া চঞ্চলভাবে নড়ছিন।

সিমানকে দেথে মনে হচ্ছিল, এই লড়াইটাই ওর একমাত্র পৃথিবী। একটু আগেই ও ‘রেড’ ফাইটার জিতবে বলে আট হাজার টাকা বাজি ধরেছে। যদি ও জেতে তা হলে হাতে-ছাত পাবে বোলো হাজার টাকা। ততে আরও কিছুদিন আনন্দ আর ফুর্তি করা যাবে। বাবার কাছ থেকে ইদানীং হাতখরচের টাকা পেতে একদু অসুবিধে হচ্ছে।

এ-কথাট মনে হতেই সিমানের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব উথলে উঠन।
 হলে হবে কী, ওদের শরীর রক্ত-মাংসের শরীরের মতোই ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল। হাত-কপালে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল। মুখ দিয়ে যন্ত্রণার উঃ! আঃ! শব্দও বেরোচ্ছিল।

ঘরের প্রায় সিলিং-এর কাছাকাছি শৃন্যে ভেসে আছে একটা হলোগ্রাম স্কোরবোর্ড। তাতে ডিজিটাল হরফে নীল এবং লাল রঙে যথাক্রমে রু এবং রেড-এর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে। লড়াইয়ের সন্গে তাল মিলিয়ে পয়েন্ট বাড়ছেকখনও লালের, কখনও নীলের।

সবকিছু মানুষের মতো হলেও হলেেগ্রাম ফাইটাররা লড়াই করছিল অতিমানবের মতো। এমন সব মার কিংবা মারপ্যাচ ব্যবহার করছিল যা একমাত্র সিনেমার স্পেশাল এফেক্টের মাধ্যমে দেখানো সষ্ভব। ওদের লড়াইয়ের অভিনব মুভণুলো দেখতে-দেখতে দর্শকের দল উত্তেজনায় চিৎকার করছিল।

এসরের মধ্যে হঠাৎ করেই একটা গন্ডগোল শুরু হন।
কন্ট্রোল প্যানেলের বোতাম টেপার দখল নিয়ে সিমানের সজ্গে একটা মেয়ের ঝামেনা লাগল।

মেয়েটার মুলগুলো ছোট, খাড়া-খাড়া। চোেে সবুজ রঙের ফুওরেসেন্ট কাজল। নাকে আর গলায় দুটো সোনার রিং। কপালে চকচকে কী একটা তুঁড়ো

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## ৬b <br> www.banglabioêt padf.tīogspot.com

মাখা। তার কণাণুলো জোনাকির মতো ঝিকমিক করছে।
মেয়েেটার গায়ে স্লিভলেস শর্ট জ্যাকেট। পা়্যে লেদার স্ন্যাক্স, তার ওপরে মেটাল বাটন। ডানহাত একটা ফানি চকোলেটট স্টিক। সেটা মাঝে-মাঝে চুযছে।

ফনি চকেলেট স্টিকটা ঠিক নেশার জিনিস নয়। তবে এটার একটা বিশেষ গুণ আছে। অন্য কোনও কিছু থেকে একবার নেশা হলে ফানি চকোেেট স্টিক সৌ নেশার ন্রোককে বহৃহ্ণণ ধরে রাখতে সাহায্য করে।

মেয়েটা সিমানকে একটা ধাক্কা মেরে জড়ানো গলায় বলন, ’য়ু স্কাম! ওই কন্ট্রোল প্যানেলের বাট্নগুলো তোমার পার্সোনাল প্রপার্টি নয়। লেট মি প্রেস সাম... ’’

সিমান রুখে দঁড়াল কিন্তু মেয়েটার গায়ে হতত তুলন না। নেশা জড়ানো গলায় বলল, ‘বোতাম টেপাটও একটা কম্পিটিশান, সিসি। লড়াই করে জায়গা করে নিয়ে তোমাকে বোতাম টিপতে হবে...।’
‘থ্যাংক্স ফর দ্য অ্যাডভাইস। আমি রু-র ওপরে এক লক্ষ টাকা বেট করেছি আ্যাড আই ওয়ান্ট র্লু ট উইন। সো আই ওয়ান্ট দ্য উইনিং মুভস, ও.কে.? উড য়ু প্লিজ গেট লস্ট, ডিউড?'
'অু দ্য হেল আর য়ু?’ মেয়েটার মুখের কাছে হিশ্রু মুখ নিয়ে এল
 क्ञाएँ"

তচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সিমান ঃ ‘এখানে তোমকে নতুন মনে হচ্ছে। য়ু ডোন্ট নো দ্য র্ল্স। কাম ব্যাক হোয়েন য়ু গ্রো আপ, বিচ!’

সিমান কথাগুলো উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটা নোংরা গালিগালাজ করে উঠল এবং সিমানের গালে সপাটে এক চড় কষাল।

সিমান প্রথমটা হকচকির্যে গেলেও পরমুহুর্তেই একটটা পালটা থাপ্রড় কষিয়ে দিল মেয়েটার গলে। মেয়েটার হাত থেকে ফানি চকোলেট স্টিকটা পড়ে গেল।

তারপর যেটা শুরু হল সেটা কিল-চড়-লাথি-ঘুসির বিচিত্র লড়াই। কোনও পুরুষ এবং মহিনার এরকম অসভ্য লড়াই কল্পনা করাও কঠিন।

হলোগ্রাম ফাইটারদের অক্নান্ত লড়াই চলছিল। তাদের ঘিরে দর্শকদের ইইহুল্লোড়ও চলছিল। কিন্তু তারই মধ্যে দশ-বারোজন সিমান এবং মেয়েটিকে घিরে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং বিনাপয়সার মজা দেখতে লাগল।

হঠাৎই ওদের কেউ বাজি ধরার ব্যাপারটা শুরু করল। সঙ্গে-সঙ্গে ওরা নিজেদের মধ্যে বাজি ধরতে লাগল। কেউ সিমানকে জেতার জন্য চিয়ার আপ করতে লাগন। আর কেউ মেয়ৌকে।

কিন্তু কেউই ওদের লড়াইটা থামাতে এগির্যে এল না। বিশৃংখল উম্লাসে

## ‘জয় রুম’ তथন কাঁপছছ।

সিমান আর মেয্যেটির শরীর অক্ষত ছিল না। আঁচড়-কামড়ের চিহ্ থেকে রক্ত বেরোচ্ছিল। কিন্তু সেদিকে ওদের কেনও জ্রক্ষেপ নেই। ওরা তুচ্ছ কারণে অত্তন্ত মনোযোগ দিয়ে লড়াই করছিল।

হঠাৎই একটি ছেলে ‘স্টপ দ্য ফাইট! স্টপ ইট!’ বলে চিৎকার করে উঠল। আরও একটি মেয়ে ছেলোিির সঞ্গে গলা মেলাল। ওরা দুজনে ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেচ্টো করতে লাগল, আর একইসঙ্গে ‘ওদের থামাও! ওদের থামাও!' বলে চিৎকার করে চলল।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন ছেলেটাকে লক্ষ্য করে গালাগাল ছুড়ে দিল। এবং তার প্রয় সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ঘুসি।

ছেনেটা ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসা একটা অভদ্র ধাক্কা ওর পড়ে যাওয়াটা রুথে দিল। আর তরপরইই অন্য এক আ্যা্গেল থেকে কেউ ওকে লক্ষ্য করে আর-একটা ঘুসি চালাল।

তারপর ব্যাপারটা চলতেই থাকল। এবং শেষ পর্যন্ত ছেলেটা পড়ে গেল। ছেলেটির প্রতিবাদী সঙ্গী মেয়েটিও রেহাই পায়নি। ওর কপালেও একইসক্গে কিছু খুচরো চড়-থাপ্পড় জুটেছে। ওর একটা চোখ ফুলে গেছে. নাকের



সব মিলিয়ে ব্যাপারটা এই দাড়াল যে, সিমান আর ওই মেয়েটির মারপিট যেন একটা মজদার সাসপেল্স সিনেমা। দু-একজন ‘পাগল’ ছাড়া কেউই চায় না সিনেমাট মাঝপথে বন্ধ হোক।

কিন্তু সিনেমাটা একটু পরেই শেষ হল। শেষ করল মেয়েটাই। ও কখন যেন একটা মেটাল কি-রিং বের করে সিমানের গালে বসিয়ে টেনে দিয়েছে।

সিমানের গাল ফাঁক না হয়ে গেলেও ক্ষতটা যে মোটমমুটি গভীর সেটা রক্তের ধারা এবং সিমানের যম্ত্রণার চিৎকার শুনে বোঝা গেল।

সিমান ভয়ে ছিটকে পিছিয়ে গেল। একটা গাত আহত গালে চেপে ধরল। চোেে খানিকটা বিশ্ময়, খানিকটা অপমান। আর তার সঙ্গে যন্ত্রণার অশ্রুজল।

সিমানের মুখটা দেখে ময়া হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু জনতার আচরণ দেখে মায়া ব্যাপারটা ওদের মধ্যে আফৌ আছে বলে মনে হল না।

হলোগ্রাম ফাইটার বু এবং রেড তখনও লড়ছিল। হলোগ্রাম স্কোরবোর্ডের হিসেবে র্লু তখন অনেক এগিয়ে আছে। কিন্তু স্কোর ওলটপালট হয়ে যেতে পরে যে-কোনও মুহৃর্তে।

সিমানকে স্রেফ ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ের দল আবার হলোগ্রাম ফইটটের উत্তেজনায় ডুবে গেল।

সিমনের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে যাওয়া মেয়েটা অন্য সকলের সঙ্গে মিলেমিশে হাসাহাসি করছিল। আর পকেট থেকে একটা হিলিং স্প্রে বের করে নিজের শরীরের ক্কেের ওপরে স্প্রে করছিল। তথন একটা ছেলে একটা সবুজ রঙের ফানি চকোলেট স্টিক মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল। মেয়েটা ওকে হেেে ‘থাংকস’ জানাল, চকোলেট স্টিকটা চুষতে লাগল।

হলোগ্রাম ফাইট যতই শেব্যের দিকে এগোতে লাগল চিৎকার আর উত্তেজনার মিটার ততই চড়তে লাগল। সিমান ভিড়ের চক্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আহত নজরে লড়াই দেখছিল আর শরীরের কেটে-ছড়ে যাওয়া জায়গাগলো মেরামত করার চেষ্টা করছিল। ওর বুকের ভেতরে ঢিপঢিপ করে শব্দ হচ্ছিল। কে জিতবে? রেড, না ব্ল? ওর বাজি ধরা আট হাজার টাকা শেষ পর্যষ্ত...।

হলোগ্রাম ফইট শেষ হতেই চিৎকারের ফোয়ারা ছুটল। তার সল্গে তীব্র শিসের আওয়াজ, পশ্-পাখির নকল ডাক।

যারা বাজিতে জিতেছে তারা পাগলের মতো হাত তুলে লাফাতে লাগল। আর যারা হেরেছে তাদের চিৎকার, লম্ফ্বাম্প সব স্তিমিত হয়ে গেল।

রেড ফাইটার ওয়ে পড়েছে মেঝেতে। তাকে আর দেখা যাচ্ছে না।
 ওই অবস্থাতেই বসে পড়ল নকল ঘাসের মেঝেতে।

আট হাজার টাকা গেল! এখন তো সম্বল বলতে কিছুই প্রায় নেই! কাল যখন নেশার টান মনটা আকুলিবিকুলি করবে তখন কী করবে ও? 'জয় রুম’এর এন্ট্রি ফি কোথা থেকে পাবে? টাকা চেয়ে বাবার কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। আর মা? মা তো ওর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোনও কথথ বলে না!

তা হলে?
আগামীকলের নেশার তেষ্টার কষ্টটা সিমান যেন এখন থেকেই টের পেতে শুরু করল। ওর গলা তকিয়ে এল। বুকের মধ্যে কেমন একটা চাপ তৈরি হল। আর একইসজ্গে দু-চোে জলের ধারা বইতে লাগল।

কিছুহ্ষণ একইভাবে বসে থাকার পর সিমান চোখ মুছল। নাক টানল কয়েকবার। তারপর ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল।

না, হাল ছাড়লে চলবে না। ওর কাছ় সামান্য যা কিছু টাকা আছে সেটাকেই পুঁজি করে আগামীকলেলের সন্ধেটা ুরু করতে হবে। যদি ও কয়েকটা ছোট-ছোট বাজি জিতরে পারে তা হনেইই আর চিন্তা নেই।

কিন্তু ভাগ্য ওকে সাহাযা করবে তো? ও পারবে তো জিততে?

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে ভাঙাচোরা সিমান ‘জয় রুম’ থেকে বেরিয়ে এল।

গেম পার্টিসিপ্যান্ট্স্ ক্যাম্পাসের জীবন জিশানের অসহারকম একঘেয়ে লাগছিল। সারাটা দিন ধরে শুধু অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিমের ট্রেনিং, নানান আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং, ফ্রি হাডড এশ্সারসাইজ, অ্যাথলোটিক অপারেশান্স, কিল গেম সিমুলেটর-এ ট্রেনিং আর সাইকোলজিক্যাল সেশান। এরই ফাঁকে বিকেলে দেড় ঘণ্টার ব্রেক। তখন জিশান আর অন্য পার্টিসিপ্যান্ট্স্রা নানান খেলাধুলো আর আদ্ডা-গল্পে মেতে ওঠ১।

আড্ডা মারার সময় বা গল্প করার সময় জিশান অবাক হয়ে থ্যোল করে ও হাসছ্, আর অন্যান্য প্রতিযোগীও তার ব্যতিক্রম নয়। ওদের কেউকেউ বেশ জোরে-জোরে হেসে উঠছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যাচ্ছে, কোন পরিস্থিতির মধ্যে ওরা াঁডড়িয়ে রয়েছে। ওদের মাথার ওপরে ঠিক কী ধরনের এবং কতটা ধারালো খাঁড়া ঝুলছে।

পিট ফাইটের পর এক্রমস সাতদিন পার হয়ে গেছ্ছ। জ্রিশান আরও এ কারণ, মিনি আর শানুর সঙ্গে ওর দেখা হবে কি হবে না তার একটা চূড়াষ্ত নিষ্পত্তি হতে চলেছে। এবং তার পরই ওর জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে শাষ্তিপূর্ণ জীবন। মিনি-শানুর কাছে ফিরে যেতে পারলে যেমন ওর শাষ্তি, তেমনই ফিরে যেতে না পারলেও যেখানে ও যাবে সেখানে চিরপ্রশাত্তি।

घুমের ঘোরে এসব কথা ভাবছিল জিশান। তখনই অটোমেটিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি মেয়েটার মিষ্টি গলা তনতে পেল ও।
‘জিশান! জিশান—ওঠে। ভোর হয়েছে...।
জিশান চোখ খুলন। একঢা হাই তুলে উळ্ে বসল বিছানায়।
প্লেট টিভি ‘অন’ হয়ে গেছে। তার রািিন ‘পরদানশিন’ মেয়েটি মুত্যে সুন্দর হাসি ফুটিয়ে জিশানকে ডাকছে।

আশর্য! জিশানের সজ্গে চোখাচোখি হতেই মেয়ে বলল, 'ুড মর্নিং। তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুর্যে রেডি হয়ে নাও। মার্শাল স্যার ঠিক সাতটায় তোমার সজ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। ওই ইমার্জেন্স স্পেশাল মিটিং-এর পর তোমার অ্যানালগ জিমের শিডিউল শুরু হবে...।'

জিশান বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দেওয়ালের ঘড়ির দিকে তাকাল। ছঢা বেজে পঁচ মিনিট।

## १২ <br> www.banglabiôk plf.bilogspot.com

মেয়েটা মনে হল সরাসরি জিশানের দিকে তাকিয়ে আছে। এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জিশানের ভিডিয়ো ইমেজ ও স্পষ্ট দেখতে भाচ্ছে।

অসজ্তব কিছু নয়। লুকোনো ক্যামেরা আর আধুনিক প্রयুক্তি যদি হাতে হাত মেলায় তা হলে ব্যাপারঢা জলের মতো সহজ।

জিশান মেয়েটির চোখে চোখ রেখে সামান্য জড়ানো গলায় বলল, ‘ও.কে.-থ্যাংক য়ু। আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি...।'

টিভির পরদার আলো দপ করে নিভে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। স্ব্য়ংক্রিয়ভাবে প্লেট টিভি অফ হয়ে গেছে।

জিশান তৈরি হতে শুরু করল। আর একইসঙ্গে ভাবতে লাগল, শ্রীধর পাট্টা আবার কেন ডেকে পাঠিয়েছেন।

জিপিসির বাইরে বেরোনোর জন্য ওকে শাস্তি দিতে ডেকেছিলেন শ্রীধর। চুলকুনি অন্ত্র দিয়ে অভিনব শাস্তি। কিন্তু তারপর তো চার দিন পার হয়ে গেছে! এর মধ্যে ঢো জিশান কোনওরকম গোলমাল করেনি! বরং ভালো ছেলের মতো নিয়ম করে রোজকার রুট্নিন মেনে চলেছে।

তা হলে?

সিন্ডিিট বিল্ডি - অফিসটার চরিত্র সকাল এগারোটার মতন।

অফিসঘরে জিশানকে ঢুকিয়ে দিয়ে পিস ফোর্সের ‘বোবা’ গার্ডরা চলে গেল। আর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিসে পা দিয়েই জিশান বিমূর্ত সৌন্দর্যের ধাক্কা খেল।

এত সুন্দর করেও একটা অফিসঘর সাজানো যেতে পারে!
ও হত্বাক হয়ে ঐশ্বর্যময় অফিসঘরটটকে দেখছিল। ঘরের ডানপাশে একটা ফুলের বাগান। ফুটপাঁচেক চওড়া-গোল রিং-এর মতো। একটা স্বচ্ছ স্pটিকের স্তম্টকে ঘিরে খুব چীরে ধীরে চক্রের মতো ঘুরছে।

বাগানে ছোট-ছোট ফুলের গাছ—তাতে রভিন ফুল। এরকম সুন্দর প্রজাপতির মতো ফুল জিশান জীবনে দেখ্খেনি।

বাগানের ঠিক ওপরে উড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ফ্যান টেইল্ড লাভ-বার্ড। অন্তত জিশানের দেখে তাই মনে হল।

পাখিগুলো কিচকিচ করে ডাকাডাকি করছে, বাগানের ওপরে একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে উড়ছে—এখানে-ওখানে বসছে, কিন্তু কোনও অদৃশ্য মন্ত্রবলে যেদিকে-সেদিকে উড়ে চলে যাচ্ছে না।

এমনটা ভাবার কারণ, কোনও জাল কিংবা খাঁচাজাতীয় বস্তু জিশানের

## www.banglabookpdf.blogspot.com



চোথে পড়ছে না।
বাগানের উলটোদিকের দেওয়ালে ঝরনার জল গড়িয়ে-গড়িয়ে পড়ছে। আলো পড়ে চিকচিক করছে। তার সঙ্গে জলের মৃদু কলকল শব্দ। এই ঝরনাকে পটভূমিতে রেখে অদ্ভুত স্টাইলে সাজানো রয়েছে আটটা বড় মাপের টিভির পরদা। তাতে নিউ সিটির কয়েকটা গুরুত্বপুর্ণ এলাকা দেখা যাচ্ছে।

ঘরের সিলিংটা অনেকটা ওলটানো কড়াইয়ের মতো। তাতে নীল আর সাদা ধোঁয়ার ছায়া আকাশের আভাস তৈরি করেছে। তার মধ্যে ছোট-ছোট হলদে আলোর ফুটকি জূলজ্বূল করছে। যেন অসংখ্য তারা ঘরের আলোর জোগান. দিচ্ছে।

ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র স্বচ্ছ পলিমারের তৈরি। তার মধ্যে হালকা নীলরঙের আভা জ্যান্ত সাপের মতো নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটা বিশাল টেবিলের ওপারে পাথরের মূর্তির মতো বসে রয়েছেন শ্রীধর পাট্টা। ওঁর উলটোদিকে ছ’তা চেয়ার। তার মধ্যে চারটে চেয়ার খালি—ডান-দিকের শেষ দুটো চেয়ারে বসে রয়েছেন দুজন হোমরাচোমরা বয়স্ক মানুষ। ওঁদের ফিটফাট পোশাক আর বয়স্ক চেহারা দেখেই জিশান ওদের হোমরাচোমরা বলে আন্দাজ করেছে।


শ্রীধরের টেবিলের সব জিনিস বেশ সুন্দর করে সাজানো। পেন, স্যাটেলাইট ফোন, রাইটিং প্যাড, মিনারেল ওয়াটারের সিপার ইত্যাদি এমনভাব সাজ্木ানো যেন কেউ ওञুলো বিক্রির জন্য দোকান সাজ্রিয়ে বসেছে।

টেবিলের ডানদিকে একটা আর্ক কম্পিউটার মনিটর। তার কিবোর্ডের ওপরে শ্রীধরের ডানহাতের আঙুল নড়ছিল। জিশানকে দেখে আঙুল থামল। শ্বেতপাথরের মুখে সামান্য হাসি ফুটল।
‘এসো, জিশান—এসো। বোসো-।’ শ্রীধর উষ্ণ আহ্হান জানালেন।
জিশান টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। বসে থাকা দুই প্রৌঢ়ের সঙ্গে একটা চেয়ারের তফাত রেখে বসে পড়ল।

বসে পড়ার পরেও জিশান লাভ-বার্ডগুলোর দিকে আড়চোথে তাকাচ্ছিল। ওদের ওড়াউড়ি দেখছিল। আর অদৃশ্য খঁচাটার রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করছিল।

সেটা লক্ষ করে শ্রীধর বললেন, 'ওগুলো ফ্যান টেইল্ড লাভ-বার্ড। জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। ওদের জোড়ের একটা মারা গেলে অন্যটাও দু-চারদিনের মধ্যে দুঃখে মারা যায়।'

জিশান একটু হাসল, মাথা নাড়ল : জানি। আমি ওয়়্র খাঁচাটা দেখার চেষ্টা করছি।’

## www.banglabioefk putf.tilogspot.com

শ্রীধর শব্দ করে হাসলেন। জিশানের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, ‘দেখতে পাবে না। কারণ, খঁচাট ইনভিজিব্ল। ওটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে তৈরি। পাথিণুলো একটা স্ফিরিক্যাল ফোর্স ফিল্ডের ক্যাভিটির মধ্যে আছে। এলাকার বাইরে গেলৌই ওরা স্ট্রং ফিল্টাটা সেন্স করতে পারে। তখনই চট করে কমফোর্টবব্ল জোনে ফিরে আসে।' স্বচ্ছ টেবিলে আঙ্লুলের ডগা לুকলেন শ্রীধর : ‘এই অদৃশ্য খাঁচা আমাদের সায়েন্টিস্টদের আবিষ্কার। দারুণ, না?’
‘৫ঁ, দারুণ—’' জিশান বলল।
কিন্তু জিশানের কথা ছাপিয়ে দুই প্র্রীঢ়র সন্মিলিত গলা শোনা গেল, ‘একসিলেন্ট, স্যার, একসিলেন্ট। আপনার ইনভেন্টিভ পাওয়ার রিয়েলি একস্ট্রর্ডিনারি-।

জিশান চাটুকার দুজনের দিকে একবার তাকাল।
জিশান না হয় এই অডুত খাচা প্রথম দেখছে, কিন্তু এঁরা নিশ্যয় ব্যাপারটা নতুন দেখছেন না। তা হলে এই চাটৃক্তির মানে কী? 'চাটুকার’ শব্দটা কী ‘চাট’’ থেকে তৈরি হয়েছে?

মনসুখ চক্রপাণি আর গণপত আচারিয়ার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। নিউ সিটির একনম্বর এবং দু-মম্বর সায়েন্টিস্ট। শ্রীধর পাট্টার পা


বাবার একটা কথা মনে পড়ে গেল জিশানের।
‘বিষ্ঞানীদের কেউ-কেউ শাসকদ্রর পা চাটতে পারে—কিন্তু জেনে রাথিস জিও, বিষ্ঞান কখনও কারও পা চাটে না-।’

জিশান পশে বসে থাকা লোকদুটোর দিকে ঘৃণার চোেে তাকাল। তারপর শ্রীধর পাট্টার চোথে চোখ রেথে জিগ্যেস করল, ‘বলুন, আমাকে কেন ডেকেছেন?'
'শরীর কেমন আহে?' মোলায়েম গলায় পালটা প্রশ্ন করলেন শ্রীষর।
জিশান ভীষণ অবাক হল। ওর শরীরের খবর নিচ্ছেন শ্রীষর। ঠিকাদার যেমন মাটি-কাটা শ্রমিকের শরীরের খবর জানতে চায়, সেরকম? নতুন কী 'মাটিকাট’’র কাজ রয়েছে জিশানের জন্য?
‘ভালো’ ছোট্ট উত্তর দিল জিশান।
‘তড।। এবটু কফি খাও—’’ বলে স্যাটেলাইট ফোন তুলে নিয়ে কাকে যেন ফোন করলেন। চারজনের জন্য কফি আর কুকিজ চেয়ে পাঠালেন।

তারপর ঃ ‘জিশান, এবারে কাজের কথায় আসি। আমাদের কোর কমিটির মিটিং-এ কিল গেমের তারিখ মোটামুট্ভাবে ঠিক হয়েছে সেকেন্ড সেপ্টেম্বর, রবিবার।’

জিশানের শরীরের ভেতরে বরফ-জলের স্রোত বয়ে গেল। অথচ এই স্রোতটা বয়ে যাওয়ার কথা ছিল না। যেহেতু গত তিনমাস ধরে সবই ওর জানা।

জিশান অবাক হন। ‘ফঁসসি’ হবে এটা নিশ্চিতভবেে জানা থাকা সত্গেও ‘ফাঁসি’র তারিখটা শুনলে এরকম হয়? ড্যাশ, কমা, কোলন, সেমিকোলন যতই থাক না কেন ফুল স্টপের ওজনই আলাদা। কিল গেমের এই তারিখটা যেন সেই ফুল স্টপ।

জিশানের মাথাট কেমন ঘুরে গেল। চোখের সামনে শ্রীধর পাট্টার ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেন। বরফ-জলের হিমণীতল স্রোতটা এখন শিরদাঁড়া বেয়ে নামহে।

সেকেড সেপ্টেম্বর। ফুল স্টপ।
‘...দিনটা মোটুমুটিভেবি ঠিক হর্যেছে। এখনও হান্ড্ডেড পার্সেন্ট ফইনাল হয়নি। শ্রীধর তখনও কथা বলছিলেন।

জিশান বুঝ্ত পারছিল, শ্রীধরের কিছু কথা ও মিস করেছে-যেহেতু ওর মাথা ঠিকঠাক কাজ করছছ না।
‘...তবে দু-তারিখটায় যদি কোনও প্রবলেম হয় তা হলে আমরা নাইন্থ সেপ্টেম্বরে শিফ্ট করব। কারণ, দিনটা রোববার হওয়াটা খুব জরুরি। বুঝতেই পারছ—আমাদের অসংখ্য ভিউয়ার্স দরকার। ত ছাড়া স্পনসরদের কোটি-কোটি



জিশান সম্মোহিতের মতো চুপচাপ বসে ছিল। শ্রীধর্রের কথা শুনছিল। কিন্তু ও এথনও বুঝে উঠতে পারছিল না শ্রীষর পাট্টা কেন ওকে সাতসকালে ওঁর অফিসে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই ও অপেক্মা করছিল।
'জিশান-' চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন শ্রীধর : 'আমরা এবার কিল গেম্মের প্রোমাশনাল পাবলিসিটি শুরু করতে চাই। তুমি হয়তো টিভিতে দেত্যেছ তোমার কিছু-কিছু ভিডিয়ো ক্লিপিংস আমরা নানারকম প্রোডাক্টের অ্যাডে ব্যবহার করছি। কিন্তু এবার আমরা ফুল সুইং-এ ক্যাম্পেন শুরু করতে চাইছি। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে তোমাকে আমরা ব্যবহার করব—অবশ্য তার জন্যে তুমি পয়সা পাবে। এ ছাড়া কিল গেমের পাবলিসিটিতেও তোমকে ভাগ নিতে হবে।

তুমি হয়তো জানো না, আমাদের কিল গেমের যে-লাইভ টেলিকাস্ট আমরা করি তার ভিউয়ার্সের সংখ্যা বিলিয়ন্স-এ হিসেব করতে হয়। টিভি আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই এক্সাইটিং গেম একেবারে জ্যান্ত হয়ে ঢুকে পড়ে সবার ঘরে। সুতরাং, তুমি রাতারাতি একটা ইন্টারন্যাশনাল ফিগার হয়ে যাবে। একবার ভাবো তো! কোথায় তুমি ওন্ড সিটিতে একট। কেন্নোর মতো ধুঁকে মরছিলে...সেখান থেকে একেবারে ইন্টারন্যাশনাল সেলিত্রিটি! তুমি ভাবতেই পারছ না..।'

## www.banglaboefk patf.tílogspot.com

শ্রীধরের কথা শেষ হওয়ার আগেই জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল ঃ ‘যদি আপনার আর কোনও কজের কথা না থাকে তা হুে আমি এবার যাব—।'

শ্রীধর পাট্টা ভুরু উঁচিয়ে সামান্য কৌতুকের চোেে জিশানের দিকে তাকালেন। তারিফের গলায় বললেন, ‘দিস ইজ হোয়াট আই লাইক অ্যাবাউট যু। জোশ। তেজ। অথচ কুল ব্রেইন। এই ফ্যাকাল্টিগুলো তোমাকে নানান গেমে জিততে হেল্প করেছে-' চেয়ারে হেলান দিয়ে শরীরটাকে দোলাতে লাগলেন : ‘বোসো, বাবু জিশান। শোনো আমার প্ধ্যান...।’ এবার হাত দিয়ে জিশানকে বসতে ইশারা করলেন ঃ ‘বোসো, বোসো...।’

জিশান বসে পড়ল আবার। তবে ওর মুখের বিরক্ত ভাবটা গোপন রইল ना।
‘কেন তোমকে এত কথা বলছি শোনো-’ ছোট বাচ্চাকে বোঝানোর মতো করে বলতে শুরু করলেন শ্রীধর, কিল গেমের মোটামুটিভাবে একমাস আটদিন বাকি। এই সময়টা আমরা ইন্ট্টেন্সিভ প্রোমোশনাল ক্যাম্পেন করতে চাই। আমরা ফুল সুইং-এ यে-ক্যাম্পেন খরু করতে চলেছি তাতে সবসময় তোমাকে দরকার হবে। ফলে তোমকে নিউ সিটির হরেক জায়গায় নানান প্রো্রামে যেত্রে হবে। তোমার ওপরে নজরদারির জন্যা সর্বক্ষণ দু-ঢারজন গার্ডকে
 সিটিজেনদের চোখে ভালোও ঠেকবে না। বরং তুমি যদি স্বধীীনভাবে সব জায়গায় যেতে পারো, সব প্রোগ্রাম, আ্যাড ক্যাম্পেন আ্যটট্ড করতে পারো সেটা অনেক বেটের। মানুষ দেখবে স্বাধীন জিশান পালচৌধুরী নিউ সিটির যত্রত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্যাট উইল বি গ্রেট, তাই না?’

জিশানের প্রতিক্রি⿰়াযা দেখার জন্য ওর দিকে স্থির ঢোে তাকিয়ে রইলেন শ্রীধর পাট্ট।

য়ুনিফর্ম পরা একজন লোক ট্রলি নিয়ে ঢুকল ঘরে। স্বচ্ছ কাপ-প্লেটে রাখা কফি আর কুকিজ সাজিয়ে দিল চারজনের সামনে। শ্রীধর ইশারায় সবাইকে কফি নিতে অনুরোধ করলেন। ওরা কাপে মুমুক দিতে তুুু করল।

কফির স্বাদটা তেতো লাগল জিশানের। ও একটা কুকিজ তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

স্বাধীনত? এই নামের কোনও বস্তু হয় নাকি শ্রীধর পাট্টার রাজত্নে?
জিশান নিজের কানকে বিশ্ধাস করতে পারছিল না। ও দেখল, ওর পাশে বসা প্রৌঢ় দুজন অল্প-অब্প হাসছেন, শ্রীধরের কথায় সায় দিত্যে মাথা নাড়ছেন। ‘হাঁ, জিশান, তোমাকে আমি ফ্রিডম দেব...' আবার কথা বলতে তরু করলেন শ্রীধর, 'তবে অ্যাবসলিউট ফ্রিডম নয়-কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম। মানে, তুমি

१т www.banglabôek prif.bīlogspot.com
স্বাধীনভাবে যতই ঘোরাফেরা করো না কেন একটা প্রিঅ্যাসাইন্ড টইমে তোমাকে জিপিসির গেস্টগাউস্সে ফিরে আসতেই হবে। রোজ। আর ডুমি ফিরে আসবে নিজে-নিজে-কাউকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসতে হবে না। যেেবে শুয়োর নিজে থেকে শ্ৰেঁয়াড়ে ফিরে আসে। কী, তাই তো?’ শেষের প্রশ্নটা করলেন প্রোঢ় দুজনের দিকে তাকিয়ে।

প্রৌঢ় দুজন হেসে সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন।
জিশান একাু ধন্দে পড়ে গেল। কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম জিনিসটা আবার কী?
শ্রীধর প্রৌঢ় দুজনের দিকে হাতের ইশারা করে বললেন, ‘এরা হলেন আমাদের টেকনিকাাল কমিটির চিফ আর আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেে। কন্ট্রোল্ড ভ্রিডমের বুদ্ধিটা ওঁরাই বের করেছেন। দারুণ বুদ্ধি, তাই না, জিশান? সারাটা দিন তুমি স্বধীীভাবে খুশি মতো ঘুরে বেড়াবে, আর সময় হলেই নিজেনিজে ফিরে আসবে, গুটিগীটি पুকে পড়বে খাচায়...।'

কথা শেষ করে হেসে উঠলেন শ্শীধর।
কীভাবে এটা সষ্তব? জিশান চিষ্তার গোলকধাঁধায় .ঘুরতে লাগল।
ঠিক তথনই ফ্যান টেইল্ড লাভ-বার্ডণুলো জোরে-জোরে ডেকে উঠন।
জিশান ভাবল, ওর জন্য হয়তো নতুন ধরনের কোনও ফোর্স ফিন্ডের


জিশান মনে-মনে কন্ট্রোল্ড ফ্রিডমের গুঢ় অর্থা বুঝতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু রহস্যাট ভেদ করতে না পেরে তিনজন মানুষের মুঢের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। ওঁদের হাবভাব আর বডি ল্যাঙ্ৰুয়েজ দেখে রহস্যের সমাধানটা आঁচ করার নিঃxব্দ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল।

জিশানের মুত্ে একটা অসহায় বোকা-বোকা ভাব ফুটে উঠেছিল। শ্রীধর পাট্টার দিকে তাকিয়ে ও বুঝল শ্রীধর সেটা বেশ রসিয়ে উপভোগ করছেন।

জিশান আর ভাবতে পারছিন না। হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নীচ করল। অপেক্ষ করতে লাগল।

একটু পরেই শ্রীষরের কথা শনতে পেল ও।
‘আমিই জিশানকে বাপারট খুলে বলছি। যদি টেকনিক্যাল কোনও পৰ্যেন্ট আমি মিস করি তা হলে সেটা আপনারা-প্লিজ-জুড়ে দেবেন...।' জিশান মুখ তুলল।
শ্রীধর সরাসরি ওর দিকে তাকালেন। ঠোটে একচিলতে হাসির ছেঁয়া।

ওঁর ঠিক পিছনেই বিশাল জানলা। ফটোক্রোমিক ন্যানোপলিমার প্লেট লাগানো। এই প্লেটের প্রতিসরাঙ্ক বাতসের প্রতিসরাক্কির ভীষণ কাছাকাছি। ফলে প্লেটটা লাগানো আছে কি নেই সেটা ঠিক বোঝা যায় না।

জানলা দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। ভোরের নীল আকাশ। তার সঙ্গে হাইরাইজ কয়েকনটা বাড়ির জ্যামিতি।

আকশে থেয়ালি মুডে ভেসে বেড়ানো বাচ্চা-বাচ্চা মেঘ। আর কখনওকখনও তাদের চিরে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ব্যু ఆটার।

ঝরনার জলের কলকল শব্দ কানে আসছিল, আর লাভ-বার্ডগুলোর কিচকিচ। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

বেশ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর শ্রীধর মুখ খুললেন।
‘িিশান, আজ রাতে তোমাকে আর্মমেন্ট ডিপার্টমমন্টের "রিমোট অপরেশান্স" ল্যাবে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার ওপরে প্রথমে "গ্রিন টেস্ট" করা হবে। যার পারপাস হল, তোমার শরীরের সুটেবিলিটি পরীক্ষ করা যে, তুমি কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম প্রোগ্রামটা নিতে পারবে কি না।’
‘ "গ্রিন টেস্ট"-এ কোয়ালিফাই করে গেলে তারপর আসল অপারেশান। একটা পলিমার কোটেড সিলভার ক্যাপসুল...।’
 এনেন : 'তুমি জানো, জিশান, লাইফ কেন এত ইন্টারেস্টি??'

জিশান চুপ করে রইল। পাশের প্রৌ়় দুজনও চুপচাপ। তবে একজনের চোয়াল নড়ছে। তিনি কিছু একটট চিবোচ্ছেন।

শ্রীধর টেবিলে আঙুলের টোকা মারলেন। ভুরু উচিয়ে জিশানের চোেে চোখ রেথে বললেন, 'জিশান, লাইফ ইজ ইন্টারেস্টিং বিকজ...বিকজ ইট ইজ ফুল অফ সারপ্রাইজ্জে। আমাদের জীবনে অনেক লুকেনো চমক থাকে যেগুলো আমাদের বাঁচার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। ঢুমি আমাদের চেয়ে অনেক লাকি, কারণ, তোমার লাইফে চমকের সংখ্যা অনেক বেশি-অন্তত তুমি নিউ সিটিতে আমাদের হাতে এসে পড়ার পর। আমি এই একটা চমক তোমার জন্যে বাঁচিয়ে রাখলাম। আজ রাতে...দশটার সময়...তুমি যখন "রিমোট অপারেশান্স" ল্যাবে যাবে তখনই জানত্ পারবে, "কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম"-এর রহস্য। সো, য়ু মে লিভ নাউ। তোমার এখন ছুটি...।'

শ্রীধর আচমকা ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। মিটিং শেবের ইঙ্গিত।

জিশানও উঠে দাঁড়াল। একইসঙ্গে প্রৌঢ় দুজনও।
শ্রীধর জিশানের দিকে আডুল দেথিয়ে প্রোঢ় দুজনকে বললেন, 'তা হলে

দুজনের মধ্যে একজন প্র্রাঢ় বললেন, ‘কোনও চিত্তা করবেন না, স্যার— আমরা তৈরি আছি।’

শ্রীধর ছেট্ট করে হাসলেন। এই নিউ সিটিতে সবসময় তৈরি থাকাটই দস্টুর।

চারজন সিকিওরিটি গার্ড জিশানকে ‘রিমোট অপারেশান্স’ ল্যাবে পৌঁছে দিল।

হাতঘড়ির দিকে তাকাল জিশান। কাঁটায়-কাঁটায় সওয়া দশটা।
দরজার সামনে দাঁড়িয়েই গোটা ল্যাবটা প্রায় দেখা যাচ্ছিল। তার কারণ, চারদিকে শ্ধু কাচ আর কাচ। দরজা থেকে শুরু করে ল্যাবের সব দেওয়ালই কাচের। তার কোথাও-কোথাও স্টেইনলেস স্টিলের ফিটিংস আর কোথাও বা রঙিন পলিমার।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে আর্মামেন্ট ডিপার্টমেন্টের হেড জিশানের সন্গে ইন্টারঅ্যাকটিড টারমিনাল্ল কথা বলেছেনা ‘রিম্মাট অপারেশানস’ ল্যাবের
 দিয়েছেন।

ওঁর কাছ থেকেই জিশান জেনেছে, এই ল্যাবের বিভিন্ন সাব-ল্যাবের চার্জে यাঁরা-यাঁরা आছেন তাঁরা ইচ্ছেমতো নিজের-নিজের অংশের কচের দেওয়ালগুলোকে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ করতে পারেন। অর্থাৎ একটা স্বচ্ছ কাচকে অস্বচ্ছ করতে চাইলে ন্যানোঅপটিক্স প্রयুক্তির জোরে চোেের পলকে সেই কাচটটাকে সুপারপোলারাইজ্ড করে দেওয়া হয়। ব্যস, কাজ শেষ।

প্রयুক্তির এই অভিনব 'ম্যাজিক’ুলো শেষ পর্যন্ত মানুষের ভালোর জন্য ব্যবহার করা হলে কত ভালো হত!

জিশানের বুকে ছোট অথচ তীব্র একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠল।
ঢোকামাত্রই জিশানকে ল্যাবের টিম টেকওভার করল।
ওকে প্রথমে পাঠানো হল স্টেরিলাইজিং স্কানারের মধ্যে দিয়ে। তারপর কাচের গোলকধ্ধারার ভেতরে এ-পথ সে-পথ দিয়ে হেঁটে অনেক ঘোরপ্যাচের পর ওকে তারা নিয়ে গেল একটা ল্যাবে।

ল্যাবের দরজায় লাগানো এল. সি. ডি. প্যানেলে লেখা ‘্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব’।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বিশাল বড় মাপের একটা কাচের ঘর। ঘরের

ডানদিকের দেওয়ালে একটা সুন্দর মসৃণ কন্ট্রোল প্যানেল। তার ওপরে বেশ কয়েকটা সি. আর. টি. স্ক্রিন আর ডিজিটাল মিটার লাগানো। তাত নানান গ্রাফ আর সংখ্যা নাচানাচি করছে।

প্যানেল থেকে হাত তিনেক দূরে একটা লম্বা টেবিলে তিনটে লার্জ স্ক্রিন আর্ক কম্পিউটার। সেগুলোর সামনে বসে দুজন অপারেটর।

বাঁ-দিকে একটা ছোট কন্ট্রোল প্যানেল আর তার সামনে একটা বড় মাপের অড্ুুত চেয়ার।

অজ্রুত এই কারণে যে, চেয়ারটা দেখতে অনেকটা ডেন্টিস্টের চেয়ারের মতো হলেও আসলে তার চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। চেয়ারটার হাতলের কাছে বেশ কিছু জটিল যন্ত্রপাতি। পায়ের কাছেও কতরকম কনট্র্যাপ্শন আর আ্যাটাচমেন্ট।

সব দেখ্যেতে জিশানের মনে হল, চেয়ারটা যেন কোনও ধর্মীয় পবিত্র বস্তু, কোনও 'জাগ্রত’ দেবতার সিংহাসন—আর নানান মানুষ অদের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার আশায় ঢিলের বদলে নানান যষ্ত্রপাতির টুকরো চেয়ারটার গায়ে বেঁধে দিয়ে গেছে।

চেয়ারের ঠিক পাশটিতে কাঠ-কাঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ভীষণ রোগা তরুণী। পরুন্ হলুদ চুডিদার, তার ওপরন বাদামি রূঙে লেস্ত দিয়ে বোনা


জিশান মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বয়েস কত হবে? খুব বেশি হলে পঁয়্রিশ কি ছত্রিশ। ওর রিমিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

মেয়েটির রং কেমন যেন ফ্যাকসে ধরনের ফরসা। বেশ রোগা হলেও লম্বা। ছোট্ট মুখ—অনেকটা পুতুলের মতো। চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। প্রজাপতির কোমল ডানার মতো নাকের দুপাশে মেলে আছে।

রিমিয়া খুব স্বপ্ন দেখত। আর এই মেয়ের চোখ দুটো স্বপ্নের মতোএবং স্বপ্ন দেখানোর মতো।

ওর গলায় বাদামি ক্রিস্টালের একটা মালা। চোখের জলের মতো চিকচিক করছে। আর বাঁ-হতের অনামিকায় একটা চিকন আংটি।

মেয়েটি এত চুপচাপ স্ট্যাছুর মতো দাঁড়িয়ে যে, জিশান ওকে প্রায় পুতুল বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিন। ঠিক তখনই মেয়েটি জিগ্যেস করল, ডুমি জিশান তে?’

প্রশ্নের সপ্রতিভ ঢঙে জিশান অবাক হয়ে গেল। বহুদিনের চেনা মানুষ এইভাবে প্রশ্ন করে। ওর একটু অস্বস্তি হল, কারণ, ল্যাব টিমের তিনজন মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে জিশানের পিছনে সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে। আর কম্পিউটারের সামনে দুজন।

জিশান সহজভবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করল, ‘গাঁ, আমি জিশান-।
‘আমি ডক্টর সুধাসুন্দরী...না, না, হেসো না-’ হাত তুলে ইশারা করল মেয়েটি : 'আমি জানি আমি সুন্দরী নই, কিন্তু কী করব, এটা আমার সত্যিকরের নাম...বাবা-মা দিয়েছিন।’

জিশান বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটি যে সুন্দরী নয় সেটা ওকে কে বলল? জিশানের তো পুতুনটিকে যথেষ্ট সুন্দর বলে মনে হচ্ছিল।

একে তো নামাা বেশ অড্ভুত, পুরোনো-পুরোনো। তার ওপর অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে কী আজব আষ্তরিক কথাবার্তার চং! নিউ সিটিতে এটা নতুন।
‘শোনো, জিশান—এখন যে-কাজটা আমি করব সেটা আমার খুব অপছন্দের। কিন্তু করতে হবে-' ঠোঁ ওলটাল ঃ 'কাজ তো কাজ!’

জিশান ওর পিছনে রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনের দিকে একবার তাকাল। ‘রিমোট অপারেশান্স’ ল্যাবে ঢোকা ইষ্কক এই তিনজন ওর সঙ্গে ছায়ার মতো জুড়ে গেছে।

দু-এক সেকেডের দ্বিধা কাটিয়ে জিশান জিগ্যেস করে ফেলল, 'কী কাজ?'


‘াঁ-স্পেশাল ইনজেকশান।
কথা বনতে-বলতে সুধা ডানদিকের কন্ট্রোল প্যানেলটার কাছে চলে গির্যেছিল। ব্যত্তভবে কয়েকটা বোতাম টিপল। দুটো মিটারের রিডিং খুঁটিয়ে দেখল। তারপর জিশানের দিকে ফিরে তাকিয়ে হাতে হাত ঘষল।
'ও.কে., জিশান, আই অ্যাম রেডি। আই হোপ য়ু আর—।'
জিশান লক্ষ করল ওর ইংরেজি কথা বলার ঢং অনেকটা যেন সাহেবি ধাঁচের। ছোট করে বলল, আপনি রেডি হলেই আমি রেডি।’
'চমৎকার। তা হলে ওই চেয়ারটায় শুয়ে পড়ো—’'
জিশান ল্যাবের চারপাশে তাকাল। তাক্য়েয় অবাক হল। কখন যেন চারটে দেওয়ালের কাচ ঘোলাটে হয়ে গেছে। আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ল্যাবের যে-উজ্জ্রল আলোগুলো এতক্ষণ তীব্র কর্কশ মনে হচ্ছিল সেগেলো যেন অনেকটা মোলায়েম হয়ে গেছে।

আরও কিছুফ্ষণ ইতস্তত করে বিশাল চেয়ারটার কাছে চলে গেল জিশান। ওটাতে বসে পড়ন, নাকি শুয়ে পড়ন? উঁঁ, ব্যাপারটা বসা এবং শোয়ার ঠিক মাঝামাঝিি দাঁড়াল।
‘গুড বয়।’ সুধাসুন্দরী ওর কাছে এগিত্যে এল : ‘অ্যাড্ড স্টে কুল

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## www.banglabiofetpaff.tiogspot.com

লাইক আ গুড বয়।'
জিশান চেয়ারে তয়ে সুধাকে দেখছিন।
ওই রোগা ফরসা পুতুল-পুতুল মেয়ৌার ‘পুতুল-পুতুল’ বাপারটা স্রেফ ওপরের চেহারাতেই শেষ। ওর ভেতরে রয়েছে দক্ষতা আর আষ্মবিশ্বাসে ঠাসা একজন ডক্ট্র।

জিশান অবাক হচ্ছিল। এই মেয়েটা শ্রীধরের রাজত্বে এসে পড়ল কেমন করে?

জিশানের তিনজন সঙ্গী চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বোকা-বোকা নজরে এদিক-ওদিক দেখছিল। ওদের কাজটাই বোধহয় জিশানের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে থাকা।

আচমকা ওদের দিকে ডানহাত উঁচিয়ে কয়েকটা চুটকি দিল সুধা। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনাদের এখন ল্যাবের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করার সময় এসে গেছে। দিস ইজ দ্য রুল অফ মাই ল্যাব।

তিনজনের মধ্যে দুজন তক্ষুনি ন্যাবের দরজার দিকে রওনা হওয়ার बোঁক নিল, কিন্তু একজন একটু ইতস্তত করতে লাগল।

সেই লোকটা আমতা-আমতা করে বলল, ‘আমাদের বস বলেছেন জিশান

 ইয়োর বস আউটসাইড মাই ল্যাব। অ্যাড সো অল হিজ অর্ডার্স সিম্প্লি স্টপ আউটসাইড মাই ড্যাম ল্যাব ডোর। নিউ সিটির সবার সব অর্ডার আমার ল্যাবের দরজা পর্যষ্ঠ এসে থেমে যায়-ভেতরে ঢুকন্র পারে না...'

কথা বলতে-বলতে সুধা কম্পিউটার-টেবিলের ওপর থেকে একটা সেল ফোন তুলে নিল। তাতে অটো ডায়াল করে ও-প্রান্তের কথা ঞুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষ করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করন সুধার কপালে ভাজ, আয়ত চোথে বিরক্তি।
প্রতিবাদী লোকটা তখনও বলছিল, ডক্ট্র, প্লিজ, ভুল বুঝবেন না। আমাদের জিশনেের সঙ্গে-সঙ্গে থাকার জন্েে 药ং ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। আমরা... ${ }^{\prime}$
'মার্শাল স্যার, সুধাসুন্দরী বলছি। ফ্রিসম কন্ট্রোল ল্যাব থেকে—।'
জিশান অবাক হয়ে গেল। সুধা সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে ফোে কথা
বলছে! ওর হাত এত লম্বা বে, শ্রীধরকে এককথায় ফোন করতে পারে?
শ্রীধরের গলা শোনা গেল, ইয়েস, সুধা। বলো তোমার জন্যে কী করতে পारि।'

শ্রীধরের কথা শুনে পাওয়ামাত্রই জিশান বুঝল ঘরের সবাইকে ওwww.facebook.com/groups/banglabookpdf

প্রন্তের কথা শোনানোর জন্য সুধা ওর মোবাইল ফোনের স্পিকার অন করে দিয়েছে।
‘আমি এখন জিশান পাল চৌ্ধুরীর ওপরে "গ্রিন টেস্ট" শুরু করতে চলেছি। এসব টেস্ট কিংবা অপারেশানের সময়-আপনি তো জনেন-আমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন ছাড়া আর কোন লোকের প্রেজেন্স পছ্দ করি না। কিন্তু এখানে একজন রয়েছে-জিশানের এসকর্ট-সে বলছে কোনও অবস্থাতেই জিশানকে ছেড়ে যাবে না। ওর ওপরে নাকি অর্ডার আছে-' সুধা ফোনে কথা বলছিল আর এসকর্ট তিনজনের দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। মাঝেমাঝে জিশানের দিকেও। ওদের ঐকজন, জিশানের চেয়ারের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে, আর বাকি দুজন ল্যাবের দরজার কাছে-অনেকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ভभ্গিতে দাঁড়িয়ে।

একটু থেমে সুধাসুন্দরী বলল, ‘আপনি আমকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে ডিসিশান দেবেন, স্যার। না হলেে আমি ইলেভেন্থ সেকেড্ডে আমার রেজিগনেশান আপনাকে ই-মেলে সাবমিট করে দেব। বিকজ আমার ল্যাবে সায়েন্স ছাড়া আর কারও হুকুমে আমি চলি না।’

জিশান শখ্রু অবাক নয়, একেবারে হত৩ম্ব হয়ে গেল। ও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শ্রীধর পাটার সাঙ্গে এইভান্ কথ্গ বলা যায়।

শ্রীধর পাট্টার শান্ত গলা শোনা গেল : ‘সুধা, ডুমি ফোনটা প্লিজ ওই এসকর্ট্রে দাও—’’

সুধা জিশানের চেয়ারটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। প্রতিবাদী কর্মনিষ্ঠ এসকর্টটির হাতে নিজের ফেননটা তুলে দিল-কিন্তু একটাও কথা বলল না। লোকটা ফেনটা কানে দিয়ে ‘গালো’ বলত্তই ওপাশ থেকে শ্রীধরের শান্ত গলা শোনা গেল : ‘তোমার নামটা কি জনতত পারি?’

লোকটার মুঁখ অনেকক্ষণ আগেই ফ্যাকাসে হতে শুরু করেছিল, এখন সেটা প্রায় ব্বটিং পেপারের কাছাকাছি। আর ওর শকনো মুখে ভয়ের সিলম্মোহর। কাঁপা গলায় ও বলল, ‘আ-আমার নাম বি-বিকাশ সাহা, স্যার।'
‘চমৎকার।’ বললেন শ্রীধর, ‘বিকাশ সাহা, তুমি এই মুহূর্তে ডক্টরের হাতে সেল ফোনটা ফেরত দিয়ে ল্যাব থেকে তোমার সাঙ্গপাঙ্গ কাচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে यাও—’
‘ও.কে., স্যার। ইয়েস, স্যার।’ বিকাশের গলা এবং শরীর কাঁপছে।
‘যদি ঘর থেকে বেরোতে তোমার পাঁচ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগে তা হলে আমি তোমার সুইচ পার্মানেন্ট্লি অফ করে দেব।
‘খট’ করে লাইন কেটে দেওয়ার শব্দ হল। বিকাশ কাঁপা হাতে ফেনটা

## ৮৬ <br> www.banglaboefk pdf.blogspot.com

সুধকে ফেরত দিল। এবং প্রায় আলোর গতিতে ল্যাব থেকে বেরিয়ে গেল। ওর দুজন সাথী ওর আগেই ল্যাবের বাইরে চলে গেছে।
সুধাসুন্দরী ওর মোবাইল ফোনটা অফ করে কম্পিটটার-টেবিলে রেখে দিল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখের ভাব করে জিশানের চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, ‘জিশান, প্রথমে তোমার "গ্রিন টেস্ট" হবে। সেই টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ হলে তবেই ম্যাজিক শট—মান, ম্যাজিক ইনজেকশান... ${ }^{\prime}$

জিশান একটা হাত তুলে বলল, আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান—আগে আপনাকে কনগ্র্যাট্স জানাই-তারপর ওসব টেস্ট-ফেস্ট হবে।'
‘কেন?’ সুধার ফরসা কপালে ভাঁজ পড়ল।
‘যেভাবে আপনি মার্শালের সল্পে কथা বললেন...ওই ফোর্স, ওই কনফিডেেন...ভাবা যায় না। নাঃ, ডক্টর, আপনাকে সেলাম জানাই’’

জিশানের ভেতরে-ভেতরে একটা সত্যিকারের তেট উথালপাথাল করছিল। আনন্দের ঢেউ। নিউ সিটিতে এরকম দৃপ্ত সাহসী মানুষ আর ক'জন আছে কে জানে!

সুধা জিশানের চোখে চোখ রেখে তাকাল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'জিশান, দুটো কথা। এক, ঢুমি আমার সঙ্গে "আপনি-আপনি" করে কথা বলবে না।

 এট্সেট্রা...। আমি এখানে চাকরি করি, জিশান—কিন্তু তাই বলে এঁদ্রে চাকর নই। আমি শুধ্রু বিষ্ঞানের চাকর-আর কারও নয়।'

সুধাসুন্দরীর মুত্থ অড্ভুত এক আলো দেখতে পেল জিশান।

সুধাসুন্দরী কथা বলছিল, আর একইসঙ্গে ব্যস্ত হাতে কাজ করছিল। কন্ট্রোল প্যানেলের কাছে গিয়ে কতকণুলো মিটার রিডিং দেখল, এক্টা ছোট মাপের পুশবাট্ন প্যানেলে আঙুলেের ডগা দিয়ে চটপট কয়েকটা বোতাম টিপল। সঙ্সে-সঙ্গে দরজার কাছ থেকে একটা ‘ক্লিক’ শব্দ শোনা গেল আর দরজার কাচটা অস্বচ্ হয়ে গেল।

জিশানের কাছে এল সুধাসুন্দরী : ‘ররজাটা লক করে দিলাম। এবার তোমার ডানহাতটা চেয়ারের হাতলের ওপরে রাখ্যে। হাতের চেটো ওপর দিকে—।'

জিশান কথা ওনল।
'স্যামি! চিকি!’ আর্ক কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা আ্যাসিস্ট্যান্ট

## www.banglaboofk putf.t̄logspot.com

দুজনের দিকে ইশারা করে বলল সুধা, ‘পেশেন্টকে গ্রিন টেস্টের জন্যে রেডি করো-।'

পেশেন্ট! জিশান এখন তা হলে পেশেন্ট? অন্তত সুধার চোখে।
জিশান অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে লাগল সুধাও।
চিকি আর স্যামি কম্পিউটার ছেড়ে উঠে এল। ছিপছিপে চেহারার দুজন স্মার্ট যুবক। একজনের চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল মাখানো, আর-একজনের চোখ একেবারে নির্লিপ্ত, ঠান্ডা।

ঠান্ডা চোখের যুবকটি চট়পট জিশানের কাছে এল। জিশানের দুটো হাত চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ফাইবারের স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর সে উবু হয়ে বসে পড়ল জিশানের পায়ের কাছে। গোড়ালির গাঁটের ঠিক ওপরটায় শক্ত করে স্ট্র্যাপ বেঁধে দিল।

জিশান অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল।
হাসল সুধা। বলল, ‘সেফ্টি, জিশান। কারণ এখন যে-টেস্টটা করব তাতে তোমাকে একটা স্পেশাল মেডিসিন ইনজেক্ট করতে হবে। যদি তাতে তোমার কেনেও রিয়্যাকশন না হয় তা হলে ওয়েল অ্যান্ড গুড। কেন্ও প্রবলেম নেই। কিন্তু...' জিশানের কাছে এগিয়ে এল সুধাসুন্দরী : ‘কিন্তু যদি রিয়্যাকশন হয় তা হলে...তা হুলে তোমর ঝাম্রো হরে। ঠিক দশ সেকেন্ড তোমার শরীরে
 এই স্ট্র্যাপ। সেফ্টি।' আবার হাসল ও।
‘আর যদি কোনও রিয়্যাকশন না হয়, তা হলে?’
'তা হলে তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ। দশ মিনিট পরেই তোমাকে ম্যাজিক শট দেওয়া যাবে।'

দ্বিতীয় লোকটি একটা অদ্ভুত ট্বে নিয়ে এসে দাঁড়াল সুধাসুন্দরীর সামনে। ট্বে-তে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মোড়কে একটা খুব সরু ইনজেক্শন সিরিঞ্জ। একজোড়া হালকা নীল রডের রাবার লেটেক্স-এর গ্লাভ্স। একটা ছোট্ট ওষুধের শিশি। শিশিতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা তরল। আর তার পাশে ছোট্ট গোলাপি সাবানের মতো দেখতে একটা কী যেন।

এতক্ষণে ‘গ্রিন টেস্ট’ নামের মানে বুঝতে পারল জিশান।
সুধাসুন্দরী কাজ শুরু করল রোবটের মতো যান্ত্রিক দক্ষতায়। লেটেক্স গ্লাভ্স পরে নিয়ে ইনজেক্শনের সিরিঞ্জটা বের করে নিল। ভায়ালে ছুঁচ ফুটিয়ে সবুজ তরলের প্রায় সবটইই টেনে নিল সিরিঞ্জে। ট্রে থেকে গোলাপি টুকরোটা তুলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল জিশানের ওপরে।

টুকরোটা জিশানের ‘চিত’ করা ডানহাতের শিরার ওপরে ঘষতে-ঘষতে সুধাসুন্দরী বলল, ‘এটা সলিড স্টেরিলাইজার। আর সিরিঞ্জটার স্পেশালিটি হল,
bt www.banglabiofer palf.bitogspot.com
এটার ছুঁচটা ভীযণ শক্ত অথচ সরু-এত সরু যে, ঢুমি টেরই পাবে না এটা তোমার শিরায় ছুকছে।
‘আর এই সবুজ লিকুইডটা?’ জিশান জিগ্যেস করল।
‘ওটা একটা স্ট্রেঞ্জ কম্পাউড...’ হাসল সুধা : ‘মার আবিষ্কার...।’
'আপনার...মানে, তোমার আবিষ্ধার? সত্যি?’
‘হাঁ-এতে অবাক হওয়ার কী আছে? জনো, বায়োকেমিষ্ট্রির ফিল্ডে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্ট আছে!'
‘পেটেন্ট?’ অবাক হয়ে সুধার দিকে তাকাল জিশান : ‘সেটা আবার की?
‘সোজা কথায় বোঝাতে গেলে, আমার তেতাল্লিশটা আবিষ্কার আছে। সেই আবিষ্কারণুলোর মালিকানা রেজিস্ট্রি করার নামই হল পেটেন্ট...। সিরিজ্জের তীক্ক্ ডগাটা জিশানের হাতের শিরায় ছুইয়ে সুধাসুন্দরী বলন, ‘রেডি, স্টেডি, গো-!

এবং সবুজ তরলটা জিশানের শিরায় ঢুকিয়ে দিয়ে তৎপরভাবে দু-পা পিছিয়ে দাঁড়াল। জিশানের চোখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল। বোধহয় মনেমনে এক-দুই গুনে দশ সেকেন্ড পার করছিল। আর ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন

 জিগ্যেস করল, 'ডুমি তা হলে খুব নামকরা সায়েন্টিস্ট?'
‘কে জানে!’ ঠোট ওলটাল : ‘লোকে তো বলে।’
অ্যাসিস্ট্যান্ট দুজন সুধাকে লক্ষ করে হাতের ইশারা করল। যার অর্থ হল, দশ সেকেড পার হয়ে গেছে।
'তুমি গ্রিন টেস্টে পাশ করে গেছ, জিশান। য়ু আর নাউ এলিজিব্ল ফর গোেং দ্য ম্যাজিক শট।’ হঠাৎই জিশানের মাথায় হাত দিয়ে ওর চুল ঘেঁটে দিল সুধাসুন্দরী। यেমন করে তরুজনরা বাচ্চাদের আদর করে, অনেকটা সেইরকম।
‘আমার হাত-পা কি এখনও বাঁধা থাকবে?’ ঢোখের ইশারায় হাত-পায়ের স্ট্রাযাপুলো দেখাল জিশান।
'ना, ना, এক্ষুনি ওগুলো খুলে দিচ্ছি। চিকি—।'
চিকি যন্ত্রের মন্ত কাজ করতে শুরু করল।
‘এই দশটা মিনিট আমরা কীভাবে কাটাব?’ প্রশ্টটা করে জিশান সুধাসুন্দরীর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে রইল।

সুধাসুন্দরী ইনজেক্শনের সিরিঞ্জনা স্যামির ট্র-তে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যাজিক শট প্রিপেয়ার করো—।' তারপর জিশানের দিকে তাকাল ঃ ‘এখন

আর ন’মিনিট বাকি আছে। এই সময়টা তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারিম্যাজিক শট নিয়ে।’
'তাই? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে-কী এই ম্যাজিক শট। এই ইনজেক্শন নিলে কীভাবে কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম পাওয়া যায়...।'
'বলছি—' বলে সুধাসুন্দরী স্যামির দিকে তাকিয়ে কয়েকটা টেকনিক্যাল ইনস্ট্রাক্শন দিল। তারপর তাকাল জিশানের দিকে ঃ ‘ছোট্ট একটা পলিমার কেটেড সিলভার ক্যাপসুল তোমার কনের নীচে আমি ইনজেক্ট করে দেব। সেই মেমেন্টটইই হল টাইম জিরো। তারপর থেকে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা পর তোমার ভীষণ জল তেষ্টা পাবে। ভয়ঙ্কর জল তেষ্টা। ডিমনিক থার্স্ট। তুমি কল্পনা করতে পারবে না এমন ত্টো।’
‘তেষ্টা পেলে জল খাব-সিম্প্ল।’ জিশান হালকাভাবে বলল।
‘উঁহ, ওটাই তো মজা! যত খুশি জল তুমি খাও না কেন, ওই তেষ্টা কিছুতেই কমবে না। কিছুতেই না।'
'তা रলে?’
হাসল সুধা। বলল, 'চব্বিশ-ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই তোমাকে ফিরে আসতে হবে আমার কাছে-এইই ল্যাবে। আমি রিমোট অপারেশানে সিলভার ক্যাপসলটটক নেক্সট টয়েন্টি ফোর আওয়ার্সন জর জন্যে রিচার্জ কর্লে দেব। তখন
 পারো—চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে।’ একটু থামল সুধা। স্যামির দিকে একপলক তাকিয়ে আবার চোখ ফেরাল জিশানের দিকে : 'আই হোপ নাউ য়ু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম-।'
‘জিশান মাথা নাড়ল ওপর-নীচে। হাঁা, এবার ও ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে।

স্যামি একটা অদ্ভুত ধরনের পিস্তল আর একটুকরো সলিড স্টেরিলাইজার ট্রে-তে সাজিয়ে সুধাসুন্দরীর কছে নিয়ে এল।

জিশানের ডানদিকের কানের নীচে স্টেরিলইজার ঘষল সুধা। তারপর ট্রে থেকে অদ্ডুত ধরনের পিস্তলটা তুলে নিল।

জিশান লক্ষ করল, পিস্তলের নলটা অস্বাভাবিক মোটা, কালো রঙের। গুলির চেম্বারের গায়ে একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে উইড্ডে।। সেখানে কতকগুলো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে।

সুধাসুন্দরী পিস্তলের নলটা জিশানের ডান কানের নীচে চেপে ধরল। 'সরি, জিশান। এটা না করে আমার উপায় নেই।’
জিশানের ভেতরে কোনও প্রতিরোধ তৈরি হল না। ওর একটা মাংসপেশিও প্রতিরোধের প্রতিবর্তী ক্রিয়ায় শক্ত হল না। বরং মনে হল,

## www.banglabiofk pect.tislogspot.com

আপাতভাবে ‘স্বাধীন’ হয়ে নিউ সিটিতে ঘুরে বেড়ানো যাবে, এটইই বা কম के!
‘রেডি, স্টেডি, গো-।’ বলে পিস্তলের ট্রিগার টিপল সুধা।
ছোট্ট চাপা শব্দ হল। এবং জিশানের মনে হল একটা অন্ধকার কুয়োর ভেতরে ও পড়ে যাচ্ছে। পরিভাষায় যাকে বলে ‘ফ্রি ফল’।

ও পড়ছে তো পড়ছেই। পেটের ভেতরটা কেমন অড্রুতরকম খালি লাগছে।

কিন্তু এক<েঁঁটটও যন্ত্রণা নেই।
বহ্দূর থেকে একটা ফাঁপা নলের মধ্যে দিয়ে সুধাস়ুন্দরীর প্রতিধ্বনিময় গলা ভেসে এল, 'স্টেডি, জিশান, স্টেডি-।’

হঠাৎই চোের সামনে আলো ফুটে উঠল। চারপাশটা আবার স্বাভাবিক। ‘‘্রিডম কন্ট্রোল ল্যাব’-কে আবার আগের চেহোরায় দেখতে পেল জিশান। ওই তো সুধাসুন্দরী! ওই তো স্যামি আর চিকি!

সুধা হাসছিল ঃ "উঠে দাঁড়াও, জিশান। এখন নিউ সিটির কোথাও তোমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা। এনজয় ইয়োর ফ্রিডম...।'
‘থ্যাংক্স—' বলে জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ডান কানের নীচে

 এবদু ব্যাথা টের পেল ও।
‘ওটা পোস্ট অপ্স পলিমার সিল। ক্যাপসুলটা শরীরে ঢোকার জন্যে সামান্য বেট্রুকু ড্যামেজ হয়েছে সেটা আমি সিলিং গান দিয়ে সিল করে দিয়েছি। তখन তুমি ব্য্যাক আউট স্টেটে ছিলে। তিন ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে’’

জিশান ল্যাবের ভেতরে কয়েক পা পায়চারি করল। না, শরীর কোনও অসুবিধের কথা জানান দিচ্ছে না। সমষ্ত পেশি জিশানের নিয়ষ্ত্রণীই আছে।
‘আমি কি তা হলে এখন যেতে পারি?’ জানতে চাইন জিশান।
‘হাঁ-পারো।’ সুধাসুন্দরী বলল, ‘কিন্তু কাল তোমাকে রাত ন’টার সময় আমার এই ল্যাবে ফিরে আসতে হবে। यদিও এখন সময়...' কন্ট্রোল প্যানেলের ঘড়ির দিকে তাকাল ঃ ‘...রাত প্রায় এগরোট, আমি সেফস্সাইডে থাকার জন্যে তোমাকে দু-ঘণ্টা আগে আসতে বলছি এবং সেই সময়টটই ফিশ্স করেছি। তখন আমি তোমার কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম আবার পরদিন রাত এগারোট পর্যন্ত রিচার্জ করে দেব। ইনিশিয়াল শটের সময় ওই কাপসুলটা বে-রেফারেন্স টাইম ওর মেমোরিতে স্টোর করে সেই টাইমটার আর নড়চড় হয় না। সো-' হাতে হাত ঘষল সুধা। ভোরবেলা ফোটা ফুলের মতো প্রশান্ত আয়ত ঢোখ মেলে

জিশানকে দেখল : টুমরো ইভনিং, নাইন ও’ ক্লক। তোমার সঙ্গে রোজ এই ন্যাবে আমার দেখা হরে—’
‘ঁাঁা-কিল গেমের আগের রাত পর্যন্ত।’
এ-কথায় সুধা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, ‘স্যামি তোমাকে সঙ্গে করে এখন নিয়ে যাবে। যা-यা ফরম্যালিটি আছে সেণেলো সেরে নেবে—'
‘ফরম্যালিটি?’ জিশানের ভুরু কুঁচকে গেল।
‘হঁঁ-ফরম্যালিটি’’ মাথা নেড়ে বলन সুধাসুন্দরী, ‘রিমোট অপারেশান্স ল্যাবে যাওয়া-আসার জন্যে তোমাকে একটা স্মার্ট কার্ড দেওয়া হবে। প্রতিদিন রাত প্পেনে নঁা থেকে সওয়া ন্টার মধ্যে তুমি ওই কার্ড সোয়াইপ করে আমার এই ল্যাবে ঢুকে পড়তে পারবে।’
'তা ছাড়া তোমকে একটা সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড দেওয়া হরে। মানে, "কন্ট্রোলড্ ফ্রিডম সিটিজেন" কার্ড। নিউ সিট্তিত ঘুরে বেড়ানোর সময় নানা জায়গায় এই ম্মার্ট কার্ডটা তোমার কজজে লাগবে। আর তোমাকে একটা পার্সোনাল গাড়িও দেওয়া হবে। তবে ওটা মার্শালের ব্যাপার। উনি ঠিক সময়ে ওটার ব্যবস্থা করে দেবেন।

 তোমার মতো কেউ আসেনি। মনে হচ্ছে, তুমি মার্শালের হিসেব ওলটতে পারবে। উইশ য়ু অল দ্যু বেস্ট ইন কিল গেম—।
'থ্যাংক্স-' বলে সুধার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা মুঠোয় নিল জিশান। হান্ডশেক করল।

স্যামি জিশানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিশান কী ভেবে ওকে বলল, ‘আপনি একটু ল্যাবের বাইরে গিয়ে দাঁড়ান—আমি আসছি।'

চিকি তখন ওর কাজের টেবিলে চলে গেছে। ওর আর্ক কশ্পিউটারের সামনে বসে পড়েছে।

জিশান চিকির দিকে একবার তাকাল। আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, ও সুধাকে নীহ গলায় কোনও কথা বললে সেটা চিকি ওনতে পাবে কি না।

জিশান সুধার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'
'को কथा?'
প্রায় ফিসফিস করে জিশান বলল, ‘একটা ব্যাপার ভীষণ তাজ্জব লাগছে। তোমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট শ্রীধর পাট্টার তৈরি নরকে বসে कী করহে—’

সুধাসুন্দরীর মুখের উজ্জ্রল ভাবটা মিলিয়ে গেল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল ও। বোধহয় ভাবতে লাগল।

একদু পরে ও বলল, '‘াল তো ঢুমি আসছ। কাল বলব।’ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলन ঃ ‘সত্তিই তো! এই নরকে আমার থাকার কথা নয়...’’

সকলেে ব্রেকফাস্ট সেরে নেওয়ার পর গেস্টহাউসের ঘর ছেড়ে বাইরে এল জিশান। আজ ওর স্বাধীনতার প্রথম দিন।

সকাল সাতটার সময় অটেেেেিিক প্লেট টিভি থেকে মিষ্টি গলার মেয়েটি জিশানের ঘুম ভাঙিয়েছে। তারপর ওর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে।
'গড মর্নিং, জিশান।
'গুড মর্নিং-' জিশানও পালটা বলল। ইন্টারঅ্যাক্টিভ টিভিতে সেকথ্থ শুতে পেল মেয়েটি।

দু-আডুল তুলে জয়ের ‘ভি’ সংকেত দেখাল মেয়েটি : 'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ!’ তারপর হাসল।

'ना, বলো—।
‘আমাদের মার্শাল তোমর জন্যে একটা অটোমোবিল আ্যালট করেছেন। সেই গাড়িটা নীচের পার্কিং নটে এখন দাঁড়িয়ে আছে। ডুমি আমাদের এই হাইটেক গাড়ি প্রথম-প্রথম চালাতে পারবে না। তাই গাড়িতে একজন ড্রাইভার রয়েছে। এ ছাড়া তুমি গাড়িতে একটা প্যাকেট পাবে। তাতে জেনারেল প্যাকেট রেডিয়ো সারভিস আর গ্গোবাল পজিশনিং সিস্টেম অ্যাক্টিভেট করা একটা স্যাটেলাইট ফোন রয়েছে—নিউ সিটিতে তুমি যতদিন আছ ফোননটা ততদিন पুমি ইউজ করবে। এ ছড়া নিউ সিটি সম্পর্কে নানান তথ্য জানার জন্যে রয়েছে কয়েেটা ডিভিডি। গাড়ির ডিভিডি প্লেয়ারে তুমি ইচ্ছেমতো ওগুলো চালিয়ে দেখতে পারো—’’
'নিউ সিটির কোথায় আমি যেতে পারব, আর কোথায় পারব না, তার কোনও ইনস্ট্রাক্শন রয়েছে?' জিশান জিগ্যেস করল।
‘হাঁ, ওই প্যাকেটে রয়েছে তোমার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ড। সিটির শে-বে জায়গায় তুমি বব্ধ দরজা পবে সেখানে ঢোকার জন্যে তোমাকে এই সি. এফ. সি. কার্ডটা সোয়াইপ করতে হবে। তাতে দরজা यদি খুলে যায় তা হলে ডুমি অ্যালাউড—আর না খুললে, নয়।
‘শোনো। ড্রাইভার ছেলেটির নাম গুনাজি। ভীযণ ব্রাইট বয়। ও তোমকে সবরকমভাবে গাইড করবে, আর সব ব্যাপারে হেল্প করবে। বলতে গেলে ও তোমার লিভিং ম্মার্ট কার্ড। ও.কে.?'

জিশান বলল, ‘ও.কে.।’
‘এনি ফারদার কেশেেন?'
জিশান ভেবে দেখল, ওর মনে এই মুহূর্ত্ আর কোনও প্রশ্ন নেই। তাই ও বলল, 'থ্যাংক য়ু। নো কোশ্চেন।'

হাসল মেয়েটি ঃ 'গুড। তা হলে শেষ জরুরি কথাটা এবার বলি। টাকা। রাস্তায় বেরোলে তোমর কিছু খরচ হতে পারে। অনেকগুলো কমপিটিশানে জিতে তোমার এখন অনেক টাকা। সেই টাকা থেকে তুমি অনায়াসে খরচ করতে পারো। ওই সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডই তোমার এটিএম কার্ড। তুমি নিউ সিটির বে-কোনও এটিএম কিয়োক্কে ওই কার্ড সোয়াইপ করে টাকা তুলতে পারো। তোমার এটিএম পিন গুনাজি তোমকে বলে দেবে। হি ইজ আ ভেরি স্মার্ট বয়’’ হাত নাড়ল মেয়েটি, বলল, ‘বাই, জিশান—।’
‘বাই—’’
ইন্টারঅ্যাক্টিভ টিভি অফ হয়ে গেল।
এখন, ব্রেকফস্টের পর, জিশান घ্যের দরজা টেনে দিয়ে বাইরে
 বেন্টের সক্গে আটকনো একটা পাউচে মইক্রোভিডিয়োফোনটা ঢুকিক্যে নিয়েছে। নিউ সিটিতে घুরে বেড়ানোর সময় মিনির সঙ্গে কথা বলতে চায় ও। শহরটা দেখতে কেমন তার একটা ধারাবিবরনী দিতে চায়।

গেস্টহাউস ছেড়ে নীচে নেমে পায়ে-পায়ে ফোয়ারার কাছে গিত্যে দাঁড়াল জিশান। ফোয়ারার দিকেে তাক্য়ে ওর ফকিরাঁাঁদের কথা মনে পড়ন। মনে পড়ল ওর হতভাগ্য ভাইয়ের কথা। নেক্রোসিটির কথা।

এদিক-ওদিক চোখ ফেরাল জিশান। এখন কী করে ও গুনাজিকে খুঁজে পাবে? ওর গাড়িটই বা কোথায়?

হঠাৎ弓 দেখল, মেন গেটের দিক থেকে অত্তন্ত রোগা লম্বা একটা ছেলে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ফরসা, খোকা-খোকা চেহরা। গোঁফের রেখা সদ্য গজিয়েছে। মাথার চুল সোনালি রঙে রাঙানো এবং হেয়ার জেলের দৌলতে বেশ খাড়া-খাড়া হয়ে আছে।

জিশানের কাছে এসে একগাল হাসল ছেনেটা। বিচিত্র ঢঙে সেলাম ঠুকে বলল, 'স্যার, আমার নাম গুনাজি। ট্রাসপোঁ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আমকে একটা গাড়ি দিয়ে আপনার কাছে পাঠিয়েছে। আপনার সঙ্গে সবসময় থাকব আমি। প্রুর সার্ভিস দেব—’

## s৪ www.banglaboôk patf.tīogspot.com

জিশান অবাক হয়ে ছেলেটাকে দেখতে লাগল।
গুনাজির বয়েস বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। টগবগে। চাবুকের মতো। মুখ থেকে কম বয়েলের ছটা বেরোচ্ছে।

কিন্ত ছেলেটা জিশানকে হঠাৎ সেলাম ঠুকল কেন? আর ‘স্যার’ই বা বলছে কেন?

এই বাপারগুলো জিশান মোটেই পছন্দ করে না। তাই গুনাজিকে বলन ‘犭⿰াজি, তুমি আমার ড্রাইভার নয়-আমার মাস্টারমশাই। আমকে তুমি গাড়ি চালানো শেখাবে। আর একইসঙ্গে তুমি আমার গইড, আমার বন্ধু। ডুমি আমাকে "স্যার" বলবে না, আর ওইরকম বোকা-বোকা সেলামও ঠুকবে না—।

জিশানের কথায় ছেলেটা একটু দমে গেল যেন। তারপর বলল, 'আপনার মতো করে কেউ কখনও বলেনি-সেই যোলো বছর বয়েস থেকে গাড়ি চালাচ্ছি-।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'তবে আপনাকে সেলাম रুকেছি অন্য কারণে।
'কী?
‘আপনার সমস্ত গেম আমি টিভিতে দের্খেছি। আপনি এককথায় সুপার। आপনার মতन কাউকে দ্দেথি। তা ছাড়া পিট ফাইটের সময় आপনি লাস্ট
 সత্তেও আপনি জাব্বাকে মেরে ফেলেননি-ছেড়ে দিত্যেছেন। সেলামটা সেইজন্যে-।'

জিশান ছেনেটটে দেখতে লাগল। ও তখনও কথা বলছিল।
আসলে আমাদর এই শহরটা থেকে দয়া, ময়়া, ক্ষমা-এসব উঠে গেছে। তাই টিভিতে অনেকদিন পর সেটা দেখে খুব ভালো লেগেছিল। আমার কখনও যদি আপনাকে সেলাম করার ইচ্ছে হয় সেটা কিন্তু স্যার বারণ করবেন ना।'
‘আবার স্যার?’
‘সরি’’ লাজুক হাসল গুনাজি। আডুল তুলে বাইরের দিকে দেখাল : 'চলুন, গাড়িটা ওইদিকে ডান সাইডে পার্ক করা আছে-।'

ওর সঙ্গে হাঁট দিল জিশান। ওুনাজির পাশাপাশি হঁটটতে ওর কেন জানি না ভালো লাগছিল।

ফোয়ারার জলে সকলের রোদ চিকচিক করছিল। অসংখ্য সোনার কুচি। জিশানের চোখ পলকের জন্য আটকে গেল।

তারপর আকাশের দিকে তাকাল। আজ অনেক বেশি নীল লাগছে। সেখানে বেশ কয়েকটা পাখি চোথে পড়ন। ডানা খেলিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

## www.banglabookpdf.blogspot.com



জিশানের পাখি হতে ইচ্ছে করল। কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম নয়-ওর টোটাল ফ্রিডম চাই। ওর একার জন্য নয়-সকলের জন্য।

জিশান একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।
ঠিক তখনই গুনাজি ওর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিগ্যেস করল, 'আপনার গায়ে খুব জোর, তাই না?’

জিশান ওর দিকে তাকিয়ে হেলে ফেলল। তারপর বলল, ‘শeখু গায়ে নয়, গুনাজি-মনেও জোর চাই...।'

বাতাসে পাথির পালক যখন ভেসে যায় তখন যে-কোমলতার স্পশ্শ অনুভব করা যায় জিশানের ঠিক তেমনটাই লাগছিল। গুনাজি যেন গাড়ি চালাচ্ছিল না, একটা তুলতুলে পালক ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল নিউ সিটির নিখুঁত পরিপাটি রাস্তায়।

চারপাশে তাকলেলই ছবির মতো সব বাড়ি, ছবির মতো মসৃণ রাস্তাঘাট, পার্ক, গাছপালা, বাগান, লেক। ছবিটা সবমিলিয়ে খুবই সুন্দর, তবে এটা যে ‘বাইরের’ ছবি -সেটা জিশান্নে মনে পড়ল। ‘জেতরের’ ছবিটা দ্যোর জন্য জিশান


গুনাজি গাড়ি চালাচ্ছিল আর টগবগ করে কথা বলছিল। জিশানকে ওর স্যাটেলাইট ফেননটা দিয়ে তার নানান বোতামের ব্যবহার বুঝিয়ে দিচ্ছিল। को করে ফোন করতে হয়, কী করে ফোন ধরতে হয়, কী করে জি. পি. আর. এস. আর. জি. পি. এস ব্যবহার করতে হয়-এইসব।
'ডুমি এত কিছু শিখলে কী করে?' জিশান ওকে জিগ্যেস করল।
গাড়ির সামনের কাচে চোখ রেথে হাসল গুনাজি ঃ 'স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে ঘাঁটাঁাঁটি করা আমার স্বভাব। তা ছাড়া আমাদের নিউ সিটির "ডেটা কমিউনিকেশান সেন্টার"-এ আমি ছ’মাস ট্রেনিং নিয়েছি। আমি লাস্ট দেড় বছর ধরে সবাইকে স্যাটেলাইট ফোন অপারেট করা শেখাই আর সি থ্রু অটোমোবিল চালানো শেখাই। এই কাজটা আমার খুব ভালো লাগে...।’

যে-গাড়িটা গুনাজি জিশানের জন্য নিয়ে এসেছে সেটা ব্যাটারিতে চলে এবং সেটা সি থ্রু। অর্থাৎ, গোট গাড়িটা স্বচ্হ ফাইবারের তৈরি। তার ভেতরের বিভিন্ন পার্টস, মোটর, ক্রাচ, গিয়ার বক্স, ডিফারেনশিয়াল গিয়ার-সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। গাড়ির ডিজাইন এরোডায়ানামিক এবং একইসক্পে আরগোনোমিক। ছুটে যাওয়া গাড়িটাকে যাতে দেখতে কারও অসুবিধে না হয় তার জন্য গাড়িকে ঘিরে ফাইবারের বডির ওপরে ছইঞ্চি চওড়া ফুওরেসেন্ট র্ল রঙের উজ্জূল

পটি आঁকা আছে। এই নীল রং দিনে কিংবা রাতে নীল আগুনের মতো জ্রলজূল করে।

গাড়িটাকে দেথ্থেই জিশানের তাক লেগে গিত্রেছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলল, ‘এ-গাড়িটা ইমপৌর্ট করা, স্যার...।’
‘আবার ‘স্যার"?’ জিশান বকুনির ঢঙে বলল।
‘না, স্যার-মানে, দাদা। এটা ইমপোভৈডে গাড়ি। তবে কিউ মোবাইলের চেয়ে দামে সস্তা। এ-গাড়ি নিউ সিটিতে অনেক আছে।’

জিশান গাড়ির ভেতরটা অবাক হয়ে দেখছিল। অটো এয়ারকন্ডিশানিং সিস্টেম। অটো নেভিগেশান স্ক্রিন। স্মার্ট গিয়ার। ইন্টেলিজেন্ট কন্ট্রোল। আরও कण की!

গুনাজি জীবন্ত 'ম্যানুয়াল’ হয়ে জিশানকে সি থু অটোমোবিল নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল। ওর কথায় বোঝা যাচ্ছিল, এই গাড়ির কারিগরি নিয়ে ও অনেক সময় থরচ করেছে।

জিপিসি-র গেস্টহাউস থেকে গাড়ি ছাড়ার একটু পরেইই জিশান গুনাজিকে বলেছে, 'গুাজি, আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালানো শিখব না। আজ ঢুমি নানান জায়গায় ঘুরে আমকে শহরঢা চেনাবে, কেমন?
 কখনও শহরের পার্ক, কখনও লেক, কখনও অফিসপাড়া, কখনও বা সুপারগেম্স কর্পোরেশানের বিল্ডিং কিংবা সিভ্ডিকেটের হেডকোয়ার্টর।

শহরটা দেখতে-দেখতে জিশানের মনখারাপ হয়ে যাচ্ছিল। কারণ, ওর ওন্ড সিটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওর শহরটা একমনে গড়িয়ে যাচ্ছে ফ্য়ের দিকে।

গাড়ির কন্ট্রোলের দিকে নজর রেখ্খেিল গুনাজি। আর একইসঙ্গে জিশানের গইডের কাজ করাছিন। শহরের নানান জায়া সম্পর্কে ও যতটুকু জানে সেটই অন্তরঙ্গবে জিশানকে বলার চেষ্টা করছিল।

শহরের রাস্তাঘাটে পথচারী মানুযজন প্রায় ঢেটেই পড়ে না। শখু গাড়ি আর গাড়ি। নানান মাপের, নানান রঙের, নানান ঢঙের। শহরাঁ যেন শধু যন্ত্র দিয়ে ঠাসা—ভাবল জিশান। কিস্তু গাড়িুুো সব ব্যাটারি ড্রিভেন হৃয়ায় আকাশ-বাতাস পরিষ্কার—দূষণের ছোয়া টের পাওয়া যায় না।

একটা ফ্লাইওভরের ওপর দিয়ে জিশানের গাড়ি ছুটছিল। নীচের দিকে তাকিয়ে জিশান হঠাৎই দেখত্ত পেল একটা সবুজ জঙ্গল। আকারে চৌকে। তার এক-একদিকের বাহ্র মাপ চারশো কি পাঁচশো মিটার হবে।
'নীচে ওটা কি, গुনাজি?’
‘ওটা পাথির বাসা’’
‘পাথির বাসা মানে?' অবাক হয়ে গুনাজির দিকে তাকাল জিশান। জিশানের দিকে চোখ ফেরাল গুনাজি। হাসল : ‘বার্ড স্যাংুয়ারি, দাদা। আমি শর্টে বলি পাথির বাসা—’'

জিশান হেসে ফেলল।
গুনাজি বলল, ‘এ শহরে এরকম মোট দশটা স্যাংচহয়ারি আছে-শধু পাথির জন্যে। ওই মিনি জস্গণুলোয় পাথি ছাড়া আর কিছু নেই। যে-কেউ ইচ্ছে করলে টিকিট কেটে ওই জঙ্গলে पুকে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াতে পারে। তবে তার গায়ে মইর্রো-ক্যামেরা ফিট করে দেওয়া হয়-যাতে পাখিদের। ।ানও ক্ষতি করতে না পারে। পাথি ধরতে বা মারতে চেষ্টা করলে জঙ্গলের সিকিওরিটি গার্ডরা তাদের মনিটরে সেটা দেখতে পাবে। আর তখনই শাস্তি—’’
‘কী টইপের শাস্তি?’ জিশান জানতে চাইল।
‘এসব কেলে শাস্তি হচ্ছে ফাইন—মানে, টাকা। আর টাকার ফিগারটা এমন যে, তার ইকনমিক ইনডেক্স পড়ে যেতে পারে। মানে, বাই-বাই নিউ সিটি হয়ে যেতে পারে-।'

জনলা দিয়ে নীচে তাকাল জিশান। আরও একটা পাথির বাসা ওর চোথে


‘না, আর যা আছে সব শহরের বাইরে। নিউ সিটির মধ্যে খুধু পাখি। কারণ, আমাদের মার্শাল পাখি ভালোবাসেন...।

জিশানের মনে পড়ে গেল শ্রীধরের অফিসের ফ্যানটেইল্ড লাভবার্ড্সগুলোর কথা। আর একইসঙ্গে মনে পড়ল পাথিওুলোর ‘কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম’-এর कथा।

কিন্তু এই অভয়ারণ্যের পাথিতুলোর স্বাধীনতায় শ্রীধর পাট্টা কোনওরকম খবরদারি করেননি।

শহরের নানান জায়গায় জিশান অনেক ফ্লাইওভার দেখতে পাচ্ছিল। বিশাল-বিশাল, রামধনুর মতো তাদের চেহারা। আর তাদের প্রত্যেকের গায়ে লাল, নীল, হলদ্রে মতো উজ্জ্, রং। আর সবকঢঢই এক অলৌকিক উপায়ে কোনওরকম পিলার ছাড়াই শৃন্যে ভেসে আছে।

এখন যদি একটা সত্যিকারের রামধনু ওঠে তা হলে দারুণ হয়। ভাবল জিশান।

শহরে ঘোরাঘুরির পথে গুাজির গাড়ি এক ফ্নাক্ওভার ছেড়ে আর-এক ফ্যাইওভারে উঠছিল। জিশানের মনে হচ্ছিল, ও নানান পাহাড়ে উঠছে আর নামছে। আর সেই ‘পাহাড়’ থেকে দেখতে পাচ্ছে গাছপালা, হাই-রাইভ, উড়ে

যাওয়া পাখি আর শিস দিয়ে ছুটে যাওয়া খটার।
দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নেওয়ার জন্য একটা ফুড মলের কাছে গাড়ি পার্ক করল গুনাজি।

প্রায় দশতলা উঁু মল-বিল্ডিং। বাইরের চেহারা সুষম বহহুুজের মতো। পুরোটই কাচে ঢকা। আর বিল্ডিংতা খাড়াতাবে দাঁড়িয়ে খুব ধীরে-ধীরে ঘুরছে। বিল্ডিং-এর নানান তলায় বসে থাকা লোকজনকে আকাশের ছায়া-মাখা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

শহরের বৈভব আর কারিগরি দক্ষতা জিশানকে যেন আবার নতুন করে ধাক্কা দিল।

গাড়ি থেকে নামার আগে গुনাজি বলল, দাদা, সানগ্গাসটা ঢোে দিয়ে নিন। আর এই র্লু ক্যাপটা মাথায় পরে নিন-' গাড়ির পিছনের সিট থেকে একটা ব্যাগ তুলে নিয়ে তার ভেতরে হাত ঢোকাল গুনাজি। একটা সানগ্গাস আর একটা নীল টুপি জিশানের হাতে দিয়ে বলল, আমার ওপরে এরকমই ইনস্ট্রাকশন আছে। এই সানগ্নাস আর টুপি না পরলে পাবলিক চট করে আপনাকে চিনে ফেলতে পারে। তখন ভিড়-টিড় জমে গিয়ে ঝােলা হবে...।’

জিশান গুনাজির দেওয়া জিনিস দুটো চোখে আর মাথায় পরে নিল। তারপর গ্য়ি থেকে নামল্
 মিনির সঙ্গে কথা বলল জিশান। প্রতিদিনের বরাদ্দ দশমিনিট থেকে কিছু-কিছু করে সময় জমিয়ে জিশানের টকটাইম ব্যালান্স এখন এক ঘন্টারও বেশি। ওর মনে হয়েছে, কিল গেমে যাওয়ার আগের কয়েকটা দিন মিনির সঙ্গে ওর অনেক বেশি সময় ধরে কথা বলতে ইচ্ছে করবে। তাই ও গত একমাস ধরেই এমভিপি-র সময় জমচ্ছে।

শুনাজি আবার যখন গাড়িতে স্টার্ট দিল তখন জিশান ‘ছদ্মবেশ’ খুলে রেথে মিনি আর শানুর ভাবনায় ডুবে আহে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, দাদা, আমরা এবার সেন্ট্রাল লেকের দিকে যাচ্ছি। এটা শহরের খুব সুন্দর জায়গা। লেকটা মাপে এত বড় যে, এপার থেকে ওপার দেখা যায় না। আর সাহেবদের চোেে মতো নীল জल... ${ }^{\prime}$

ওর তুলনার ঢঙে জিশান হেসে ফেলন। একইসঙ্গে ওল্ড সিটির মা আর ছেলের চিষ্তার জাল ছিঁড়ে পলকে চলে এল সি থ্রু অটোমোবিলে। ও গুনাজির দিকে একপলক তাকিয়েই চোখ ফেরাল সামনের দিকে। গাড়ির স্ক্র্যাচ্রুফ স্বচ্ছ পলিমার উইন্ডশিন্ডটা এমন যে, আছে বনে চট করে বোঝা যায় না। গাড়ি ছুটে চলল আরও চারমিনিট কি পাচমমনিট-তারপরই চোখ-

জুড়োনো একটা জায়গায় জিশানরা পৌঁছে গেল।
সীমাীী একটা క্রদ। তার জল সত্যিই সাহেবদের চোথের মতো নীল। যেদিকে তাকানো যায় শ্ধু নীল আর নীল। সেই নীলের বুক চিরে চওড়া কালো ফিতের মতো রাস্তা। রাস্তার দুপালে হলদে রঙের পাম গাছের ঘন সারি, আর সেগুলোর কোল ঘেঁষে ধবধবে সাদা ছোট-ছোট কটেজ।

রাস্তা থেকে নেমে ঘাসে ছাওয়া জমির ওপরে গাড়ি থামাল গুনাজি। জিশান আবার রোদচশমা আর টুপি পরে নিল। তারপর ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে লেকের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল।

লেকের অন্তত একশো মিটার ওপর দিয়ে পাচটটা রঙিন ফ্লাইওভার চলে গেছে। ওతুলো কী করে শূন্যে ঝুলে আছে জিশান ভেবে পেল না। নিউ সিটির প্রयুক্তিকে মনে-মনে সেলাম দিল জিশান।

সামনে তাকালে দেখা যায়, দূরে—বश্দূরে লেকের নীল জল ঝাপসা সবুজ এক পাহড়ে গিয়ে মিশেছে।

আর পিছনে, প্রায় সমান দূরে, চোথে পড়ছে হাই-রাইজের সারি।
‘এই হল আমাদের সেন্ট্রাল লেক।’ গুনাজি বলল, ‘নিউ সিটির সবচেফ়ে আ্যাট্রাকটিভ টুরিস্ট স্পট। ওই যে কটেজগুলো দেখছেন-' আডুল তুলে

 তারা এখানে গাড়ি নিয়ে আসে, একটু ঘোরে-ফেরে, নৌকো চড়ে লেকে রাইড নেয়—তারপর সন্ধে হলে চলে যায়...।'

ঢারপাশে তাকিয়ে অনেক মানুষজন দেখতে পেল জিশান। লেকের কিনারায় অলস পায়ে বেড়াচ্ছে। বড়দের পাশাপাশি ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও রয়েছে।

এ ছাড়া লেকের নীল জলে সুন্দর ছাদের রঙিন নৌকো ভেসে রয়েছে। বেড়াতে আসা মানুষরা তাতে বসে আনন্দে ইইচই করছে।

প্রাণ ভরে দৃশাগুলো দেখতে লাগল জিশান। সত্যি, পৃথিবীতা कী সুন্দর। কিল গেমে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত ও রোজ একবার করে এখানে আসবে। নিজেকে বারবার করে বিশ্ধাস করাবে, পৃথিবী অপরূপ, অলৌকিক। নিউ সিটির যে-ভয়ংকর রূপ সেটা সাময়িক এবং লৌকিক।

সূর্যের দিকে তাকাল জিশান। বেলা সাড়ে তিনটের সুর্য খানিকটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। নীল লেকের জলে তার উজ্জ্রল ছায়া।

आরামের বাতাস বইছিল। হ্রুদের জলে কাঁপন ধরিয়ে শিরা উঠছিল। জিশান চোখ বুজে দাঁড়িয়ে বাতাসটা শরীর তষে নিতে চাইছিল। তখনই কয়েকটা পাখির শিস ওর কানে এল।

চোখ বুজে এক অদ্রুত সৌন্দর্যকে অনুভব করতে লাগল জিশান।
একটু পরে চোখ খুলে ও তাকাল গুনাজির দিকে : ‘গুনাজি, আমরা কি একটা বোট নিয়ে লেকে বেড়াতে পারি?’
‘হাঁ, দাদা—পারি’’ হাসল ছেলেটা ঃ ‘আপনার সি. এফ. সি. স্মার্ট কার্ডটা দিন—আমি সোয়াইপ করে আনছি...।’

কার্ডটা নিয়ে লেকের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা ‘লেক কন্ট্রোল রুম’-এর দিকে চলে গেল গুনাজি। এবং ফিরে এল পাচ মিনিটের মধ্যেই। তারপর নীল রঙের একটা হাইটেক শ্মার্ট বোট নিয়ে ওরা লেকের জলে ভেসে পড়ল।

বোটতুলোয় কোনও চালক নেই। সবটটই প্রি-প্রোগ্রাম্ড। ফলে চালানোর কোনও ব্যাপার নেই, স্টিয়ারিং ঘোরানোর কোনও ব্যাপার নেই। শখু আরাম করে বসে থাকলেই হন। নৌকো নিজের মনে চলবে। তার অটোনেভিগেশান এমনই যে, কোনও একটা নৌকোর সঙ্গে আর-একটা নৌকোর কখনওই ধাক্কা লাগবে না। আর নির্দিষ্ট সময় পার হলেই নৌকো পাড়ের কাছে স্টার্দিং পয়েন্টে আবার ফিরে আসবে।

নীল জলের ওপরে জিশানদের নীল রঙের বোট তেসে বেড়াচ্ছিল। জলের দিকে তাকালে দ্খো যায় সেখানে জল্ল আর আকাশ মাখামাি। তারই
 হঠাৎই একটা সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।
আওয়াজটা এসেছে ওপরদিক থেকে।
সঙ্গে-সন্গে জিশান আর গুনাজি মাথা তুলে তাকাল আকাশের দিকে। দেখল, ফ্বাইওভারের রেলিং ভেঙে একটা সি থ্রু অটোমোবিল ছিটকে গেছে শূন্যে। নীল আকাশের বুকে গাড়ির স্বচ্ছ ফাইবারের বডি সূর্বের আলোয় ঝকঝক করছে। গাড়িটা শূন্যে লাট খেতে-খেতে নেমে আসছে নীচে।

লেকে তেসে বেড়ানো বোটের যান্রীরা চিৎকার করে উঠল। সে-চিৎকারে আতঙ্ক ছিল, কারণ প্রতিটি বোটই অটোনোভিগেশানে চলছে। শূন্যে বাতাস কেটে গাড়িটা যেভাবে নেমে আসছে ততে ওটা বে-কোনও বোটের ওপরে এসে পড়ত্ত পারে।

লেক কন্ট্রোল রুম থেকে বোধছয় কিছু একটা করল, কারণ, হঠাৎই সবকণা নৌকো ছুটত্ত তরু করল পাড়ের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে।

আর তখনই গাড়িটা উক্ধার মতো ধেয়ে এসে লেকের নীল জলে ‘ঝপাস’ শব্দ তুলে আছড়ে পড়ল। পড়েই বেশ কয়েক হাত লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার আছড়ে পড়ল।

লোকের জল বিস্ফেরণের স্প্নিট্টারের মতো চারিদিকে ছিটকে গেল। সেই

জলে নৌকোয় বসা অন্নে লোকের জামাকাপড় ভিজে গেল। যান্রীদের হইচই চিৎকার কিছুতুই থামছিল না। গাড়িটা যে কোনও নৌকার ওপরে আছড়ে পড়েনি তার জন্য লোকজনের সেই চিৎকারে আতক্কের চেয়ে এখন আনন্দের ছাপ ছিল অনেক বেশি।

গাড়ির মধ্যে একটা ছেলেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিন। পাগলের মতো বেরোনোর চেষ্টো করছে গাড়ি থেকে, কিস্তু গাড়ির দরজা কিছুতেই খুলছে না। বরং গাড়িটা ধীরে-ধীরে লেকের জলে ডুবে যাচ্ছে।

অতটা উঁদু থেকে গাড়িটা পড়ার পরেও ছেলেটা যে বেঁচে আছে সেটা জিশানকে অবাক করেছিল। সে-কথা গুনাজিকে বলতেই ও বলন, ‘এখানকার সব গাড়িতেই অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগ থাকে। হঠাৎ করে ছুটত্ত গাড়ি থেমে গেলে-মানে, কোনও কিছুতে ধাকা খেয়ে আচমকা গাড়ির স্পিড কমে গেলওই এয়ারব্যাগ 0.1 সেকেন্ডের মধ্যে ফুলে ওঠঠ আর ড্রাইভারের মাথাট ঘিরে বসে যায়। ফলে ড্রাইভার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেঁচে যায়। আর ড্রাইভারের পাশে যে বসে সে-ও একইভাবে সেভ হয়ে যায়...।'

গাড়িট তথনও ডোবেনি, আর ছেলেটও গাড়ির ভেতরের দেওয়ালে কিল-ঘুসি মারছিন। বন্ধ গাড়ির ভেতর থেকে ওর চাপা চিৎকারুও শোনা যাচ্ছিল।
 পারনে না। তখন অ্যান্টি-কলিশান এয়ারব্যাগের ব্যাপারটাই মাঠঠ মারা যাবে। ব্যাগটা ওকে ইমপাক্ট ইনজুরি থেকে বাঁচিয়েছে, কিন্তু লেকের জল তো ওকে রেহাই দেবে না!

চারপাশে খুব দ্রুত নজর চালিয়ে নিল জিশান।
অন্যান্য বোটের লোকজন এবার মজা দেখছে। বিনাপয়সার রোমঞ্চকর শে।। ওরা গাড়িটার খাবি খাওয়া দেখছে, ছেলেটার মরিয়া হাত-পা ছোড়াছুড়ি দেখছে আর নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভবে আলোচনা করছে।

রাস্তায় পামগাছের সারির কাছে দাঁড়ানো লোকজনের অবস্থাও তাই।
জিশান আর দেরি করল না। চোখ থেকে সানগ্নস খুলে ছুড়ে দিল বোটের মেঝেতে। তরপর দুপিটাও। এবং বাঁপ দিল লেকের জলে।

আগের মজার সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হওয়ায় দর্শকরা আবার উঁদু পরদায় ইইইই করে উঠল।

জামা-প্যান্ট পরা অবস্থাতেই জিশান গাড়ি লক্ষ্য করে সাঁতার কাট্তে লাগল। লম্বা-লম্বা গাত টেনে আধমিনিটের মধ্ৌই ও গাড়িটার কাছে পোঁছে গেল। ডুবষ্ত গাড়ির বনেটের ওপরে উঠে ও সোজা হয়ে দাঁড়াতে চাইল, কিক্তু পারল না। কারণ, ইঞ্জিনের ভারে গাড়ির সামনের দিকটা ডুবে গির্যে বনেটটা

## ঢালু হয়ে গিয়েছিল।

টাল খেয়ে পড়ে যেতে-যেতেও জিশান ডানপায়ের এক প্রচণডড লাথি কষিয়ে দিল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিনের ওপরে। একটু পরেই আর-একবার।

গাড়ির উইন্ডক্কিন ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেল।
জিশান নীচ হয়ে ঝুঁকে হাত বাড়াল গাড়ির ভেতরে। পলকে আঁকড়ে ধরল ছেলেটার জামা। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে ওকে ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে টেনে নিল বাইরে।

ছেলেটা আতক্কে চোখ বুজে গোঙাচ্ছিল। জিশান ওকে টেনে নিয়ে ভেসে পড়ল জলে। তাড়াতাড়ি ডুবষ্ত গাড়িটার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। কারণ, ডুবে যাওয়া গাড়ির জন্য জলে যে-ঘূর্ণি তৈরি হবে তাতে ও তলিয়ে যেতে চায় না।

ছেলেটা হাঁকপাঁক করছিল। ওর কপালের একপাশ থেকে রক্ত বেরোছে। জিশান ওর চুলের মুঠি ধরে সাঁতরে চলল পামগাছের সারির দিকে।

ততক্ষণে লোকজন ওকে চিনতে পেরে গেছে। ওদের শহরের রিয়েলিটি শো-র হিরো জিশান। তাই ওরা উল্লাসে ফেটে পড়ল।

সব বোট তখন স্টার্টিং পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে গুনাজি ‘দাদা! দাদা! চলল আসুন! আর-একট! আর-এককটু!' বলে চেঁচচচ্ছে। ওর আশপাশে আর অनिক লোক शাত নাড়ি।

জিশানের মনে হল, ও যেন একটা কমপিটিশানে নাম দিয়েছে। সেখানে ও প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ফিনিশ লাইন বা ওইরকম কোনও কিছুর দিকে এগোচ্ছে।

হঠঠাৎই লেক কন্ট্রোল রুম থেকে ছ’জন লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের গায়ে কালো সিক্কের জ্যাকেট। তার বুকে-পিঠে রুপোলি অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা : ‘ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট।’ ওরা দুটো বোট নিয়ে চট করে পোঁছে গেল জিশানের দুপাশে। অভ্যত্ত কৌশলে ওদের দুজনকে একটা বোটে তুলে নিল। তারপর বোট দুটো ছুটে চলল পাড়ের দিকে।

জিশানের ভেজা জামা-প্যান্ট থেকে জল ঝরে পড়ছিল। ও ছেলেটাকে দেখছিল। একটু আগে ছটফট করছিল, কিন্তু এখন নিস্তেজ হয়ে চুপচাপ মেঝেতে শুয়ে রয়েছে। বড়-বড় শ্বাস ফেলে হাঁপাচ্ছে। চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে।

ছেলেটার বয়েস সতেরো কি আঠেরো। ওর থুতনিতে এক চিলতে দাড়ি। আর বাঁ-গালে একটা ছোট্ট লাল ফুল—লেসার ট্যাটু।

জিশান হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল ছেলেটার কাছে। ওর কপাল থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। ওকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পোঁছে দেওয়া দরকার।

208 www.banglabôelk pdf.bึ̆ogspot.com
ও ছেলেটার মুঢের ওপরে ঝুঁকে পড়ল। গালে আলতো করে দুটো চাপড় মারল : 'আমার কথা তুনত পাচ্ছ? এই যে, শুনতে পাচ্ছ?'

ছেলেটার চোখ এবার জিশানকে দেখতে পেল যেন। কেমন একটা যন্ত্রণার গোঙানি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

জিশান আবার আলতো চড় মারল গালে। জিগ্যেস করল, ‘তোমার নাম कী? বাড়ি কোথায়?'

ছেলেটটর ઠোঁট নড়ল, কিন্তু কোনও কथা বেরোল না। ওর মুখ থেকে ঝিম ধরানো পেপারমিন্টের গা্ধ বেরোচ্ছিন। বোধহয় নেশা-টেশা করেছে।

জিশান ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার চেচচিয়ে জিগ্যেস কর্, ‘তোমার নাম কী?’

ছেলেটা জড়ানো গলায় অতিকষ্টে উচ্চারণ করল, ‘সিমান—’’

গুনাজির আডুল সি থ্রু অটোমোবিলের কন্ট্রোল প্যানেলের ওপরে নড়াচড়া করছিল। জিশান পাশের সিটে বসে আড়চোেে ওর দক্ষতা লক্ষ করছিল। আর
 ठनिशि ऊनाজि।

একটু দুশ্চিন্তাও ভেসে বেড়াচ্ছিল জিশানের মনে। মাথা ঘুরিয়ে পিছনের সিটের দিকে একপলক তাকাল ও। নেশায় অচেতন সিমান ঔয়ে আছে।

ওকে পাড়ে নিয়ে আসার পর ‘ডিজাস্টার ম্যানেজনেন্ট’ গ্পপের লোকেরা ওর তদারকি করেছে। ওর ভেজা জামাকাপড় পালটে দেওয়া হয়েছে। ইমার্জেপ্সি কেয়ার ইউনিট থেকে চিফ মেডিক এসেছেন, সিমানের ট্রিটমেন্ট করেছেন, ওকে একটা ইনজেকশানও দিয়েছেন-কিন্তু সিমনকে জাগানো যায়নি। অবশ্য ইনজেকশানটা ঘুমপাড়ানোর না নেশা থেকে জাগানোর সেটা জিশান জানে না।
‘লেক কন্ট্রোল রুম’-এর কর্মীরা ব্যাপারটা পিস ফের্স্সের লোকাল ইউনিটে জানিয়েছে। তারপর যখন ওরা বলল যে, ছেলেটির আইডেনৃটিটি পাওয়া না গেলে ওকে কয়েকদিন পিস ফোর্সের হেফাজতে থাকতে হতে পারে, তখন জিশান আপত্তি করেছে। এবং ছেলেটির পরিচয় রেঁঁার জন্য ওর ভেজা জামাপ্যান্টের পকেট হাতড়ে দেখার অনুমতি চেয়েছে।

জিশান এখন সকলের কাছে সুপারহিরো। তাই ওর কথায় ‘লেক কন্ট্রোল রুম’-এর অফিসাররা রাজি হয়ে গেল। জিশান ঝুঁকে পড়ে সিমানের ডেজা জামাকাপড়ের নানান পকেটে তম্নাশি ওরু করল।

একটু পরেই একটা মাগনেটিক কার্ড পাওয়া গেল ওর পকেট থেকে।

ততে লেখা : ‘সিমান বিশ্পাস। বাবা রঙ্গপ্রকাশ। মা পর্ণমালা। বাড়ির স্থননাক্ক: জে—সেভেনটিন কমা ফরটি সিক্স। এ ছড়া রয়েছে ইমর্জেসি কনট্যাক্ট কোড। অফিসারদদর অনুমতি নিয়ে নেশায় অচল সিমানকে সি থ্রু অটোমোবিলের পিছনের সিটে তুলে নিয়েছে জিশান। তারপর ও আর ওনাজি সামনের সিটে বসেছে। এবং গাড়ি ছুট্য়ে দিয়েছে।

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন থেকে গুনাজি সিমানের ইমার্জেন্ কনট্যাক্ট কোডে ডায়াল করেছে।

ওপাশে কেউ কথা বলতেই জিশানের হাতে ফোন তুলে দিয়েছে গুনাজি। বলেছে, ‘দাদা, আপনি কথা বলুন—।'
'शালো, জিশান বলছি-জিশান পালচৌধুরী...।'
‘আমি ডক্টুর রহ্গপ্রকাশ বিশ্ধাস বলছি...।' কপ্ধস্বর মসৃণ এবং স্থির রাখতে চেয়েছিলেন, কিক্তু সেটা পুরোপুরি হল না। শব্দগুলোর উচ্চারণে আঁকাবাঁকা ঢেউ থেলে গেল।

এই সেই জিশান! যার সাইকোজিক্যাল প্রেফাইলিং নিয়ে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্ট, সময় কাটিত্যেছেন রর্গ্রকাশ!

গাঁ, নিশ্চয়ই সেই জিশান! কারণ, নিউ সিট্তিত জিশান পালচৌধুরী একজनই।

জিশীন র্রবার \& बে পীরে সিমানির অ্যাক্Aিডেন্টের ব্যাপারটা খুলে বলল। বলল বে, দুশ্চিষ্তা করার কিছু নেই। ‘লেক কন্ট্রোল রুম’-এ সিমানের যथাসাধ্য ক্রিটম্মেট্ট করা হয়েছে। এখন ও জিশানের সি থ্রু অটোমোবিলে তয়ে রয়েছেবিশ্রাম নিচ্ছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জিশান ওকে নিয়ে রঙ্গপ্রকশের বাড়িতে পৌঁছে যাবে।

রжপ্রকাশের মধ্যে মিশ্র অনুভৃতি কাজ করতে লাগল। মনে হল, হঠাৎই একজন সেলিভ্রিটি টিভির পরদা থেকে বেরিয়ে সরাসরি পা রেথেছে রজপ্রকাশের ঘরে।

রঙপ্রকাশ কেমন একটা অনীক ঘোরের মধ্যে জিশানকে বারবার ধন্যবাদ জানালেন। তারপর বললেন, ‘আপনি আসুন। আমরা আপনার আসার জন্যে ওয়েট করাছি-।

এক্জিট বোতাম টিপে ফোন রিসেট করল জিশান। ফোনটা গাড়ির সিটে রেথে দিল। জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর সিমনের দিকে একবার দেখল। ঘুমোচ্ছে।

গাড়ি চালাতে-চালাতে গুনাজি বলল, দাদা, আপনাকে এ-শহরের বহ্ লোক চেনে। ভালোও বাসে।’

সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জিশান আনমনাভাবে বলল, ছঁঁ’

গাড়ির ড্যাশবোর্ডের প্যানেলে রঙিন নেভিগেশান ম্যাপ। সেখানে উজ্জ্, লাল রেখায় সিমানের বাড়ির স্থানাঙ্ক প্পৗঁছেনোর পথ आঁকা রয়েছে। তুনাজি জানাল, সেখানে প্পাঁছতে মোটামুটি ঘণ্টাখানেক লাগবে।

এথন প্রায় সাড়ে পাচটা বাজে। সূর্য হেলে পড়েেে। জিশানের মনে হন, ঠিক এই সূর্যuই একইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে ওন্ড সিট্তেতে।

একটা দীর্ঘশ্পাস বেরিয়ে এল জিশানের বুক থেকে।
একটু আগে অল্প থিদে পাচ্ছিল। এখন সেই থিদের বোধটা বড্ড জোরালো হয়ে উঠেছে। গুনাজিকে সে-কথাই বলল জিশান। তখন গুনাজি বলল, দাদা, আমারও একই অবস্থ।। আমকে পাচটট মিনিট টৗইম দিন, একটা ফুড মলে গাড়ি লাগাচ্ছি-।'

পঁচ মিনিট নয়—তার কম সময়েই একটা অড্রুত চেহারার ফুড মলের পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড় করাল গুনাজি।

ফুড মলটা একটা গাছের মতো শাখা-প্রশাখা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। স্টেইনলেস স্টিল আর কাচ দিয়ে তৈরি। তার ওপর রঙিন আলোর আভা এক অলৌকিক মায়া তৈরি করেছে। ছাই রঙের আকাশের পটভূমিতে এক বিমূর্ত চেহোরার আলোকবৃক্ষ।
 নীল টুপিটা মাথায় দিয়ে নিল।

গাড়ির পিছনের দরজা খুলে সিমানের ওপরে ঝুঁকে পড়ল জিশান। ওর কপালে হাত বুলিয়ে তাপ নিল। নাঃ, জ্রর-টর কিছু নেইই।

গুনাজির দিকে তাকাল জিশান : 'আমাদের বেশি দেরি করলে চলবে না। সিমানকে জলদি বাড়িতে প্পৗঁছতে হবে—।

সায় দিয়ে ঘাড় নাড়ল ুনাজি।
'ওর জন্যে একটা হেল্থ ড্রিংক বা ওই টইইপের কিছু নিয়ে নিয়ো। যদি ঘুম থেকে উঠে কিছু থেতে টেতে চায়...’’
‘এক লিটরের একটা সফট এনার্জি প্যাক নিয়ে নেব, দাদা।'
ফুড মলের যে-রেস্তোরাঁটায় গিয়ে ওরা ঢুকল সেটার নাম ‘হেভেন্স কিচেন।' রেস্তরাঁর বিশাল বড় প্লেট টিভিতে তখন জিশানের পিট ফাইট দেখানো হচ্ছে। घাম-চকচকে শরীর নিয়ে জিশান জাব্বার সন্গে লড়ছে।

জিশান একদ্মু অস্বস্তি পেল। মাথার দুপিটাকে টেনে কপালের ওপরে আরও খানিকটা নামিয়ে দিল।

গুনাজি চাপা গলায় বলল, ‘দাদা, আপনার ফাইট দেখাচ্ছে।’
‘ছঁ-।’ বলে একটা খালি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল জিশান। একটা

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। গুনাজিও বসে পড়ন ওর পাশে।
ম্বচ্ছ টেবিলে ফুটে ওঠা রঙিন ব্যকলাইটেড টাচস্ক্রিন মেনুর দিকে তাকাল গুনাজি। সেখানে হালকা স্ন্যাক্স আইটেনের ওপরে আডুল ছুঁয়ে অর্ডার দিন। রেশেরাঁটায় বেশ ভিড়। দু-তিনটে টেবিল ছাড়া সব টেবিলেই লোকজন রয়েছে। বেশিরভাগ খদ্দেরই পুরুষ, তবে কয়েকটা টেবিলে ফ্যামিলি চোখে পড়ছে।

প্রায় সকনেরই চোখ টিভির পরদার দিকে। লড়াই দেখতে-দেখতে অনেকে অনেকরকম মন্ত্যা করছে। কেউ উন্তেজিত়ভাবে জিশানকে সাপৌর্ট করছে, আর কেউ-বা জাব্বাকে। সব মিলিয়ে একটা চাপা গুজ্জন আর ইইচই।

জিশানের ভালো লাগছিল না। বারবার গাড়িতে রেথে আসা সিমানের কথা মনে পড়ছিল। কতক্ষণে ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সে-কথাই ভাবছিল।

আশপালের টেবিল থেকে টুকরো-לুকরো কথাবার্তা ছিটকে এসে ওর কানে पুকে পড়ছিল। হঠাৎই ও খনতত পেল পালের টেবিলে একজন বলছে, ‘এই নিয়মটা বড্ড ফালতু যে, নিউ সিটির কোনও সিটিজেন এইসব কম্পিটিশানে নাম দিতে পারবে না—।
 টিভির দিকে। ওদের সামনে তিনটে প্লেট আর তিনটে গ্নাস। গ্লাসে রভিন তরলসফ্ট্ এনার্জি ড্রিংক কিংবা হার্ড এনার্জি ড্রিংক হতে পারে।

তিনজনের চেহারা তিনরকম, কিস্তু বয়েস আর পোশাক অনেকটা একই রকমের।

একজনের মাথায় কদমছ゙ঁট চুল। গোঁফ কামানো। থুতনিতে একটু দাড়িসিমানের মতন। আর কানে চকচকে কোনও ধাতুর মাকড়ি। ছেলেটা বসে থাকলেও লম্বা বে, সেটা বোঝা যায়।

দ্বিতীয়জনের মাথায় লম্বা কোঁকড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। চোয়ালের দুপাশের হাড় উঁ̆। নাকটা থ্যাবড়ানো। নাকের নীচে সরু গোফ।

তৃতীয়জনের দুল ব্যাকব্রাশ করে आঁচড়ানো। কপালের ঠিক মাঝখান বরাবর চুলের এলাকা চোখা হয়ে নেমে এসেছে-ইংরেজিতে যাকে ‘উইডোজ পিক’ বলে। গাল ভাঙা। গালে ল্খোচা-ৰ্খোচ দাড়ি। ডানচোখের ডুরুর ওপরে একটা মাকড়ি ঝকবকক করছে।

ওদের দিক থেকে ভেসে আসা প্রথম কথার לুকরোটা জিশানের কৌতৃহল উসকে দিয্রেছিল। কারণ, ওর ধারণা ছিল নিউ সিটির কোনও মানুষ সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কোনও খেলায় নাম দিতে চায় না।

কোঁকড়া চুল তখন বলছ্, ’ফালতু মানে? একেবারে ন্যাকচৈতন নিয়ম। এটা সিন্ডিকেট বোঝে না যে, প্রইজ মানির কড়কড়ে রোকড়া সব ওন্ড সিটিতে টপকে যাচ্ছে!'

কদমছ゙ঁ पूল তখন বলল, 'ওই যে জিশান নামের ছেলেটা যে লড়ছে, ওকে পালিশ দেওয়া কি খুব একটা টাফ ব্যাপার? শালা ফালতু কিছু নোট এপার থেকে ওপারে চলে গেল। আর মাঝাখান থেকে জিশান বড়লোক হয়ে গেল—’'

কথাগুলো গুনাজির কনেেও যাচ্ছিল। ও জিশানের দিকে তাকাল। জিশান ইশারায় ওকে দুপচাপ থাকতে বলল। টুপিটা টেনে আরও খানিকটা সামনের দিকে নামাত চাইন।

ওদের খাবার টেবিলে এসে গিত্যেছিন। ও আর গুনজি মাথা নীচ করে খাওয়া শুরু করল।

पूল ব্যাক্বাশ করা ছেলেটা বলল, দাঁफ়া, কালই সিভ্ডিকেটে একটা রিট্ন অ্যাপিল করছি। তাত রিকোয়েস্ট করব, নিউ সিটির লোকজনও যেন সুপারগেম্স কর্পোরেশনের এই থ্রিলিং কমপিটিশনে নাম দিতে পারে—।
‘সিন্ডিকেট?’ ব্যক্গের সুরে প্রশ্মট করে কদমছাঁট ঠোট বেঁকিয়ে
 বাইরের লোকজন এসে সব মালকড়ি নিয়ে কেটে পড়ছে এ-বাপারটা আমার হেভি গায়ে লাগছে।

কোকড়ানো চুল বেশ কিছুক্ষণ ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল। ওর নজর লক্ষ্য করে সেদিকে তাকাল জিশান।

কয়েকটা টেবিল পরেই একটি ফ্যামিলির চারজন একটা টেবিলে খেতে বসেছে। তার মধ্যে একটি অল্পবয়েসি মেয়েও রয়েছে। বয়েস খুব বেশি হলে কুড়ি-একুশ। পরনে উজ্জূল হলদে স্নিভলেস টপ। আর কালো রঙের স্কিনটটইট বারমুডা স্ন্যাক্স। মাথার চুল বিচিত্র ভभ্পিতে উঁদ করে বাঁধা। টানা-টানা র্রপসী চোখ। কপালে লেসার হলোগ্রামের টিপ। গলায় গোলাপি পাথরের একটা মালা। মেয়েৈার সঙ্পে রয়েছে সষ্ভবত ওরা মা-বাবা আর ভাই। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল, হাসাহাসি করছিল।

কদমছ゙ँট চুল বাঁকা হাসি হেসে কোকড়া চুলের পিঠে একটা থাঞ্ৰড় কयाল।

ব্যাকব্রাশ চুল মজা করে বলল, ‘কী সার্ভে করছেন, স্যার?’
কোঁকড়ানো চুল ছেলেটা বন্ধুদের দিকে ফিরে চোখ টিপল : ‘গ্রেট স্টাফ। এখন ওর জিয়োগ্রাফি সার্ভে করছি। হিস্ট্রি পরে জনার চেষ্টা করব। আর, বস,

হিস্ট্রির পর আসবে আর্কিওলজি-।
কথাটা শেষ হতে না হতেই তিনজনে এমন নোংরা ভঙ্গিতে হাসল যে, কথার নোংরা ইঙ্গিতগুলো জিশানের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। ওর গা ঘিনঘিন করে উঠল। সেইসঙ্গে রাগও হল।

গুনাজি জিশানকে লক্ষ করছিল। জিশানের মনের অবস্থাটা বুঝতেও পারছিল। তাই ও টেবিলের ওপরে হাত বাড়িয়ে জিশানের বাঁ-হাতের পাতার ওপরে রাখল, চাপ দিল। তারপর চাপা গলায় বলল, ‘দাদা, প্লিজ-। এখানকার বেশিরভাগ ছেলেছোকরাই এই টাইপের...।’

ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।
পাশের টেবিলের তিনটে ছেলেই নিজেদের চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে সরাসরি মেয়েটার দিকে মুখ করে বসল এবং একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে লোভী কুকুরের মতো চেয়ে রইল। শুধু ওদের জিভগুলোই যা বাইরে বেরিয়ে লকলক করছিল ना।

গুনাজি বলল, ‘দাদা, চলুন, তাড়াতাড়ি খেয়ে আমরা চটপট বেরিয়ে যাই—।

জিশান ‘্ঁঁ’ শব্দ করে খাওয়ায় মন দিল। কিন্তু মাঝে-মাঝেই ওর নজর ছেলে তিনটের অসভ্যতার দিকে চলে যাচ্ছিল্ল্।
 তিনজনের আর মন ছিল না।

মেয়েটিকেও লক্ষ করছিল জিশান। ও টিভির পরদার দিকে তাকাচ্ছিল, বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল, আর কখনও-কখনও অসভ্য ছেলে তিনটের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হচ্ছিল, অস্বস্তি পাচ্ছিল।

রেস্তরাঁর অন্যান্য খদ্দের ছেলে তিনটের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। কিন্তু শুধু দেখছিলই—কিছু করছিল না।

মেয়েটি ওর মা-বাবাকে বোধহয় কিছু বলল। ওঁরা ছেলে তিনটের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন আচমকই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

টেবিলে ওঁদের আধখাওয়া প্লেট পড়ে রইল। ওঁরা ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তরাঁর দরজার দিকে এগোলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে ছেলে তিনটেও উঠে দাঁড়াল।
এখন বোঝা গেল, কদমছাঁট চুল ছেলেটা শুধু যে মাথায় লম্বা তা নয়, চওড়াতেও বেশ মানানসই। ওর চোখ দুটো যেন কোটরে বসানো চকচকে মার্বেল—সবসময় এদিক-ওদিক নড়ছে।

ছেলেটটার পরনে মেটালিক জিন্স। গায়ে একটা প্রিন্টেড পোলো নেক টি-শার্ট।

## य>0 www.banglabooferpadf.tbiogspot.com

ওর দু-বন্ধুর টি-শার্টও একই ডিজাইনের—ওধ্ধু রo-টা আলাদ।
ছেলে তিনটে নির্লজ্জ বেপরোয়াভাবে মেয়েটার দিকে বাজে ইশার্গা করছিল। আর বেশ তাড়াহ্হড়ো করে রেস্তুরাঁর দরজার দিকে এগোচ্ছিল।

জিশান খাওয়া থামিয়ে দিল। ছেলে তিনটের অভিসপ্ধি বুঝতে চাইল।
কিন্তু তার জন্য জিশানকে বেশি মাথা ঘামাতে হল না, কারণ, তার আগেই দক্ষ নাচিত্যের তৎপরতায় কদমছাঁট চুল রেস্তরাঁর দরজার কাছে প্পাঁছে গেছে এবং মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়িয়েছে।

আর ওর বাকি দুই সঙ্গী তথন মেয়েটির বাবা-মা-ভাইয়ের ঠিক পিছনে পাহারাদারের মরো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

জিশান টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু গুনাজি ওর হাত চেপে ধরল। বলল, ‘াদা, আপনি ঝামেলায় জড়াবেন না। তা হনে মার্শাল খেপে যাবেন। এখানকার এটাই দস্তুর। সবাই চুপচাপ দেতে যায়, এড়িয়ে যায়। যা করার পিস ফের্স্সের গার্ডরা করে। মেয়েটির সঙ্গে যারা আছে- মনে, ওর বাবামা—ওরা পিস ফোর্সের লোকাল ইউনিটে ফোন করে দিলেই গার্ডরা চলে आসবে... ${ }^{\prime}$

জিশান গুনাজির দিকে অবাক চোখে তাকাল। জিগ্যেস করল, ‘ততক্ষণ
 চলুন, আমরা বরং চলে যাই—’’

এ-কথায় জিশান कী ভাবল কে জানে! ও উঠে দাঁড়াল।
টেবিলের একপাশে কার্ড সোয়াইপ করার স্লট ছিল। সেই স্লটে জিশানের স্মার্ট কার্ডটা সোয়াইপ করে খাওয়ার বিল মেটাল গুনাজি। তারপর সিমানের জন্য নেওয়া সফ্ট এনার্জি প্যাকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ওরা দুজনে তাড়াতাড়ি রেস্ঠরাঁর দরজার দিকে পা বাড়াল।
কদমৃঁঁট চুল তখন মেয়েটিকে বলছে, 'তুমি খুব সুন্দর। আর আমি সুন্দর জিনিস পছন্দ করি—’

মেয়েটি লোফার ছেলেটাকে পাশ কাটিয়ে বেরোতে গেল, কিন্তু ছেলেটা দ্রুত পালে সরে গিক্রে ওর পথ আগলে দিল।

রেস্তরাঁর অনেকেই এখন টিভির পরদা থেকে চোখ সরিয়ে জ্যান্ত 'নাটক’ দেখছে।

জিশান লক্ষ করল, মেয়েটির বাবা কিংবা মা সাহয্য চেয়ে চারপাশের লোকজনের দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। হয়তো ওঁরা জানেন, এইভাবে সাহায্য চেয়ে কেেনও লাভ নেই।

মেয়েটি এবার বলল, 'সরুন। আমাকে যেতে দিন—’’

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## य2 www．banglabiofekpedf．tizogspot．com

‘তোমার সঙ্গে আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে．．．।’
＇আমার একদুও ইচ্ছে করছে না।
‘তাই？’ বলে জেরে হেসে উঠল অসভ্য কদমছ゙ঁ।
জিশান আর ওুনজি ততক্ষণে রেস্তরাঁর দরজার কাছে পৌঁছে গেছে। গুনাজি কী এক অড্ভুত কারণে জিশানের কবজি মুঠো করে ধরে রেখেছিল－ যেমন করে ছোট বাচ্চা বাবার হাত ব্বেরে রাথে। ওর ভয় হচ্ছিল，এই বুঝি জিশান গভ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ে।

জিশান কদমছ゙টটের দিকে তাকিয়ে বলল，‘্লিজ，একাু সরুন－আমরা বাইরে বেরোব।＇

গুনাজির বুকের ভেতরে তখন অকারণেই ঢিপঢিপ শব্দ হচ্ছিল।
কদমছ゙ঁট ছেলেটা তখনও মেয্যেটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জিশানের কথায় ওর দিকে না তাকিত্যেই ছেলেটা সামান্য সরে দাঁড়াল। জিশান আর গুনাজিকে পথ করে দিল। গুনাজি আগে，পিছনে জিশান। ওুাজির হাতে জিশানের হাত।

জিশান হঠাৎই থমকে দাঁড়াল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল，আআসুন－ আপনারাও আসুন．．．।＇

 না।। आমি ওর সঙ্গে কথা বলছি—।
‘কিন্তু ও তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে না।’
জিশান এ－কথা বলামাত্রই গুনাজি ওর কবজিতে টান মারল। উত্তরে জিশান একটা ছোট মোচড়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। সঙ্গে－সঙ্গে গুনাজির বুকের ভেতরে বিপদের পাগলাঘন্টি বাজতে তরু করল।

কদ্মছাটটের দুজন সঙ্গী এখন জিশানের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে।
জিশান ওদের দিকে একপলক দেখল। ওদের মুখে নেশাগ্রস্ত জঙ্গীভাব ফুটে উঠেছে।

এতক্ষণ পর কদমছাঁট চুলের মালিক জিশানের দিকে ভালো করে তাকাল। ঘেন্নায় নাক－মুখ কুঁচকে বলল，＇তুমি বেখানে যাচ্ছ যাও। নইইলে প্রবলেম আছে।’ ＇কীসের প্রবলেম？＇
এ－কথার উত্তর না দিয়ে ছেলেটা দরজার পাশের ধাতব দেওয়ালে প্রচণ জোরে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

দেওয়ালের পাত তুবড়ে গেল। দেওয়ালের সঙ্গে ঘুষির সংঘর্ষের শক্তি দরজার «্সেমের দিকে প্রবাহিত হয়ে দরজার কাচ ঝনবন শব্রে ভেঙে পড়ল।

টিভির পরদার দিকে যারা তাকিয়েছিল তাদের নজর ঘুরে গেল দরজার

দিকে। চাপা গঞ্জন শুরু হল। একজন মহিলার ভয্রের চিৎকার শোনা গেল। জিশান দেখল, ওর সামনে দাঁড়ানো সুন্দরী মেয়েটির মুখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কিন্তু ওর মা-বাবা আর ভাইয়ের চোথে আশাক্কা ছায়া ফেলেছে।

জিশান কদমছাঁটের চোখের দিকে তাকাল। মীরে--ীীরে বলল, ‘‘েওয়ানরা খুব ভালো। কখনও পালটা ঘুসি মারে না...। কথাটা বলেই জিশান মাথা থেকে নীল ঢুপিটা খুলে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দिन।

কদমছঁঁট চুল অসভ্য ছেলেটা সঙ্গে-সঙ্গে জিশানকে চিনতে পারল। ওর চকচকে মার্বেল-চোখ ছিটকে গেল ঢিভির পরদার দিকে। তারপর জিশানের দিকে। হাঁ, টিভির সুপারহিরোটই ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছেলেটার মনোযোগ এবার মেয়েটির দিক থেকে সরে গেল—পুরোপুরি চলে এল জিশানের দিকে। এ কী অপৃর্ব সুযোগ ওর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে! বরাবর যা নিয়ে ওর সিড্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তার সরাসরি সমাধান
 শব্দ করে তাচ্ছিল্যের হাসি।

জিশান ছেলেটার হাসির অর্থ একাট-একটু বুঝ্ত পারছিল। ও মেঝেেে পড়ে থাকা কচের לুকরোগুলোর দিকে তাকাল। রেস্তরাঁর ভেতরে যদি হাতাহাতি শুরু হর্যে যায় তা হলে বাড়াবাড়িরকম্মের ভাঙ্হুর হতে পারে। তার চেয়ে রেস্তোঁর দরজার বাইরে চলে যাওয়া ভলো।

সুন্দরী মেয়েটি জিশানের গাতের নাগালের মধ্যে ছিল। জিশান আচমকা ছোঁ মেরে ওর হাত খামঢে ধরল। তারপর এক ঝটকায় ওকে টেনে নিল দরজার বইইরে। একইসঙ্গে চাপা গলায় বলল, ‘শিগগিরই এখান থেকে চলে যাও-।'

মেয়েটির মুঢে তখন বিহ্নল ভাব। সেটা চট করে কাটিয়ে উঠে ও ইশারায় মা-বাবাকে বাইরে আসতে বলল।

প্রতিক্রিয়া দেখাতে কদমছ゙ঁট দুল কয়েক পলক সময় নিল। তারপর জিশান যা ভেবেছিল ও ঠিক তাই করল। সরাসরি তেড়ে এল জিশানের দিকে। পিছনে ওর দুই শাগরেদ।

রেস্তুরাঁর বাইরে একটা বড়সড় লাউঞ্জ। লাউঞ্জে ব্যাক লাইটেড গ্রাফিক গ্নাসের সিলিং আর চারপাশে অনেক বড়-বড় টোকো ক্রিস্টালের পিলার।

পিলারের গায়ে ফুটে উঠছে চলমান রঙিন ছবি－নানান জিনিসের রঙিন অডিয়োভিশ্য়াল বিজ্ঞাপন। সেই রঙিন আলো জিশানের গা়ে পড়ছে। ওর মুখটা অড্রুত দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে，জিশান নিজ্জে একটা রঙিন বিজ্ঞাপন।

লাউঞ্জে যারা চলাফেরা করছিল তাদের দু－চারজন জিশানকে চিনতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়ন। এই ছেনেটা সত্যিই কিল গেমে কোয়ালিফাই করা，ঢিভিতে দেখা，জিশান পাল টৌধুরী কি না তাই নিয়ে নিজেেের মধ্যে তর্ক জুড়ে দিল। গুনাজি কখন যেন আবার জিশানের হাত ধরে ফেনেছিল，আলজো করে টান মারছিল। আসন্ন মারপিটের ব্যাপারটাকে ও এড়াতে চইছিল। কিন্তু এড়ানো যে যাবে না মনে－মনে সেটাও বুঝতে পারছিল।

জিশানের তিন－চার হাতের মধ্যে এসে কদমছাঁট থামল। জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে－চিবিয়ে বলল，‘কী সুপারহিরো，লাইভ টেলিকাস্ট ছাড়া রিয়েলিটি শো হবে নাকি？

ওর শাগরেদ দুজন একে অপরের দিকে চোখ ঠারল। जারপর হেসে চেচচচিয়ে বলল，＇জিশান，তুমি জিতলে আমরা চাদা তুলে তোমাকে প্রইজমানি দেব। মইরি－কসম খেয়ে বলছি．．．। নিজের টুট্তিতে আডুল ছোয়াল একজন।
‘জিশান’ নামটা শোনামাত্রই গু্জন উঠল লাউঞ্জে। জিশানদের ঘিরে

 করছিল। ওর মুখে উদ্বেগের ছোয়া।

কদমছ゙ঁট ছেলেটা গাতের চার আডুল নেড়ে জিশানকে কাছে আসার জন্য ওসকাচ্ছিল আর বলছিল，‘এসো，সুপারহিরো－দাদাগিরির প্রইজমানি নেবে এসো। ওঃ，কাম অন—’’

ওর শাগরেদ দুজনের একজন—বোধহয় কোঁকড়া চুল—হি刀্র গলায় কদমছ゙ँটকে লক্ষ করে বলল，＇চামোন，মালটাকে গিলে খেয়ে নে！’

জিশান বুঝরে পারছিল，মেয়েটির ব্যাপারে হঠাৎ এভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়াটা ওর ঠিক হয়নি। কদমছ゙ঁট চুল ছেলেটিকে ওর ঠাডা মাথায় বোঝানো উচিত ছিল। কারণ，অসভ্যতকে অ－সভ্যতা দিয়ে রুখলে বাপাপারটা শেষ হতে চায় না। নিউক্লিয়ার ঢেইন রিয়্যাকশনের মতো তার তেজস্ক্রিয় বিকিরণ চলতেই থাকে। যেমন এখন চলছে।

তাই জিশান আচমকা গুাজির মুঠো থেকে নিজের হাতটা টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে জোড়হাত করে ফেলল। চামেনকে অনুরোধের গলায় বলল，＇ভাই， কিছু মনে করবেন না। আমাদের কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে—’’
＇তাই？＇চামমান ন্যাকা গলায় জিগ্যেস করল। তারপর ওরা তিনজনেই বস্তির নোংরা ভাষয় গালাগাল ছুড়ে দিল।

জিশান তাও হাল ছাড়ল না। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাতজোড় করে ওদের শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল।

উত্তরে সমবেত জনতকে রীতিমতো চমকে দিয়ে চামোন জিশনের রগে সপাটে এক ঘুসি বসিয়ে দিল।

পটকা ফাটার শব্দ হল। জিশানের বাঁ-কানে তালা লেগে গেল পলকে। একইসঙ্গে ও কাচ-চকচকে মার্বেলের মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

ও যাতে গায়ের ওপরে এসে না পড়ে সেজন্য ভিড়ের বৃত্ত চট করে সরে গেল পিছনে। চিৎকারের একটা ঢেউ উঠল লাউঞ্জে।

গুনাজি আর দেরি করল না। পরেট থেকে একটা স্যাটেলাইট ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল। পিস ফের্সের লোকাল ইউনিটে এখনই খবর দেওয়া দরকার।

জিশান ঘুসির আঘাতটা সামলে নিতে পারল। মাসের পর মাস ধরে নিউ সিটিতে ট্রেনিং নিয়ে ও লড়াই করতে যেমন শিখ্ছে, সহ্য করতেও তেমন শিদেছে। ওর রোজকার ওয়ার্কআউট রুটিনে এক কণাও ছন্দপতন হয়নি। তাই মেঝেতে দুবার পাক খেয়েই ওর শরীরটা আবার উচে দাঁড়াতে পেরেছে।

চামোন তখন পরের আক্রমণের জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

 করছে।

জিশান শাষ্ত গলায় চামোনকে বলল, 'ভাই, আমি মারপিট করতে চাই না। মারপিট আমার ভলো লাগে না। প্লিজ, কুল ডাউন। আমি...।'

উত্তরে চামোন ওর শরীরটা একপাশে হেলিয়ে জিশানকে লক্ষ করে জোরালো লাথি চালাল। জিশান কথা বলতে-বলতেই দু-ছাত একজোট করে অনায়াসে লাথিটা রুঁখে দিল।
‘প্লিজ, আমার কথা শনুন...' জিশান বলতত লাগল, 'মাথা ঠান্ডা করুন। আপনারা রেস্তরাঁয় ফিরে যান। হাতজোড় করে বলছি, মারপিট আমি ভালোবাসি না। শ্ধু ওই মেয়েটিকে আপনারা ডিসটার্ব করছিলেন বলে...।'

জিশানের কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা লাথি এসে পড়ল ওর শরীরে। যেহেতু লাথিট এসেছে ওর পিছন থেকে তাই জিশান এটা রুথতে পারল না। আবার ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

লাথিট মেরেছিল চামোনের ব্যাকর্রাশ চুল বন্ধু। সে কখন যেন জিশানের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধুকে শাসিয়ে উঠেছে চামোন ঃ ‘অ্যাই, কিছু করবি না। আমি একা। আমি একা—’

১> www.banglaboofk pdf.tifogspot.com
এ-কথায় ব্যাকব্রাশ চুল দমে গেল। ఆর মুখটা কাঁমুমাহ হয়ে গেল। কথা বলতে-বলতত জিশানের হাত ধরল চামোন। ওকে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল। ওর দিকে তাক্ক্যে ন্যাকবোকা ভঙ্গিতে হাসল। বলল, 'আমি এক। তোমাকে আমি একা খতম করব, সুপারহিরো।

গুনাজির খুব খারাপ লাগছিল। প্রথমটায় ওর মনে হয়েছিল জিশান বুবি নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটা মোকাবিলায় নেমে পড়তে চইছে। কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো দেখে ওর উলটোটই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, না, জিশান মারপিট ভালোবাসে না।

জিশান খুব সময়মতো নিজেকে সামলে নিয়েছিল। এটা ঠিকই যে, চমোনের অসভ্য আচরণ ওর মেজাজ খারাপ করে দিয়েছিল। ఆ ভেবেছিল, চামোনদের উচিত শিক্ষ দেবে। কিন্তু সেই মৃহূর্ত্ই ওর মনে হয়েছে, সেটা ঠিক হবে না। হিংসা আর প্রতিহিংসা মনুষকে কখনও এগিয়ে দেয় না। তা ছাড়া ওর কন্ট্রোল্ড ফ্রিডমের কथা মনে পড়েছিল। হয়তো এখানে গন্ডগোল করলে কাল থেকে ওর গুনাজির সঙ্গে বেরোনো বন্ধ হয়ে যাবে। জিপিসি-র গেস্টহাউসেই দমবন্ধ করে মুখ ऊঁজে থাকতে হবে। তারপর দেখতত-দেখতে এসে যাবে ২ সেপ্টেম্বর, রবিবার। জিশানের বাঁচা-মরার দিন। কিল গেম। হয়তো
 अর্কनশানককে ন্যা।

জ়িশান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অল্প-অল্প টলছিল, আর এসব কথা ভাবছিল।
চামোন জিশানের গালে অসম্ভব জোরালো একটা থাপ্রড় কষিয়ে দিল। জিশানের মুডুটা এক ঝটটকায় ষাট ডিগ্রি ঘুরে গেল। গাল ফেটে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

জিশান যন্ত্রণার চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু সেটা একটা ছোট্ট টুকরো মাত্র। চিৎকারের বাকিটা ও দাঁতত-দাঁত চেপে সহ করছিল। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় আক্ষেপের শব্দ বেরিয়ে এল জিশানদের ঘিরে থাকা দর্শকদের ঠোট চিরে।

জিশান চোখে યাপসা দেখছিল। চারপাশের বিষ্ঞাপনের মিউজিক আর দর্শকদ্দর অঞ্জন কেমন জড়িয়ে জট পাকিত্যে হিজিবিজি শোনাচ্ছিল। ও কেমন করে চামোনদের বোঝাব্, নিউ সিটির লড়াইয়ে ও সাধ করে আসেনি! ওকে ফাঁদে ফেলে এখানে আনা হয়েছে।

জিশানের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পিস ফোর্সের মার্শাল শ্রীধর পাট্টার ওপরে। চামোনদের এইরকম বখ্যে যাওয়া আচরণের জন্য ওই শয়তান লোকটটই দায়ী। ওই লোকটাই নিউ সিটির মানুভের কাছে ভ্যালু আর প্রাইস-এই দুটো শদ্দের মানে একাকার করে দিয়েছে।

জিশানের রাগটা আবার উথলে উঠছিন। ও গুনাজির দিকে একবার তাকাল। তাকানোর ভঙ্গিতে বোধহয় অননুঃতি চাওয়ার একটা নীরব আরজি ছিল। সেই করুণ রক্তাক্ত মুখ্রে দিকে তাকিয়ে গুনাজির চোথে জল এসে গেল। ও কান্না চেপে ভাঙা গলায় বলল, ‘দাদা, আর মার খেয়ো না। আমি পিস ফোর্সে থবর দিত্যেছি। কিন্তু ওরা আসতে-আসতে তুমি...তুমি...লেষ হয়ে যাবে...। কथা শেষ করতে-করতে কেঁদে ফেলল গুনাজি। আর ঠিক তখনই চামোনের পা গুনাজির পেট লক্ষ করে ধেয়ে এল।

সংঘর্ষের ভোঁতা শব্দ হল়। একইসঙ্গে গুনাজির মুখ দিয়ে একটা বীভৎস ‘ওঁক’ শব্দ বেরিয়ে এল। গুনাজির হাত থেকে সিমনের জন্য কেনা এনার্জি ড্রিংকের প্যাকটা ছিটকে পড়ল। ওর রোগা লন্ধা শরীরটা ভাঁজ হয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে পড়ল দর্শকদদর ঘড়ে। একটা মেয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

জিশান যেন একটা শক খেল। ঝাপসা নজর স্পষ্ট হয়ে গেল পলকে। চটপট হাত-পা নেড়ে ও শরীরের ভেতরের একটা অদৃশ্য সুইচ অন করে দিল। শক্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের সুইচ।

জিশান সবে চামেনের দিকে এক পা এগিয়েছে, সঙ্গে-সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। ফুড মলের দুজন সিকিওরিটি গার্ড গোলমালের খবর পেয়ে



গার্ড দুজন চিৎকার করতে-করতে আসছিল আর মাঝে মাঝে ওয়াকিটকিতে কथা বলছিল।

ওরা ভিড়ের বৃত্ত ঠেলে-ঠেলে ভেতরে ঢুকে এল। চামোন আর জিশানকে লক্ষ করে একজন বলল, 'অ্যাই একুুনি হজ্জুতি বন্ধ করো। যাও, বাইরে যাও!'

দ্বিতীয় গার্ড বলল, ‘এখানে এসব লাফড়া চলবে না। এক্ষুনি পিস ফোর্সের কাছে হাডডওভার করে দেব...।’

এরপর যা হল সেটা জিশান কল্পনাও করেনি।
ঢামোন গার্ড দুজনের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছিল। কিন্তু ওর দুজন দোস্ত সবাইকে চমকে দিয়ে গার্ড দুজনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কোকড়ানো লম্বা চুল ছেলেটা সাপের ছোবলের কিপ্রতায় একজন গার্ডের ওয়াকিটকি কেড়ে নিয়ে সেটা প্রবল শক্তিতে সেই গার্ডের ব্রপ্মতালুতে বসিয়ে দিল। গার্ডটা একটা ‘আঁক’ শব্দ করে স্রেফ খসে পড়ল মেঝেতে।

ভুরুতে মাকড়িওয়ালা ব্যাকব্রাশ চুল সরাসরি দ্বিতীয় গার্ডটার গলা টিপে ধরল দু-হাত। এবং নিজের মাথা দিয়ে সাংঘাতিক এক ছুঁ মারল।

গার্ডটার মাথা কাত হয়ে গেল একপাশে। তখন ব্যাকব্রাশ চুল ওকে এমন

হেলাফেলা করে ছুড়ে দিল যেন একটা ন্যাকড়ার পুতুল—তাও আবার জলে ডেজ।

গার্ড দুজনকে ডিঅ্যাক্টিভেট করার ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল বে, জমায়েত পাবলিক ইইচই চিৎকার করারও সুযোগ পেল না। মুহূর্ত্রের জন্য সবাই কেমন থম মেরে গেল।

কদমছাঁট চুল হঠাৎই শব্দ করে হাততালি দিয়ে উঠল। আর একইসঙ্গে একজোড়া বন্ধুকে লক্ষ করে বলে উঠন, ‘শাবাশ! জিয়োঃ!’

উত্তরে ব্যাকব্রাশ দুল মাথা নেড়ে সিটি বাজাল তিনবার। তারপর গার্ড দুজনের নিথর দেহের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় নোংরা থিস্তি করে উঠল।

চামোন বক্সারদের মতো লাফাতে-লাফাতে জিশানের কাছে এগিয়ে এল। তারপর প্রচণ্ড এক ঘুসি মারার জন্য ডানহাতটা মুঠো করে পিছিয়ে নিয়ে এল।

গুনাজি আর থাকতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, দাদা, এবার মারে!! পালটা মারে!?

জিশান যেন হঠাৎই ঘুম থেকে জেগে উঠল। হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারল ওর গাঁধিগিরি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ গাঁধিগিরি প্রয়োগ করা যায় মানুষের ওপরেঅমানুষের ওপরে নয়। তা ছাড়া বে-ওুনাজি একটু আগে ওকে ‘ঝামেলায়’
 মরে!?

জিশানের তাজ্জব লাগল। দুনিয়া কী দ্রুতই না রং পালটায়।
সুতরাং জিশান ডানহাঁঁ ভাঁজ করে শৃন্যে লাফ দিল বাজপাথির মতো। সামনে হাত বাড়িয়ে দু-হাতের তালুতে বন্দি করল কদমছাঁটের মাথ। এবং হাঁটুর গাঁট দিয়ে ওর চিবুকের নীচে এক মরণ-আঘাত করল।

ব্যাপারঢা সেখানেই থামল না। ওর মুড্ু শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মেঝেরে চিৎ হয়ে আছড়ে পড়ল জিশান। সেই প্রবল টানে মাথায-মাথায় চোকঠুকি হন। শব্দ শুনে মনে হল এই বুঝি কারও•খুলিতে ফাটল ধরল।

জিশানের মুত্ে তখন ছूঁয়ে রয়েছে কদমছাঁটের মুখ। নাকে আসছে উৎকট ঘামের গন্ধ। জিশান যেন চিড়িয়াখানায় কোনও জন্তুর খাঁচায় ঢুকে পড়েছে হঠাৎ।

নিউ সিটি জিশানকে লড়াইয়ের এইসব কলাকৌশল শিথিয়েছে। শিথিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাই নিউ সিটির এই অসভ্য জানোয়ারটাকে নিউ সিটির শিক্ষ ফেরত দিচ্ছিল ও। এবং তারই শেষ দফা হিসেবে ও কদমঘাঁটের গালে ভয়ংকর এক কামড় বসাল। বাকরণণের বাইরে লড়াই।

এর ফলে যে-চিৎকারটা তৈরি হল তকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কসাইখানায় ছুরি যখন আগ--পিছু করে কোনও শুয়োরের গলা কাটে তখন সে

বোধহয় এরকম আর্তনাদই করে থাকে।
জিশান শরীরটাকে কয়েেক পাক গড়িয়ে ছিটকে সরে এল চামোনের কাছ থেকে। ও তখন গালে হাত চেপে কাটা পঁঠার মতো ছটফট করছে আর একইসঙ্গে পাগলের মতো চিৎকার করছে। ওর আঙ্ভুলের ফাঁক দিয়ে চুইয়েচুইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

পাবলিক এবার চিৎকারের ঢেউ তুলল। তাত উত্তেজনার সঙ্গে মিশে আছে ভয়ের ছেঁয়া। কেউ-কেউ ভয়ে সরে গেল অন্য কোথাও। কারা যেন কাদের নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। কেউ বা ব্সস্ততাবে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপছে।

জিশান উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ, মুখ, চোয়ালের রেখা এখন অন্যরকম লাগছে। জিভে নোনা স্বাদ। সত্তিই ও এখন কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

চামোনের দু-বন্ধু জিশানের প্রতিরোধের চেহো দেখে স্তষ্ভিত হয়ে গির্যেছিল। জিশানের ক্ষমত আর শক্তি ওরা এতক্ষণ আঁচ করতে পারেনি। কিন্তু এখন আঁচ করতে পারা সত্ত্তে বন্ধুর হেরে যাওয়ার অপমানের বদলা নিতে ওরা তিরবেগে ঝাঁপিয়ে এল জিশানের দিকে।

কিস্তু ওই পর্যত্তই।
ওরা বুলেটের মজন জিশান্নে দিকে অসছিল, কিক্ত ওদের রুখ্যে দিল পारीनिक।

কেঁাকড়াচুল আর ব্যাকব্রাশ এটা কল্পনাও করেনি। ওদের সঙ্গে পাবলিকের হুড়োহড়ি আর ধস্তাধস্তি শুরু হর্যে গেল। রেস্তোরাঁর সামনের লাউজ্জটা মুহূর্তে কুরুক্কের্রের চেহারা নিল।

জিশানের চোখ এবার গুনাজিকে খুঁজতে লাগল।
বেশিক্ষণ থুঁজত়ত হল না। বরং গুনাজিই ওকে খুঁজে নিল। জটলার ফঁকক দিয়ে আচমকা হাজির হল। তারপর জিশানের হাত ধরে টান মারল : ‘দাদা, শিগগির চলে এসো—’’

ওরা দুজনে প্রায় দৌড়তে ওরু করল।
অটো-এলিভেটরে করে নামার সময় জিশান বলল, ‘সিমানের এনার্জি প্যাক তো আর নেওয়া হল না...।'

গুনাজি ছঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘পথে কোথাও গাড়ি দাঁড় করিয়ে নিয়ে नেব।

জিশানের ভালো লাগছিল না। ওর গাল জ্ৰালা করছিল। ও মারপিট করতে চায়নি। ছলস্থুল বাধাতেও চায়নি। কিশ্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল! পার্কিং লটে এসে ওরা গাড়িতে উঠঠে বসল। জিশান তাকাল সিমানের দিকে। এখনও অযোরে ঘুম্মেচ্ছে।

## ১২০ www.banglabiôk palf.biogspot.com

গুনাজি গাড়িতে স্টার্ট দিতেই জিশান বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমদের অনেক দেরি হয়ে গেছে।'
'চিন্তা কেরো না, দাদা—একুনি প্পৗছে যাব।'
বাইরে সল্ধে নেমে গেছে। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলোয় আলো জৃলে গেছে। কখনও-কখনও চোেে পড়ছে বিজ্ঞাপনের রঙ্লিন নকশা। এই রাতটাকে দেখে বোঝার উপায় নেই নিউ সিটি হিংসা আর প্রতিহিংসার ব্যাবসা করে। জিশানের নিজের ওপরে ঘেন্না হল।
বেশ কিছুক্ষপ চুপচাপ থাকার পর ও অনেক্টা যেন আপনমনেই বলল, ‘বিশ্ধাস করো, আমি মারপিট করতে চাইনি...।’ নাকি কথাটা ও বলল মিনিকে?

সামনের রাস্তার দিকে চোখ রেথে গুনাজি বলল, জানি, দাদা। আমি মার্শালের অফিসে খবর পৌঁছে দিয়েছি। বলেছি, তোমকে ওই গুল্ডাগুলো টরচার করতে-করতে মেরেই ফেলত। বলেছি, তোমার কোনও দোষ নেই। দেখ্যে, মার্শাল তোমাকে কিছুই বলবে না—গ্যারান্টি।'

শেষ শব্দটা শুনে জিশানের হাসি পেয়ে গেল। কিন্তু হাসতে গিয়েই গালে টান পড়ল। গালের জ্বালাঢা বেড়ে গেল।

রঙ্গপ্রকাশের বাড়ি আর কতদূর? মনে-মনে ভাবল জিশান।

## NWVW, banglabookodirologspotaon

একটা আর্ক কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে ছিলেন শ্রীধর পাট্টা। ধনুকের মতো বাঁকনো এল. সি.ডি. পরদায় একটা লোকের নিরীছ মুখ। ফরসা। বেশ গোলগাল দেখতে। চোখগুলো ছোট-ছোট। গালে থুতনিতে খাপছাড়াভাবে হালকা দাড়ি।

মুখটা খুঁটিয়ে দেখে শ্রীধরের পছন্দ হল। দারুণ কনট্রাডিক্ক্শান। দেখে যা মনে হয় না লোকটা ঠিক তাই। লোকটার মুখে কেমন একটা নিষ্পাপ বাচ্চাবাচ্চা ভাব। অথচ লোকটা প্রথম সারির একজন হার্ডকোর ক্রিমিনাল। অপাশি কানোরিয়া। বয়েস প"য়ত্রিশ কি ছত্রিশ।

ওর यা বয়েস ওর খুনের সংখ্যাও প্রায় তাই। এ পর্যন্ত বত্রিশটা খুন করেছে অপাশি। তার মধ্যে তিনটে ফ্যামিলি আছে যাদের ও এক-এক খেপে খুন করে রক্তের হোলি থেলেছে। পরিভাষায় যাকে বলে মাসাকার।

প্রথম ফ্যামিলিতে চারজন ছিল। মাঝবয়েসি বাবা-মা। আর তাদের সদ্য তরুণ ছেলে আর মেয়ে। চপার হাতে আধঘণ্টার মধ্যে সেই চারজনকে ঘুমন্ত অবস্থায় খতম করেছিল অপাশি। ওদের ফ্যোট রক্কে তেসে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় ফ্যামিলিতে ছিল পাঁচজন। অল্পবয়েসি বাবা-মা, আর তাদের ছোট-

ছোট তিন সন্তান। দু-ছেলে, এক মেয়ে।
এই হত্যালীলায় অপাশি কানোরিয়ার অস্ত্র ছিল চপার আর শাবল। শাবলটা ও ওদের বাড়ির বাগানে খুঁজে পেয়েছিল।

তদד্ত করতে গিয়ে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল যে, বয়েসে সবচেয়ে ছোট আট বছরের মেয়েটাকে অপাশি সবার শেষে খুন করেছিল। ওকে তাড়া করে অপাশি ধরে ফেলে বাড়ির বাগানে। তারপর ওইটুকু বাচ্চা মেয়েকে জঘন্য হেনস্থা করে শাবল দিয়ে পিচিয়ে মেরেছিল।

তৃতীয় ফ্যামিলিতে সদ্স্যের সংখ্যা ছিল তিন। বাবা-মা আর বোলো বছরের একটি মেয়ে।

মাথায় থান ইটের বাড়ি মেরে অপাশি প্রথমে ওদের তিনজনকে অভ্ঞান করে দিয়েছিল। তারপর ইলেকট্রিকের তার দিয়ে কবে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলেছিল। সবশেষে ওদের গায়ে পৌ্রেল ঢেলে ওদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

এ ছাড়া নানান কারণে অপাশি প্রুুর খুচরো খুন করেছে। ক্রিকেট খেলায় বাউঙ্ডারি না মেরে খুচরো এক রান কি দু-রান নেওয়ার মতো। ওর খুন-খুন খেলায় বাউড্ডারি বলতত ওই তিনটে : চার, পাঁচ, আর তিন।

আর্ক কম্পিউটারের পরদায় অপাশি কানোরিয়ার হুলিয়া দেখছিলেন



অপাশি কানোরিয়া সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার সবই রয়েছে এই সফ্ট ফাইলে। আর সমস্ত বিবরণের পর রয়েছে ফোঢো-ফাইল। সেখানে অপাশির নানান ঢঙে তোলা অসংখ্য রঙিন ছবি রয়েছে। আর তার পরে, ওর জীবনীর শেষ অধ্যায় হিসেবে, রয়েছে ওর সাইকেেলজিক্যাল প্রোফাইল।

পরদার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শ্রীধর পাট্টা লেখাণুলো এক মনে পড়ছিলেন আর ছবিগুলো থুঁটিয়ে দেখছিলেন। একইসল্গে মনের মধ্যে খুশি ছটফটিয়ে উঠছিল। কিল গেমে জিশানের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য অপাশি কানোরিয়া ক্যাভ্ডিডেট হিসেবে একেবারে ‘খাপে খাপ, আবদুল্নার বাপ!’

ঠোঁটের কেণেণ হাসলেন শ্রীষর। কনট্রাডিক্শান। সাইকোলজিক্যাল প্রোফইল या বলছে, খুনি হিসেবে কানোরিয়ার দক্ষতা, হিং্রতা আর অভিজ্ঞতা যা বলছ্, ওর ফোোগ্রাশ্গুলো ঠিক তার বিপরীত। যেন হাসি-খুশি এক নিষ্পাপ গোলগাল শিखু—যে একটা মশাও মারতে পারে না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীধর। কিল গেমে জিশান পালচেধুরীর সঙ্গে খেলার জন্য প্রথম প্লেয়ার বাছা হয়ে গেছে।

পরেট থেকে ছেটট্ট একটা শিশি বের করলেন। হাঁ করে মুখ তুললেন ওপরদিকে। শিশির ছিপি খুলে কয়েক বেঁঁটা এনার্জি সল জিভে ঢলললেন।

## 

তারপর আওয়াজ করে স্বাদ নেওয়ার ঢঙে জিভ দিয়ে টাকরায় টকাস-টকাস শব্দ করলেন। শরীরে শক্তির আগুন ঝাঁজির্যে উঠল।

কিল গেমের তারিখ ক্রমশ এগিয়ে আসছে-দরজায় কড়া নাড়ছে।
শ্রীধর পাট্টার পালে তিনজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদদর প্রত্যেকের গায়ে ব্যাক ইউনিফর্ম। নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলের সব অফিসারের পোশাকই এইরকম। শধু চিফ জেলারের বুকে দশটা সিলভার স্টার বসানো।

চিফ জেলার হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় শ্রীধরের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চেহোর় ছোটখাটো কিন্তু স্মার্ট। চোখে সরু মেটাল ফ্রেমের চশমা।

रরিমোহন জানেন যে, জানেন যে, কিল গেমের আগে মার্শাল নিজে সেন্ট্রাল জেলে আসেন। কিল গেমের তিনজন প্লেয়ারকে চুলচেরা বিচারের পর সিলেক্ট করেন। সেই সিলেকশানের সময় মার্শালের নানান প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ডেথ সেট্টেন্স পাওয়া অপরাধীদের সম্পর্কে নানারকম তথ্যের জোগান দিতে হয়। সেজনাই হরিমোহন সঙ্গে দুজন জুনিয়ার অফিসারকে ডেকে নিয়েছেন।

ওঁরা চারজন এখন বে-ঘরটায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেটা সেন্ট্রাল জেলের কব্ট্রোল রুম।

নিউ সিটি আর ওল্ড সিটির সীমানার গা ঘেঁষে সেন্ট্রাল জেলের চার কিলোমিটার বই দ-কিল্লোমিটর বিস্তুত এলাক্য। শটার চড়ে উড্ডে আসার সময়


জেল এলাকার একটা দিক পরিখা বরাবর টানা দু-কিলোমিটার। সেদিক দিয়ে কোনও অপরাধীর জেল ভেঙে পালানোর কোনও উপায় নেই। কারণ, পরিথার খড়া কংক্রিটের দেওয়াল। সেই দেওয়াল বরাবর পঁচচশ ফুট গভীরতায় গেলে তবেই জলের শুরু। আর সেই, গভীর খালের মধ্যে কিলবিল করছে বিষধর সাপ আর পিরান্হা মাছ। ওরা যাতে আরামে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য জলের উষ্ণতা, নোনত ভাব—সবকিছুই সুক্ম পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পরিথার দিকটা জেল বিল্ডিং-এর পিছনদিক। বিল্ডিংটা লম্বায় পাঁচশো মিটার। একতলা। গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি। বিল্ডিং-এর সব গেটেট বুলেটপ্রুফ পলিমারের অটেেমেটিক শাটার। সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম দিয়ে লক করা।

জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলে পাওয়া যাবে এক অদ্ডুত দৃশ্য।
ডানদিকে আর বাঁ-দিকে সাড়ে সাতশো মিটার করে ধু-ধু মাঠ। আর সামনে চার কিলোমিটার, ফাঁকা জায়গা। সেখানে দেড়-দু-ইঞ্চি লম্বা মিহি ঘাসের শিষ ছাড়া আর কিছু নেই। তাও ঘাস রয়েছে কোথাও-কোথাও—বেশিরভাগ জায়গাটই ধুলো মাখা ধূসর মাঠ।

জেল বিল্ডিং ছাড়া বাকি জায়গাটা হাতের তালুর মতো ফঁঁকা। পোকামাকড় ছাড়া আর কোনও প্রাণীর পক্ষে সেই খোলা জায়গায় লুকোনো

সম্ভব নয়। यদি কোনও ক্রিমিনাল জেল ভেঙে পালাতে পারে তা হলে জেল বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে তাকে ধু-ধু মাঠের ওপর দিয়ে অব্তত সাড়ে সাতশো মিটার পেরোতে হবে।

সেই সময় তকে লক্ষ্য করে ছুটে আসবে রক্ষীদের মিসাইল পিস্তলের গুলি। এই আলট্রামডার্ন পিস্তলের গুলি ইনয়ারেড সোর্স লক্ষ্য করে ছুটে যায়। মানুষ্রে শরীর থেকে যে-ইনয়ারেড তাপ-তরঙ্গ বেরোয় সেটাই গুলিটকে জানিয়ে দেয় কোথায় গিয়ে তকে আঘাত করতে হবে। মানুযটা যেভবেই এঁকেবেঁকে দৌড়োক না কেন গুলিও ‘বুদ্ধিমান’ ছুঁচোবাজির মতো তার পিছনপিছন এঁকেবেঁকে ছুটবে। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ছুটন্ত মানুষটাকে গতিতে হারিয়ে দেবে। এবং খেল খতম।

ধরে নেওয়া যাক, কোনও অপরাধী মিসাইল পিস্তলের গুলিকে ফঁাকি দিয়ে জেল এলাকার সীমানায় পোঁছতে পারল।

সেখানে তার মুঢ্োমুখি হবে কুড়ি ফুট উমু বুলেটপ্র্রফ পলিমারের মসৃণ স্বচ্ছ পাচিল। সেই পাঁচিল পেরোলেই মুক্তি।

কিন্তু সেইই পাচিলের মাথার দিকে প্রায় এক ফুট-জায়গা জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো সমান্তরাল তামার তার। সূর্থের আলোয় ঝকব্বক করছে। পলিমার

 কিলোভোন্ট এসি সাপ্লই।

স্বচ্ছ পাঁচিলের মাথায় यদি কেউ উঠতে চায় তা হলে তাকে ভয়ংকর শক খেয়ে মরতে হবে।

জেল এলাকার ধু-ধু মাঠের নানান জায়গায় রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার।
ওয়াচ টাওয়ারুুলো একটু অড্রুত চেহারার।
স্বচ্ছ ফইইবারের একটা লম্বা ঋুটটি খাড়া উঠে গেছে ওপরদিকে। সেই খুঁটির মাথায়—প্রায় চল্লিশ যুট ওপরে-রয়েছে একটা দ্রান্সপারেন্ট কিউবিক্ল। সেখানে একজন সান্তী মিসাইল পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

ওয়াচ টাওয়ারে যেহেতু ওঠা-নামার কোনও সিঁড়ি নেই তাই সান্ত্রী বদলের কাজটা করা হয় ওটার দিয়ে। সেন্ত্রাল জেলের আডারে মোট দশটা అটার রয়েছে।

ওয়াচ টাওয়ারের মাথা থেকে ছাতার ফ্রেমের মতো নণা মেটালিক আর্ম বেরিয়ে রয়েছে। প্রায় দশমিটার লম্বা এই বাহ্ণুলোর প্রন্তে লাগানো রয়েছে অতি শক্তিশালী মেটাল হালাইড ল্যাস্প। রাতে এই বাত্গুলো জেল এলাককে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়। সেই আলোয় একটা নেংটি ইঁদুরও ছায়ার আড়াল थूँজে পায় না।

## ১২8 <br> www.banglaboosk plff.batogspot.com

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেল নিউ সিটির গর্ব। দেশবিদেশ থেকে বহ হেেরাচোমরা মননু এই হাই-টেক আলট্র্রামডার্ন জেল দেখতে আসেন। এটা শ্রীধর পাট্টার খুব ভালো লাগে। গর্বে বুক কয়েক ইঞ্চি ফুলেও ওষ্ঠে হয়তো। কারণ, এই সেন্ট্রাল জেলের চিফ ডিজাইনার শ্রীধর নিজে।

শীধর পাট্টা ঢেয়ারে বসে পড়লেন আবার। হরিমোহন্নকে ইশারায় বসতে বললেন। হরিমোহন ঘাড়টা সামা্য বেঁকিয়ে বোধহয় একটা বেয়াদব ব্যথাকে শায়েস্তা করলেন। তারপর একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে শ্রীধরের একরকম মুঢ্যামুখি বসে পড়লেন। ওঁচের দুজনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে আর্ক কম্পিউটারের মনিটর চোখে পড়ছিন। সেখানে অপাশি কানোরিয়ার বেশ কয়েকটা রঙিন ফোটোগ্রাফ।

াঁঁ-হাতের পিঠের ওপরে ডানহাতের আডুল দিয়ে কয়েকবার তাল ঠুকনেন শ্রীধর। ছোট করে ওপর-নীচে থুতনি নাড়লেন কয়েকবার। তারপর খুব আলতো গলায় বললেন, ‘এই ক্রিমিনালটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। জিশান পালচৌধুরীর মোকাবিলা করতে হলে এরকম হার্ডকোর ক্রিমিনালই দরকার। ওর সি-ভি আমার দারুণ লেগেছে।’ অল্প হাসলেন শ্রীধর ঃ ‘ওকে কোথায় পেলেন? লাস্ট কিল গেমের সময় যখন আমি সিলেকশানে এসেছিলাম তখন ওর সি-

 করে উপায় নেই!

তারপর ওপরের ঠোঁটটা একবার চেটে নিয়ে বললেন, ‘ঠিকই ধরেছেন, স্যার। অপাশি কানোরিয়া আমার জ্েলে এসেছে আড়াই মাস। ওর ডোসিয়ারের ফার্স্ট পেজে ওর এন্ট্রির তারিথটা লেখা আছে। ওন্ড সিটির নর্দার্ন বেল্টের পাহাড়ি এলাকা থেকে ওকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম।
‘আমি ওর ফাইলটা ওপর-ওপর স্ক্যান করেছি। তয়ংকর মানুষ হিসেবে খুবই অ্যাট্রাকটিভ সি-ভি। ওর টোটাল ফাইলটার একটা সফ্ট কপি আর একটা হার্ড কপি কাল বিকেলের মধ্যে আমার কিল গেম্মের ইন-বক্সে পাঠিয়ে দেবেন। এখন ওর ব্যাপারে ইন আ নাটশেল কিছু আমকে বনবেন?’

জিভ দিয়ে ঠোট চাটলেন হরিমোহন। বিনা প্রয়োজনে হাত কচলানোর ঢঙে হাতে হাত ঘষলেন। তারপর ঃ ‘আপনি এগজ্যাক্টলি কী জানতে চইছছেন জানি না, স্যার...তবে...অপাশির ফেরোসিটি কোশেন্ট হল ৯.৪—অর্থাৎ, আলট্রাহাই রেঞ্জে...|'

নিউ সিটির সেন্ট্রাল জেলে ভয়ককর ক্রিমিনালদের রেটিং ঠিক করা হয় ফেরোসিটি ক্কেল দিয়ে—অনেকটা ভূমিকম্পের রিথ্টার স্কেলের মতো। একজন অ্যাভারেজ ক্রিমিনালের ফেরোসিটি কোশেন্ট হল 8.৫। আর, একজন সিরিয়াল

কিলারের কেব্রোসিটি কোলৌ্ট ৮.০।
শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ডক্টর মনসুখ চক্রপাণি আর ডক্টর গণপত আচারিয়া-याँদ匕র শ্রীধর যথাক্রমে ‘এ’ এবং ‘কিউ’ বলে ডাকেন-এই ফেরোসিটি স্কেলের কনলেপ্ট আর তার ভ্যালু কম্পিউট করার ইমপিরিক্যাল ফরমুলা আবিষ্কার করেছেন। সেন্ট্রাল জেলে সব অপরাধীরই ফেরোসিটি স্কেল হিসেব করা আছে।
‘চমৎকার! চমৎকার!’ হাঁঁুতে ছোট-ছোট তিনটে চাপড় মারলেন শ্রীধর। ফেরোসিটি স্কেল যার ৯.৪ তার কাছ থেকে অনেক কিছুই আশা করা যেতে পরে।

দুবার জোরে-জোরে নাক টননলেন। তারপর ভুরু উঁচিয়ে হরিমোহনকে জিগ্যেস করলেন, 'আর ফিজিক্সাল স্ট্রেংথ? সেটা কীরকম?'

হরিমোহন চটপট জবাব দিলেন, ‘সেটাও খারাপ নয়। তবে ওর হাত আর কঁঁধে জোর সবচেয়ে বেশি। স্রেফ চপার চালিয়ে অপাশি একটা ছোটখাটো গাছের ঔঁড়ি এককেপে কেটে ফেলতে পরে—’’
‘আর কোনও ইমপরট্যান্ট ইনফরমেশান?’
একটু ইত্তত করলেন। তারপর : ‘এটা আল্দো কোনও ইনফরমেশান

'মানে...মানে...সবসময় একা-একা থাকতে ভালোবালে। বিকেলের রিল্যাক্স আওয়ারে ও কারও সঙ্গে মেশে না। উ"হ्,, "মেশে না" কী বলব, কথাই বলে ना... $\mid$

থুতনিতে আডুল বোলালেন শ্রীধর। বিড়বিড় করে বললেন, 'ওর সি-ভি-তে ক্রাইম রেকর্ডও একই কথা বলছে। সবক’ঢা খুন ও একা করেছেসঙ্গে কোনও আ্যাক্প্লিস নেয়নি। হি ইজ আ লোন অপারেটার।

চিফ জেনারের সঙ্গে আরও কিছুদ্ষণ কথা বলার পর শ্রীধর বললেন, ‘এবার আমি অপাশি কানোরিয়াকে দেখব। ওর সঙ্গে ক্থা বলব—।’
‘অফ কোর্স, স্যার।’ হরিমোহন চোখের পলকে ‘হজুরে হাজির’ হয়ে গেলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন অফিসার তাঁদের শরীরের ঢিলেতালা ভাবটাকে পলকে ঝেড়ে ফেলে টান-টান হয়ে দাঁড়ালেন।
'অপাশি কনোরিয়া—’ হরিমোহন বললেন : ‘কোড নম্বর A-1207। মার্শাল স্যার ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবেন-কথা বলবেন। যান, গিত্যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করুন, আমি মার্শাল স্যারকে নিয়ে আসছি...।'

অফিসার দুজন জুতোর গটগট শব্দ করে চলে গেলেন।

## ১২৬ www.banglaboôk padf.bifogspot.com

ওদ্রর মিনিট দশেক সময় দিলেন হরিমোহন। শ্রীধরের সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের নানান সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। जারপর একসময় বিনীত গলায় মার্শালকে বললেন, 'চলুন, স্যার। অপাশি কনোরিয়া—।'

হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় পথ দেথিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। শ্রীধর চুপচাপ ওঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

করিডর আর তার দুপাশের ঘর, দেওয়াল ইত্যাদি, আলোর ব্যবস্থা, এমনকী সিলিংও যথেষ্ট আধুনিক এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন। দেশে জেলের বদলে একটা থ্রি স্টার হেটেলের কথা আগে মনে পড়ে। জেলের এই স্তরের যত্ন নেওয়ার খরচ জোগায় সিড্ডিকেট-অথবা, আরও সরাসরি বলা ভালো-শ্রীধর পাট্ট। কারণ, এই জেলের হার্ডকোর ক্রিমিনালদের ওপরে নির্ভর করছে কিল গেমের জনপ্রিয়তত এবং সাফল্য, বিষ্ঞাপনের রেভিনিউ, নিউ সিটির ইকনমি।

কিছুহ্ষণ হাঁটর পর ওঁরা একটা লেসার ডিসপ্লে লেখতে পেলেন। তাত লাল আলোর হরফ্ে ইংরেজিতে লেখা ‘রেষ্ট্রিক্টেড এরিয়া’। তারপরই বিভাজনের স্বচ্ছ দেওয়াল।

হরিমোহন মার্শালের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'স্যার, আপনি এক

 এই দেওয়াল পেরোলেই হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকা। তাই দেওয়ালটা আক্ষরিক অর্থেন্থ এক্দম "হার্ডকোর"-মনে, ট্রান্সপারেন্ট, রেসিলিয়েন্ট আর বুলেটট্রুফ।

কথা থামিয়ে পরিতৃপ্তির চোথে মার্শালের দিকে তাকালেন হরিমোহন।
প্রভুভক্ত অ্যালসেশিয়ান্নর পিঠ চাপড়ে দেওয়ার ঢঙে চিফ জেলারের পিঠ চাপড়ে দিলেন শ্রীধর : ‘আপনার এফিশিয়েন্সি আমি ভালো করেই জানি। সেইজন্যেই তো আপনার ওপরে এতটা ডিপেভ্ড করি...।

হরিমোহন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন। ওঁর লেজ থাকলে সেটা নিশ্চয়ই এখন এদিক-ওদিক দুলত।

ব্বচছ্ছ দেওয়ানের সামনে দাঁড়িয়ে চারজন সিকিওরিটি গার্ড। তদের কোমরে শকার এবং হাত মিসাইল পিস্তল। ওদ্দের দেখে মনে হচ্ছিল ওরা মানুষ নয়-পাথরের মূর্তি। হরিমোহন আর শ্রীধরকে দেখে ওরা যাম্রিকভাবে বাও করল।

দেওয়ালের গায়ে কোনও দরজা ঢোেে পড়ছিল না শ্রীধরের। ঠিক যেন একটা সিমলেস বিভাজন পাত।

তিনি সামান্য ভুরু কুঁচকে হরিমোহনের দিকে তাকাতেই হরিমোহন
www.banglabookpdf.blogspot.com


পকেট থেকে একটা ছোট রিমাট ইউনিট বের করে সেটা দেওয়ালের দিকে তাক করে একটা দশ ডিজিটের কোড ইনপুট করলেন।

স্বচ্ছ দেওয়ালের একটা স্বচ্ছতর অংশ নিঃশব্দে একপালে সরে গেল। হরিমোহন শ্রীধরকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

হার্ডকোর ক্রিমিনালদের এলাকায় আলোর কোনও ঘাটতি নেই। এ ছড়া তার নানা জায়গায় আধুনিক প্রयুক্তির ছোয়া।

হরিমোহন অলিপথ ধরে হঁটছিলেন আর রিমোটের কীসব বোতাম টিপছিলেন। পাথরের মেঝেতে ওঁদের জুতোর শব্দ ফাঁকা প্রতিধ্বনি তুলছিল।

একটু পরেই একটা সেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন দুজনে।
স্বচ্ছ ফইবারে তৈরি একটা ওয়ান রুম স্টুডিয়ো ফ্য্যাট। ভেতরে উজ্জূল আলো। একজন মোটসোটা লোক টেবিলের কাছে বসে কী যেন লেখালিথি করছে।

হরিমোহন চাপা গলায় বললেন, ‘অাশি কানোরিয়া, মার্শাল স্যার—’'

শ্রীধর দেখলেন, ঘরটা সুন্দরভাবে সাজানো। এমনকী ঘরে রঙিন টিভি পর্যন্ত রয়েছে।
 এরी निड সिणिর বলष्ठ গেলে ज्रालिए।

শ্রীধরদের দিকে একবারও চোখ তুলে তাকাল না অপাশি। নিজের মনে লিখতে লাগল। তারপরু হঠৎৎই টেবিল ছেড়ে উঠে দঁড়াল। পায়চারি করতে লাগল। শ্রীধরদের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। অপাশি সরাসরি শ্রীধরদের দিকে তাকিত্যে আছে, কিন্তু চোেে শূন্য দৃষ্টি।
শ্রীধর পাট্টা অস্বস্তি পাচ্ছিলেন। ইত্তত করে অবাক চোেে চিফ জেলারের দিকে তাকালেন।

হরিমোহন হেসে বললেন, 'আপনাকে চমকে দেব বলে আগে থেকে বলিনি, স্যার। আমি রিমোটের বোতাম টিপে একটা স্পেশাল কোড ইনপুট দিলেই এই সেলের ফাইবারের ওয়ালগুলো সব ওয়ান ওয়ে মিরার হয়ে যায়। তাই অপাশি ওর ঘরের দেওয়ালগুলোকে এখন আয়না হিসেবে দেখছে-আমাদের দেখতে পাচ্ছে না।’

শ্রীধর অপাশিকে দেখতে লাগলেন।
একটু আগে কম্পিউটারে যা দেখ্খেছিলেন, কনট্রাডিক্ষশান যেন তার চেয়েও অনেক বেশি। যেমন নিষ্পাপ চেহারা ঠিক তেমনই নিষ্পাপ বডি ন্যাঙ্গুর্রেজ আর অভিব্যক্তি। তবে ছোট-ছোট সরু চোখের কোথায় যেন মিশে আছে এক ফেঁঁট সতর্কতা।

শ্রীধরের কেন জানি না মনে হচ্ছিল, এই ওয়ান ওয়ে মিরারের গল্পটা অপাশির অজানা নয়।

বেশ কয়েক মিনিট অপাশিকে লক্ষ করলেন ওঁরা দুজনে। তারপর শ্রীধরের ইশারায় রিমোট কন্ট্রোল ইউনিটের বোতাম টিপে সেলের ফাইবার ওয়ালের ক্যারেকটার পালটে দিলেন হরিমোহন। ওটা এখন টু ওয়ে সি থু ফাইবার শিট হয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে অপাশি ওঁদের দুজনকে দেখতে পেল। সরলভারে একগাল হেসে দিল ও।

সেই মুহূর্ত্ কনট্রাডিক্শানের মাত্রাটা এক ঝটকায় এমন বেড়ে গেল যে, শ্রীধর পাট্টার মতন মননষও চমকে উঠলেন।

হরিমোহন আবার রিমোট ইউনিটের বোতাম টিপলেন।
ওঁদের সামনের দেওয়ালে আটটা ছোট-ছোট জানলা তৈরি হয়ে গেল। দুটো সারিতে চারটে করে খুদে জনলা-প্রত্যেকটা মাপে এক ইঞ্চি বাই এক ইঞ্চि।

হরিমোহন গর্বের হাসি নিয়ে ঘুরে তাকালেন মার্শালের দিকে। বললেন, ‘সেলের কয়েদিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এই ব্যবস্থ, স্যার...।’

শ্রীধর ওঁর দিকে চেয়ে একচিলতে হাসলেন শধু।


শ্রীধর অবাক হয়ে চিফ জেলারের দিকে তাকানেন।
চিফ জেলার বললেন, ‘ও "আপনি-আজ্ঞে" বাপারারটা খুব পছন্দ করে। তাতে বেশ হাসি-খুশি আর শান্ত থাকে’’

অপাশি কানোরিয়া শ্রীধরদের খুব কাছে এসে দাঁড়াল। মুখে হাসি, ঢোথে সামান্য কৌতৃহল।

চিফ জেলার শ্রীধরের সঙ্গে অপাশির পরিচয় করিয়ে দিলেন।
'মিস্টার কানোরিয়া, ইনি হলেন নিউ সিটির পিস ফোর্সের মার্শাল মিস্টার শ্রীধর পাটা। ঠিকভাবে বলতে গেলে, ইনিই নিউ সিটির শেষ কথা...।'

হাসল কানোরিয়া। বলল, ‘‘েমন এই জেলে আপনিই শেষ কথা।’ তারপর শ্রীধরের দিকে তাকিয়ে : ‘গাউ আর য়ু, মার্শাল,? নাইস দু মিট য়ু..।’

শ্রীধর কানোরিয়ার শেষের দিকের কথাগুলো ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছিলেন না। কারণ, ওঁর মাথায় ঘুরছিল কনট্রাডিক্শান।

কানোরিয়ার মধ্যে কনট্রাডিক্শানের চূড়াষ্ত দেখে শ্রীধর ভেতরে-ভেতরে টগবগ করছিলেন।

কী আশর্য মিহি অপাশি কনোরিয়ার গলার স্বর! এ যেন ধে•心 মেয়ের গলাকেও হার মানায়!

অথচ এই লোকটাই গুনে-ণুনে বত্রিশটা মানুষকে ঠাড্ডা মাথায় খুন করেছে! বত্রিশ রান!

কিল গেমের দিন ও নিশয়ইই অনায়াসে আরও একটা রান স্কোর করতে পারবে!

সিমানকে অনেকক্ষণ ধরে ফোন করে পাচ্ছিলেন না রঙ্গপ্রকাশ। ওঁর কপালে ভাঁজ পড়ছিল। একইসল্গে ব্যুথার জগতে হারিয়ে যাচ্ছিলেন।

প্রয়ই এরকম হয়। ছেলেটা বলতে গেলে সবসময়েই রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালাকে দুশ্চিন্তায় রাথে। কে জানে কোনও বিপদ্দ পড়ল কি না!

সিমনের সঙ্গে-সঙ্গে নিজের ইকনমিক ইনডেক্স-এর কথাও ভাবছিলেন। ভাবছিলেন ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর কথা।

মাথার দুপাশ দপদপ করছিল। কেউ যেন প্যাচ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ইশ্পাতের তুরপুন চালিয়ে দিচ্ছে মাথার ভেতরে।

পর্ণমালা পাশের ঘরে। বোধহয় পামটপ নিয়ে ব্যস্ঠ। নিশ্যয়ই ইমপোৰ্ট-

 ভেতরের ঝড় খুব একটা আঁচ করা যায় না। কিন্তু রঙ্গপ্রকাশের সে-দক্ষতা নেই। তাই ওঁর কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।

গলা তুলে পর্ণমালাকে এক কাপ কফি দেওয়ার জন্য বললেন। দেখা যাক, এক কাপ কফি তুরপুনের তেজ কমাতে পারে কি না।

প্লাজ্মা কম্পিউটরেরের মনিটরের দিকে তাকালেন। সেখানে জিশানের ভিডিয়ো ছবি চলছে—তবে সাউন্ড ‘মিউট’ করে দেওয়া। শম্দহীন চলচ্চিত্র দেখছেন ডক্টুর রঙ্গপ্রকাশ বিশ্বাস। কারণ, ওঁর প্রিয় এলাকা হন ‘কইনেসিক্স’। অর্থাৎ, অঙ্গভঙ্গি আর শরীরের ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশচর্চার বিষ্ঞান। না বলা মনের ভাব, উদ্দেশ্য ইতাদি বিল্লেষণের মাধ্যমে বুঝে নেওয়া।

এখন জিশানের নিঃশব্দ ছবি দেখে ওর মনের ভেতরের রহস্য আরও গভীরভাবে বুঝতে চাইছেন। যা-যা বুঝতে পারবেন সেসব চলে যাবে জিশানের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলের ফাইলে।

ঠিক এমন একটা সময়ে, প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে, অচেনা একটা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল।

তিনি ‘্যালো’ বলামাত্রই ও-্র্তন্ত থেকে জিশান পালচৌধুরীর গলা শোনা গির্যেছিল। হাঁ, জিশান—জিশান পালটৌধুরী!

টেলিফোেে জিশানের বলা কথাগুলো রস্গ্রকাশের মনের ভেতরে হঠাৎই বেজে উঠল আবার।
‘হালো, জিশান বলছি-জিশান পালচৌধুরী...।'
উত্তর দেওয়ার সময় রঙ্পকাশের গলা কেঁপে গিয়েছিল। তারপর...।
তারপর, সিমানের কথা শোনার পর, মন এবং গলা সংযত করে জিশানকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। কিন্তু ফোনে কথা বলা শেষ করার পর নিজেকে আর সুস্থির রাখতে পারেননি। তলের ঘরের মতো ছত্রখান হয়ে গিয়েছেন।

মরণাপন্ন জন্তুর মতো আর্তনাদ করে ডুকরে উঠেছেন। পাঁজরার পলকা হাড়গুলো যেন পটপট করে মটকে যাচ্ছিল।

অড্রুত যন্ত্রণার শব্দে পর্ণমালা ছুটে এসেছেন কম্পিউটার রুমে। বিস্ময়ের ধাক্কা থেয়ে দেখেছেন বিষ্ঞানী স্বামী টেবিলের ওপরে মাথা রেথে সব-হারানো বাচ্চার মতো কষ্টে জর্জরিত হয়ে ছটফ্ট করছেন।

পর্ণমালার হাত থেকে গরম কফির কাপ খসে পড়েছে অ্যান্টি-্ট্যাটিক ঙ্রোরে। কাপটা পাঁচ לুকরো হয়ে গেছে। আর কফিও ছড়িয়ে গেছে যেখানেসেখাে।

ওঁর মুথ দিয়ে গোঙানির মতো ‘সিমান! সিমান!’ শব্দটা বেরিয়ে আসছিল
 বুঝত্ পারছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। ভয় হচ্ছিল, তিনি বোধছয় শত-সহ্ম টুকরোয় ছूর্ণ-বিচূর্গ হয়ে শেষ পর্যষ্ত পুলো হয়ে যাবেন।

কিন্তু সেটা হন না পর্ণমালার জন্য।
ছুটে এসে স্বামীকে জাপটে ধরে সামাল দিতে লাগলেন। সাব্ব্বনা দিতে, সাহস জোগাতে কত না এলোমেলো কথা বললেন। তারই মধ্যে উতলা গলায় জিগ্যেস করছিলেন, ‘কী হয়েছে? সিমানের কী হয়েছে?’

ওঁদের আপাত সুন্দর সুখী বাড়িটার ভেতরে দুশ্চিন্তা আর শোকের ঢেউ উথলে উঠছিল বারবার। কিন্তু বাইরের রাস্তা থেকে সেসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল ना।

প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ওঁরা সামলে উঠলেন। তারপর সোফায় হেলান দিয়ে থমথমে মুত্থ অপেক্ষা করতে লাগলেন। সিমান কখন আসবে কে জানে!

স্বামীকে নিয়ষ্তণ্রে রাখার জন্য পর্ণমালা আরও তিনবার কফি তৈরি করে নিয়ে এলেন। রঙ্গপ্রকাশকে দিলেন, নিজেও নিলেন। তারপর পরিস্থিতির চাপ হালকা করার জন্য প্নাজ্মা কম্পিউটারে জিশানের হলোগ্রাম ভিডিয়ো ইমেজ দেখতে শুরু করলেন।

রঙ্গপ্রকাশের চোখের কোল ফোলা। বারবার নাক টানছেন। কিন্ত www.facebook.com/banglabookpdf

202 www.banglaboork patf.biłogspot.com
একইসঙ্পে ওঁর চোখ আটকে রয়েছে কস্পিউটারের পরদায়। কীজাবে যেন ওঁর বিষ্ঞানী সত্তার একটা ছোট অংশ কোতৃহনী হয়ে উঠেছে। ‘কাইনেসিক্স’ রঙ্গ প্রকাশকে উসকে দিচ্ছে।

এভবে কতক্ষণ যে কেটেছে ডক্টরের থেয়াল নেইই। হঠাৎই ওঁর কम্পিউটার রুমের দরজায় হাজির হয়ে গেল দুজন মনুষ।

জিশান আর সিমান।
রঙ্গপ্রকাশ কয়েক সেকেন্ড কোনও কথা বলতে পারলেন না। নিষ্পলক চোখে জিশানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই টগবগে তরুণ কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় প্লাজ্মা কম্পিউটারের মনিটর থেকে লাফিয়ে নেম্মে পড়েছে ওঁর ঘরের দরজায়।

অনেক পরে মনোযোগ গেল ছেলের দিকে।
ক্রান্ত-শ্রান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। কপালে ব্যান্ডেজ। গায়ে হসপিটলের রুগিদের মতো ঢেলা পোশাক। জিশানের গায়ে হেলান দিয়ে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কফির কাপ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন পর্ণমালা। চোখ ঝাপসা হয়ে গির্যেছিল। আপাত সংযমের বর্মের নানান স্তর মোচার থোলার

 কেঁদে উঠলেন।
‘সিমান!'সিমান! এ कী দশা হয়েছে তোর! কোথায় ছিলি তুই? কোথায় ছিলি, বাবা?’

জিশান আর রঙ্গপ্রকাশ মা আর ছেলেকে দেখতে লাগলেন। জিশানের মনে পড়ল অর্কনিশানের কথা! ওঃ! কতদিন ওর সোনামণি শিওটাকে ও বুকে জড়িয়ে ধরেনি!

ग্ত্রীকে দেখে খানিকটা যেন অবাক হচ্ছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। সিমানের জন্য পর্ণমালার এতটা টান তিনি আগে কখনও বুঝতে পারেননি। মাৃত্নেহ তা হলে সহজে মরে না!

জিশানের হাতে একটা বায়োডিগ্রেডেব্ল প্যাকেট ছিল। তার মধ্যে সিমানের ভিজে জামাকাপড় রয়েছে।

ও দু-পা সামনে এগিয়ে প্যাকেটটা কফি টেব্লের ওপরে রাখল। বলল, ‘এর মধ্যে সিমানের ভেজা জামা-প্যান্ট রয়েছে...।'

জিশানকে সামনাসামনি দেখা আর সিমানকে ঠিকঠাক অবস্থায় ফিরে পাওয়ার শক ধীরে-ষীরে কাটিয়ে উঠলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফা ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর এক পা সামনে এগিয়ে জিশানের দিকে হাত-বাড়িয়ে দিলেন।
‘থাংক্স। आপনাকে অনেক ধন্যবাদ...।’ রঙ্গপ্রকাশের ঢোে জল এসে গেল। ভাঙা গলায় নিজের আর পর্ণমালার পরিচয় দিলেন।

জিশান হাত মেলাল। সামান্য হাসল : ‘ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই, ডক্টর বিশ্ধাস। একজন সাধারণ মানুষ যা করত আমি তা-ই করেছি-তার বেশি কিছু করিনি-।

এইজনাই বোধহয় জিশান অসাধারণ। ভাবলেন রঙ্গপ্রকাশ।
‘আপনি প্লিজ বসুন...।'
একটা সিঙ্গল সোফার দিকে ইশারা করলেন ডক্টর। ঢোখ মুছে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন।

জিশান বসল—রঙ্গপ্রকাশের মুখোমুখি। সিমান আর পর্ণমালাকে একপলক দেখল। তারপর অ্যাক্সিডেন্টের থুু থেকে সব বলতে করু কর।

গাড়িতেই সিমনের নেশার ঘোর কেটে গিয়েেিল। তখন গাড়ি থামিয়েছে গুনাজি। জিশান গাড়ি থেকে নেমে সিমনের পাশে গিয়ে বলেছে। ওকে এক গাত জড়িয়ে ধরে সফ্ট এনার্জি প্যাক থেকে অল্প-অল্প করে এনার্জি ড্রিংক ওকে খাইয়েছে। তারপর ওর শরীরটাকে যত্ন করে আঁকড়ে ধরে বসে থেকেছে।

গুনাজির স্টিয়ারিং তখন রঙ্গপ্রকাশের বাড়ির সঙ্গে ওঁর সি থ্রু
 রঙ্গপ্রকাশের চোখে চোখ রেখে বলল, ‘এখন ওর শুধু রেস্ট দরকার। জিশানের কাছে সব ঘটনা শুনতে-শনতে রঙ্গপ্রকাের চোখ আবার ভিজে উঠেছে। তিনি চট করে উঠে দাঁড়ালেন। সিমান আর পর্ণমালার কাছে গেলেন। ছেলের মাথয় স্নেহমাখা হাত বোলালেন কয়েকবার। বাঁ-হতের পিঠ দিয়ে নিজের চোের জল মুহলেন। ভারী গলায় পর্ণমালাকে বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে যাও। বিছানায় ওইয়ে দাও। রেস্ট-অ্যাবসোলিউট রেস্ট। ওকে এত ভাঙাোরা দেখচচ্ছে... ${ }^{\prime}$

পর্ণমালা ছেলেকে নিয়ে ষীরে-ষীরে চলে গেলেন ভেতরের ঘরের দিকে। রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্যাস ফেললেন। তারপর হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন, সামনের কম্পিউটারের পরদায় জিশান চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে-কিন্তু কোন শ শ্দ নেই।

কম্পিউটারের মনিটর থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি নজর ঘোরালেই আসল জিশান।

রঙ্গপ্রকশের বিজ্ঞানী সত্তা বলে উঠল, ‘আচ্ছা, ছবির জিশান, আর সামনে বসে থাকা জলজ্যান্ত জিশান—কাইনেসিক্স কি এই দুজনের শরীরের ভাষার তুলনামূলক বিচার করে নতুন কোনও উত্তর বের করতে পারে?’

## www.banglaboôk pdff.bilogspot.com

সামনে বসা জিশানকে দেখছিলেন রঙ্গপ্রকাশ। স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, জিশান যতই বিনয় করে বলুক না কেন, ও আসলে সাধারণ নয়। ও যে অন্যরকম, তার একটা অদৃশ্য বিকিরণের তেজ রঙ্গপ্রকাশ অনুভব করতে পারছিলেন। সেইসঙ্গে সিমানকে নিরাপদে ফিরে পাওয়ার স্বস্তি এবং আনন্দ মনের ভেতরে বুদ্মুদের ফোয়ারা তৈরি করছিল। আর সামনে বসা তরুণটির প্রতি কৃতজ্ঞতার ঢেউ বুকের ভেতরে আছড়ে পড়ছিল বারবার।

জিশান ঘরটা অবাক ঢোে দেখছিন। দেখছিন সেমি-দ্রান্সপারেনট গ্লাস পার্টিক্ল ইমপ্রেগনেটেড পলিমারের ফার্নিচার। আর দেওয়ালের জায়ান্ট প্লেট টিভি এবং প্লাজ্মা কম্পিউটারের মনিটর।

রহ্গ্রকাশ ওকে লক্ষ করছিলেন।
জিশানের কপালে একটু ভাঁজ পড়েছে। একটা ভুরু সামান্য উঁচিত়ে রয়েছে। হাত, হাতের আডুল উদ্দেশ্যুীনভাবে ইতস্তত নড়াচাড়া করছে।

সব মিলিয়ে বিম্ময়, কৌতূহল, অস্বস্তি।
সত্যি, ‘কাইনেসিক্স’ বড় বিচিত্র বিষয়। প্রায় চারশো বছর আগে নৃবিষ্ঞানী রে বার্ডছইহস্টেল প্রথম এই শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। তিনি গবেষণা করে বুঝরে চেয়েছিলেন, মুঢের ভাবভপ্গি, হাতের ইশারা, পায়ের নড়াচড়া,

 আমরা যে সামাজিক জীবনে নিয়মিত ভাব বিনিময় করি তার মাত্র তিরিশ কি পঁয়্রিশ শতাংশ করি ভাষার মাধ্যম-আর বাকিটা অভিব্যক্তি আর অঙ্গভঙ্গি मिয়ে।

সেসব কথা খুব মনে পড়ছিল এখন।
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জিশান বলল, ‘গাড়িতে আসার সময় आমি সিমানের সঙ্গে...কথা বলছিলাম। ততে যা...জেনেছি...সেগুলো আপনাকে...জানানো দরকার। সিমানের ভালোর জন্যে...।'

রঙ্গপ্রকাশ ছোট একটা ধাক্কা খেলেন। 'সিমানের ভালোর জন্যে....।’ তার মানে?

উৎকণ্ণিত হয়ে জিশানের চোvের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপেক্ন করতে লাগলেন।

একসময় অধ্ব্য হয়ে বলে উঠলেন, ‘বলুন-কী বলবেন...।’
টেবিলের দিকে চোখ নামাল জিশান। নীচ গলায় বনল, আপনার ছেলে সিমান...সসুসাইড করতে চেয়েছিল...।

এবার বড় একটা ধাক্কা খেলেন। সুইসাইড করতে চেয়েছিল সিমান?
কিছুহ্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না রঙ্গকাশ। ওঁর ঠোঁট সামান্য

কাঁপতে লাগল। কিন্তু ওঁর বিজ্ঞানী সত্তা তখনও জিশানের অভিব্যক্তি আর নড়াচড়া লক্ষ করছিন।

না, জিশান যে মিথ্যে বলছে সেরকম কোনও লক্ষণ চোেে পড়ছে না।
রঙ্গক্রকশের বুকের ভেতরে কয়েকটা বিশাল লোহার বল গড়াতে লাগল। দম আটকে আসতে চাইল। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, এখন কথা বলার চেষ্টা করলে শুধুই কান্না বেরিয়ে আসবে।

বে-ছেনেটের জন্য তিনি সবসময় মানসিক চাপ আর যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটচ্ছেন, যার জন্য নিউ সিটি ছেড়ে চলে যাওয়ার আতক্ক মনের আকাশে কালো মেঘের মতো ছেয়ে রয়েছে, সে রঙ্গকাশ আর পর্ণমালার জীবন থেকে চিরকালের জন্য চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

রঙ্গপ্রকাশ সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়লেন। পর্ণমালাকে এ-ঘরে একবার ডাকা দরকার। কারণ, জিশান এবার যে-কথাগুলো বলবে সেগুলো একা-একা শোনার মতো সাহস তিনি তৈরি করতে পারছেন না। নিউ সিটির ‘সাইকোজ্যানালিসিস সেন্টার’-এর চিফ সাইেকোলজিস্ট এখন নিজের মনের শক্তি এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিভ্রান্ত।

জিশানকে বললেন, ‘আপনি একদু বসুন। আমার ওয়াইফকে একটু ডেকে নিক্রে आসি-।
 জায়গামতো পড়ছে না। ভয় পাচ্ছিলেন, এই বুঝি টলে পড়ে যাবেন।

ভাগ্য নেহাত ভললো বলতে হবে বে, চারটে কি পাঁচটা পা ফেলার পরই পর্ণমালাকে দেখতে পেলেন। একটা লৌখিন ট্রে হাতে এগিয়ে আসছেন ওঁদের দিকে। ট্রে-তে স্ন্যাক্স আর কফি-জিশানের জন্য।

তাড়াতাড়ি সোফার কাছে ফিরে এলেন রঙ্গপ্রকাশ। সোফায় বসার আগে ग্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'সিমান?’

কফির টেবিলে হাতের ট্রে-টা নামিয়ে রেvে শান্ত গলায় জবাব দিলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা নার্ভ সুদার দিয়েছি...।'
'পর্ণ, ঢুমি একটু এখানে বোসো। মিস্টার পালচেধুরী কী বলছেন শোনো—।

স্বামীর কাছে বসলেন পর্ণমালা। জিশানের দিকে তাকালেন।
জিশান থেয়াল করল, সিমানের জন্য কান্নাকাটি করে পর্ণমানা ওর মেকাপের ধার যোুকু নষ্ট করেছিলেন সেটা এটুকু সময়ের মধ্যেই সাধ্যমতো মেরামত করে এসেছেন।

জিশান কফির কাপে চুমুক দিল।
রঙ্গপ্রকাশ একটু ইতস্তত করে বললেন, ‘জিশান, বলুন, সিমানের কথা

कী বলছিলেন-।'
‘হাঁ-বলছি’’ পর্ণমালার দিকে তাকাল জিশান : 'ম্যাডাম, আপনাদের ছেলে সিমান গাড়ি চালিয়ে স্কাই-হাই ফ্যাইওভার থেকে সেন্ত্রাল লেকে ঝাঁপ দিয়েছে। ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল। তারপর...তারপর কীভবে ওকে রেসকিউ করা হয়, মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়, সেসব তো আগেই ডক্টর বিশ্ধাসকে আমি ফোনে জানিয়েছি...।'

রঙ্গক্রকশ পাশে হাত বাড়ালেন। পর্ণমালার হাতটা খুঁজলেন। একসময় সেটা পেয়ে आাকাড়ে ধরলেন।
'ও সুইসাইড করতে চেয়েছিল কী করে বুঝলেন?’ পর্ণমালার ভুরুতে ভঁঁজ। কণ্ঠস্বরে হালকা বিদ্রোহ।

জিশান হাতে হাত ঘষল। এদিক-ওদিক উদ্দেশ্যহীন তাকাল। তাকাল, কিক্তু ওর চোখ কিছু দেখতে পেল না।

রঙ্গপ্রকাশ বুঝলেন, ও দোটানায় পড়েছে। স্পষ্ট কথা বলবে, নাকি মানবিক সৌজন্য বজায় রাখবে? একজন বাবা-মা-কে আঘাত দেবে, নাকি দেবে ना ?

শেষ পর্যন্ত সত্যের জয় হল।

থুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখালেন পর্ণমালা। পালটা জিগ্যেস করলেন, ‘কেন, সুইসাইড করতে চেয়েছে কেন? ওর কীসের কষ্ট? কীসের অভাব? আমাদের কোন ব্যবহারে কি ও ব্যথা পেয়েছে?’

জিশান ইতস্তত করে বলল, 'না, না, ঠিক সেরকম নয়। আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। সিমান ওর থুব পারসোনাল কথা...গাড়িতে আসার সময় আমাকে বনেছে... 1
‘খুব পারসোনাল কথা। অথচ আমাদের না বলে আপনাকে বলেছে!’ পর্ণমালার ভুরু এখনও কুঁচকে রয়েছে। চোের তারায় আলতো বিশ্ময়।

জিশান একটু নড়েচড়ে বসল। সোফায় শরীরটাকে খানিকটা এলিয়ে দিল। কিচুண্ষণ চুপ করে গির্যে কফির কাপে কয়েকবার চুমুক দিল। স্ন্যাক্সে কামড় দিল। তারপর বলল, আশা করি আপনারা এগুলো সিমনের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। ঠোঁটের ওপরে একবার আঙুলু বুলিয়ে নিল জিশান। এপাশ-ওপাশ তাকাল। তারপর ঃ আলোচনা যদিও বা করেন, প্লিজ, বলবেন না যে, এসব আপনারা আমার কাছ থেকে ওনেছেন। তা হলে...তা হলে আমার প্রতি ওর যে আস্থা আর বিশ্বাস-সব নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা...সেটা আমার ভালো লাগবে না...।
‘আপনাকে এসব পারসোনাল কथा ও বলতে গেল কেন্’ পর্ণমালা এখনও সেই একই প্রশ্নে আটকে আছেন। কারণ, জিশানকে সিমানের ব্যজ্তিগত কথাবার্ত বলার ব্যাপারটা পর্ণমালা আর রঙ্গপ্রকশশের সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের দূরপ্নটাকে বড্ড কুৎসিতভাবে আডুল তুলে দেখাচ্ছে।
'একটা কথা বলি, ম্যাডাম-' পর্ণমালার দিকে সরাসরি তাকাল জিশান : ‘আমকে নিশ্য়ই আপনাদের খুব কাছের মানুয বলে মনে হচ্ছে। কারণ, গত তিনমাস ধরে টিভিতে, রাস্তাঘাটের বিলবোর্ডে, নানান জায়গায় আমাকে—আমার ছবিকে-বেপরোয়াভাবে প্রচার করা হয়েছে। আপনাদের মিডিয়া আমাকে আপনাদের ঘরের লোক করে তুলেছে। এই শহরে ঘুরে বেড়িয়ে আমি দেত্খেছি, কিল গেম পার্টিসিপ্যান্ট জিশান পালচৌধুরীকে নিয়ে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েদের মধ্যে কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা, কী হুল্লোড় মাতামাতি আর হইচই। ওদের কাছে আমি সুপারহিরো হয়ে গেছি-।'

রঙ্গপ্রকাশ বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাদের কাছেও’’
পর্ণমালা স্বামীর দিকে একবার তাকালেন। তারপর জিশানের দিকে আবার মনোযোগ দিলেন।
‘সেইজন্যেইই বোধহয় সিমান ওর মনের কথা আমার কাছে বলেছে।...



আপনি ওর লাইফ সেভ করেছেন।' রঙ্গপ্রকাশ বললেন, ৬ই আর গ্রেটফুল לু যু...।
‘প্লিজ-' অনুনয় করে বলল জিশান, 'একটা মামুলি কর্তব্যকে শুষু৩খু বড় করে দেখাবেন না। যাই হোক, ডক্টর বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস...আপনাদের ছেলে প্রায় একবছর ধরে ড্রাগ, বেটিং আর গ্যাম্বলিং-এ মেতে আছে। আপনাদের এই নিউ সিটির সুপারফস্ট লাইফস্টাইলে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অথচ এই লাইফস্টাইলের ডেতরটা বে ভোঁপরা সেটা আপনারা দুজন নিশ্চয়ই বোঝেন।

ডউক্ষ্রর, টাকা খরচ করতে পারার ক্ষমতাটাই একমাত্র ক্ষমতা নয়, গায়ের জোরে কাউকে হারাতে পারার ক্ষমতাটই একমাত্র ক্ষমতা নয়। যারা এসব সত্যি বলে ভাবে তারা ভালোবাসার ক্ষতার কথা জানে না...।' কফিতে আবার চুমুক দিল জিশান : আসলে কী জনেন, মানুষ্েের সল্গে মনুুের সম্পর্কে যে-টান—সেই টানটাই সবচেয়ে পাওয়ারযুল। আপনাদের সঙ্গে সিমনের

## ১৩৮ <br> www.banglabor̂k paff.bitogspot.com

রিলেশানের টান কতটা ডেভেলাপ করেছিল সেটা আপনারাই ভালো জানেন। তবে...তবে...’ একটু ইতস্থত করল জিশান। তারপর নীম গলায় বলল, ‘সিমান বলছিল, সেই টানটা ও কখনও সেভবে টের পায়নি। ওর সবসময় মনে হয়, ওর কোনও পিছুটান নেই—’

রঙ্গ্রকাশ অবাক হয়ে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এসব কী শোনাচ্ছে জিশান। রস্গপ্রকাশ আর পর্ণমালার সঙ্গে সিমানের সম্পর্কের গোপন কथा?

কে সাইকোলজিস্ট? রঙ্গপ্রকাশ, না জিশান?
রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিলেন না। ‘কাইনেসিক্স’ বলবে, তিনি আসলে বিষয়টাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

আড়চোখে পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ওঁর অবস্থাও একইরকম। ঘরের ফার্নিচার খুঁটিয়ে দেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছেন।

জিশান তখন বলছিল, ‘আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বলছি বলে, প্লিজ, ক্ষমা করবেন। কিন্তু সিমানের কথাগুলো তুে আমার মনে इল সেণলো आপনাদের দুজনের কাছে প্পৗঁছেনো দরকার। তা হলে হয়নো সিমানের সল্পে আপনাদের কমিউনিকেশানের গ্যাপটা কমবে। যেমন ধরুন...। সামান্য মাথা

 বলতে ও ইত্ততত করছে, সময় নিচ্ছে। বোধহ় কথাটা বেশ স্পর্শকাতর।
‘যেমন ধরুন, আপনি—ডক্টর বিশ্ধাস—আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন...।’

রঙ্গক্রাশ চমকে গেলেন। জিশান এ-কথা জননল কেমন করে? ওর তো এসব জানার কথা নয়!

পর্ণামালাও অবাক হয়েছিলেন। ফার্নিচারের দিক থেকে চকিতে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন জিশানের দিকে।

জিশান বলল, ‘না, না, ডক্ট্র-এতে আপনার অস্বস্তি পাওয়ার কিছু নেই। সেপ্টেম্বরের দু-তারিযে আমাকে কিল গেম্মে নামতে হচ্ছে। এটটই আমার কাছে সবচচয়ে বড় সত্যি-এর মধ্যে কোনও ‘ইফ্স অ্যাভ্ড বাট্স’ নেইই। এবং আপনাকে বলে রাখছি, আমি সেদিন প্রাণপণ লড়ব। জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করব। কেন জানেন, ডক্টর?’

হঠাৎই উट্ঠে দাঁড়াল জিশান। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওর মাইক্রোভিডিয়োফোন ইউনিটটা বের করল।

এই মুহূর্ত্র ওর মিনির সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ওকে দেখতে ইচ্ছে করছে। শানুকেও দেখতে ইচ্ছে করছে।

সেটটা অন করে একাঁ টিউন করতেই জিশানের আপনজনেরা চলে এল ওর চোখের সামনে।

মিনি। সুন্দর মুথ্যে ঘাম এবং হাসি। জিশানের দিকে তাকিত্যে ওর চোখ দুটো আরও জীবন্ত হয়ে উঠল। আস্তে করে জিগ্যেস করল, ‘কেমন আছ?’

জিশান হাসল : 'ভলো—।'
‘দ-তারিথ তো দেখতে-দেখতে এসে যাবে...’’ সামান্য চোখ নামাল মিনি।
‘গাঁ, এসে যাবে। তারপর পেরিয়েও যাবে। তथন তোমাদের কাছে ফিরে যাব। আমার দেরি সইছে না।
‘তখন...তখন...’ মিনির কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ল : ‘তখন यদি ওই শ্রীধর পাট্টা ঢোমাকে ফিরতে না দেয়?’
‘না দিলে ওকে চিবিয়ে ঔঁড়ো করে ফেলব। তারপর তোমাের কাছে ফিরে যাব।

কথাটা বলার সময় জিশানের চোয়ানের রেখা যে শক্ত হল সেটা রঙ্গপ্রকশের চোখ এড়াল না।
'শানু কোথায়?’ জিশান ছেলেকে দেখতে চাইল।
মিনি ওর এমভিপি সেটটা নিয়ে গেল ছেট্ট ছেলেটার কছে। বলল,


কয়েকটা ভাঙা গাড়ি আর রঙিন পুতুল চারপাশে ছড়িয়ে মেঝেতে বসে आছে।

এমভিপির পরদায় শানুর ফুটফুটে মুখ দেখা গেল। জিশান ওর এমভিপি সেটটট নিয়ে চনেে এল রঙ্গপ্রকাশের পাশে। পরদার ছবিটা দেখিয়ে বলল, আমার ছেলে, ডক্টর। ওর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমকে কিল গেমে জিততে হবে। ওর মায়ের কাছে ফেরার জন্যেও। ওরাই আমার সবচেয়ে জোরালো টান, সবচেয়ে বড় শক্তি-।'

পর্ণমাनাও ঝֵঁকে পড়ে শানুকে দেখছিলেন। ওঁদের সিমানও একদিন এইরকম ফুটফুটেটে ছিল।

জিশান সরে এল নিজের সোফার কাছে। বসে পড়ল। আরও কয়েক মিনিট মিনি আর শানুর সঙ্গে কথ্া বলে কাটাল। তারপর সেট্টা অফ করে मिन।

রঙ্গক্রকাশ আর পর্ণমালা দুজনেই তকিয়ে ছিলেন জিশানের মুখের দিকে। সেখানে এক অদ্ডুত দুতি ওঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন ঃ প্রিয়জনের ভালোবাসার দ্যুতি। সেই দ্যুতির সঙ্গে প্রাশক্তির উজ্জ্রলতাও মিশে ছিল।

রঙ্গপ্রকাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আড়চোথে স্ত্রীর দিকে তাকিত্যে

বুঝতে পারলেন সেইই দীর্ঘ্বপ্বসের কোমল শব্দ পর্ণমালা ওনতে পেত্যেছেন। জিশান বলল, 'ডক্টর বিশ্যাস, আপনি আমার সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল তৈরি করছেন। নিশ্য়ই শ্রীধর পাট্টার জন্যে। কিল গেমের জন্যে। যাই হোক, आপনার কাজ আপনি করবেন। আমারটা আমি। তবে একটা কথা আপনাকে বলি। কিল গেমের ফরম্যাট অনুযায়ী দু-তারিখে তিনজন মার্ডারার—লাইফার— আমাকে খুন করতে নামবে। আমি ওদের ফাঁকি দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বেঁচে থাকার চেট্টা করব। যেটুকু জেনেছি তাত এখানকার নিয়ম অনুযায়ী যাবজ্জীবনের সাজা পাওয়া আসামিকে সত্যি-সত্যি সারাটা জীবন জেলে কাটতে হয়। তাই ওই তিনজনের সামনে কোনও নতুন ভবিষ্যৎ নেই। বর্তমানটাই ওদ্রে ভবিষ্যৎ...’ একটু থামল জিশান। অপলক চোথে তাকাল রঙ্গক্রাশ বিশ্ধাসের দিকে। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, ‘কিন্তু আমার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ এক নয়, ডক্টর। আমি মিনি আর শানুর কাছে ফিরে যাব। ফিরে যাওয়ার এই টানটা আমার বর্তমান, আর ফিরে যাওয়াট আমার ভবিষ্যৎ।
‘আপনার তৈরি করা সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইলে এই ফিলিংটা নিশ্যয়ই নেই। আপনি কাইল্ডি এটা ইনরুড করে নেবেন। আমি চই নিউ সিটির সবাই


জিশান ওঁর বাড়িতে এসে হজির হয়েছে, এত কথা বলছে-সেটা রঙ্গক্রকশের সাইকোলজিস্ট ব্যক্তিত্বের ভালো লাগছিল। কারণ, খুব দ্রুত প্রদুর তথ্য পাচ্ছিলেন। তিনি জিশানের প্রোফাইল এ পর্যন্ত যা তৈরি করেছেন এখন পাওয়া তথ্যকণাসাগর তার সঙ্গে জুড়ে নিলে প্রোফাইলটা অনেক গুণ সমৃদ্ধ হবে।

আর সরাসরি যেটা বুঝতে পারছিলেন, কিল গেমে জিশান সহজে হারবে না, সহজে মরবে না। ও সত্যিই একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। ও হারার আগে মারবে, মরার আগেও মারবে। ফ্যামিলির জন্য টন ওর সবচেয়ে ধারালো অ줏।

কিস্তু যে-প্রশ্া রঙ্গপ্রকাশকে শ্খাচচচ্ছিল সেই প্রশ্নটই এবার করলেন, আমি যে আপনার সাইকোলজিক্যাল প্রোফইল তৈরি করছি সেটা আপনি জানলেন কেমন করে?’
‘সিমান। বলে হাসল জিশান। মাথা দোলাল কয়েকবার। তারপর : ‘সিমান আরও অনেক কিছু জানে। ও জনে বে, আপনার ইকনমিক ইনডেক্স ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে চলে গেছে। সেটা ইমপ্রভ করার জন্যে আপনার হাতে সময় রয়েছে নব্বই দিনেরও কম... '

রঙ্গপ্রকাশ স্তি্ভিত হয়ে গেলেন। ভয় পাওয়া বিমূঢ় মুত্থ তাকিয়ে রইলেন জিশানের দিকে।

পর্ণমালা এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন স্বামীর দিকে। এ কী কथা अনছেন তিনি! ই. আই. নেমে গেছে!

রঙ্গক্রাশ কাঁপত লাগলেন। বিম্ময় আর নপুংসক রাগ ওঁর তেতরে উত্তাল ঢেউ তুলল।

সিমান এ-কথা জানল কেমন করে! যে-কথা রঙ্গপ্রকাশ ভীযণ যত্নে গোপন রাখতে চেয়েছেন সেটা এখন যেন হুড়মুড়িয়ে ৰাঁপিয়ে পড়ন সবার সামনে কফি টেব্লের ওপরে।

পর্ণমালা যে এ-ঘটনায় বেশ ধাক্কা থেয়েছেন সেটা ওঁর বিহুল চোখমুঢে স্পষ্ট ধরা পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশের মুণ্ে যে-নীরব প্রশ্নটা ফুটে উঠেছিল সেটা জিশান পড়ে নিতে পেরেহিল। তাই ও আলতো গলায় থেমে-থেমে বলল, 'সিমান...আপারার... আপনার ই-মেল অ্যাকাউন্ট...झাক করেছে। ছাক করে সব জেনেছে। ই. আই. ক্রিসিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়ার কথাও...।'

পর্ণমালা স্বামীর পাশে চলে এলেন। অসহয় মুখে ওঁর দিকে তাকিয়ে



রঙ্গ্রকাশ মাথা ঝুঁকিয়ে. বসনেন। সামান্য মাথা নাড়লেন ওপর-নীচে। ভাঙা গলায় বললেন, 'সত্যি-সব সত্তি...।'

জিশান ভেঙে পড়া বাবা-মা-কে দেখছিল। ওর খুব খারাপ লাগছিল। নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের ব্যাপারটা সিমানই ওকে বলেছে। জিশানের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার কথা। यে-বাবা সবসময় মাথা তুলে বাঁচার কথা বলতেন।

ইকনমিক ইনডেক্স! মুখের ভেতরটা তেতো লাগল জিশানের। এই অমানবিক নিয়ম একমাত্র নিউ সিটিকেই মানায়।

এখন কী করবেন রঙ্গপ্রকাশ? কোথায় মুখ লুকোবেন? সিমান ওঁর মেল গাক করে সবকিছু জেনেছে বলেই কি সুইসাইড করতে গির্যেছিল?

সম্পর্কের টানের অভাব বহুদিন ধরে টের পেয়েছে সিমান। আর একইসঙ্গে জানতে পেরেছে ই. আই.-এর নড়বড়ে অবস্থা। তই হয়তো ও সুইসাইড করতু গিয়েছিল এবং জিশান দেবদূত হয়ে ওকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখन कী হবে?

সিমনককে ফিরে পেয়ে রঙ্গপ্রকাশ আর পর্ণমালা প্র্রণ ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু এখন যদি সিমান জানতে পারে যে, ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর নীচে নেমে যাওয়া

এই ই. আই.-কে মেরামত করার কোনও কমতা ওঁদের নেই! তা হলে কী হবে? সিমান কি সেরে উঠে আরও উচ্ছছখল হয়ে উঠবে, নাকি আবার সুইসাইড করায় চেট্টা করবে?

তथन?
রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকালেন। ভেতরে-ভেতরে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। জিশানকে কি থুলে বলবেন নতুন সমস্যার কথা? যদি এক্ষুনি জিশানকে কিছু না জানান তা হলে পরে আর জানানোর সুযোগ পাওয়া यাবে না। জিশান হয়তো আর পাঁচ-দশ মিনিট কথা বলেই চলে যাবে। তারপর হয়তো ওর সজ্গে আর কেনওঙিনও দেখা হবে না।

রঙ্গপ্রকশের বারবার মনে হচ্ছিল, জিশান এমনই একজন মানুয যে সব পারে। সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে নিম্মেে। ওর সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইল থেকেও ওর ‘প্রবলেম সলভিং স্কিল’-এর ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল। ঢা হলে একবার বলৌই দেখা যাক না!

রঙ্গপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে এলেন। চাপা গলায় বললেন, আমকে ক্ষমা কোরো, পর্ণ। আমি তোমাকে ই. আই-এর ব্যাপারটা সাহস করে বলে উঠতে পারিনি। আমি পাগলের মতো একটা সলিউশান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম--কিন্তু কেনও পথ পাইনি’।
 আমাদের তা হলে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হবে?’
'জানি না।' মাথা নাড়লেন রস্পপ্রকাশ : 'शতে এখনও মাস তিনেক সময় আছে। কিন্তু ততে কী লাভ! যখন সামনে কোনও ওয়ে আউট দেখতে পাচ্ছি ना...।
‘ওল্ড সিট্তিতে গিয়ে থাকতে হলে আমি...আমি সিম্প্লি মরে যাব। আর...আর সিমানও কতটুকু বাঁচবে জানি না...' পর্ণমালার চোথে জল এসে গেল। হাত দিয়ে ঢোখ মুহলেন।

জিশান খুব অস্বস্তি পাচ্ছিল। বুঝতে পারছিল, একটা অত্তন্ত ব্যক্তিগত আলোচনার আবহাওয়ায় ও চুকে পড়েছে।

রঙ্গপ্রকাশ জিশানের দিকে তাকালেন। একটু আগেই জিশান বলছিল, ও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান। কিক্তু রঙ্গপ্রকাশের এখন মনে হল, জিশান একা নয়—তিনি নিজেও একজন ডেসপারেট ফ্যামিলি ম্যান।

রঙ্গপ্রকাশ দুবার ঢোক গিললেন। চোয়াল শক্ত করে কিচুহ্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। তারপর জিশানের দিকে তাক্কিয়ে বললেন, 'জিশান, আপনি আমার ছেলেকে আজ বাঁচিত্যেছেন বটে কিন্তু আসলে পুরোপুরি বাঁচাত্ পারলেন না। কারণ, আমরা তিনজনেই শেষ হয়ে গেছি। আমাদের হাতে আর মাত্র তিন মাস

সময়—তারপরই আমরা শেষ।'
জিশান বলল, ‘জানি—ভালো করেই জানি। আমি একসময় এই নিউ সিটিতে ছিলাম। আমার যখন বারো বছর বয়েস তখন এই ই. আই.এর প্রবলেমের জন্যে আমাকে আর আমার বাবাকে নিউ সিটি ছেড়ে চলে যেতে হয়। বাবার চোখের জলের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। তখন আমার নাম ছিল নিশান। ওল্ড সিটিতে গিয়ে বাবা আমার নতুন নাম রাখেন জিশান। আমি সেই দিনটার কথা ভুলতে পারি না, ডক্টর। আমার বাবা বাকি জীবনটা কী কষ্ট পেয়েছিলেন তা আমি ভালো করে জানি।

রঙ্গপ্রকাশ মুখ নামালেন। জিশানের ব্যথাটা অনুভব করতে চাইলেন।
কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জিশান। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, ‘ডক্টর, আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কোড নম্বরটা আমাকে দিতে পারেন?’
‘কেন?’ চমকে উঠে মুখ তুললেন রঙ্গপ্রকাশ।
জিশান বলল, ‘দিন না—একটু দরকার আছে—।’
রঙ্গপ্রকাশ পর্ণমালার দিকে তাকলেন। দেখলেন, ওঁর মুখেও বিস্ময়।
জিশানের কথা আর ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল যে, রঙ্গপ্রকাশ আর আপত্তি করতে পারলেন না।


রঙ্গপ্রকাশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অ্যাকাউন্ট কোড কেন চাইছে জিশান? ও কি রঙ্গপ্রকাশের ই. আই.এর ব্যাপারটা হাতে-কলমে যাচাই করে নিতে চাইছে?

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের কেডড নম্বরটা ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করলেন। আর জিশানও টাচ স্ক্রিন কি-প্যাডে আঙুল ছুঁয়ে সংখ্যাগুলো ওর ফোনে ইনপুট করতে লাগল।

নম্বর বলা শেষ হলে রঙ্গপ্রকাশ কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, ‘এই কোড নাম্বার দিয়ে আপনি কী করবেন?’
‘এই কোড নম্বর দিয়ে আমি সিমানকে বাঁচাব। এবার বোধহয় ওকে পুরোপুরি বাঁচাতে পারব।’
'তার মানে?' পর্ণমালা। ওঁর চোখের পাতা সামান্য কাঁপছে।
হাসল জিশান : 'ম্যাডাম, এই নিউ সিটিতে এসে আমি বহু টাকার প্রইজ জিতেছি। আমার এক বন্ধু মনোহর সিং-ও ওর প্রইজ মানি আমার ছেলেকে গিফ্ট করে গেছে। আমার এখন অনেক টাকা। এই টাকাটা আমি কাজে লাগাতে চাই...’ কথা বলতে-বলতে স্যাটেলাইট ফোনের কি-প্যাডে আঙুল ছোঁয়াচ্ছিল জিশান। কয়েক সেকেন্ড পরে মুখ তুলে রঙ্গপ্রকাশের দিকে তাকাল, হাসল :

## www.banglaboêkplff.b゙ogspot.com

‘আপনার অ্যাকাউন্টে আমি আট লাখ টাকা ট্রান্সফার করলাম, ডক্টরর...। আপনাদের জন্যে না-সিমানের জন্যে। আর একটা কথা...প্লিজ, আমাকে কোনও ধন্যবাদ জানাবেন না...।'

রঙ্গকাশ হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। পর্ণমালা স্বামীর গায়ে হেলে পড়লেন, ওঁর বাা্হ आাক্ড়় ধরলেন।

পর্ণমালার চোখ বোজ। ঠোট কাঁপছে।
রঙপ্রকাশ কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু ওঁর কथা জড়িয়ে গেল।
জিশান ঠোটে আডুল তুলে ইশারায় ওঁকে চুপ করতে বলল। তারপর উঠে দাঁড়াল।

ডডক্টর, কিল গেমে জিতে আমি যে-একশো কোটি টাকা পাব তা দিয়ে ওল্ড সিটির প্রুর মানুষকে আমি নিউ সিটির সিটিজেন করে দিতে পারব। আমি ওদের এখানে নিয়ে আসতে চাই কেন জনেন?’ ঠোটের কেণে হাসল জিশান। বলল, ‘আপনাদ্রর এখানে মনুষ্যত্বের বড় অভাব। ওরা এখানে এলে সৌই অভাব অনেকটা ঘুচবে...।’

এক লহমা চুপ করে থেকে জিশান বলল, 'যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি সেপ্টেম্বরের দু-তারিখের পর আমাদের আবার দেখা হবে।’


স্যাটেলাইট ফোনটা পকেটে ঢোকতে-ঢোকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জিশান। খুব টায়ার্ড লাগছে। গালটওও সামান্য জ্রালা করছে। তবে মনটা ভালো লাগছিন।

জিশান ঘড়ি দেখল। না, আর দেরি করনে চলবে না। সুধাসুন্দরীর কাছে সময়ের মধ্যে ফিরতে হবে। কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় ও একটা হাই তুলল।

সুখারাম নস্কর মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল।
कী সাংঘাতিক নীল! দেখলে লোভ হয়। যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, 'চলে আয়!'

আর সেই নীলের চাদরে গাঁথা রহ্যেছে একটা ঝলমলে সোনালি বল। জ্রলছে। তবে এখন বিকেল বলে তেজ কম।

এই দুটো জিনিসের দিকে তাকানেই সুখারামের স্বাপীন হতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে। আর তখনই ওর মন-কেমন-

## করা 火ুরু হয়।

সেন্ট্রাল জেলের প্রকাণ মাঠে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েদিরা। কেউ-কেউ বারবেল বা ডাম্বেল নিয়ে শরীরচর্চা করছে। কয়েকজন নিজেদের মধ্যে টিম তৈরি করে থেলাধুলো করছে। পাচটটা ফুটবল মঠেে মধ্যে ছুটোছুটি করছে। তার পিছনে খেলোয়াড়রা। আবার কোথাও বা ক্রিকেট বল আর ব্যাট নিয়ে ইইহই চলছে।

সব কয়েদির পরনে একইরকম পোশাক। ছই রঙের টাইট স্লিভলেস ভেস্ট আর কালো রঙের টাইট প্যান্ট। প্রত্যেকের ভেস্টের ওপরে সামনে এবং পিছনে বারকোড প্রিন্ট করা। এই বারকোড লেজার স্কানার দিয়ে স্ক্যান করনেই সেই কয়েদির সমস্ত খুঁটিনাটি স্কানারের ফাইবার অপটিক কেব্ল দিয়ে চলে যাবে কম্পিউটরের মেমোরিতে। এবং কম্পিউটরের মনিটরে ফুটে উঠবে।

শ্ধুমাত্র বিকেলের এই ড্রিলের সময় কয়েরিদ্রের সেল থেকে বেরোতে দেওয়া হয়। চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যষ্ত এই ‘্বাধীনতা’-র সময়টাকে ওরা ঠাট্টা করে বলে ‘ফান আওয়ার’। এই সময়টা জেলের খোলা মঠঠে ওরা থেলাধুলো কি গল্পণুজব করে নিজেদের খুশিমতো সময় কাটায়।

জেল বিল্ডিং-এর এক কেণে রয়েছে ‘ড্রিল কাউন্টার’। সেই কাউন্টার

 পাচটা বাজলেই সমস্ত আইটেম কাউন্টারে আবার ফেরত দিয়ে জেল বিল্ডিংএ पুকতে হয়। কেউ যদি কোনও আইটেম কাউন্টারে জমা না দিয়ে জেল বিল্ডিংএ ঢেকে তা হলে স্পেশাল লেজার স্কানার লাগানো দরজা দিয়ে পার হওয়ার সময় বিশেষ ধরনের বিপিং সাউন্ড শেনা যাবে। তখন শাস্তি হিসেবে সেই ‘অপরাধী'-কে একটানা তিনদিন স্রেফ জল খেয়ে কাটাত হবে।

সুখারাম মাঠের একটা জায়গায় পা ছড়িয়ে ছুপচাপ বসে ছিল। চারপাশের চেনা দৃশ্যটা একজন নিরপেক্ষ দর্শকের চোথে দেখছিল। আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে আকশের দিকে তাকাচ্ছিল।

ড্রিলের এই সময়টা মাঠে বসে বা শয়ে আকাশের দিকে তাকালেই ওর এই সেন্ট্রাল জেল থেকে পালাতে ইচ্ছে করে। যদিও ও জানে সেটা অসম্তব।

হঠাৎই সুখারামের নজরে পড়ল, বেশ খানিকটা দূরে দুজন কয়েদির মধ্যে হাতাহাতি লেগেছে।

বসস, সঙ্গে-সঙ্গে সেন্ট্রাল জেলের লং ডিসট্যান্স লেজার স্কানার কাজ শুরু করে দিল। বেশ কয়েেটটা ওয়াচ টাওয়ার থেকে সিকিওরিটি গার্ডদের লেজার স্ক্যানিং গান পলকে অ্যাক্টিভ হয়ে উঠল। সেই লেজরের আলো গিয়ে পড়ল যুযুধান দুই ক<্যেদির ওপরে। ওদের বারকোড স্ক্যান হয়ে সমষ্ত

তথ্য ঢুকে পড়ল জেলের কম্পিউটারে।
এরপর কী হবে সুখারাম জানে।
ওই কয়েদি দুজনকে নিয়মমাফিক কম-বেশি শাস্তি পেতে হবে।
সত্যি, এই সেন্ট্রাল জেলের নজরদারির প্র্বুক্তির তুলনা নেই!
সুখারাম নস্করের বুক ঠেলে একটা দীর্ঘশ্পাস বেরিয়ে এল। ও অলসভাবে চেয়ে রইল লড়াইখ্যাপা দুই কয়েদির দিকে।

কয়েদি দুজনের লড়াই একটু পরেই থেমে গেল।
এরকমটা প্রয়ই হয় : এই লড়াই, তো এই ভাব।
এই জেলে সুখারাম আছে তিন বছর, কিন্তু তিন বছরে মাত্র চারবার ওর সঙ্গে অন্য কয়েদির হাতাহাতি হয়েছে। আর প্রত্যেকবারই সুখারাম ঝগড়া মিটিয়ে নিয়েছে। তারপর হেসে হাড়েক করেছে শক্রুর সল্গে।

কেনও-কোনও কয়েদি সুখারামকে দুর্বল ভাবলেও বেশিরভাগ কয়েদি তা ভবেনি। বরং তদের মনে হয়েছে, যে-ছেলেটট ছ’যুট এক ইঞ্চি লম্বা, যার হাত আর পায়ের মাস্ল নমনীয় অথচ মজবুত, যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে, শূন্যে ছ’uুট লাফাতে পারে, সে আর যা-ই হোক দুর্বল হতে পারে না।

সুখারাম নস্কর নিজেও সেটা জনে। তবে যেটা অনেকেই জনে না সেটা হল্ন, ঝগড়া কিংা মারপিট করতে ওর জ্রে্গো লাগে না। ওর লালো ল্লাগে


ও স্বপ্ন দ্যাথে, ও দৌড়চ্ছে-না, দৌড়চ্ছে না, উড়ে যাচ্ছে বাতাসের বেগে, আর ওর মাথার ওপরে নীল আকাশ আর সোনালি সূর্য।

অথচ হাফ-ম্যারাথন রানার সুখরাম নস্কর এখন সেন্ট্রাল জেলের দ্রান্সপারেন্ট ফাইবারের পাচিলের ঘেরাটোপে বন্দি।

সুখারাম পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। একজন লং ডিসট্যাস্স রানারের প্র্যাকটিসের অভ্যেস। এই জেলে আসার আগে, যখন ও স্বাীীন ছিল, তখন ও সপ্তাহে গড়ে ছাপ্রান্ন কিলোমিটার করে দোড়ত। প্রতিদিন প্রাকট্সিসের সময় ওর কোচ বরাট স্যার স্টপ ওয়াচ হাতে লক্ষ রাখতেন। বলতেন, 'সুখা, আ্যাভরেজে তোর এক-একমাইল কভার করতে পঞ্চান্ন সেকেন্ড লেগে যাচ্ছে!’ মাথা নাড়তেন বরাট স্যার ঃ ‘কমা, কমা। টাইম আরও কমা। অন্তত পঞ্চাশ সেকেঙ্ড কর্...।'

বরাট স্যার কোচিং-এর জন্য সবার কাছ থেকে টাকা নিতেন-শ্ধু সুখারামের কাছ থেকে কিছু নিতেন না। কারণ, তিনি সুখারামের বাড়ির অবস্থা জানততন। অসুস্থ বিধবা মা, আর স্কুলে পড়া একটা ছোট বোন। অভাব ছড়়া ওদের সম্বল বলতে আর কিছু ছিল না। তিনটে প্রাণীর দু-বেলার খোরাকি জোটাত সুখারাম ওন্ড সিটিত্তে দিনে দশঘণ্টা করে সাইকেল ভ্যান টানত। বরাট

স্যার ওকে উৎসাহ দিয়ে বলত্নে, ‘বাচ্চা, চালিয়ে যা। জানিস, লোড করা সাইকেল ভ্যান টানলে পাক্রের কাফ মাস্ল কত ডেভেলাগ করে, কত স্ট্রং হয়! পঁচিশ বছরের সুখারাম সব বুঝত। বরাট স্যারের কথাগুলো মিথ্যে ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে একটা আক্ষেপ লুকিয়ে থাকত। নিজের সেরা ছত্র সুখারামের জন্য তিনি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেননি। সুখারামের তাত দুঃখ ছিল না। ও হাসিমুখে সাইকেল ভ্যান টানত। আর রোজ ভোরবেলা প্র্যকটিসে আসত—একদিনও কামই করত না। কারণ, দৌড়তে ওর দারুণ ভলো লাগত। ওর মনে হত, দৌড়টই ওর জীবন।

সেইজন্ই সুখারাম ওর পুরোনো অভ্যেস ছাড়তে পারেনি। জেলের ভেতরে এই বিশাল থোলা মাঠে ও ড্রিলের সময়টায় দৌড় প্র্যাকটিস করে। রোজ গড়ে আট কিলোমিটার করে ওর দেড়়ো চাই-ই চই। তা হলে সপ্তাহে ছাপ্পান্ন কিলোমিটারের কোটা পূরণ হয়। বরাট স্যার যা বলেছিলেন।

এই মাঠে যখন ও দৌড়য় তখন ওয়াচ টাওয়ারের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও একজন সান্ট্রীকে ও বরাট স্যার বলে কল্পনা করে নেয়।

বয়েস পঞ্চাশ-বাহান্ন। রোগা চেহারা। মাথায় অর্ধেকটা টাক। চোেে চশমা। গাল বসা। কপালে অনেক ভাঁজ। পরনে খদ্দরের পাঙ্জবি আর ঢোলা ফুলপ্যান্ট।

 তখন তার মুখ দিয়ে থুতু ছিটকে বেরোত।

বরাট স্যার বয়েসকালে লং ডিসট্যাল্স রানার ছিলেন। তবে দৌড়ে খুব বেশি এগোতে পারেননি। এ-পাড়া সে-পাড়ায় দু-চারটে লোকাল কাপ জিতেছেনব্যস, এই পর্যষ্তই।

অনেকে আড়ালে ওঁকে ব্যঙ্গ করে বলে, যারা আ্যাথলেটিক্সে আলট্মিেলি কিছু করতে পারে না, তারাই বয়েস হলে কোচ হয়ে ইয়াং অ্যাথলিটদের ওপরে মাতব্বরি করে আর পয়সা কামায়।

কথাট कী করে যেন পাঁচকান হয়ে বরাট স্যারের কানে গিয়েছিল। পরদিন ভোরবেলা মাঠে এসে বরাট স্যার বলেছিলেন, ‘শোন, আমি তোদর আর প্রাকটিস করাব না।’

সুখারামরা মোট পঁচজন ছিল সেদিন। ওরা প্রায় একসঙ্গে জিগ্যেস করেছিল, ‘কেন, স্যার? শেখাবেন না কেন?’

বরাট স্যার ওদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছিলেন। ভাঙা গলায় জানতে চেয়েছিলেন, 'আমি তোদের ওপরে মাতব্বরি করি? তোদর কাছ থেকে পয়সা কাম!?

বরাট স্যারের সেই অপমান মাখা কণ্ঠষ্বর সুখারামের আজও মনে আছে।

প্রশ্ন দুটো করার সময় বরাট স্যার কেঁদে ফেলেছিলেন। এবং সেই কান্না মেশানো গলায় একই প্রশ্ন বারবার করতে－করতে ভাঙাচোরা মানুষটা পাশের একটা গাছের নীচে বসে পড়েছিলেন। আর সুখারামরা স্যারকে ঘিরে ধরে প্রাপপণে সাষ্ব্বনা দিয়েছিিল，আর বারবার বুঝিফ্যেছিল যে，কথাগুলো সব মিথ্যে।

প্রায় আধঘণ্টা পর চশমার কাচ মুছে আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবং কোচিং তরু করেছিলেন। কিন্তু সেদিন ততটা মন দিয়ে শেখাতে পারেননি।

স্যারের কথা ভাবতে－ভাবতে সুখারাম নস্কর জেলের মাঠে শুয়ে পড়েছিন। ওর চোে জলও এসে গিয়েছিল। বরাট স্যার এখন কী করছেন কে জানে！তিনি যদি জননতেন，সুখারাম একজন সান্র্রীকে বরাট স্যার ভেবে নিয়ে সেন্ত্রাল জেলের এই মাঠে রোজ বিকেলে দৌড় প্রাকটিস করে তা হলে को খুশিই না হতেন！

চোখ বুজ্েে স্যারের কथা ভাবছিল সুখারাম，আর মনে－মনে রেসিং দ্ব্যাকে দেড়িচ্ছিল। द্ব্যাকের এক－একটা পাক শেষ করার সময় দ্র্যাকের ঠিক পাশে ও বরাট স্যারকে দেখতে পাচ্ছিল। স্টপ ওয়াচ দেখছেন আর উত্তেজিত হাতের ইশারা করে বলছেন，＇চালিয়ে যা，সুখ！！চালিয়ে যা！＇

সুখারামকে স্যার খুব ভালোবাসতেন। সবসময় বলতেন，ঢুই আমার সেরা ছত্র। आমি শিয়োর－তই একদিন কিছ্ না কিছ করে দ্রেখাি．．．।
 হয়েছিল। কাপ，ক্যাশ প্রাইজ আর সার্টিফিকেট নিয়ে ডায়াস থেকে নামতেই বরাট স্যার ওকে জাপটে ধরেছিলেন। আবেগে মানুষটা কোনও কথা বলতে পারছিল না। বারবার అধু বলছিল，＇সুখা．．．সুখা．．．সুখা．．．।＇

প্রাইজের টাকা দিয়ে বরাট স্যারকে একটা খদ্দরের পাা্জাবি আর একটা সস্তার ফুলপ্যান্ট কিনে দিয়েছিল সুখারাম। ওঁর বস্তির দেড়খানা ঘরে গিয়ে যখন ও উপহারের প্যাকেটটা স্যারকে দেয় তথন হতবাক মানুষটা আবার ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর আবেগে কেঁপে যাওয়া গলায় বিড়বিড় করে বলছিল， ‘এ ঢুই কী করলি！এ তুই कী করলি！তোর নিজেরই এত টানাটানি．．।＇

সুখারাম উত্তরে নীহ হয়ে স্যারের পা জড়িয়ে ধরেছিল। ভাঙা গলায় বলেছিল，‘এ আমার গুরুদ্ষিণা，স্যার．．．৩রুদক্ষিণা．．．।

বরাট স্যার ওকে একহাতে ধরে দাঁড় করিয়ে মাথায় হাত রেথে বলেছিলেন，‘তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করি，সুখা। তুই আমার সেরা ছাত্র．．．।’

স্যারের পাজ্জাবিতে মুখ अঁজে সুখারাম বলেছিল，＇আমি শৃধু ছুটতে চাই， স্যার। সারাজীবন ছুটতে চাই．．．।＇

ওর মাথায় হাত বোলাতে－বোলাতে স্যার বলেছিলেন，＇犭火火ু ছুটবি না－ আমি জানি ঢুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি। অনেক বড় কিছু．．．।

আজ হঠাৎ বরাট স্যারের কথাগুলো খুব বেশি করে মনে পড়ছে।
স্যার বলততন, 'শোন, পিচ্চর রাস্তা কিংবা সিমেন্ট বাঁধানো চাতলে কখনও দৌড়বি না। আর মাঠে যদি কোনও ঢল টের পাস তো সেখানেও প্র্যাকটিস করবি না। সমান জায়গা চাই—সমান। আর শোন, ছোটার সময় পায়ের তলার মাটি স্প্রিং-এর কাজ করে। এই স্প্রিং অ্যাকশান সিম্টেন্টে কি অ্যাসফান্টে পাবি না-।

একদিন জুতোর ফিতে তিলে করে বাঁধা ছিল বলে ছুটতে-ঘুটতে আচমকা দ্র্যাকে ছিটকে পড়েছিন সুখারাম। একইসক্গে সেই রেস থেকেও ছিটকে গিয়েছিল।

ততে বরাট স্যার বাপক রেগে গিয়েছিলেন। দু-চারটে অশ্লীল গালিগালাজও বয়স্ক লোকটার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুখারামকে সেদিন স্যার মুত্থে তুলোধোনা করেছিলেন। কথার সঙ্গে-সঙ্গে সেদিন স্যারের মুখ থেকে থুতু ছিটকে বেরোচ্ছিল।
‘আরে ছাগল, প্রিপ্যরেশানে ধেয়ান দে! তুই যখন দ্ব্যাকে দৌড়স তখন কি আসলে তুই দৌড়স নাকি?’

সুখারাম প্রশ্নটার মানে বুঝরে না পেরে হা করে স্যারের মুখ্রে দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাগে অগ্নিশর্মা মানুষটা তখন বলেছিল্গ, ‘লশান পাঁঠা, দ্র্যাदক যখন তুই


এ-কথা বলতে-বলতে পাগলের মতো নিজের বুকে আডুল ঠুকেছিল লোকটা।
‘সুখা, তোকে নিয়ে আমার কত আশ! আর তোর এই ভুল! ছিঃ!’ আপশোশে এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়েছিলেন বরাট স্যর : 'মন দিয়ে প্র্যাকটিস কর্-মন দিয়ে। আমি শিয়োর, ঢুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি... বড় কিছু...’’

হাঁ, শেষ পর্যন্ত ‘বড় কিছু একটা’ করে দেখিয়েছে সুখারাম। অত্যষ্ত দক্ষতার সঙ্গে একা পাচ-পাঁচটা ক্রিমিনালকে খতম করে দিয়েছে। আর সেই ‘বড়’ কাজটা করার সময় ওকে দৌড়তে হয়েছিল। এমন দেড় ও লাইফে কখনও দৌড়য়নি।

এই সাংঘাতিক ঘটনাটার খবর পেয়ে বরাট স্যার থানায় ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। এসে প্রিয় ছাত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সেদিন স্যারের বুকে মুখ রেখে সুখারাম নস্কর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল। আর একইসল্গে ও স্যারের খদ্দরের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ পেয়েছিল।

সেই গক্ধে এত আদর আর আন্তরিকতা মাখানো ছিল যে, সুখারামের মনে হয়েছিল এই গন্ধটা স্বর্গ থেকে ভেসে আসছে।

রবিবারের সেই মেঘলা বিকেলটা সুখারামের স্পষ্ট মনে আছে। শেবিকেন থেকে ওর জীবনটা বাঁক নেওয়া শুরু করেছিল।

কাঠ-মিলের মাঠে ফুট্টল ম্যাচ ছিল। সুখারামদের বস্তির সক্গে পোড়া বস্তির ছেলেদের।

কাঠ-মিলের মাঠটা মাপে বিশাল বড়। তার তিন দিক ঘিরে রয়েছে বড়বড় স’মিল। তার মধ্যে গোটা ছয়েক চানু রয়েছে, আর বাকিগুলো গা-ছমহমে ভাঙচোরা পোড়োবাড়ি। কাঠ-মিলগুলোর সামনে ছোট-বড় কাঠের ঔঁড়ির স্থৃপ। লম্বা, করে শোয়ানো। একটার ওপরে একটা চাপিয়ে সার দিয়ে ছোট-ছোট পিরামিডের মতো সাজানো। ক’দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে গঁড়িওলো ভেজা, বাতসে ভেজা কাঠের ভুসির গন্ধ। ছোটবেলায় সুখারাম যখন বন্ধুদের সঙ্গে মিলে ঝুলন সাজাত তখন এইসব মিল থেকে বিনাপয়সায় কাঠের ভুসি নিয়ে य্যে 1
 তারপরই নোংরা জলের সরু খাল।

খালের জল কালো, তেলচিটে—অনেকটটই কহুরিপানায় ঢাকা। খালের দু-পাড় থেকে কালো মাটি আর পাঁক ঢাল বেয়ে প্রায় মাঝখান পর্যন্ত চলে এসেছে। খালের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে প্রবল দুর্গ্ধ্ নাকে এসে ধাক্কা মারে। তার একটা বড় কারণ, কুকুর-বেড়াল গোরু-ছাগল মারা গেলে তাদের ডেডবডি ফেলার জায়গাও এই খাল।

খালপাড় ধরে একটানা ঝুপড়ি। বর্ষার আক্রমণ ঠেকাতে নীল, সবুজ, কালো কিংবা লালরঙের পলিথিনের টুকরোয় ঢাকা।

মাঠের কাছ থেকে প্রায় কিলোমিটারখানেক দূরে পোড়া বস্তি। সুখারামের খুব ছোটবেলায় খালধারের ওই বস্তিটায় আগুন লেগে গিয়েছিল। তার পর থেকেই ওটার নাম হয়ে গেছে পোড়া বস্তি।

পোড়া বস্তির বেশিরভাগ ছেলৌই চূরি, ডাকাতি আর ছিনতাইয়ের কাজে জড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে খুন-জখমের খেলাও আছে। ওদের মধ্যে ফেরোশাস্ বে দু-চারজন, তারা ধীরে-ধীরে ‘ভাইয়া’ বনে গেছে। ফলে তারা পয়সা করেছে। বস্তিতে থেকেও ঠাটবাট বজায় রাখতে পারে। মোটরবাইকে চেপে ঘুরে বেড়ায়।

সুখারামের সঙ্গে পোড়া বস্তির কারও কোনওরকম দোত্তি ছিল না। তবে

সুখারামদের বস্তির কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ওদের বোগাযোগ ছিল। আর সেই যোগাবোগ থেকেই কীভাবে যেন ফুট্বল ম্যাচটার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল।

সকাল থেকেই মেঘলা, আর আকাশ থেকে একঘেয়েভাবে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

বিকেল চারটের সময় দুটো দল দুটো ফুটবল নিয়ে কাঠ-মিলের মাঠে হাজির হয়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া মাঠে ছিন জনা তিরিশ কি চল্লিশজন দর্শক। কারও মাথায় ছাত, কারও বা পলিথিন, আবার কারও মাথায় শুধুই ভেজা আকাশ। মাঠের পাশে রাথা ভেজা কাঠের গুঁড়ির গ্যালারিতে দর্শকরা ভে-যার মতো বসে পড়েছিল। এ ছাড়া মাঠের গোলপোস্টের পিছনে দাঁড় করানো ছিল বেশ কয়েকটা সাইকেল, মোটরবাইক, আর সাইকেল ভ্যান। তার মধ্যে সুখারামের সাইকেল ভ্যানটাও ছিল।

খেলা শুরু হওয়ার দু-পাচচ মিনিট পরেইই বৃষ্টি থেমে গেল। ফলে দর্শকের ভিড়ঁট আরও একটু বেড়ে গেল। ইইচই চিৎকারের মধ্যে খেলা চলতে লাগল। মাঠ ভরতি জল-কাদায় বাইশজন প্লেয়ার আর একজন রেফারি বেদম ছুটোছুটি করতে লাগল।

প্লেয়ারদের কারও পা়্যে কেড্স, কারও পায়ে সস্তার স্নিকার, আর বেশির্তগগী খাল পান

সুখারামির দ-জ্রোড়া রানিং ত ও পুরোনো জুতোট পরেই মাঠে নেমেছিল। এ ছাড়া পোশাক বনতত হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি।

সুখারাম ফুট্বল প্লেয়ার হিসেবে বিরাট কিছু নয়, তবে লং ডিসট্যান্স রানার হওয়ার সুবাদে ও অনায়াসে বলের পিছনে ছুটোছুটি করতে পারছিল। অন্যদের মতো সহজে হাপপিয়ে পড়ছিল না।

খেলা যখন প্রায় শেষের দিকে তখনই গোলমালটা বাধল।
ম্যাচের রেজাল্ট তখন ফোর টু থ্রি। সুখারামদের টিম এক গেলে হারছিল।

সেই অবস্থায় হঠাৎই মিডফিল্ড থেকে সুখারাম পায়ে বল পেয়ে গেল এবং হরিণের মতো ছুট্তে ওরু করল।

ছুটতত-ছুটতে ও ঢুকে গেল বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে। কিন্তু গোলে শট নেওয়ার মতো পজিশন তৈরি করার আগেই বিপক্ষের একজন ডিফেে্ডার পাশ থেকে ছুটে-এসে ওকে হাঁুর নীচে লাথি মারল।

সুখারাম উলটে পড়ল এবং রেফারি বাঁশি বাজাল। পেনাল্টি।
ম্যাচ ড্র করতে পারার সুয়োগ সামনে পেয়ে ওদের দলের সবাই ‘পেনাল্টি! পেনাল্টি!' বলে চেচোতে লাগল। আর ওদের সাপোর্তাররা তার দশণুণ

## ১৫マ www.banglabôfk plff.b\#ogspot.com

চিৎকারে মেঘলা আকাশ ফাটাত লাগল।
সুখারাম সেরকম কোনও চোট পায়নি। পড়ে যাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও উঠে াঁড়িয়েছিল। মাথাট পলকের জন্য গরম হয়ে গির্যেছিন। কিন্তু রেফারি পেনাল্টির বাঁশি বাজানোয় ও রাগটাকে সামলে নিয়েছিল। শধু বেঁটে মোটা ডিফেঙ্ডারটার দিকে কটমট করে কয়েকবার তাকিয়েছিল।

রেফারির দেথিরে দেওয়া জায়গায় বল বসিয়ে সুখারাম যখন পেনাল্টি শট নেওয়ার জন্য কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তখনই সেই ডিফেন্ডার ছেলেটা ছুটে এসে এক লাথিতে বলটাকে উড়িয়ে দিল। তারপর সুখারামকে লক্ষ করে খিত্তির বন্যা ছুট্যেে তেড়ে গেন ওর দিকে। জোড়া হাতের জোরালো ধাকায় ওকে ছিটকে ফেলে দিল।

ব্যস, শুরু হয়ে গেল প্রবল হট্টগোল আর হাতাহাতি। রেফারি গওগোল থামনোর চেষ্টায় ঘন-ঘন বাঁশি বাজাতে লাগল, কিন্তু কেউ তাত কান দিচ্ছিল ना।

এবটু পরেই হাতাহাতিটা মারপিটে প্পাঁছে গেল। তার সঙ্গে পরস্পরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে চোখ রাঙিয়ে গলাবাজি করে তর্কাতর্কি।

মাঠের ধার থেকে, কাঠের গঁডড়ির ‘গ্াালারি’ থেকে, দর্শকরা নেমে এল

 বেড়াতে কী করে যেন মাঠের কিনারায় চলে এল।

বেঁটে ডিফেন্ডারটা বারবারই সুখারামের দিকে তেড়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু কয়েকজন ওর হাত-কোমর ইত্যাদি आঁকড়ে ধরে ওকে বশে রাখছিল। যেটা বশে রাখা যাচ্ছিল না, সেটা হল ওর মুখ থেকে ফোয়ারার তোড়ে বেরিয়ে আসা অশ্রাবা থিস্তি।

সুখারাম হাত-পা নেড়ে প্রতিবাদ জনাচ্ছিল, তবে বড় কোনও গোলমালে জড়াতে চাইছিল না।

হঠাৎই বেঁটে ডিফেন্ডারটা বুন্নো মোেের শক্তি দিয়ে এক ঝাটকায় সঙ্গীদের হাতের বাধন ছাড়িয়ে নিল। তারপর সুখারামের ওপরে বাঁপিয়ে পড়ে ওর মুখ্ একটার পর একটা ঘুসি বসাতে লাগল।

সুখারাম যতটা পারল সেগুলো এড়িয়ে গেল কিংবা মুখের সামনে হাতের ঢাল তৈরি করে আটকাল। তারপর আ্যাথিটের ক্ষিপ্রতায় পাশে সরে গেল।

খুস্গুলো জুতসইভাবে প্রতিপক্ষের মুখে না লাগায় ডিফ্েেডার ছেলেটা খেপে গেল। ও বাঁড়ের মতো একরোখাভাবে ছুটে গেল সুখারামের দিকে। ভজ্গি দেত্ে মনে হচ্ছিল, ছেলেটার মাথায় বোধহ়্য একজোড়া শিং রয়েছে। সেটা দিত্যে ও সুখারামকে ঔঁতিয়ে খতম করতে চাইছে।

একেবারে শেষ মুহূর্তে সুখারাম ছেলেটার আক্রমণ-রেখা থেকে ছিটকে সরে গেন।

তিরবেগে ছুটে যাওয়া ছেলেটার মাথা কাঠের ঔঁড়িতে গিয়ে সজোরে ধাকা মারল। সংঘর্বের শব্টটা এমন জোরালো শোনাল বে, সবাই চমকে উঠল।

ডিফেন্ডার ছেলেটা ক্যারমের ঘুঁটির মতো কাঠের ঔঁড়িতে রিবাউড্ড করে মাঠে ছিটকে পড়ে গেল। তারপর আর একৃুও নড়ল না।

এতক্ষণ ধরে যে-শোরগোলটট চলছিল সেট হঠাৎই থেমে গেল।
দু-চারজন ছেলেটার ওপর बूँকে পড়ে ওকে ডাকতে লাগল : 'মদনোয়া! এ মদনোয়া! উঠ, সালে! উঠ জনলদি...!

কিন্তু মদন, অথবা মদনোয়া, সে-ডাকে সাড়া দিল না।
তখন দুজন ওর মাথার কাছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ওর কাঁধ আর বুকে হাত রেথে ওকে ১েলতে লাগল আর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

কিন্তু মদনোয়া নড়ল না।
দর্শকদ̆র মধ্যে থেকে একজন বয়স্ক লোক সামনে এগিয়ে এল। মিশকালো রং, গায়ে ময়লা প্যান্ট-শার্ট। গলে দু-চরদিনেের না-কামানো সাদা লোঁচা-ひেঁচা দাড়ি।
 করতে চাইল।

जারপর ওর নাকের খুব কাছে হাতের পিঠ রেখে বুঝতে চাইল নিশ্বাস পড়ছে কি না।

ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল লোকটা। তারপর শেষতম পরীক্ষর জন্য উপুড় হয়ে মাথা পেতে দিল মদনোয়ার বুকে।

নাঃ, জূৎপিণের কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সব চুপচাপ।
বৃদ্ধ লোকটা মাথা তুলে ঢোখ বড়-বড় করে তাকাল চারপালে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের দিকে। ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, আরে, ইয়ে সালা তো মর গয়া!'

কথাট শোনামাৰ্রই কোন এক আশ্চর্य ম্যাজিকে জমে থাকা ভিড়ৗটা পাতলা হতে শুরু করল। তিন-চারটে ছেলে মদনোয়ার ওপরে «ুঁকে পড়ে ওর শরীরটাকে পাগলের মতো ঝাঁকাতে ঞুু করল, আর গলা ফাটিয়ে ওর নাম ধরে ডাকতে লাগল।

সুখারাম একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না এখন কী করবে। তাই এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছিল।

ওর বস্তির দু-চারজন ছেলে ওর কাছে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, www.facebook.com/banglabookpdf
'সালা কেলো হয়ে গেল। মদনোয়ার দাদা বদনোয়া পোড়া বস্তির ভাইয়া। ও সালা বহ্ত খতরনাক তোলাছপ্রন মাল। এ কেস তো সহজে সালটাবে না...।’ আর-একজন বলল, 'সুখ, তুই হাপিস হয়ে যা। নইলে বদনোয়া তোকে পালিশ দিয়ে গিলে করে দেবে।'

সুখারাম অবাক হয়ে বলল, ‘কেন, আমি কী করেছি? কেসটা তো পাতি অ্যাক্সিডেন্ট! মদনোয়ার বুকে সালা খিঁচ ছিল-তই টপকে গেছে...।’
'সে তো আ্যাক্সিডেন্ট আমরা সবাই জানি। কিস্তু বদনোয়ার গ্য্য সেটা মানবে না। সালারা বদলা নিতে আসবে—’’

কয়েকটা মোটরবাইক স্টার্ট নেওয়ার শব্দ শোনা গেল। সুখারাম শক্দের উৎসের দিকে চোখ ফেরাল। গোল পোল্টের পিছনে দাঁড় করিয়ে রাখা তিনটে মোটরবাইক ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে খালপাড়ের রাস্তায় পোঁছে গেছে। ফটফ্ট আওয়াজ হুলে বাইকগুলো পোড়া বস্তির দিকে ছুটে গেল। বোধহয় বদনোয়াকে খবর দিতে।

সুখারামকে ওর সঙ্গীরা নানান পরামর্শ দিতে লাগল। তার মধ্যে সংখ্যার হিসেবে সবচেয়ে বেশি যে-পরামর্শটা পাওয়া গেল সেটা হল, কোথাও পালিয়ে গিয়ে কয়েকদিন লুকিয়ে থাকা।

বিধবা মা আর বোন্নের কথা মন্ম পড়ল্ সৃখারাম্রে। ওক্দের ছেডে ও
 আণ্মীয়ম্ধজন বা বন্ধুবান্ধব নেই যাদের কাছে গিয়ে এক-দু-সপ্তাহ গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায়।

তা হলে কোথায় পালাবে সুখারাম?
গিন্টি নামে একজন বন্ধুর কছে মোবাইল ফোনটা জমা রেখে ও ম্যাচ খেলতে নেমেছিল। গিন্টি বস্তিতে ওর পাশেই থাকে। ও গিন্টিকে ডেকে ফোনটা চেয়ে নিল। তারপর বাড়িতে একটা ফোন করল।

মা ফোন ধরল।
'মা, সুখা, বলছি।'
'বল—’’
'ফুটবল ম্যাচে একটা কেস হয়ে গেছে-।'
‘কী হয়েছে?’ মায়ের গলায় উদ্বেগ।
সুখারাম সব বলল।
বদনোয়া আর তার গ্যাঙের কথা শুনে মা একদু ভয় পেয়ে গেল। 'এখन को করবি?'
‘কঢা দিন একাু গা-ঢকা দিয়ে থাকতে হবে। গিন্টিরা সব তাই বলতে...।’
'সে कী রে!' মায়ের গলায় কান্ন এসে গেল।

## www.banglabrook patf.tılogspot.com

‘হাঁ। আমি এক্ষুনি বাড়ি যাচ্ছি। টুকটাক কঁ্ট জিনিস গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়ব। তুই একদম চিন্তা করিস না, মা। সব সালটে যাবে—’

ফোন কেটে দিয়ে সাইকেল ভ্যানের দিকে ছুটল সুখারাম। তারপর মজবুত পায়ে প্যাডেল করে সোজা বাড়ির দিকে।

মাঠে তथনও বেশ কিছু লোকের ভিড় ছিল। সুখারাম জানে, ভাইয়ের অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে একইু পরেই বদনোয়া আসবে, তারপর হয়তো পুলিশ। কিন্তু ওন্ড সিট্তিতে পুলিশের যা অবস্থা তাতে ওদের শুধু গায়ের পোশাক আর তক্মাটুকুই আছে-বাকি সব গেছে।

বদনোয়াকে ওর বস্তির ছেলেরা নানারকম রং চড়ানো গল্প শোনাবে, ওকে ওসকাবে। তারপর ক্ষিপু বদনোয়া সুখারামের পিছনে ছুটবে। তখন ওকে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে বেড়াতে হবে। যেমন করে হোক প্রাণে বাঁচতে হবে। কারণ, সুখারাম প্রণে না বাঁচলেে ওর মা আর বোন বাঁচবে কেমন করে! সুখা বিনা ওরা ভুখা মরে যাবে।

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্যাডেল করছিল সুখারাম। ওর মনে হচ্ছিল যেন ও কোনও রেসিং দ্ব্যাকে ছুটছে। তথনই ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ল। কাল ভোরবেলা ও প্রাকটিসে যেতে পারবে না ভেবে খারাপ লাগল।
 ওর বস্তিতে চুকে পড়ল।

নোংরা কাদা প্যাচপেচে রাস্তা, টিমটিম্মে আলো, দুপাশে আবর্জনার স্থূপ। দম আটকানো বাতলে উৎকট দুর্গন্ধ। কিন্ত এসবই সুখারামের গা সওয়া। ওকে মোটেই নাক টিপে ধরতে হয় না। বরং এই দুর্গন্ধটা ওর অস্তিত্বের এক ধরনের পরিচয়পত্র। এই বিশেষ গন্ধটা নাকে এনেই ওর মনে হয় ও বাড়ি ফিরেছে। মা আর বোনের কাছে ফিরেছে।

সাইকেল ভ্যানটা ওদের ঝুপড়ির সামনে দাঁড় করাল। মশার ঝাঁক ওকে ঘিরে ধরে পিনপিন শব্দে উড়তে লাগল।

দরজায় ধাক্কা দিতেই সুখারামের বোন চোলি দরজা খুলল। ওর পিছনে झারিকেনের আলো থাকায় ওর মুখটা অন্ধকার দেখাচ্ছিল। কিন্তু সুখারাম জানে চোলিকে সুন্দর দেখতে, আর সেজন্য ওদের অনেক বাজে উৎপাত সহ্য করতে इड़।

সুখারাম ঘরে ঢুকতেই চোলি দরজাটা চটপট আবার বন্ধ করে দিল। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করল, ‘কী হয়েছে, দাদাভাই?’

মা ঝুপড়ি-ঘরের এক কোণে বসে ছিল। ঘরের মেঝেতে পলিথিনের চাদর পাত, তার ওপরে চাটই আর পুরোনো পিচবোর্ড। এক পালে তেলচিটে বিছানা।

মা আর চোলি ওই বিছানায় শোয়।
বিছানাটার পাশেই দরমার ‘প্চচিল’। সেই পঁচিলেন ওপারে সুখারাম্রে বিছানা পাতা।

সুখারাম মায়ের পালে গিয়ে পলিথিনের ওপরে বসে পড়ল। চোলিও ওর কাছ ঘেঁষে উবু হয়ে বসল।

সুখারাম মাঠের কাহিনি সংক্ষেপে আবার বলল।
বদনোয়ার নাম শুনে মা ডুকরে উঠল। চোলি কাঁদতে শুরু করল।
চোলির দিকে তাকিয়ে সুখারাম্রে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল।
হলদে রূেে একটা সালোয়ার কামিজ পরে আছে। সেটা ময়লা হলেও
ওকে বেশ মানিয়েছে। পোশাকটায় কোথও না কোথাও ছেঁড়া-ফাটা নিশ্চয়ই आছে, তবে সেটা দেখা যাচ্ছে না।

চোলির বয়েস উনিশ-কুড়ি। মাজা রং। ওকে দেতে মোটেই ঝুপড়িবাসী বলে মনে হয় না। বরং ঠিকঠাক পোশাক পরলে ওর সঙ্গে সুখারামদের দূরত্বটা অনেক বেড়ে যাবে।

চোলির জন্য মাঝে-মঝেে দুঃখ হয় ওর। কেন যে এই সুন্দরী মেয়েটা এই বস্তিতে জন্মাতে গেল! ওর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারলে নিশ্চিষ্ত



সুখারাম ঠিক করেছে, ঝুপড়ির কোনও ছেলের সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবে না। তার জন্য যত কষ্ট করতে হয় হোক।

এখনও পর্যন্ত যে চোলির কোনও সম্বন্ধ ঠিক করা যায়নি তার একটা তুচ্ছ কারণ আছে : চোলির বাঁ-পাটা লম্বায় সামান্য খটো-তাই ও একাু খুঁড়িয়ে চলে।

কিন্তু ওকে যে এত সুন্দর দেখতে, সেটা কিছু নয়!
চোলি আর মা-কে ক’দিন ছেড়ে থাকতে হবে তেবে সুখারামের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠল।

ও বোনের চোেের জল মুছিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘মোবাইল ফেনটা ঠিকমতো চার্জ দিয়ে রাথিস, মা। আমি খুব ভোরবেলা আর রাত বারোটার পর ফোন করব...।’

বস্তির ঘরে-ঘরে বিদ্দুৎ না পৌঁছোলেও বস্তির ল্যাম্পপোস্টের গোড়ায় মোবাইল ফোন চার্জ করার সকেট লাগানো আছে।

চোলি আর মা-ও এবার উঠে পफ়ল। সুখারামের দরকারি জিনিসগুলো ভরে দিল একটা নাইলনের থলেতে। বিছানার নীচ থেকে কিছু টাকা বের করে মা ছেলের হাতে দিল। তারপর কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "ঠিকমতো

খাওয়াদাওয়া করিস, সুখা...'
ঢুই কোনও চিত্তা করিস না। ক'ট দিনের তো ব্যাপার। সব্বাই দেখেছে ওটা আ্যাপ্সিডেন্ট-আমি কিচ্মু করিনি...।'

হঠাৎ করে সুখারামের কী মনে হল, ও 《ুঁকে পড়ে চট করে মা-কে প্রণাম করল। তারপর চোলির মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলন, ‘বরাট স্যারকে আমি ফোন করে দেব যে, ক’দিন প্র্যাকটিসে যাব না। নইলে স্যার চিত্তা করবে...বাড়িতে খোঁজ নিতে চলে আসবে। থলেটা হাতে তুলে নিল : ‘তোরা সাবধানে থাকিস। কোনঞ প্রবলেম হলে আমাকে ফোন করবি। আমি গাড়িট নিয়ে যাচ্ছি...'

চোলি কাঁদছিল। কাঁদতে-কাঁদতেই জড়ানো গলায় জিগ্যেস করল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?’
'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যাং বাড়িতে এসে হামলা করতে পারে। তখন আমার ঠেক জানার জন্যে তোদের জ্বালিয়ে খাবে-টরচার করবে।

না, মা আর বোনকে সুখরাম ওর ভাবী আস্তানার কথা জানায়নি। যদিও ও মনে-মনে ওর লুকেেনোর জায়গাট ঠিক করে ফেলেছিল।

চোখে জল নিফ্লে চেলি আর মা দরজার কাছে এল। অক্ধকারের মধ্যে


এবড়োেেবড়ে পথে নেমে এসে সুখারাম ভাবল, এখন ওর আর মায়ের দুটো মোবাইল ফেনইই সমস্ত ডরসা। সস্তায় কেনা এই সেকেড ছাডড কি থার্ড হানড মোবাইল সেটতুলো ঠিকঠাক কাজ করলে হয়!

ঘোরালো নির্জন পথ ধরে সাইকেল ড্যানটা ছুটে यাচ্ছিল। এই রাস্তাগুলো দিনের বেলাতেও কেউ ব্যবহার করে না। নেহাত রাস্তাগুলোর পালানোর উপায় নেই তাই ওরা চুপাপ এখানে পড়ে আছে। নইলে ওরাও এই নির্জনত ছেড়ে পালাত।

রাস্তার পাশে কখনও-সখনও ল্যাম্পপোস্ট ঢোেে পড়ছে এবং তার দু-একটায় মলিন বাল্ব জ্রলছে। ভাঙাচোরা রাস্তার এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে।

সুখারাম জোরে-জোরে প্যাডেল ঘোরাচ্ছিল আর ভাবছিল বরাট স্যারের কথা। ওর কাফ মাসল এখন প্রতি মুহূর্তেই শক্তিশালী হচ্ছে। ক’দিন প্র্যাকটিসে না যেতে পারার খামতিটা ওকে মাঝরাত্তিরে ভ্যান চালিয়েই পুষিয়ে নিতে হবে।

সুখরাম লুকিত্যে থাকার যে-জায়গাটা পছন্দ করেছে সেটা কাঠ-মিলের মাঠের পশেই। শে-মিলগুলো বহ্ বছর ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে তারই একটা ভাঙাচোরা গা-ছমছমে মডেল বেছে নিয়ে সুখারাম তার অন্দরমহলে

আা্তনা গাড়বে। ব্দনোয়া বা ওর গ্যাং ভবঢেই পাররে না সুখারাম নস্কর অকুशুলের এত কাছাকাছ গ-ঢাক্ দিয়ে রয়েছে।



তই এখন ও সাইককল ভ্যান নিয়ে খানাথc্দ ভরা অঙ্ধকার निর্জন রাশ্তাৎলোয় ঘুরে বেড়াবে। কিংবা কোথাও গাড়ি লাগিষ্রে বিশ্রাম নেবে। তরপর রাত অনেক গা়় হলে কেনও সস্ঠার হোটেলে খাও্যাদাওয়া লেরে ওর নতুন আশ্তানায় গিল্যে ছকবে।

 আড়াল করে গাড়িট লাগান। তারপর গাড়িত্ই চিৎপাত হর়ে ঔয়ে পড়ন,








 করে ন্বরঢ ল্গখ।

মা खেন করেছে।
 দাদাঅই!

'ডুই ঠিক आছিস নে?’
 হাে-!

 आমি দিয়ে দিক্রেছি...|

जবাক रয়ে গেন সুখারাম। ঢোখ জল এলে গেন। এত তাড়াহ্ড়ে অার


হাতের পিঠ দিয়ে ঢোখ মুহন। ঢোনিকে বলন, গাঁ, লের্রে নেব। তোরা

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## ১৬০ www.banglabioêk palf.b̈togspot.com

চিত্তা করিস না...।’
ডুই সাবধানে থাকিস, দাদাভাই...’ কিছুছ্ষণ চুপ করে রইল চোলি। তারপর কান্না-কান্না গলায় বলল, ‘‘েখানেই থাকিস না কেন...।’
‘তোরাও সাবধানে থাকিস। রাখছি—’’
ফোন কেটে দিল সুখারাম।
আর ঠিক তখনই দূরে তিনটে হেডলাইটের আলো দেখতে পেল। সঙ্গে সাইলেন্সারের ফটটফট শদ্দ শোনা গেল।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় লাফাতে-লাফাতে তিনটে মোটরবাইক এগিয়ে আসছে। রাস্তার নানান গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জলে হেডলাইটগুলোর ছায়া থেকে-থেকেই ঝলসে উঠছে। তিনটে আলো সংখ্যায় চারটে, পাঁচটা কিংবা ছ"ঢা रয়ে याচ্ছে।

সুখারাম নস্করের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল।
বদনোয়ার দল নিশ্চয়ই খবর পেয়েছে, সুখারাম ওর ঝুপড়িতে নেই। তাই ওরা মোটরবাইকে করে সব রাস্তায় টহল দিতে বেরিয়েছে। খ্যাপা নেকড়ের মতো সুখারামকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ভয়ে সুখারামের মুখ শকিত্যে গেল। ভীষণ জল তেষ্টা পেল ওর। ঝটপট

 ঊঠলেই সর্বনাশ।

জং ধরা লোহালক্কে়ের গয়ে গা ঠেকিয়ে দম বব্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল সুখারাম।

মোটরবাইকের আলোগুো নাচতে-নাচতে ওর দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছিল।

সুখারাম ভয় পেল। না, শুধু এভবে লুকিয়ে থাকলে চলবে না,—আরও কিছু করতে হবে। কারণ, ওর পায়ে রানিং ৩, গায়ে স্যাজ্ডো গেঙ্জি, আর হাফপ্যান্ট। এগুলো ওর মাঠের পোশাক। এগুলো লেখলেই ওরা চিনে ফেলতে পারে।

সঙ্গে-সঙ্গে মোবাইল ফোনটা লোহালক়্ের খঁজে তঁজে দিল সুখা।
চটপট পায়ের জুতো খুলে खেলল। জুতো জোড়া ছুড়ে দিল গাড় অন্ধকারের দিকে। একটানে খুলে ফেলন স্যান্ডো গেঞ্জি। ওটা তানগোল পাকিত্যে রাস্তার গর্তে জমে থাকা জলে ডুবিয়ে দিল। তারপর হাফপ্যান্টটার বোতাম খুলে

কোমরের খানিকটা নীচে টেনে নামিয়ে দিল। এবং উপুড় হয়ে শুয়ে পড়াল নোংরা রাস্তায়। ঠিক যেন চালমুলোহীন কোনও ভবঘুরে পথ্রে মদ-টদ থেয়ে পড়ে আছে।

সুখারাম মনে-মনে ভগবানকে ডাকছিল। মোটরবাইকে ছুটে আসা শয়তানগুলো যেন ওকে দেখতে না পায়। ওর বস্তির ঘরে এককেণে ছোট্ট ঠাকুরের আসন রয়েছে। সেथানে মা কালীর ফটো রয়েছে। মা সকাল-সক্ধে ধূপকাঠি জ্রেলে নকুলদানা আর জল দিয়ে ঠাকুরের পুজো করে। এখন দু-ঢোখ বুজে সেই ফটোটরেই দেখতে চাইছিল ও। আর আবছাতাে দেখতে পাচ্ছিলও। ওই তো মা কালী—নৃমুণ্ডমালিনী!

বাইকগুলো ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ও আড়চেথে দেখল, দুটো বাইকে পাঁচজন ছেলে বসে আছে। তার মধ্যে প্রথম বাইকটায় বসে আছে বদনোয়া। একা।

আবছ আলোতেও ওর মুখটা সুখারাম চিনতে পারল।
ভারী চেহেরা। খানিকটা যুঁড়ি রয়েছে। গালে চাপদাড়ি, মোটা গোফ৷। মাথার লম্বা চুল ব্যাকব্রাশ করা। ডানशতে চক্চকে সোনার বালা।

যেতে-বেতে একেবারে পিছনের বাইকটা হঠাৎই একটা গর্তে পড়ে টাল

 গালাগাল দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল। সৌা কানে যাওয়াতে সামনের বাইক দুটো থেমে গেল। পিছনের বাইকটা তখন সুখারামের খুব কাছাকাছি।

পিছনে তাকিয়ে একজন বলল, ‘দেখে চালা। রাস্তা তো নয় সালাযেন গুটি বসন্তের ছম্না লেগেছে—’'

কাত হয়ে যাওয়া বাইকটার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেটা স্টার্ট দিয়ে আরোহী একদলা পিক ফেলল রাস্তায়। চেচচচি়ে বোধহয় বদনোয়াকে উদ্দেশ করে বলল, ‘বস, সুখারাম হারামির বাচ্চাটা কোথায় সেঁধিয়ে গেল বলো তো! ব্যাটা একেবারে লাপাতা হয়ে গেল দেখছি...।'

সামনের বাইক থেকে বদনোয়া হিশ্র্র গলায় বলল, 'লাপাতা হেকে জয়েগা কাঁহ! পাতলে গিয়ে ছুকলেও ঔয়োরের বাচ্চার চুলের গোছা ধরে টেনে তুলে আনব। মদনোয়ার দাম সুদে-আসলে চুকতা করব।’

ওদের বাইকের কাছ থেকে ছ'-সাত ফুট দূরে অন্ধকারে পড়ে থাকা সুখারামের বুক ঢিপঢিপ করছিল। মায়ের জন্য, চোলির জন্য ওর বুক কেঁপে উঠन।

ঠিক তখনই ওদের একজন হেসে বলল, 'সুখারাম পালালে কী হবে? ওর ঘর-বাড়ি তো আর জায়গা ছেড়ে পালাতে পারবে না! ওর মা আর ফুলাটুসি

কথাট শুনে সুখারামের শীত-শীত করে উঠল। ওর মনে হল, ও বিশাল এক বরফের স্লাবের ওপরে শয়ে আছে।

বাইক তিনটে আবার চলতে শুু করল। শেষের বাইকটার চাকা আবার জল জমা গর্তে পড়ত্তই কাদজল ছিটকে এল সুখার গায়ে। ওর মনের ভেতরে তখন স্টিম রোলার চলছিল।

বাইকগুলো চলে যেতেই মা কানীকে ডাকাডাকি করা থামিয়ে উঠে বসল। এখन ও को করবে? कী করা উচিত?

মা আর চোলির কথা ভেবে ওর ভয় করতে লাগল। ওর ভেতরে এক অদ্ভুত টানাপোড়েন ওুরু হল। ওর ডেতরে একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা উচিত। কিন্তু একইসঙ্গে আর-একটা সুখারাম বলতে লাগল, ওর এখন বাড়ি যাওয়া উচিত—মা আর চোলির ওকে ভীষণ দরকার।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝিকিয়ে উঠল। তারপরই মেঘের বাঘের ডাক।
মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সুখা। হে মা কালী, আমাকে বলে দাও আমি এখন कী করব। আমি কি মায়ের কাছে যাব?
 বৃষ্টি তারই সংকেত।

উঠ্ঠে দাড়াল সুখা। প্যান্টট ঠিকঠাক করে পরে নিল। সারা গায়ে কাদাজল লেপটে আছে। বৃষ্টি ওর গা ধু<্রে দিচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ও এগিয়ে গেল অন্ধকারের দিকে। উবু হয়ে বসে ওর রানিং খুঁজতে লাগল।

একদু পরেই সেগুলো হাতে ঠেকল। রাস্তায় লেপটে বসে জুতো জোড়া তাড়াতাড়ি পরে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। মোবাইল ফোন। সাইকেল ভ্যান। ছুট, ছুট, ছুট।

ভ্যান চালাতে-চালাতেই মা-কে ফোন করল।
ফোন ধরল চোলি।
'দাদাভাই! বল....।’
‘শিগগির মা-কে ফোন দে।’
চোলি ঘাবড়ে গেল। דাঁপা গলায় জিগ্যেস করলে, ‘কেন রে?’
'ওঃ, শিগগির মা-কে দে—’'
এক সেকেন্ড পরেই মায়ের গলা পাওয়া গেল।
‘কী रয়েছে, সুখ!’
'মা, ঢুই আর চোলি এক্ষুনি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যা-।'
‘সে কী! কেন?’
'মা, বদনোয়ার গ্যাং আমাকে পাগলের মতো খুঁজছে। আমকে হাতে না পেয়ে ওরা ঘরে গিয়ে তোদের আ্যাটাক করার কথা ভাবছে- তোকে আর চোলিকে। আমি নিজের কানে শুনেছি...।
‘কিন্তু এখন আমরা কোথায় পালাব? পালিয়ে কোথায় যাব?’ হতভম্ব গলায় মা বলল।
‘‘েখানে হোক যা-’ অধৈর্য গলায় বলল সুখারাম, ‘গিন্টিদের ঘরে কি আর কারও घরে গিয়ে লুকিয়ে থাক। আমি ভ্যান নিয়ে এখুনি আসছি...।

ফেনের লাইন কেটে দিল। পাগলের মতো সাইকেল ড্যানের প্যাডেল ঘোরাতে লাগল। বৃষ্টি, খানা-খন্দ-কিছুই ও টের পাচ্ছিল না।

মনে পড়ল, কয়েক ঘণ্টা আগে চোলি ওকে কাঁদতে-কাঁদত্তে জিগ্যেস করেছিল, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস?'

উত্তরে সুখা বলেছিল, 'জানি না। জানলেও বলতাম না। বদনোয়ার গ্যা… I'

তখন ও একরকম টরচারের কথ্থা ভেবেছিল—আর এখন অন্যরকম।
সাইকেল ভ্যানটা বস্তির কাছাকাছি চলে এসেছিন। এখানটায় রাবিশের
 বৃष्ठित जল গড়़eয় নমমো

একপাশে দুটো ভাঙাচোরা ঘর চোখে পড়ল। যারা থাকত তারা মাসক<্যেক আগে আস্তানা ছেড়ে চলে গেছে। তাদের ফেলে যাওয়া ঘরের বাঁশ, চাটই, ছেঁড়া পলিথিন—বে যা পেরেছে হাতিয়ে নিয়েছে। এখন ঘর দুটো যে-অবস্থায় পড়ে আছে তাকে ঘরের ‘কক্কাল’ বললেও অনেকটা বাড়িয়ে বলা হয়। সুখারাম ওর সাইকেল ভ্যনটা সেই দুটো ঘরের একটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে খুব সাবধানে ওর ঘরের দিকে পা বাড়াল।

বস্তির গলিপথে অন্য অনেক কিছুর মতোই আলোরও অভাব। তাই বৃষ্টি বে পড়হে সেটা দেখা যাচ্ছিল না, তবে বস্তির ঘরগুলোর চাল থেকে হালকা শব্দ উঠছিল, আর গায়েও টের পাওয়া যাচ্ছিল।

ళীরে-ধীরে এগোতে-এগোত সুখারাম হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। না, তখনও ও কিছু দেখত্ পায়নি-কিন্তু ওনতে পের্যেছে।

কারা যেন চিৎকার করছে। এবং সে-চিৎকারের যতটুকু বোঝা যাচ্ছে তার বেশিরভাগটই নোংরা গালিগালাজ।

ব্যাপারটা যে কী হচ্ছে সেটা আঁচ করতে পারল। তাই একটু তাড়াতাড়ি পা চালাল।

ওদের ঘরে পৌঁঁনেোর বাঁকটার মুতে একটা যুটপাঁচেক চওড়া খঁজ আছে।

সেখানে ভাঙচোরা ইটের টুকরো আর নানান আবর্জনা। তার একপাশে সাইরেল আর সাইকেল ভ্যনের বাতিন টায়ার-টিউব, সিট কভার ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। সুখা জানে, ওজনদরে বিক্রি হয় এমন কোনও মেটাল পার্স্স সেখানে নেই। শীতের সময় ওইসব টায়ার-টিউব টেনে নিয়ে বত্তির লোকরা ধুনি জ্রালিয়ে শীত তাড়ায়।

ওই খঁজটাকে বস্তির সবাই বারোয়ারি বাথরুম হিসেবেও ব্যবহার করে। ফলে ওর পাশ দিয়ে হেেটে যাওয়ার সময় নাকে হাত চাপা দেওয়াটা নেহাতই প্রতিবর্তী ক্রিয়া বলা যেতে পারে।

তাই সুখারামও রোজক্রর অভ্যাসমরো বাঁকটা ঘোরার সময় নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়েছিন।

ভাগ্যিস দিয়েছিল, নইলে বাঁক ঘুরেই যে-দৃশ্য ওর চোথে পড়ন তাতে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসা জান্তব চিৎকারটা বদনোয়ার গ্যাং-এর কেউ না কেউ হয়তো শুনে ফেলত। কিক্তু নাক-মুখ হাতে ঢাকা থাকায় ওর চিৎকারটা ডুকরে ওঠা চাপা কান্নার মতো শোনাল। সুখরাম চট করে দুর্গন্ধময় খাজটায় ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে উঁকি মেরে ওর ঘরের সামনের দৃশাটা দেখতে লাগল। ওর মনে হচ্ছিল, ও যা দেখছে সেটা বাস্তব নয়-কোনও সিনেমার দৃশ্য। কিন্তু

 করছিল।

মা আর চোলি তা হলে পালাতে পারেনি!
সুখারামদের ঘরের সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কয়েকটা বাঁশের খুঁটি পুঁতে নইলনেের দড়ি টাঙানো। বস্তির কয়েকঘর মানুষ ওই দড়িতে জামাকাপড় শকোতে দেয়।

সেই জায়গাটায় বদনোয়াদের তিনটে মোটরবাইক দাঁড়িয়ে আছে। সুখারামদের ঘরের দরজা তাক করে তিনটে বাইকের হেডলাইট জ্বালানো। ফলে জায়গাটায় বেশ আলো ছড়িয়ে আছে। বাইকগুলোর দুপাশে একরকম সার বেঁধে বদনোয়ারা পौচজন দাঁড়িয়ে আছে। আলোর আওতার বাইরে থাকায় সুখারাম ওদের সিলুয়েট ছায়া দেখতে পাচ্ছিল। আর হেডলাইটের আলোয় আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির বেঁাটাগুলো ওর স্পষ্ট নজরে পড়ছিল।

আরও নজরে পড়েছিন বে, ওদের ঘরের দরজাট বন্ধ এবং সেই বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুখারাম্রে মা কান্না ভাঙা গলায় হাহাকার তুলে চিৎকার করছে।

মায়ের ওই ছোটখাটো রোগা শরীরে এত তীব্র চিৎকারের তেজ জমা থাকতে পারে তা সুখারাম স্বপ্নেও ভাবেনি। মা চিৎকার করছিল, কাঁদছিল,

বদনোয়ার দলকে গালাগালিও দিচ্ছিল।
দূূ হ, হারামজাদার দল! সুখা কাউকে কিচ্ছু করেনি। ও খুব নেক আর সাচ্চা মানুষ। মদনোয়া অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। যা এখান থেকে। দূর হ! দরকার হয় থানায় যা! বলছি না, সুখা বাড়িতে নেই! ও কোনও মার্ডার করেনি। তোরা মার্ডারার—তোরা! যত্তসব ক্রিমিনালের হাড্ডি।’

মা চিৎকার করছিল। কিন্তু মায়ের চিৎকার ছপিয়ে ওই পাঁচটা শয়তানের অন্তত দুজন তোড়ে খিস্তির ফোয়ারা ছোটাচ্ছিল। সেই গালিগালাজের মধ্যে সুখার মা-বাবা-ভাই-বোন কেউই রেহাই পাচ্ছিল না। ওর কোনও ভাই নেই। বাবা মারা গেছে সাড়ে চারবছর আগে। কিন্তু বদনোয়াদের তাতে কী!

সুখারামের ভেতরে আগুন জ্বলতে শুু করল। ওর বাঁ-হাতটা থরথর করে কাঁপতে লাগল—যেন পিনাকেতে মহাদেব টংকার দেওয়ার পর তার তারে অনম্ত কাঁপন লেগেছে। কিন্তু ও কিছু করতে পারছিল না। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখ্খিল। বুকের ভেতরে কষ্ট হচ্ছিল।

সুখারাম যে কিছু করার কথা ভাবেনি, শুধু স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, তার কারণ, বদনোয়ার দল ওর দিকে পিছন ফিরে থাকলেও ও ওদের হাতের অন্তত দুটো অন্ত্র দেখতে পাচ্ছিল।

বদনোয়ার হাতের মুঠায় ধরা একটা মাটা নলওয়ালা রিভলভার।
 সোর্ড।

এই দুটো জিনিস সুখারামকে আটকে দিয়েছিল।
অস্ত্রধারী দুজনেই তাদের হাতের অস্ত্রগুলোকে বেপরোয়াভাবে নাচাচ্ছিল, আর তার সঙ্গে এই বলে শাসাচ্ছিল যে, এক্ষুনি সুখারামকে ওদের হাতে না তুলে দিলে ওরা ‘নাকের বদলে নরুন’ নিয়ে চলে যেতে পারে।

সুখারাম স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সেই ‘নরুন’ এখন ওদের বন্ধ দরজার ওপিঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া কবুতরের মতো কাঁপছে, বুক উঠছে, নামছে। পাগল-করা ছন্দে ধড়ফড় করছে।

বস্তির ভেতরে এত প্রবল চিৎকার, চেচচামেচি—অথচ পাড়াপড়শিদের কোনও সাড়া নেই। সব ঘরেরই জানলা-দরজা বন্ধ। এখানে এত লোক গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে, অথচ এখন সুখারাম, ওর মা আর চোলি একেবারে একা।

হেডলাইটের জোরালো আলোয় সুখার মা হাত-পা নেড়ে চিৎকার করছিল, তড়বড় করে লাফাচ্ছিল। শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য যতরকম ভাবভঙ্গি আর আশ্ফালন করা সম্ভব সবই করছিল। সেটা দেখতে-দেখতে হঠাৎ সুখার মনে হল, কোনও সিনেমার যেন শুটিং চলছে। সেখানে ওর মা

স্পটলাইটের আলোয় শট দিচ্ছে। আর অন্ধকারের আড়ালে থেকে পরিচালক-সহ-পরিচালকের দলবন তাদর নির্দেশনামা ऊনিয়ে চলেছে।

অসহায় সুখারাম কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল। মা আর চোলিকে বাঁচাত না পাবার কষ্ঠটা ওকে ধীরে-ধীরে অবশ করে দিচ্ছিল।

আওয়াজটা তেমন জোরে হয়নি, কিন্তু সুখারাম সেটাকে গুলির আওয়াজ বলে ভালোই চিনতে পারল।

চেনার আরও একটা কারণ, মায়ের প্রতিবাদের ফুলঝুরি আচমকা থমকে গেল, আর একইসঙ্গে ও দেখতে পেল মায়ের ময়লা শাড়ির বুকের কাছটা হঠাৎই লাল রঙে ভিজে উঠেছে, আর ওর মায়ের ছোট্টাট্টো রোগা শরীরটা ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছে।

সুখার ঝাপসা ঢোখের সামনে সেই পলকা তেজি শরীরটা পড়তেই লাগল। পড়ত্তে লাগল।

বদনোয়ার দল উল্নাসে চিৎকার করে উঠল। ওদের একজন চিৎকার করে বলল, 'সালা, আমাদের সন্সে পাঙ্গা নেওয়া! গোটা ফ্যামিলিকে চুরুুর করে দেব!'

ওরা পঁচজন বন্ধ দরজাটার দিকে এগোতে ুরু করন। অন্ধকার থেকে



সুখারাম এবার ওদের দেখতে পাচ্ছিল। চিনে নিতে পারছিল চেহারাগুলো। মনের মধ্যে সেগুলো গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

বদনোয়াকে ও চেনে। ভারী চৌকো, হিশ্র মুখ। কিন্তু বাকি চারটে মুখ ও নতুন দেখছে।

ওরা সবাই বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে অনায়াসে সুখারামের ময়ের দেইটাকে পাশ কাটিয়ে গেল। তারপর शিস্তির পঞ্চব্যঞ্জন তারস্বরে উগরে দিয়ে ঘরের পলকা দরজাটা পিটতে শুরু করল।

ঘরের ভেতর থেকে এই প্রথম একটা ভয়ের চিৎকার শোনা গেল। একটা কোণঠাসা মেয়ের চিৎকার।

চোলি।
সুখা এখন কী করবে? ছুটে যাবে ওই রিভলভার আর সোর্ডের মুঘে? মায়ের মতো বেফোরে প্রাণ দেবে?

তা হলে বদলা নেবে কে? ওপরওয়ালা?
না, সব কাজের দায়িত্ব ওপরওয়ালার ওপরে চাপাতে পারবে না সুখারাম।
এইসব ভাবছিল, থরথর করে ওর গোটা শরীর কাঁছিল, ভয়ে মুঢে কুলুপ आঁট, কিন্তু দু-চোখ জল।

মা! মা রে! ওরা আসার আগে তোরা ঘর ছেড়ে পালাতে পারলি না? হা ভগবান!

সুখারামের মাথা ঘুরছিল, ঢোথে ঝাপসা দেখছিল। জীবনটা হঠাৎ করে को থেকে को হয়ে গেল!

অসঘ টেনশানে মাথার ভেতরে যন্ত্রণ হচ্ছিল। বদনোয়ার দলবলের দরজা পেটানোর আওয়াজ ওর কানে বোমার মতো ভয়ংকর এবং তীব্র শোনাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি চোথে অন্ধকার নেমে আসবে, মাথার শিরাগুলো পটপট করে ছিঁড়ে যাবে।

এবং তাই হল।
ওদের ঘরের দরজাট প্রথমে চিড় ধরে তারপর ভেঙে গেল। চোলির কানফাটানো আর্ত হাহাকার আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফেেটাাগুেোকে ভিজিয়ে দিল। আর সুখারামের চোখের সামনে একটা ভারী কালো পরদা নেমে এল।

ও আচমকা আবর্জনা, ইট, থেয়া আর রাবিশের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। একটা শক্ত কিছুতে ওর মাথা ভুকে গেল। নাকে এল জনতা-বাথরুমের ঝাঁজালো কাঁ গন্ধ।


๔্ঞান যখন ফিরল তখন ও কালো আকাশের দিকে তাকিত্যে। সেখান থেকে বৃষ্টিন ফোঁটা একঘেয়েভাবে নেমে আসছিল ওর মুখে, চোেে, শরীরে। মাথায় অসश্য ব্যথা, নাকে নোংরা গন্ধ।
হঠাৎই বমির ওয়াক বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। ওর শরীরটা প্রবল দমকে ঝাঁকুনি খেল।

উঠে বসল সুখারাম। মাথার পিছনটা টনটন করছে। সেই অবস্থায় ওয়াক উঠল আরও কয়েকবার। শব্দ চাপা দিতে মুখে হাত উঠে গেল ওর।

একাঁ পরে হাত সরিয়ে হাঁ করে দু-চারবার শ্বাস নিল। তারপর ভালো করে চারপাশে তাকাল। মাথা ঝাঁকিয়ে ঢোেের দৃষ্টি সড়গড় করতে চাইল। আরে! তিনটে বাইকের হেডলাইট তো এখনও জূলছে!
जা হলে বদনোয়া আর ওর দলবল গেল কোথায়?
উত্তর পেয়ে গেল সক্পে-সক্পেই।
সুখারাম দেখল, ওদের ঘরের ভাঙচোরা দরজা দিয়ে শক্রুরা একে-একে বেরিয়ে আসছে।

১wt www.banglabiofek putt.tílogspot.com
প্রথমে বদনোয়া—আর ওর পিছনে-পিছনে বাকি চার শাগরেদ। হেডলাইটের আলোয় ওদের মুখগুলো স্পষ্টভবে ঢোেে পড়ছিল।

মুখে অক্লীল হাসি, তার সল্গে থিস্তিখেউড়, আর এলোমেলো পা ফেলে श゙ঁ।

ঘরের ভেতর থেকে কোনওরকম চিৎকার-টিৎকার আর শোনা যাচ্ছে ना।

সুখারাম হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করল। यাতে শব্দ না হয় সেইজন্য দু-হতের তালু চেপে ধরল মুখে। অসহয় বোবা মানুষ্ের মতো গোঙাতে লাগল।

বসা অবস্থাতেই ও আরও অন্ধকার কোণে সরে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শূন্য চোথে তাকিয়ে রইল সামনের একটা জোড়াতালি দেওয়া ঘরের দিকে।

ও কী করবে এখন? বাঁচবে? না মরবে?
আধো অন্ধকরের মধ্যেও ও দেখল সামনের ঘরটার একটা খুপরি জননলা অর্ধেকটা খুলে গেল। সেখানে উঁকি মারছে একজোড়া ভয় পাওয়া চোখ।

সুখারামের মনে হল, বস্তির অনেক ঘরের জানলা থেকেই হয়তো এরকম ভয় পাওয়া কৌতূহনী চোখ আড়াল থেকে উককিঝুঁিকি মারছে। কিন্তু সাহস করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। ওরা হয়তো বদনোয়ার গ্যাঙের এখনকার



এমন সময় একটা ফায়ারিং-এর শব্দ শোনা গেল।
আড়াল থেকে উ"কি মারল। দেখল, বদনোয়ার রিভলভার শূন্যে উঁচিয়ে ধরা রয়েছে। আর ওর দুজন সঙ্গী থিষ্তি দিয়ে সুখারাম এবং বস্তির লোকদের চেঁচিয়ে শাসাচ্ছে। একজনের হাতের সোর্ড শূন্যে আস্ফালন করে বৃষ্টির ফ্োঁটাকে ছিন্নভিন্ন করার চেষ্টা করছে।

ওরা চলে যাচ্ছে! চলে यাচ্ছে ওরা! যুদ্ধ জয় করে ওরা সিনা ফুলিত্যে চলে যাচ্ছে-পোড়া বস্তির দিকে, ওদের ঠেকের দিকে।

মোটরবাইকগুলো স্টার্ট দেওয়ার শব্দ শোনা গেল। বাইকের হেডলাইটের আলো এলোমেলোভাবে নানান দেওয়াল আর গাছপালার ওপরে পড়ল। ফিরে যাবে বলে ওরা বাইকের মুখ ঘুরিত্যে নিচ্ছে।

কান্না গোঙানি সুখারামকে চৌচির করে দিচ্ছিল। একটা অস্ত্র! একটা অস্ত্র यদি ও হাতে পেত তা হলে....।

ও পাগলের মতো আধখোলা জননলাটার ওপরে হামলে পড়ল।
বুঝতে পারল, জানলার চোখ দুটেঁ একটা মেয়ের।
সুখারামকে হঠাৎ করে জননলার কাছে চলে আসতে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে জানলা থেকে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সুখরাম কান্না মেশানো গলায় ডুকরে

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## 290 www.banglabooek putf.tifogspot.com

উঠল, ‘‘বান-ব্যেয়া না...|’
 করে ঠাহর করা যাচ্ছ না।





দूयाর ঢেক গিলে বলन आবার, ‘্ধিজজ...বোনটি আমার...’’
ছায়া-ছায়া মুখটা চট করে জননার কাছ থেকে সরে গেন।
সুখারাম ভয় পেয়ে গেন। মেয়ৌা গেন কোথায়? পোটরবাইকের আলো


ও এক্াশ প্রতাশা নিভ্যে অক্ষকার জনলাটর দিকে তাক্কির্যে রইল।
 দির্যে 'fo xর্দে के একটা গनिর রাবিশির ওপর্রে পড়ন।

সেদিকে তকিক্রে আধ্েোঁঁধারির মধ্যেও সুখাম দেখত পেল, কিছू এৰটা চক্চক করহছ।



 উরু হয়ে বসन।

বৃষ্টি মে্যুই মুঠোण ঢোের কাহ নিভ্রে এল।
भ্য় সাত-জাট ইধ্চি ফল্লার একটা জং ধরা ছুরি। जার কাঠের হতলের বেশ খানিকটা जাঙ।

সোর্ড এবং রিভনভারের সল্গে মোকাবিলায় এই ছুরি নিতা্ঠই এলটা বিদ্ম!
 ভেতে পারে।

মোর্বাইকের আলোখলো এগিক্রে আসহিন। তার ঠিক পিছনেই বলে


দুজনকে নিল্যেই সুখারামের বেশি দুশ্চিত্তা।
মায়ের কথা ভাবছিল সুখারাম। ভাবছিল চোলির কথা। এই দুঃসময়ের মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত থেকেও ওর সুসময়ের কথা মনে পড়ছিন। অনেক অভাবের মধ্যেও মায়ের শাসন আর স্নেহ মাখানো দিনগুলো মনে পড়ছিল।
‘সুখা, বৃষ্টিতে ভিজবি না। ঠাডা লাগলে জূর হবে, তারপরই ঝামেলা। ডাক্তার দেখাও, ওষুধ খাও...সে-পয়সা কোথায়? यা, ঘর যা!’
‘এই নে, সুখা, এই রসগোল্লাট খা।’ তারপর সুখারামের অবাক চোথের দিকে তাকিযেঃ ‘আজ তোর জন্মদিন রে পাগলা! তাই তিনটে রসগোল্লা কিনে এনেছি-আমাদের তিনজনের...।'
‘দাদাভাই, দশটা টাকা দে তো—।
‘কেন রে?’
'খরচ করব—’'
'তার মানে? কীসে খরচ করবি?’
‘কেন, সব কি তোকে বলতে হবে?’
'মা, শোন—ঢোলির কথ্থা শোন—।
‘ও ঠিকই তো বলেছে! ও বড় হয়েছে। ও নেলপালিশ কি কিরিম কিনবে সব তোকে বল্লত হরেে! শিগ্গির দশ টাকা দ্দ! ও তোর ছোট্রোন-তোর


সুখারাম শনতে পাচ্ছিল চোলির গলা : ‘কী রে, দাদাভাই, বদলা নিবি ना?'

চোলি বদলা চাইছে।
‘ও তোর ছোটবোন—তোর কাছে চাইবে না তোর কার কাছে চাইবে?’ মায়ের গলা।

সুখারামের ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল ঘরের দিকে, মায়ের দিকে, চোলির দিকে। ওরা কি এককণাও বেঁচে আছে? আছে?

থাক বা না থাক, সুখারামের খুব ইচ্ছে করছে ওদের কাছে যেতে। কিন্তু চোলি যে আবার আবদার করছে...কী যেন চাইছে...।

বাইকের আলোগুলো সুখারামের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল।
ছুরিটা শক্ত মুঠোয় आঁকড়ে ধরল সুখারাম। হে ভগবান! একটা সুয্োগ দাও। একটা সুভোগ! তা হলে বাকি কাজটার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে নাআমিই নিতে পারব। ততে বাঁচি-মরি কোনও দুংখ নেই। কারণ, বেঁচে থাকার আর কোনও মানে নেই।

ওই দু-এক লহমার মধ্যেই নিয়তি একটা সুযোগ তৈরি করে দিল। তিনটে মোটরবাইক ওকে পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একেবারে

## ১৭२ <br> www.banglaboêk pestf.bitogspot.com

শেযের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। বাইক চালাচ্ছিল যে-ছেলেটা সে একটা হাত শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বলল, ‘বস, একবার লিক না করলে হবে না—তনপেট সালা বাস্ট করবে...।'

সামনের দুটো বাইক থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'সালা পেটে মাল পড়নেই জামিয়ার খালি এমার্জেন্স হিসি পায়। যাকগে, আমরা ঠেকে যাচ্ছি, ঢুই লিক করে আয়। খাওয়াদাওয়া সেরে ওই হারামির বাচ্চাটাকে আবার পাত্তা করতে বেরোব...।

পিছনের বাইকটা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার সামনের সিট থেকে শূন্যে পা ঘুরিয়ে নেমে পড়ল জামিয়া। তারপর সুখারামের অন্ধকার খুপরির দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

বৃষ্টি আর আলো-আাঁধারির মধ্যে ওকে ঠিকমতো ঠাহর করতে পারছিল না সুখা। ひধু বুঝতে পারছিল, জামিয়া লম্বা এবং ওর হাতে সোর্ডটা নেই।

জামিয়ার সঙ্গী বাইকের দুপাশে পা ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল। বাইকের ইজ্জিন বন্ধ হয়নি, তাই ফটফট আওয়াজ হচ্ছিল, আর বাইকের হেডলইটটা একবার উজ্জ্, হচ্ছিল আর একবার মলিন হচ্ছিল।

না, ওই ছেনেটার কাছেও সোর্ডটা আছে বলে মনে হচ্ছে না। ওটা মনে
 প্রকৃতির চাপ আর সইতে পারছে না।

হাতল ভাঙা ছুরিটা শক্তু মুঠোয় आঁকড়ে ধরল। ওর আঙুলের হাড় ব্যথা করতে লাগল। আসুক জামিয়া—আরও কাছে আসুক। একজন-একজন করেই নিপতের কর্মকাজ্জ রুরু হোক।

বাথরুম করার দূর্গ্ধ মাথা ছোট্ট এলাকাটায় पুকে পড়ার আগেই ব্যস্ত হাত প্যান্টের ‘জিপ’ খুলে ফেলেছিল জামিয়া। তারপর ব্যস্ততাবে ঢুকে পড়েছে অন্ধকার ঘুপরিতে।

ভাঙাচোরা দেওয়াল আর ডঁঁই করা আবর্জনার মধ্যে ঘাপটি মেরে কুঁকড়ে বসেছিল সুখারাম। নিয়তির অদ্ভুত খেলা দেথে ও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তহা থেকে বেরিয়ে ওকে আর দোড়ে শিকার ধরতে হবে না। শিকার নিজেই চলে এসেছে গুহায়।

জামিয়া দু-পা ফঁঁক করে পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে-না-দাঁড়াততই সুখরামের ছুরি শঙ্ভচুড়ের চঙে ওকে ছোবল মেরেছে। ছুরির জং ধরা ফলাঢা জামিয়ার ‘লেটার বক্স’-এর ভেতর দিয়ে সরাসরি চুকে গেছে অন্ধকারে। সজোরে আঘাত হেনেছে।

ছুরির ফলাঢা কোনও বাধা পেল না দেখে সুখারাম খানিকটা আশ্চর্য

হল। মনে হল, ও যেন একতাল মাখনের মা্্য ছুরি চালিয়েছে।
জামিয়া যে-‘ওঁক’ শব্দটা করল সেটার ধরন অনেকটা মুরগির শেষ চিৎকারের কাছাকাছি। আর ওর দেইটা সামনে ভাঁজ হয়ে হুড়ি খেয়ে পড়ল সুখারাম্রের গাল্যের ওপরে।

কিন্তু সেসব তেমন মনোযোগ দিয়ে থেয়াল করার মতো অবস্থা সুখারামের ছিল না। কারণ, ওর ডানহাত তখনও একই কাজে ব্যস্ত ছিল। টিভিতে একঘেয়ে অ্যাকশন রিপ্লে দেখানোর মতো ও বারবার মাখনের তালে জং ধরা ছুরিট বসিয়ে যাচ্ছিল। আর মনে-মনে বলছিল, 'মা-ঢোলি। মা-চোলি, মা-চোলি...’’

জামিয়ার চাপা আর্তনাদ ওর সঙ্গীর কনে প্পৗঁছয়নি। কারণ, আর্তনাদের তীব্রতা যথেষ্ট কম ছিল-আর তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাইক থেকে জামিয়ার দুরত্র, বাইকের ইঞ্জিনের শব্দ এবং আশপাশের টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম।

কিন্ত জামিয়ার দেরি দেখে সে চেঁচিয়ে জমময়ার নাম ধরে ডাকন। পরপর তিনবার। াাঁর মধ্যে শেষবারের ডাকটা যথেষ্ট অধ্ধের্য ভাব আর বিরক্তি মেশানো।

সুখারাম হাঁপাচ্ছিল। ওর বুকের ভেতরে ধকধক আওয়াজ হচ্ছিল। মনটা

 ভিজে চটচটে হয়ে গিয়েছিল। এখন বৃষ্টির ফ্োঁটায় সেই চটচটে ভাবটা ধুর্যে यাচ্ছিল।

ও দেখল, বাইকে বসা ছেলেটা এবার সামনে ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল দুটো ধরল। आ্যথলিটের ভঙ্গিতে পা ঘুরিয়ে বাইক থেকে নেমে পড়ল। তারপর বাইকটাকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে ও জামিয়ার নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে সুখারামের আশ্রয়ের দিিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আয়—এগিয়ে আয়। আরও কাছে আয়...।
সুখা মনে-মনে ওকে আর ভগবানকে ডাকতে লাগল।
ছেলেটা অকুস্থলের কাছাকাছি এলেই জামিয়াকে দেখতে পেল। নোংরা আর আবর্জনার মধ্যে কেমন অদ্রুত ডঙ্গিতে হ্মড়ি থেয়ে পড়ে আছে।

ও জামিয়াকে কয়েকবার নাম ধরে ডাকল। ওর গলার স্বর আলতত, স্তিমিত। তার মধ্যে অম্পম্প্প সর্তকতা पুকে পড়েছে।

অন্ধকারে দম বন্ধ করে উবু হয়ে বসে রয়েছে সুখারাম। যেন একটা নিথর গোটানো স্প্রিং। যে-কোনও মুহূর্ত্র ছিটকে লাফিয়ে পড়বে শক্রুর ওপরে।

কিন্তু শত্রু আরও কাছে আসছে না কেন?
ছেলেটট আর-একাটু কাছে এল। ঝুঁকে পড়ে হাত লম্বা করে জামিয়াকে

ছুঁন। তারপর ‘জামিয়া। আবে জামিয়া!’ বলে ডাকল। ওর অসাড় শরীরটাকে কয়েকবার ঠেলা মারল।

ব্যস! তার পরই ও অনুসন্ধানী চোখে চারপাশে নজর চালাল। ওর চঞ্চল চোখ অন্ধকার খুপরির প্রতিটি আনাচকানাচ এক ঝলকে দেখে নিল।

আর তখনই দেখতে পেল কুকড়ে বসে থাকা শিকারি সুখারামকে।
দু-নম্বর জগতের অলিগলি ছেলেটের জনা। নানান ধরনের কাজিয়া, লড়াই, খুন্োখুনির মধ্যে ও বড় হয়েছে। বদনোয়ার দলে থাকার মতো যোগ্যতা ওর যথেষ্ট আছে। তাই ও তক্ষুনি পরিস্থিতি आঁচ করে নিল। বুঝল, ঊর্ধ্বশ্ধাসে ছুটে পালানোটই এই মুহূর্তে সেরা স্ট্রাটেজি। তাই উলটোদিকে ছুট লাগাল।

ছেনেটা যেভাবে মোটরবাইকটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল তাতে বোঝা গেল ও বাইক চালাতে জানে না।

চোখের পলকে গোটনো স্প্রিং-টা খুলে গেল। ছিটকে লাফিয়ে পড়ল গলির সিমেন্ট বাঁধানো জমির ওপরে। এবং কিপ্র পায়ে ছুটে পালানো ছেনেটার পिছু নিল।

সুখারাম নস্করের খুব আনন্দ হচ্ছিল। কারণ, শক্রুকে এখন ও বাগে পেয়ে গেছে। ছেলেটা সুখার সঙ্গে রেলে নাম দিয়ে ফেলেছে। আর ওর ফেরার পথ नেই।

मু
বৃষ্টি గিজা রাস্তায় ছুটতে ওর খুব একটা অসুবিধে হচ্ছিল না। তবে ওর বরাট স্যারের কথা মনে পড়ছিল। এই দৌড়টা জিততে হবে। জিততেই হবে!

বস্তির গলির ভাঁজতলো পেরিয়ৌ বড় রাস্তা। রাস্তাটা গলির চেয়ে চওড়া বলেই এর নাম ‘বড়’ রাস্তা। কিন্তু আসলে ওন্ড সিটির অন্যান্য রাস্তার মতো এই রাস্তাটাও শতচূর্ণ।

রাস্তার শুরুর দিকটা সাপের মতো—জাঁাবাঁাকা। তারপর খানিকটা অং্শ সোজা-নাকবরাবর। সেই সোজা রাস্তায় এসে পড়ত্তই ছুট্ত ছেলেটাকে দেখতে পেল সুখারাম। ওর সামনে—পচচচশ কি তিরিশ মিটার দূরে-লৌড়চ্ছে।

সুখার ভেতরে তেজের ঝলকানি ঠিকরে বেরোল। ওর প্রতিটি স্নায়ুতে তেজস্ক্রিয় কণার স্রোত ছড়িয়ে পড়ন। द্বাক খারাপ হলেও ও মনের মতো করে দৌড়তে পারছিল। বেশ বুঝতে পারছিল। দুজনের মধ্ধে দূরত্ব কমছে।

রাস্তার বাঁ-দিকে অবহেলায় পড়ে থাকা জমি। সেখানে ভাঙাচোরা বড়বড় যন্ত্রপাতি, পুরোনো গাড়ি, দেওয়াল কিংবা ছাদ ভেঙে পড়া ঘর, আর গাছপালা তো আছেই! এ ছাড়া ডানদিকে ছোট-বড়-মাঝারি বিল্ডিং—আর তার লাগোয়া অসংখ্য ঝুপড়ি।

সুখারাম একমনে দৌড়চ্ছিল, মুখ দিয়ে দু শব্দও বেরোচ্ছিল না। শুধু ওর নিশ্বাসের শব্দ আর জ্ৰধপিণ্ডের ধকধক শোনা যাচ্ছিল।

সামনের ছুট্ত ছেলেটা কোনও আওয়াজ করেনি-শ্ুু প্রাণপণে ছুটছিল। একবার ও পিছনে তাকিয়ে সুখারামকে দেখ্খেছিল-তারপর আর মুখ ফেরায়নি।

সাহায্যের জন্য কোনওরকম চিৎকারও করেনি ছেলৌট। কারণ, ও জানে চিৎকার করে কোনও লাভ নেই। এত রাতে এই বৃষ্টিতে কেউই ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে না। অবশ্য বৃষ্টিহীন বিকেলবেলা হলেও কেউ আসত না। শুধু বিনিপয়সার মজা দেখত। এটই ওল্ড সিটির দস্তুর।

সামনের ছুট্ত ছেলেটা কী করে যেন বুঝতে পারল সুখারামের সঙ্গে ওর দূরত্বটা বিপজ্জনকভাবে কম্মে এসেছে। তই ও ছুটতে-ঘ্ঘুটতেই ডানদিকে বাঁক নিল। হয়जো ভেবেছে ঝুপড়িগুলোর ওপরে ঝাঁপিত্যে পড়ে চিৎকার চেচামেচি করে সাহায্য চাইলে একটা হষ্টগোল তো অন্তত হবে! তাত যদি পিছন-পিছন ছুটে আসা কম্বখ্ত পাগলা কুত্তাটাকে রুখে দেওয়া যায়।

ছেলেটার ভাবনাটা ভাবনাই রয়ে গেল। কারণ, সেটা বাস্তবে অনুবাদ করার আগেই সুখারাম ওকে হাতের নাগলে পেয়ে গেল এবং এক ধাক্কা দিল।
 রাস্তার বরি মীটিতি

সুখারাম ওর কহে গিত্যে পড়তেই ছেলেটা শরীর বাঁকিত্যে সুখার পা চেপে ধরল। গোঙানির সুরে বলল, ‘ছোড় দে, ভাইয়া, হমে ছোড় দে। ইয়ে সব বদনোয়াকা কাম হায়। হাম কুছ নাহি কিয়া। আমি কিচ্ছু করিনি-বিশ্বাস কর...।’

ওপরদিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় ছেলেটটর মুথে বৃষ্টির জল ঢুকে যাচ্ছিল-তই ও বারবার ঢেক গিলছিল।

সুখারামকে প্রেতের মতো দেখাচ্ছিল। বৃষ্টি ভেজা খালি গা। মাথার চুল কপালে লেপটে আছে। কাদা মাখা ভেজা হাফপ্যান্ট। আর ডানহাতের মুঠোয় গাতল ভাঙা জং ধরা ছুরি।

ছেলেটাকে এক ধাক্কা মেরে পিছনে ঠেলে দিল সুখা। তারপর ওর গায়ের ওপর 'ছপাৎ’ শব্দে বসে পড়ল। ছুরি ধরা হাতটা শূন্যে উঁচিয়ে।

দাঁতে দাঁত ঘষে ও হাঁপাতে-ছাপাতে জিগ্যেস করল, 'বল, বাকি তিনটে হারামি কোথায় গেছে...।'

সুখারামের হাতের ছুরির চেহারাটা চটপট উত্তর পেতে সাহায্য করল। 'ওরা...ওরা পোড়া বস্তির ঠেকে গেছে-।'
ঘোড়ায় চড়ার মরো দুপাশে দু-পা রেখে ছেলেটার ওপরে সওয়ার হয়ে ছিল সুখা। চারপাশে ভিজে কাদা-মাটি। ছেলেটা হাপাচ্ছে। অসগায়ের মতো

## ১৭ษ www.banglaboêkedf.bitogspot.com

 ওপরদ্কে ফ্যানझাল কর্রে ঢাকিক্রে আহ্র।লেই অবश্ছাতই ও বলঢত নাগল পোড়া বঠ্টির ঠেকটা ঠিক কোথায়।



সুখরামের মাথার ভেতে আাখন জ্রাহান, উথালপাথাল চলছিল। কিন্তু

 এই রাতের অঞ্বকরে, এই বৃষ্টির মধ্যাও, সেটা চিনে নিতে ওর তেমন একটা जসুবিধে হরে না।
 শাস টানছিন। ওর চোখ সুখার হাতের ছুরিটির দিকে স্থির। ও বুমচ্ পারহিন,
 করহছন।

ওকে বারবার জেরা করে সুখারাম একসময় নিশ্চিষ্ঠ হন বে, ছেলেটা
 নেই। একইসল্দে ওর মাথার ভেতরে ঢোি আর মা ভ্যে চিৎকার করে কিম্


সুখারাম মুখ ডুলে আকাশের দিকে একবার লেখন। তারপর ছেলেটের দিকে।

এই ছেলেটা আরও অনেকদিন ব্ৰেচে থাকচে পারত।
 মজে आওয়াজ করে উঠন।

সুখা হিষ্ব গলায় বনन, 'शঁ কর!
ছেলেট অবাক হর্যে গেল। সুখার দিকে শুন্য চোধে তাকি়্রে রইল।
'रাঁ কর সালা। নইলে নলি ফাঁক করে দেব!'
ছেলেটা ধन্দে থাকলেও চটপট হাঁ করল এবার।
সুখা ছুরিটা ওর গলার পশ থেকে সরিয়ে এনে গলার নলির ওপর চেপে ধরল।

ছেলেটা ভয়ে কঁকিয়ে উঠল।
ওর মুখের ওপরে ঝুঁকে পড়ল সুখারাম। ছেকেটটা চুপ করে সিঁটিয়ে আছে। বোধহয় বুঝতে পারছে সুখারাম এখন মানুষ নয়——কিলার রোবট। যে অকাতরে এক ছোবলে জামিয়াকে খতম করে দিয়েছে।

চোখের পলকে সুখারাম একটা কাণ্ড করে বসল। বাঁ-হাতে এক খাবলা

কাদা-মাটি তুলে নিল। এবং সেটা থাবড়ে ঢুকিয়ে দিল ছেলেটার হাঁ করা মুতে। ছেলেট্ হাত-পা ছুড়ে হাঁসएাঁস করতে লাগল। সুখার হাত আঁকড়ে ধরল। ওর নখের আঁচড়ে সুখার হাত ছড়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সুখা দ্বিতীয়বার মাটির খাবলা তুলে নিয়ে ছেলেটার মুঢ্ের ওপরে চাপড়ে দিয়েছে। আর একইসল্গে ছুরির কাঠের হাতলের ডগাটা হাুড়ি পেটার মতো সজোরে বসিয়ে দিয়েছে শক্রুর বাঁ-রগে।

ছেলেটা এলিয়ে গেল। ওর ঝটাপটি স্তু্ধ হয়ে গেল। বোধহ়্য অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুখারাম ওর নাক টিপে ধরল। ছুরি ফেলে দিয়ে আর-এক খাবলা মাটি ঠেলে দিল ওর মুখে। ঝটকা দিয়ে একবার কেঁপে উঠল ছেলেটার দেছ। তারপর আর নড়ল না—মৃত্দেহ হয়ে গেল।

সুখারাম টের পায়নি, কখন যেন ও কাঁদতে শুরু করেছিল। ওর গাল গড়িয়ে চোখের জল নামছিল। ও ছেনেটার দুলের মুঠি ধরে পাগলের মতো ঝাঁকাতত শুরু করল। আর কান্ন ভাঙা গলায় আর্ত হাহাকার করে উঠল, 'মা! মা রে! চোলি! আমার চোলি...’’

বৃষ্টি ভেজা রাত ছাড়া আর কেউ সুখারাম নস্করের বুক ফাটা কান্না


ওর মনে হল, প্রতিশোধের দুইয়ের পাঁচ অংশ শেষ হয়েছে-তিনের পাচ অংশ এখনও বাকি।

সুখারামের নিজের ওপরে কোনও. নিয়ন্ত্রণ ছিলল না। একটা জিন पুকে পড়েছিল ওর শরীরের ডেতরে। সে-ই যেন অন্তর থেকে নির্দেশ দিয়ে ওকে নানান কাজ করতে বলছিল, ওকে দিয়ে यা খুশি করাচ্ছিল।

সেই জিনের নির্দেশেই সুখারাম এখন দ্দেড়চ্ছিল। ছুরিটা হাফপ্যান্টের হিপ পকেটে গোঁজ। চোয়াল শক্ত। চোে মরিয়া এক প্রতিজ্ঞ। ওর পায়ের প্রতিটি পেশি সেই প্রতিজ্ঞার শরিক হয়ে একমনে নিজেদের কাজ করে চলেছে।

বৃষ্টি-ভেজা রাস্তায় ওর ছুটত্ত পায়ের শব্দ হচ্ছিল। সেই শক্দের সন্গে তাল মিলিয়ে প্রতিধ্বনির মতো শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যেন আরও একজন সুখার সঙ্গে-সঙ্গে সমান তালে দৌড়চ্ছে।

সুখারাম্মে মনে হল, সৌা বরাট স্যার।
এ-কথা মনে হতেই ওর শিরা-উপশিরায় নতুন তেজের স্রোত বয়ে গেল।
 नाগศ।
 এশু-তারপরই চলে জাসবে পোড়া বচ্থির এলাকে, তারপর বদনোয়াদ্দর চেক। তারপর...

সুখারামের বুক লক্ষ্য করে বাতাস ছুটে আসছিল। বৃষ্টি ভেজা বাতাসে খল থেকে ভেসে আসা দুর্গন্ধ।

খালের দিকে চোখ গেল ওর। কাল্লে তেলচিটে জল। ঈঁক আর যত রাজ্যের তরল আবর্জনায় অনেক घন আর অারি হয়ে গেছে। রাস্তার কয়েক্টা ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো ছিটকে পড়েছে সেখানে। চকচক করছে। সুখারামের
 মেরে এগিয়ে চলেছে। একদু পরেহ শিকররে ওটা গিলে লেবে।

পোড়া বচ্ঠির এলাকা়় দুকে পড়ন। এইবার đাঁ-দিকে, তারপর ডানদিকে পরপর দূবার।

ওই जে, সামনেই অঞ্ধকর বাতবরণণ মধ্যে একটা টিট্নের চালাঘর!

 বल্লছে। বদনোয়া আর তার খুচ্রো চামচামভলী।

মরণাপন অসহায় ঢেলেটে বেयন-বেমন বনেছ্হিন তার সল্গে দিবি মিলে यাচ্ছ। আর जার ওপরে আগমার্কা সিলম্মাহর বসিয়ে দিক্রেছে ঘরের বাইরে হেলিয়ে দাঁড় করানো দूढো বাইক।






বুকের ডেতরে নানান শাদ টের পাচ্ছিল সুখারাম। একটা ঢিপচিপ শদ।
 বিনুनि।

এমন সময় घরের ডেতর থেকে বদনোয়ার গলা শোনা গেল।
 লটটে গেন?'

ওই ছেলেট্র নাম অ হলে পিল্নে! जাবল সুখারাম।

## www.banglabookpdf.blogspot.com



বদনোয়ার এক শাগরেরের গলা শোনা গেল : ‘বারবার ফোন করছিশুধু রিং হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সালারা বিজি। যাক্গে, যখন আসে আসবে। এসে দেখবে সব মাল খতম। তখন সালারা বোতল চাটবে।’

তারপরই খ্যা-খ্যা করে হাসি। আর কাচের গ্লাস কিংবা বোতলের ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

ওরা কি কেউ ঘরের বাইরে আসবে না? यদি একজন-একজন করে শয়তানগুলো বাইরে আসে তা হলে খুব ভলো হয়। সুখারাম একে-একে ওদের মোকাবিলা করবে, একে-একে ওদের খতম করবে।

কিত্তু यদি না আলে?
দ্বিধা দ্বন্দ্বে কয়েক মিনিট কাটতে না কাটতেই দরজায় এসে দাঁড়াল ওদের একজন। চোখের ওপরে হাতের আড়াল দিয়ে দূরের রাস্তার দিকে তাকাল ছেলেট।

ওর রোগা .万হারা। চুলগুলো খাড়া-খড়া। ডান হাতে তিনটে জ্যোতিষী आংটি। বাঁ-হাতটা কন హ̄ত্যের কাছে ধনুকের মতো কিছুটা বাঁকা। চোখ ঢুলুঢুলু। চোেের নীচে ছোট-ছেট পাউচ।

দেতেই বোঝা যায়, ছেলেটা কমপক্ষে শতকরা আশি ভাগ মাতাল হয়ে
 বস্-কোই নইী। না কোনও বাইক, না কোনও মানুষ!’

সুখারাম চালাঘরটার দেওয়াল ঘেঁষে ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। হিপ পকেটের ছুরিটা কখন যেন ওর হাতে উঠে এসেছে। বুকের ভেতরের বিচিত্র শব্দগুলো আরও জোরালো হয়ে উঠেছে, আর একইসঙ্গে বিকৃত শোনাচ্ছে।

সুখার কান ডেঁ-ভেোঁ করছিল। চোখের নজর ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু ও মনের জোরে সেটাকে বাপসা হতে দিল না-ছেলেটার ওপরে ফোকাস করে রাখল।

বাইরের অন্ধকার সুখাকে সাহায্য করছিল, কিন্তু টিনের ফাঁকফোকর দিয়ে আলোর কয়েকটা বর্শা অন্ধকারকে অল্পবিস্তর চিরে দিয্যেছিল।

সুখা চেয়েছিল, ছেলেটার সামনে আচমকা গিয়ে মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠবে-কিন্তু বাস্তবে সেটা অল্পের জন্য হল না। ছেলেটার ছ’নম্বর ইন্দ্রিয় ওকে সাহাय্য করল। শেষ মুহূর্তের ঠিক আগের মুহূর্তে ছেলেটা সুখারামকে দেখতে পেয়ে গেল।

সুখারাম্রে হাত তখন শূন্যে। বুকের মধ্যে লকলকে আগু। ঠোঁট সরে গির্যে ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে এসেছে। ওর হাত ছুরিটা ধরা না থাকলে

# www.banglałōcók pedf.tologspot.com 

মনে হত, ও বোধহয় দাঁত দিয়েই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবে। দাঁতই ওর প্রাকৃতিক ধারালো অন্ত্র। ভ্যাম্পায়ারের মতে।

ছেলেটা অবাক হয়ে যাওয়া গলায় চিৎকার করে উঠল ঃ ‘কওন ঘায় বে তু?’

সুখারামের ছুরি ছেলেটার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিন। বিদ্দুৎঝলকের মতো ছেলেটাকে বুকে ছোবল মারল। একবার—দুবার-তিনবার।

সুখার ছুরি ধরা হাতের সঙ্গে বুকের সংঘর্ষের দাপটে ছেলেটা যেন স্লো মোশানে পিছনদিকে হেলে পড়তে লাগল। তারপর একসময় চিত হয়ে পড়ে গেল চালাঘরের মেঝেতে। ওর অঁকুপাঁুু হাতের ধাক্কায় একটা গ্লাস আর বোতল ছিটকে গেল। মদের গন্ধের ঝাপটা ছড়িয়ে গেল বাতাসে।

ঘরের ভেতর থেকে বিকট চিৎকার শোনা গেল। তারপরই হৃড়মুড় করে খসে পড়া ছেলেটার ওপরে ঝুঁরে পড়ন বদনোয়া আর ওর শাগরেদ।

সুখারাম দরজার বাইরে থেকে ওদ্রে দেখতে পেল।
বুকে গাঁথা ছুরির বাঁটটা দেত্থেই বদনোয়া পলকে গল্পাটা বুঝতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে পাশে বাঁাপিয়ে পড়ে নিজের রিভলভারটা খামচে ধরল ও। তারপর ওরা দুজনে দরজা লক্ষ্য করে পা ফেলতেই সুখারাম ছুটতে ওরু করল। শুধু ছুট নয়-এরেবার হরিণ্রে দ্ডাড বেড়ে यাচ্ছিল।

সুখারাম বুঝতে পারছিল এখন কী হবে। বদনোয়া আর ওর শাগরেদ ছুটে এসে বাইকে উঠবে। বাইক স্টার্ট দিয়ে সুখারামকে ধাওয়া করবে। গুলি ছুড়বে। তারপর একসময়...।

বাপারটা অনেকটা তাই হন।
দরজার কাছ থেকেই সুখারামের ছুটন্ত শরীরটা লক্ষ্ম করে রিভলভার ফায়ার করল বদনোয়া। বোতলের কর্ক-ছিপি থোলার ‘প্লপ’ শব্দ হল। কিন্তু রাতের আড়ালে থাকা 'মুভিং টারগেট’ সুখারাম নস্করকে সে-গলি ছুঁতে পারল ना।

বদনোয়া ছুটে গিয়ে বাইকে চড়ে বসল। বাইক স্টার্ট দিল। উৎকট শব্দ আর পেঁঁয়ার ভলক। বাতাসে পোড়া গন্ধ। বাইকটা গুলতি থেকে ছোড়া গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল।

বদনোয়ার সঙ্গী এক ধটকায় ঘরের ভেতরে ঢুকেই আবার বেরিয়ে এল। ওর হাত এখন অস্ত্র। প্রায় দেড়হাত লম্বা একটা সোর্ড। বোঝা গেল, এই অস্ত্রণা ব্যবহারেই ও অভ্যত এবং দক্ম।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারে সোর্ডট কীজাবে যেন আটকে দিল ছেলেট।। ঢারপর বাইক স্টার্ট দিয়ে দৌড়। ও বুঝতে পেরেছে কে এই

## ১৮২ www.banglabiôth pdif.bilogspot.com

আততায়ী। এই খ্যাপা কুত্তাটকে নিকেশ না করে নিস্তার নেই। যেভাবেই হোক তয়োরের বাচ্চাটকে এখুনি খতম করতে হবে।

ভাঙাচোরা রাস্তা। যেখানে সেথানে খানাখন্দ। জল জমে আছে। আকাশে থমথমে মেঘ। কোথাও কালো, কোথাও লালচে, কোথাও বা গাঢ় ছাই রঙের। মেঘের স্তর ভেদ করে চাদ কিংবা তারা চোথে পড়ছে না। মনে হচ্ছে, যেকোনও সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বদনোয়ার বাইক লাফিফ্রে-লাফিয়ে ছুটছিল। বাইকের হেডলাইট ওন্ড সিটির রাস্তায় সুখারামকে থুঁজছিল। কিন্তু ছুট্ত কাউকে ও দেখতে भচ্ছ্ছিল না।

রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। যে দু-একজনকে চোথে পড়ছে তারা নিশ্চয়ই সহজে-ভয়-পাওয়া ছপোষা লোক নয়। কারণ, এত রাতে ওল্ড সিটির অলিগলি রাজপথে ছপোষা লোকরা ঘুরে বেড়ায় না। যারা ঘুরে বেড়ায় তারা না-পোযা, বুনো, ভয়-দেখাতে-চাওয়া মানুষ।

বাইকের গর্জন এই নিশতিতে খ্যাপা বাঘের গর্জনের মতো শোনাচ্ছিল। আর সেই গরজানো বাঘের পিচে আরও একটা হিশ্র্র বাঘ বসে ছিল। বদনোয়া।

ওর রিভলভারটা প্যান্টের বাঁ-দিকের কোমরে গোঁজা। ওটা থেকে একুু
 মদ্রে ঠেকের কাছে বাইক থামাল।

তিনজন খদ্দের দোকনের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে বসে ছিল। তিনজনের মধ্যে দুজনের অবস্থা আলুথালু, নিয়ম্ত্রণহীন। হাত-পা এদিক-সেদিক ছড়ানো, মাথা একপাশে হেলে আছে।

আর-একজনের অবস্থা তুলনায় অনেক উন্ন। হাতে বোতল এবং গ্লাস। সে মাঝে-মাঝে রোবটের ঢঙে বোতল থেকে ঞ্মেেে তরল ঢালছে এবং গ্মাসটা একদম ঠিকঠাক নিজের ঠোটে পোঁছে দিচ্ছে।

তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল বদনোয়া। কাঁধ ধরে রীতিমতো ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করল। তারপর হিন্দিতে সুখারামের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে 'ওর ハ্ৰেঁজ-খবর করতে লাগল। কিন্ত ছেলেটে বদনোয়ার সব প্রল্নের উত্তরেইই এপাশওপাশ মাথা নাড়তে লাগল।

একসময় বদনোয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। ডানপকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে নম্বর লাগাল।
‘ঝাম্সা, তু কঁহা হায় রে?’
‘তেজানি মোড়ে এসেছি, বস্...’ ঝাম্সা জবাব দিল। ফোন বাজতেই ও বাইক থামিয়ে ফোন ধরেছিন। কিন্তু ওর চোখ চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক

নড়ছিল। সুখারাম নস্কর নাম্ম কুত্তাটকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।
‘কোনও খবর পোি?’
‘না, বস্। তবে এদিকটায় আসতে পারে। এখানে ছুপে যাওয়ার অনেক থোপ-খোপানি আছে। আমি ছানবিন করে রিপোঁ্ট দিচ্ছি-।’

বদনোয়া আপনমনে একটা থিত্তি দিল। ওর ভেতরে রাগ গরগর করছিল। এত বড় সাহস! বদলা নিতে বাঘের মুথ্রে মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে চাম্পুর বুকে ছুরি গেঁথে দেয়!

জামিয়া আর পিল্লের কথা ভেবে বদনোয়ার মনে কাঁটা খচখচ করে উঠল। ওরা এখনও ফিরল না কেন? এতক্ষণ ধরে একটাও ফোন করল না কেন? বদনোয়া আর ঝাম্সা যতবারই ফোন করেছে ওদের ফোন শুধু রিং হর্েে গেছেকেউ ধরেনি।

ঋাম্সা, শোন, তুই মালটাকে দেখতে পেলেই আমকে কোন লাগাবি। आমি ঝটট্সে স্পটে চলে যাব। তারপর দুজনে মিলে যা করার করব। ঢুই একা কোনও রিস্ক নিবি না, সম্্া? মালটা খতরনাক আছে-।’

ঝাম্সা হাসল-আত্মবিশ্ষসের হাসি। তারপর বলল, ‘বেফিকর রহো, বস্। সুখারামকে পেলে আমার দেড়-ফুটিয়া সোর্ড দিয়ে ওকে প্রথমে কিমা বানাব।
 ফোন করবি... '’

ঢাপদাড়িতে আডুল ঘযতে-ঘষতে বদনোয়া বাইকের দিকে এগোল। একটা ঢেঁকুর তুলল। একれলক মদের গন্ধ বেরিয়ে এল। এই গন্ধ ওর খুব চেনা হলেও এখন গন্ধটকে একদু অচেনা মনে হল।

মনে হল, এর মধ্যে মৃত্যুর গন্ধ মিশে আছে।

বাম্সা বাইক নিয়ে তেজানি ূ্যাড়ে ধীরে-ধীরে চক্কর কাটছিল। আর মনেমনে হিসেব কষছিল, ও यদি সুখারাম হত তা হলে কোথায় গিল্যে গা-ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করত।

ঝাম্সা ঠাভ্ডা মাথার ছেলে-বদনোয়ার মতো রগচটা নয়। ও এ পর্য্্ত या কিছু করেছে সবই ঠাল্ডা মাথায় করেছে। লড়াইয়ের সময় সোর্ডটা যখন ও গাতে নেয় তখন ওর মনে হয়, সোর্ডটা কোনও আলাদা অন্ত্র নয়-বরং ওর ডানহাতটা যেন কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় আরও দেড়-ফুট লম্বা হয়ে গেছে। যখন ঝাম্সা সোর্ড চালায়, তখন ওর মনে হয় ও হাত চালাচ্ছে। ব্যাপারটা

## ১৮8 <br> www.banglaboêt pdf.bilogspot.com

ওর কাহে এতটাই সহজ আর স্বাভাবিক।
তেজানি মোড় থেকে দুটো চওড়া রাস্তা ‘ওয়াই’-এর মতো দু-দিকে এগিক্রে গেছে। তার মধ্যে একটা রাস্তা চলে গেছে ট্রাক টার্মিনালের দিকে। কী মনে ছওয়াতে ঝাম্সা সেই রাস্তায় বাইক ছুট্য়ে দিল।

একটু এগোতেই রাস্তাটার চরিত্র পালটে গেল। ছেঁড়াখ্যেড়া পিচের বদলে ইটের মপের কলেো পাথরের টুকরো খুু হল। যেহেতু এ-রাস্তায় বেশিরভাগ সময় ভারী-ভারী ট্রাকের আনাগোনা, তাই এই ব্যবস্থ।

রাত দেড়ঁটা বেজে গেছে। রাস্তায় লোকজন কেউ নেইই। লাইটপেস্টের নিস্তেজ আলোয় ফাঁকা রাস্তাটা আরও বেশি ফাঁকা লাগছে।

ঝাম্সা বাইকের গতি কমাল। ষীরে-ষীরে এগোতে লাগল। আর একইসঙ্গে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগল।

রাস্তার ধারে নানান ধরনের ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। কোনওটা খালি, কোনওটা ভরতি। লোড করা মালের ওপরে তেরপলের ছাউনি আর নইলনদড়ির বাঁধুনি। ট্বাকগুলোর ফঁঁকফেেকরে অন্ধকার।

ঢালাঘর থেকে বাইক নিয়ে রওনা হওয়ার পর থেকে সুখারামের থ্রেঁজে ঝাম্সা এর মধ্যে অনেক এলাকতেই ঘুরে বেড়িয়েছে। যেটা ওর জানা ছিল
 বেড়াচ্ছিল।

সুখারাম একসঙ্গে ওদের দুজনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চায়নি। কারণ, তা হলে প্রতিশেধের দুইয়ের পাঁচ অংশ অপূর্ণ থেকে যাওয়ার সस্তাবনা ছিল। তাই সুখারাম একের পাঁচ অংশের ইনস্টলমেন্টে কাজটা শেষ করতে চাইছিল। তবে ইনস্টলমেন্ট হিসেবে বদনোয়া কিংবা ঝাম্সা নিয়ে ওর মধ্যে কোনও বাছবিচার ছিল না।

এ ছড়া কিছুটা সময়ও সুখারাম হাতে চাইছিল—আর চাইছিল একটা অ్ㅜㅅ।

ঝাম্সা রাস্তা ধরে আরও এগোচ্ছিল। চোথে সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি। ও জানে, সুখারামের কাছে রিভলভার নেই। তাই চাম্পুকে ও দূর থেকে গুলি করেনি। ছুরি হাতে নিয়ে নিতান্ত দুঃসাহসে বিপদসীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

সেই ছুরিটাও গেঁথে আছে চাম্পুর বুকে। সুতরাং, ছেলেটার কাছে এখন কোনও অন্ত্র নেই।

এইসব অঙ্ক কষতে-কষতেই বাম্সা একটা ঘেরা এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বারো ফুট উ"দু লোহার জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল এলাকা। তার কোথাওকোথাও জাল জং ধরে ছিঁড়ে গেছে। দরজা হয়তে এককালে ছিল-এখন

ঘোরা এলাকার একপ্রান্তে, অনেকটা দূরে, কয়েকটা ভাঙাচোরা ট্রাক দাঁড়িয়ে। তার পাশে টিন্নের চালে ছাওয়া কয়েকটা তালিমারা ঘর। ছিরিছাঁদীীন ঘরগুলো এ-ওর গয়ে হেলে আছে। কোনওটার চাল ভাঙা, কোনওটার বা দেওয়াল নেই।

ঘরণুলোর পালে টিনের ড্রাম্রের পাহাড়। তাদের তিনটে চূড়া দূর থেকেই চোেে পড়ছে।

ঝাম্সা ডানদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে জাল ঘেরা এলাকাটা দেখতে-দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছিল, হুাৎই পিছন থেকে কে ওকে ডাকল।
‘बই সালা, সুয়ার কা বাচ্চা!’
বাইক থামাল ঝাম্সা। শব্দ লক্ষ্য করে মাথা ঘোরাল।
সুখারাম নস্কর।
বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ সুখারাম একমু আগেই ওনতে পেয়েছে। তখনই ওর এলোমেলো প্থোজ শেষ হয়েছে। বুঝতে পেরেছে, ঘটনাচত্রে ওরা দুজন শক্রু কাছাকাছি চলে এসেছে।

এবার একের পাচ অংশের যুদ্ধ।
WNWN, banglabookootiblogspotacon
সুখারামের হাত একটা ইট। আরও ভলো করে বলতে গেলে ইটের মাপের একটা পাথর। এটই ওর অস্ত্র। পাথুরে রাস্তার পাশ থেকে ও কুড়িয়ে निয়েছে।

ঝাম্সা সুখারাম্মের ছায়া-ছায়া কালো চেহারাটা ভালো করে ঠাহর করে ওঠার আগেই সুখারাম হাতের ইটটা উঁচিত্রে ঝাম্সাকে লক্ষ্য করে ছুটতে শরু করেছে।

ঝাম্সা বাইক থামালেও ইঞ্রিন বন্ধ করেনি। সুখারাম কী করতে চলেছে आँচ করে ও এক ञ্যাচকায় বাইকটাকে সামনে এগিয়ে দিল, আর একইসল্গে মাথা নীহ করল। কারণ, ছুট্ত অবস্থাতেই সুখা হাতের অন্ত্রটটে ছুড়ে দিত্যেছে।

ইটটা বাম্সার গায়ে লাগল না। লোহার জালে গিয়ে লাগল। তারপর পাথুরে জমিতে ছিটটেে পড়ল। শব্দ করে দুবার লাফিয়ে তারপর থামল।

সুখারামের ভেতরে একটা অপার্থিব রাগ গরগর করছিল। ঝাম্সাকে যেমন করে হোক বাইক থেকে ফেলে দিতে পারলেই ওর অর্ধেক কাজ হাসিল হয়ে यাবে। তারপর...।

সুখা ছूটত্ত শুু করল। এখন को করবে ও? को করবে?

Jtw www.banglabiofek putf.tôlogspot.com
পিছনে বাইকের আওয়াজ পেল। ঝাম্সা তাড়া করে আসছে। কিন্তু সামনেই লোহার জালের দেওয়াল। ডানদিকে ঘুরে দৌড়তে পারনে বোধহয় ভলো হত। ওই ভাঙাচোরা ট্রাকগুলোর কাহে পোঁছতে পারলে হয়তো কোনও অন্ত্র খুঁজে পাওয়া যেত—লোহার কোনও রড বা গাড়ির পার্টস।

তাই ডানদিকে বাঁক নিল সুখারাম। আর তখনই দেখতে পেল ঝাম্সা দূরে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বাইকের ইঞ্জিন গরগর করছে।

ঝাম্সার কোনও তাড়া ছিল না। ও বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর জাল ঘেরা খঁচায় বল্দি—তা সে-খাঁচা যতই বড় হোক না কেন। এই খঁচা থেকে বেরোতে হলে ঝাম্সার বাইকের পাশ দিল্যেই ওকে বেরোতে হবে।

ঝাম্সার ফোন বাজছিল। পকেট থেকে ফোন বের করে নম্বরটা দেখল उ।

বদনোয়া।
হাসল বাম্সা। ওর হাতে এখন খুব জরুরি কাজ। ওই হারামির পিল্লাটাকে কিমা বানাতে হবে। এখন কেউ ওকে ডিসটার্ব করুক ঝাম্যা চায় না।

বদনোয়ার কল কেটে দিয়ে মোবাইল ফোেে সুইচ অফ করে দিল ঝাম্সা। আগে কাজ পরে ফোন।

 সুখারামকে লক্ষ্য করে।

ঝাম্সার সোর্ডের ডগাটা পাথরে ঘষা খাচ্ছিল। ছুরিতে শান দেওয়ার সময় শানপাথর থেকে বেমন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরোয়, ঝাম্সার সোর্ডের ডগা থেকে ঠিক সেরকম আগনের ফোয়ারা ছিটকে বেরোচ্ছিল। আর শিকার ধরার আনন্দে ঝাম্সার চোথে-মুখ্ে নৃশংস উল্লাসের জ্যোতি ধকধক করছিল।

সুখারাম দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। ওই তো, ঝাম্সার মোটরবাইক ওর দিকে ধেয়ে আসছে! তার পাশে-পাশে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে দিচ্ছে ঝাম্সার সোর্ড! এখন कী করবে সুখা?

বাইকটা যখন খুব কাছে এসে পড়েছে তখন সুখারাম জাল' লক্ষ্য করে বনবেড়ালের মতো লাফ দিল। জালের তার আঁকড়ে ধরে টিকটিকির মজো ক্ষিপ্রতায় তরতর করে কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল।

আর ঠিক তার পরের মুহূর্ত্ত বাম্সার বাইক তারের জালে এসে ধাক্কা খেল। সংঘর্ষ্বের প্রতিক্রিয়ায় বাম্সা বাইকসম্মেত ছিটকে পড়ল। নেহত কপালজোরে বাইকের নীচে ওর পা চাপা পড়ল না।

ছিটকে পড়ে গেলেও সোর্ডের হাতল ঝাম্সার শক্ত মুচোয় ধরা দিন। পাথুরে মেঝেতে শোওয়া অবস্থাতেই ও দেখতে পেল, সুখারাম জাল ছেড়ে

লাফিয়ে পড়েছে নীচে। তারপর তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মতো ছুট লগাল। ঝাম্সার পাশ দিত্যে সুখা ছুটে পালানোর সময় পেশাদার খুনি ঝাম্সা ওশেে-শয়েই সোর্ড চালিয়ে দিল-यদি 犭য়োরের বাচ্চাটকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যায়।

না, পাওয়া গেল না।
তই ঝাম্সা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কাত হয়ে পড়ে থাকা বইকটার পিছনের চাকা তখনও ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। সেটাকে টান মেরে তোলার জন্য গাতের সোর্ডটা আড়াঅড়িভাবে দাঁতে কামড়ে ধরল। তারপর বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে তাতে সওয়ার হয়ে বসল।

স্টার্ট। গর্জন। ছুট।
সুখারাম তখন টিন্নের ড্রামের পাহড়ের দিকে ছুটেছে। ওর শরীর ক্লান্ত, নাক দিয়ে ঝোঁসর্েেঁস করে শ্যাস বেরোচ্ছে, থিদ্দেয় পেট চোঁ-ঢো করছে। কিন্তু বুকের ভেতরের জালা, রাগ, আর জেদ সবকিছু চাপা দিয়ে দিয়েছে।

তাই সুখারাম, লং ডিসট্যাল্ল রানার, দৌড়চ্ছে।
ঝাম্সার বাইক গোঁ-গোঁ করে ছুটে আসছিল। সোর্ডের ইস্পাতের ফলা পাথরে ঘষা থেয়ে আগুনের ফুলকির রেখা এঁকে চলেছে। অন্ধকারে সেটাকে
 একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

ড্রামগলো সার বেঁধে শোয়ানো। একটা সারির ওপরে আর-একটা। তার ওপরে আবার একটা। সারিগুলো যত ওপরে উঠছে ততই একটা করে ড্রাম কমছে। সবমিলিয়ে একটা প্রকাত ত্রিভুজের চেহারা নিয়েছে।

জায়গাট তেলচিটে, পিছল। ড্রামগুলোও তাই। বোধহয় ওগুলো পোড়া মোবিল চালানের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জাল ঘেরা এলাকার বাইরে দুটো ল্যাম্পপোস্টে বাল্ব জ্রলছে। সেই আলোর সামান্য ছঢা নেহাতই দয়া করে ড্রামগুলোর আশেপাশে ছিটকে এসে পড়েছে। সেই আলোকে আঁকড়ে ধরে সুখারাম মাথা ঝুঁকিত্যে নজর চালাচ্ছিল।

কোথায় হাতিয়ার? কোথায়?
তাড়াহুড়োয় ইটের মাপের একটা কালচে পাথর খুঁজে পেল সুখা। কিত্তু ওটা হাতে তুলে নেওয়ার আগেই ঝাম্সার বাইক কাছে চলে এল।

সুখারাম বাইকের আওয়াজ পাচ্ছিল, চোেের কোণ দিয়ে আলোর ফুলকি দেখতে পাচ্ছিল, আর ছুটন্ত বাইকটাকে কীভাবে যেন অনুভবও করতে পারছিল।

ও চকিতে ড্রাম বেয়ে ওপরে উ১তে লাগল। তিনটে ড্রাম্মের জোটে একটা করে ছোট ত্রিভুজের মতো ফাঁক তৈরি হয়েছে। সেইসব খাঁজে থাবা आঁকড়ে,

## 

পায়ের পাতা ঢুকিয়ে ও সরীসৃপের মতো ওপরে উঠে গেল। আর ঝাম্সা ওকে লক্ষ্য করে সোর্ড চালাল।

সুখার পিঠঠ কেউ যেন আগুনের রেখা টেনে দিল। জ্বালা-পোড়া যন্ত্রণায় ওর পিঠের প্রতিটি পেশি কুঁকড়ে গেল। মুখ দিয়ে আহত জক্তুর গোঙানি বেরিয়ে এল। বাম্সার সোর্ড ওর নাগাল পেয়ে গেছে।

কিন্তু একইসঙ্গে ড্রামের পাহাড় নড়ে উঠল।
কারণ, সুখারামকে কিমা বানানোর নেশার ঘোরে ঝাম্সা এতই মাতাল ছিল যে, বাইকের সক্গে ড্রামের পাহাড়ের দূরত্ব বে বিপজ্জনকভাবে কমছে সেটা আর খেয়াল করেনি।

তাই ড্রামের স্বূপের সঙ্গে ওর ছুট্ত বাইকের জোরালো সংঘর্ষ হল। বাইকের ধাক্কায় খালি ড্রামগুলোয় শুধু যে প্রচণ শব্দ হল তা-ই নয়, তিনটে ড্রামকে সঙ্গে নিয়ে ঝাম্সার বাইক ড্রামের পাহড়়ের নীচে গঁতিয়ে पুকে গেল। ফলে ওপরের ড্রামগুলো হুড়মুড় করে নীচে পড়তে লাগল। মেঘ ডাকার মতো গড়̣উড় শব্দ হতে লাগল।

একটা ড্রামের ঢকনার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঝাম্সার মুখ থেঁতনে গিহ্রেছিল। ওর কপালটা বাড়ি থেয়েছিল ড্রামের শক্ত গোল কানায়। ফলে ও যখন বইক



ঝাম্যা কেনও যন্ত্রণা টের পাচ্ছিল না, কারণ সংঘর্ষ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর মুখ-ঢোখ লাল রঙে মাখামাখি। ও চিত হয়ে তেলচিটে জমির ওপরে পড়ে ছিল। কিন্তু আশর্যতাবে দেড়যুট সোর্ডটা তখনও ওর হাতের মুঠোয় ধরা।

সংঘর্বের পর সুখারাম কাত হয়ে পড়তে-পড়ত্ত নিজেকে সামলানোর চেট্টা করছিল, কিন্তু শেষ রক্ষ্ হহ়নি। ওর হাতের থাবা সেরকম কিছু আঁকড়ে ধরতে পারেনি। তাই হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কোনওরকমে নিজেকে সামলে রাখার চেট্টা করতে-করতে ও নীচে খসে পড়ল। অল্পের জন্য ওপর থেকে গড়িয়ে পড়া ড্রাম সরাসরি ওর মাথায় এসে লাগল না।

সুখারাম চিতপাত হয়ে পড়েছিল পাথুরে জমিতে। তারপর কিছুক্ষণ ওর আর কিছু মনে নেই।

একাদু পরে চোখ যখন খুলল তখন ওর নজর গেল কালো আকাশের দিকে। আবার সেখানে মেঘ জমছে। তারারা একে-একে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

মাথার পিছ্নটা ব্যথা করছিল। দপদপ করছিল। একইসঙ্গে ডানহততর ডানার কাছটটায় ব্যথা। ডান পায়েও ব্যথা টের পাওয়া যাচ্ছে। গায়ে ড্রামের তেল-কালি লেগে আছে।

ভগবানকে মনে-মনে ধন্যবাদ দিল সুখারাম, কারণ তিনি বেশিক্ষণের জন্য ওকে অজ্ঞান করে রাখেননি। সেটা হলে যে-কাজটা এখন ওর করার কথা সেই কাজটা বাকি থেকে যেত ঃ আরও একের পাঁচ অংশের সেটল্মেন্ট।

শুয়ে-শুয়েই পাশ ফিরে তাকাল।
ঝাম্সা পড়ে আছে-রঙিন ন্যাকড়া দিয়ে তৈরি পুতুলের মতো। কপালমুখ সব রক্তে মাখামাখি। অস্ত্রটা হাতের মুঠোয় ধরা।

সুখারাম উটে বসল। তখন বুঝল, ওর শরীরের ব্যথাগুলো গ্রাহ্য করার মতো বিরাট কিছু নয়। তার ওপর মা আর চোলির ডাক শুনতে পেল ও। একটা ধাতব টানেলের মধ্যে দিয়ে ওদের ফাঁপা চিৎকার প্রতিধ্বনি তৈরি করতেকরতে ছুটে আসছে।

সুখারাম উঠে দাঁড়াল। ভূতগ্রস্ত রোবটের মতো ঝাম্সার কাছে এগিয়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে দেড়ফুট সোর্ডটা ঝাম্সার অসাড় হাতের মুঠো থেকে এক হ্যাঁচকায় ছাড়িয়ে নিল। তারপর সোর্ডটাকে শূন্যে তুলে ঝাম্সার দেহটা নেই ভেবে ওটা সোজা গেঁথে দিল পাথরের জমিতে। একবার নয়—চার বার।

ঝাম্সা অজ্ঞান হয়ে ছিল বলে মরণ-ঝাটকা দিতে পারল না, কিন্তু সুখারাম বুঝল, একের পাঁচ অংশের সেট্লমেন্ট হয়ে গেছে।

小ামসার পকেট হতত্ডে মোবাইল ফোন্ৈটা রের করে নিল দওটা একবার দেখে नित़ে পকেটে ढোকা

তাই হাতের সোর্ড মেঝেতে নামিয়ে রেথে বাইকটার দিকে নজর চালাল সুখারাম। ড্রামের জটলার ভেতরে বাইকটা কাত হর্েে আটকে আছে। বাইকের ইঞ্জিন এখনও চাপা গর্জনে গরগর করছে।

একটা-একটা করে ড্রাম সরিয়ে বাইকের কাছে গেল। ঝুঁকে পড়ে বাইকের হাতল চেপে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে পিঠের জ্বালাটা চারগুণ হয়ে গেল। কিন্তু সুখারাম সেটা ঙ্রক্ষেপ করল না। কারণ, বুকের জ্বালাটা এখনও এর শতগুণ।

অনেক কসরত করে বাইকটাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। এর আগে বারকয়েক ও বন্ধুবান্ধবের বাইক চালিয়েছে। সাইকেল চালানো দিয়ে ওর বালকজীবন শুরু হয়েছিল। তারপর সময়ে-সময়ে বাইক চেখে দেখার সুযোগ হয়েছে। একসময় শখ করে পাঁউরুনট-বিস্কুটওয়ালাদের সাইকেল্ল-ভ্যান দুষ্টুমি করে চালিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওপরওয়ালার দুষ্টুমিতে সেই সাইকেল-ভ্যান চালানোটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ আবার ও একটা গোটা মোটরবাইক হাতে পেয়েছে। এবার শুধু বদনোয়াকে হাতে পাওয়া বাকি।

সোর্ডটা বাইকের কেরিয়ারে আটকে দিয়ে বাইকে চড়ে বসল। তারপর কয়েক সেকেন্ড কী চিন্তা করে ঝাম্সার মোবাইলটা অন করে খুটুর-খাটুর করতে

## ๖>0 www.banglaboôel pedf.bitogspot.com

লাগল। বদনোয়ার ফোন-নম্বরটা ওর দরকার।
দ-চারবার বোতাম টিপতেই ফোন-নম্বরটা মোবাইল ফোেের পরদায় ভেসে উঠল।

সুখারাম্মে রগের কাছে একটা শিরা দপদপ করছিল। রক্তের কণাগুলো পাগলের মজো ছুটোছুটি করছে। ওদের থিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে।
‘ডায়াল’ বোতামটা টিপল সুখা। ‘কলার টিউন’-এর ঝিনচ্যাক হিন্দি গান বেজে উঠল। গান দু-লাইন বাজতে না বাজতেই বদনোয়া ফেন ধরল।
‘কেয়া রে? সালে কা কুছ পতা চলা?’
‘शঁ, বস-।' মুখ্রের কাছে কয়েকটা আডুল রেখে একটু চাপা গলায় জবাব দিল সুখা। আঙুলের গরাদ্দে ধাক্কা খেয়ে সুখারামের গলার স্বর খানিকটা বদলে গেল। তা ছাড়া গলা চেপে কথা বলায় বদনোয়া ওকে ঝাম্সা বলে ভুল করল।
‘কাঁহা? কাঁহা জায় উও গিদ্ধর কি আওলাদ?’ বদনোয়ার গলা থেকে আগেনের ফুলকি ছিটিকে বেরোচ্ছে।
'সালে কো জিন্দা লেকে আ রহা एँ-’ জড়ানো চাপা গলায় বলল সুখা। কায়দা করে তার সঙ্গে একটু হাপানির হাঁসফাঁস জুড়ে দিল। তারপর ঃ ‘তু কাঁহা রে, বস?’

आin ti
জায়গাটা সুখারামের চেনা।
পোড়া বস্তি থেকে খালধার বরাবর দেড় কি দু-কিল্লোমিটার উত্তরদিকে টাওয়ার নামে একাট বিয়ার কোম্পানির অফিস ছিল। তার পাশেই ছিল ওদের বিশাল গোডাউন।

সবই ‘ছিল’, কারণ এখন আর কিছুই নেই। বছর দশেক আগে ওই গোডাউন্নে আগুন লাগে। সেই দাউদাউ আগুন সব গিলে ফেলেছিল। তারপর থেকে শুধু গোডাউনটার পোড়া কংকাল পড়ে আছে। শোনা যায়, গোডাউনের ওই কংকালের ডেতরে মানুষ্রের কয়েকটা পোড়া কংকাল থাকলেও থাকতে পারে। রাতে ওটার পাশ দিয়ে গেলে নাকি এখনও আগুনে পোড়া মানুষের চিৎকার শোনা যায় আর মাংস পোড়া কটু গল্ধ পাওয়া যায়।
'ও. কে., বস-।' বলে ফোন কেটে দিল সুখারাম। বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ চেপে গিয়ার দিল। বাইক ছুটতে ऊুু করল।

সুখারামের বড় অড্রুত লাগছিল। মুখে ঠান্ডা বাতাসের ঝাপটা, পিঠে জূলা, মাথায় আগুন, বুকে প্রতিশেধের বিষ, অথচ মনটা ঠান্ড ইস্পাতের মতো শান্ত।

শরীরঢা ক্লান্ত হলেও সুখারাম রোবটের মতো একখুঁয়েভাবে শরীরটটে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## ১৯২ <br> www.banglaboeft pdf.blogspot.com

## কোথায় তুই, বদনোয়া? কোথায়?

কয়েক মিনিটের মধ্যে খালধারের রাস্তায় এসে পড়ন। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় বাইক লাফতত-লাফাতে ছুটছে। ওই তো দেখা যাচ্ছে, আকাশ জুড়ে টওওয়ার কোম্পানির পোড়া গোডাউনের কালো ছায়া। তার পাশে অনেক উঁদুতে টাওয়ার কোম্পানির লাল-নীল রঙের নিওন সাইন। এখনও সেটা জ্যান্ত-জ্রলছে-নিভছে। বোধহয় পোড়া গোডাউনের ডেডবডিটাকে পাহারা দিচ্ছে।

মোটরবাইকের হেডলাইটের আলোয় বদনোয়াকে দেখতে পেল। খালধারের ভাঙচোরা রাস্তার একদিকে টওওয়ার কোম্পানির গোডাউন, আর অন্যদ্রিকে মাবোনের মহাঘাতক। বাইকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে-হাতে জূলষ্ত সিগরেট।

বাইকের গতি কমাতে লাগল সুখারাম। লক্ষ করল, বাইকটাকে দেখে বদনোয়া হাের সিগরেটটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ডানগতটা পকেটে ঢেকাল।

সুখারাম জনতত বদনোয়া ঝাম্সার বাইকটা আগে চিনতে পারবে, তারপর-কয়েক সেকেড পর-বুঝতে পারবে বাইকের ওপরে যে বসে আছে সে একা। এবং সে ঝাম্সা নয়-অন্য কেউ।

কিন্তু ওই কয়েক সেকেন্ডই যথেষ্ট। যে-কাজের জন্য ওই কয়েক সেকেড
 চিতাবাঘের গতি নিল। বদনোয়াকে লক্ষ্য করে পাগলের মতো ছুটে চলল।

বদনোয়া পকেট থেকে ওর রিভলভারটা বের করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পুরোপুরি বের করে ওঠার আগেই সুখারামের বাইক সরাসরি এসে ওর পেটে ধাকা মারল।

আথ্মরক্ষার জন্য বদনোয়া াঁ--হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সংঘর্ষের অভিঘাতে ওর গোটা দেইটা সামনে «ুঁকে পড়ল। সুখারামের মাথার সঙ্গে ওর মাথা ঠুকে গেল। যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল দুজনের মুখ থেকেই। কিন্তু শব্দগুলো এমন জড়িয়ে গেল যে, আলাদা করে চেনা গেল না।

সংঘর্ষের সময় স্থিতিজাড্য বদনোয়ার ওপরে কাজ করেছিল। তাই ডানহাতটা ও আর পকেটে ঢোকতে পারেনি-রিভলভারটা পকেটেট থেকে গেছে। আর ওর ভারী শরীরটা শূন্যে তুলে নিয়েছে সুখারামের বাইক। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় বদনোয়া বাইকের হাতল आঁকড়ে ধরেছিল। ওই অবস্থাতেই সুখার বাইক ওকে ‘কেলে’ করে ছুটে চলল।

মাথায়-মাথায় ঠুকে গিয়ে সুখারামের অসহ ব্যথা করছিল। মাথার ভেতরে পাগল করা দপদপানি। কিন্তু ওর হাত এক অমনুষিক জেদে অ্যাকসিলারেটের आঁকড়ে ধরে ছিল। গোঁ-গোঁ করতে-করতে বইকটা ছুটে চলল খলের দিকে।
www.banglaboék petf.tilogspot.com sso
ইট-পাথরে ঠোকর থেয়ে বাইকটা লাফাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই দুচাকাওলা গাড়িটা খালপাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে শুু করল।

নামতে-নামতে নিয়্ত্রণীীন বাইকটা একটা তেঁতুল গাছের ঔঁড়িতে ধাক্কা ঙ্খল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝড়ের পাখির মতো শূন্যে ছিটরে গেল বদনোয়া আর সুখারাম। বাতসে বৃক্তাপ এঁকে ওদের শরীর দুটো খালের জলে গির্যে পড়ল। কয়েক লহমার তফাতে দুটো ঋপাং শব্দ হল। খালের তেলচিটে কালো জল ওদের অজগর সাপের মতো গিলে ফেলন।

তেঁতুল গাছের 豸ঁড়ি আর একটা পাথরের ফাঁকে বাইকটা আটকে গিয়োছিল। বাইকের ইজ্জিনের শব্দ ক্রমশ ক্য়ে আসছিল। হেডলাইটের আলোটও মলিন হয়ে যাচ্ছিল। এদিক-ওদিক থেকে ছিটকে আসা ল্যাম্পপোস্টের আলো খালের জলে পড়ে চিকচিক করছিল। দুটো শরীর খালের জলে আলোড়ন তোলায় চিকচিক করা আলোর বিন্দুগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছিল।

একটু পরে সুখারামের কালো মাথা খালের জলের ওপরে তেসে উঠল। ওর চোখ-মুখ-নাক জ্রালা করছে, নাকে আসছে কটু দুর্গন্ধ। চারপাশে নোংরা আবর্জনা আর পচা কচুরিপানা। জলের মধ্যে মিশে আছে থকথকে পোড়া মোবিল আর কলকারখানার বর্জ পদার্থ। সুখারামরা ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্ধ্যে বলাবলি করত ফে, এঁ খালের জল্লে কেউ ড্রবে মারা যাবে না, মারা
 করতে পারল।

খালটা তেমন গভীর নয়। জলের নীচে সুখার পা পাঁকের মধ্যে বসে যাচ্ছিল। ও হাত দিয়ে চোখ-মুখ্রে ওপর থেকে কালো চটচটে জল সরাল। তারপর এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে বদনোয়ার থোজ করতে লাগল।

প্রায সঙ্গে-সঙ্ছেই বদনোয়ার মাথা দেখা গেল জলের ওপরে।
প্রাণপণে মাথা đাঁকচ্ছে, বাতাস টানার জন্য হাঁকপ্ক করহে।
সুখারাম ওর মাথা নামিয়ে নিল, প্রায় নাক পর্যষ্ত ডুবিয়ে দিল জলে। তারপর খালের ধার ঘেঁষে ছেয়ে থাকা কদুরিপানার ঝাঁকের দিকে সরে যেতে লাগল।

দুর্গন্ধে সুখারামের দম আটকে আসছিল। কিন্তু প্রতিশোধের আক্রোশ ওকে সবকিছু সছ্য করার ক্ষমত জোগাচ্ছিল।

আকাশে মেঘ অনেক গাঢ় হয়েছিল। হঠাৎই ছোট-ছোট বিদ্যুতের টুকরো ঝলসে উঠন সেখানে। তার রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই চাপা গুড়ুড় আওয়াজ।

তখনই সুখারাম খেয়াল করল, বদনোয়ার ডানহাত উচচিয়ে রয়েছে শৃন্যে। সেই হাতের মুঠোয় ওর প্রিয় রিভলভার। ও এদিক-ওদিক নজর মেলে সুখারারাম

## د৯8 <br> www.banglabiofk paff.bitogspot.com

নস্করকে খুঁজে বের করার চেষ্টো করছে।
জলে ভিজে যাওয়ার পর রিভলভার ঠিকঠাক কাজ করে কি না সুখা জানে না। তবে অনেক সিনেমায় ও নায়ককে জলের তলা থেকে গুলি ছুড়তে দেখেছে। তাই সাবধান থাকাটা দরকার।

কহুরিপানার নাঁককে আড়াল হিলেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল সুখারাম। একইসঙ্গে গা গুলিয়ে ওঠা ভাবটাকে দমিয়ে রাখতে দাঁতে দাঁত চাপল। হালকাভাবে হাত চালিয়ে খালের পাড়ে পৌঁছল।

খালের পাড়ে প্রুর পরিত্তক্ত জিনিস আর আবর্জনা। তারই মধ্যে একটা লম্বা গাছের ডাল খুঁজে পেয়ে গেল। ফুট পাঁচেক লম্বা, সামান্য आাঁকাব্রাঁকা, শক্তপোক্ত আর ভারী।

অন্ধকরে হাত বাড়িয়ে ওটা াঁকড়ে ধরল। সঙ্গে-সঙ্গে বুকের ভেতরে একধরনের আঘ্মবিশ্ধাস আর শক্তি তৈরি হয়ে গেল। ডালটা ও নিঃশব্দে জনের মধ্যে টেনে নিল। জলের ওপরে বিছিয়ে থাকা কচুরিপানার জালের তলায় ঢুকে পড়ন। মাথা সামান্য উঁচিয়ে কচুরিপানার ফাঁকফোকর দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চালাত লাগল।

বদনোয়া সতর্কতাবে পাঁকের ভেতরে পা ফেনছিল আর এদিক-ওদিক চোখ ঘোরাচ্ছিল। কোথ্রাম গগল গারামি কাए অওলাদ?
 হঠাৎই কচুরিপানার জাল ঠেলে একটা ভূত মাথা তুলল। তার হাতে ধরা একটা आাকাবাঁকা লাঠি। বদনোয়া রিভলভার চালানোর আগেই লাঠিটট নিষ্ঠুরভাবে ওর ব্রদ্মতালুতু এসে পড়ল। একবার—দুবার।

তারপরই আর-একটা আঘাত এসে আছড়ে পড়ল ডান চোয়ালে। এবং আবার।

কালো ভূতটা একের পর এক নিষ্ঠুর আঘাতে বদনোয়ার মুখ আর মাথা তঁড়ো করতে লাগল। একইসন্গে খাাপা জানোয়ারের মতো অর্থহীন চিৎকার করতে লাগল।

একটু পরেই বদনোয়া খালের জনে তলিয়ে গেল। কালো গা়় জলে বুড়বুড়ি উঠল কিছুক্ষণ। তারপর সব শেষ।

লাঠিট खেলে দিয়ে খাল থেকে টলতে-টলতে উঠে এল সুখারাম। আবেগে ওর সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। সারা গায়ে কালো তেলচিটে আঠালো তরল আর কয়েকটা কুুরিপানা।

এলোমেলো পা ফেলে খালপাড়ের চড়াই বেয়ে ও কোনওরকমে উळে এল রাস্তায়। মা, চোলি, তোরা দ্যাখ—আমার কাজ শেষ। খতমের খাতায় সবকণা জানোয়ারের নাম তুলে দিয়েছি আমি।

রাস্তার ধারে টলে পড়ে গেল সুখারাম। সেই অবস্থাত্ই মা আর চোলির সঙ্গে আপনমনে বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকাল সুখারাম। গায়ের জ্বালা-পোড়া কমাতে ও ভগবানের কাছে বৃষ্টি চাইন। একইসঙ্গে নিজের পপপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পুলিশের সাইরেন বাজানো টুলদারী জিপের জনাও প্রার্থনা করল।

ভগবান ওর নীরব প্রা্থনায় সাড়া দিল।
প্রথমে বৃষ্টি এল।
তর কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ।

নিউ সিত্তিতে সাজ-সাজ রব পড়ে গিত্যেছিল। কারণ, সিন্ডিরেট কিল গেমের তারিখ ঘোষণা করেছে। সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ, রবিবার।

সারা শহর জুড়ে জিশানের পাবলিসিটির হোর্ডিং। কোনও জায়গায় আবার জিশানের স্টিল ফটোগ্রাফের বদলে রঙিন ভিডিয়ো। সেইসব ভিডিওয়োতে জিশানের ট্রেনিং অথবা নানান গেমের রোমাঞ্চকর দৃশ্য ঃ স্নেক লেকের দোড়,

 বেছে নেওয়া হবে জিশানের প্রতিদ্বন্ট্পী হিসেবে?

না, সেটা এখনও জানায়নি সুপারগেম্স কর্পোরেশন। তার বদলে ওরা টিভির দর্শকদের নিয়ে একটা কনটেস্ট শুরু করে দিয়েছে। সেন্ট্রাল জেলের বারোজন খুলের আসামিকে ওরা বেছে নিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের ফেরোসিটি কোশেট আটের ওপরে। টিভিতে সেই বারোজনের ক্রিমিনাল রেকর্ড্স দেখানো হচ্ছে। দেখানো হচ্ছে তাদের সাইকোলজিক্যাল প্রোফাইন, ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউড্ড, আর অন্যান্য রেকর্ড।

এইসব দেখে বিচার করে দর্শকদের বলতে হবে, কিল গেমের জন্য এদের কোন তিনজনকে বেছে নেবে সুপারগেম্স কর্পোরেশন। যদি কোনও দর্শক তিন জনের নাম ঠিকঠাক বলে দিতে পারে তা হলে সে পাবে সেরা পুরস্কার—পঁচিশ লক্ষ টাকা। তার নীচেই রয়েছে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার। পনেরো এবং দশ লক্ষ টাকা। বরাবরের নিয়ম অনুযায়ী বিজয়ীর সংখ্যা বেশি হলে পুরস্কারের টাকা তাদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে।

দর্শকরা এই কনটেস্টে ফোন করে অথবা ইন্টারঅ্যাকটিভ প্লেট টিভির মাধ্যমে অংশ নিতে পারে।

এই প্রোগ্রাম চলার সময় দেখানো হচ্ছে প্রুর বিষ্ঞাপন। তার মধ্যে

## ১৯৬ www.banglabroêt pedf.biogspot.com


 হইপাররোলিক ফাশানের চঙঙ বেড়ে চলেছে।

নিউ সিটির বড়-বড় রা্তায় বিশাল মাপের অসংখ্য ডিজাইনার হোর্ডি।


শহরের নানান জায়ায় কিন গেল্যের গিফ্ট आইট্টের স্ট্ বস্সেহ।

 জিশানের নড়ইই্যের নানা অপ্পির মড্ডে বিক্রি হচ্মে, কস্পিটিশনের বিভিন্ন
 পनिমার্রে মড়ে বিক্রি হচ্চে।

সারা শহর জুড়ে এককথায় টগবগে হইচই।




জিশান अনাজির সఠ্পে শহরের নানা জায়ায়া মুরে বেড়াছ্ছিন আর



 जिম : आানালগ জিম আর ডিজিতান জিম। এই জিমে জিশান একা-একা


 গা্রের রং আরুও ঢামাটে হয়েছে। শরীর্রে সমষ্ফ পেশি উৎকট্তাবে মাথাচাড়া
 একঢা দান।।

आনাनগ জ্রেম জিশান ভ্যারিয়েব্ল खোর্ নিয়ে ওয়ার্কআাটট করে। আর



 খুসি এড়ান্ো যায় লেই কৌশলও শেখা যায় এই যষ্ণ থেকে।

জিশানের জিম দুঢোর দেওয়াল মানেই আয়ন।। অার ঘরে সাজানো রয়েছে

আধুনিক সব মেশিন। সবক’তা মেশনিই মিটরে-মিটারে ছয়লাপ।
জিশান রোজ এই দুটো জিমে যন্ত্রের সঙ্গে ‘লড়াই’ করে নিজের দক্ষতা এবং যোগ্যতার মান বিচার করে। একসময় ও শাত্ত-ক্লান্ত হয়ে জিম থেকে বেরোয়। তারপর স্নান, খাওয়া আর বিশ্রাম।

রোজ বিকেলে গুাজির গাড়ি করে বেরোয় জিশান। তারপর ইচ্ছেমতো সময় কাচিয়ে ঠিক রাত ন'ঢায় ও ফ্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবে সুধাসুন্দরীর কাছে ফিরে আসে। ওর কন্ট্রোল্ড ফ্রিডম রিচর্জ করার জন্য। তখন ওর দেখা হয়ে যায় রোগা, লম্বা, ফরসা মেয়েটার সঙ্গে। যে-মেয়েটা উদ্ধত প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। এবং ব্ধু বিজ্ঞানের চাকর—আর কারও নয়।

আজ ख্রিডম কন্ট্রোল ল্যাবের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় জিশানের মনে হল, সুধাসুন্দরীকে যে-প্রশ্নটা ও প্রথম দিন ম্যাজিক শট নেওয়ার সময় করেছিল সে-প্রশ্নের উত্তর এখনও জনা হয়নি। সুধাকে যখনই ও প্রশ্নটা করেছে তখনইই ও কোনও-না-কোনওভাবে পাশ কাট্টেযেে গেছে। আজ জিশানের মনে হন্ল, অপেক্শ অনেক হয়েছে-আর নয়। আজ জিশান জেদ ধরবে, বাচ্চা ছেলের মতো বায়না করবে।

ন্যাবে কাজকর্ম ঠিকমতোই এগোল। সুধা জিশানের শরীরের ভেতরে

 গলায় বলল, ‘সুধা, প্রথম দিন আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম। ঢুমি বলেছিলে "কাল বলব।" কাল-কাল করে তো দু-সপ্তাহ কেটে গেল। সত্যি করে আমকে বলো দেখি, ঢুমি কি উত্তরটা বলতে চাও-নাকি চাও না?’

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুধা। তারপর বলল, "হাঁ-বলতে চাই... ${ }^{\prime}$
'ত হলে. বলো। সেকেড সেপ্টেম্বর আসতে আর মাত্র চব্বিশ দিন বাকি। আর...তার পর যদি বলতে চাও তা হলে...তা হলে আমার হয়তে...হয়তো আর শোনা হবে না।

সুধাসুন্দরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল জিশানের দিকে। ওর বড়-বড় চোখের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, জিশান যেন একটা খোলা বইআর মেয়েটা সেই খোলা বইটা অনায়াসে পড়ে নিচ্ছে।

কट্যেকসেকেডের জন্য চোখ বুজল সুধা। তারপর ধীরে-ধীরে চোখ খুলল। নীহ গলায় বলল, 'জিশান, जুমি কাল বিকেলে একবার আমার ল্যাবে আসতে পারবে? এই ধরো পौচটা নাগাদ?'

জিশান ঘাড় নাড়ল : ‘হাঁ, পারব—’
'তা হলে মনে করে এসো। পাচচটা। তখন তোমার সব প্রশ্নের উত্তর

## 

পেয়ে যাবে। সেকেড্ড সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তোমকে আমি অপেক্ষা করাতে চাই না।’ শেষ দিকে সুধাসুন্দরীর গলা ধরে এল। ও মুখ নামিয়ে নিল। আভুলের ডগা দিয়ে চোেের কোণ মুহে দিল।
‘আমি কি তোমকে হার্ট করলাম?’ জিশান ইতস্তত করে জানতত চাইল। ‘না, না—।' মাথা নেড়ে মেয়ে বলল, ‘কাল এসো। পঁচটটা-। ও, ভালো কথা, তুমি আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দাও। রিমোট অপারেশান্স ল্যাবের কাছে এসে আমকে ফোন কোরো-আমি একমিনিটের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে आসব... '

কথা শেষ করে ফোন-নম্বর বলল সুধা।
জিশান পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। ফোনটা মুদ্রের কাহে নিয়ে সুধার নম্বরটা উচ্চারণ করল। নম্বর মেমোরিতে দ্রান্সফার হয়ে গেল। সুধাসুন্দরীর ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল জিশান।

কফির কপে চুমুক দিতে-দিতে চারপাশে তাকাচ্ছিল জিশান। ঘরে বাড়তি কোন আসবাব নেই সাজ্জসজ্ঞার বাড়ি কোনও উপকরণ ন্ৰই ৷ এই
 ফ্যেশনারের গা্ধ পাওয়া যাচ্ছিল।

জিশানের মুখ্ামুথি একটা চেয়ারে বসেছিল সুধা। ওর হাতেও কফির কাপ। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছে।
‘এই বাড়িটায় আমি থাকি। আমার যা-কিছু প্রয়োজন সবই এখানে আছে। यদি নতুন কোনও কিছুর দরকার হয় মার্শাল স্যারকে একবার ফোন করে জানালেই হল—দ্য রিকোয়েস্ট উইল বি অনার্ড উইদিন আ ছছফ।
‘এই ঘরটা ড্রয়িকরুম। এর পাশেই আাছে আমার লাইব্রেরি কাম স্টাডি। এ ছাড়া ডেতরদিকে একটা বড় ঘর আছে—সেটা বেডরুম। কফিটা শেষ করে নাও—পরে তোমাকে গোটা বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি...।'

জিশান ওর কথা ওনছিল আর মনে-মনে একদু অবাক হচ্ছিল।
একটা ছোট্ট প্রশ্নের উত্তর জনতে চেয়েছিন জিশান। তার জন্য ওকে নিজের ফ্য্যাট দেখাতে নিয়ে এল কেন সুধা?

অবাক হলেও চুপ করে রইল জিশান। ওর মনে হল, সুধা ওকে যাयা বলতে চায় বলুক। আজ জিশান শ্খুনবে-কিছू বলবে না।

গুনাজির গাড়ি করে ঠিক পাচটটার সময় রিমোট অপারেশান্স ল্যাবে প্পাঁছেছিন জিশান। তারপর সুধাসুন্দরীকে ফোন করে সেটা জানান দিতেই

একমিনিটের মধ্যে ও এलে হািি।
‘তোমার গাড়ি ছেড়ে দাও। তুমি আমার গড়িতে যাবে।’
সুধা কথাটা এমনভাবে বলল বে, সেটা অনুরোধের বদলে দাবির মতো শোনাল।

জিশান এবফু ইতস্তত করছিল। তাই দেখে সুধা বলল, আমি তোমকে ঠিক রাত নটার সময়ে আমার ল্যাবে নিয়ে আসব-তোমার ক্যাপসুল রিচর্জের জন্যে। তারপর তুমি তোমার গাড়িতে যেয়ো...।

গুনাজিকে সেরকমভাবেই বলে দিল জিশান। রিম্মোট অপারেশান্স ল্যাবের পার্কিং লটে গাড়ি রেখে গুনাজি জিশানের জন্য অপেক্ষা করবে।

তারপর সুধা ওর গাড়িতে গিয়ে বসল। জিশান ওর পাশে।
গাড়ি চলতে শুরু করার পর জিশান শুধু একবার জিগ্যেস করেছিল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'
‘তোমার প্রশ্নের উত্তরের থ্যোজে—’’ জিশানের দিকে তাকিক্যে হেসেছে সুধা।

পনেরো কি কুড়ি মিনিট চলার পর গাড়ি এসে থেমেছে একটা একতলা বাড়ির সামনে।
 রাস্তীর দুপীশে সার ব্বেধে সাদা রূেের এ্রকতলা বাড়ি ঘ্রিতি বাড়ির মাথায় ডিশ অ্যানটটনা।। বাড়িগুোর স্টাইল খুব আধুনিক। বাড়ির সামনে আর পালে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাগান। বাগান বলতে সবুজ লন, আর লনের কিনারায় ফুলগাছের সারি।

সুধা জানাল, এটা সায়েন্টিস্ট্রের ক্লাস্টার। নিউ সিটির সব সায্যেন্টিস্ট এই এলাকত্তে থাকেন। নিউ সিটিতে কোনও সার্যেন্টিস্টের নিজস্ব বাড়ি থাকলেও তাঁর এখানে থাকাটা জরুরি। এটাই নিয়ম।

জিশানের বাবার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল, নিজেদের বাড়ির কথা।
সুধা বলল, 'আমার সেসব প্রবলেম নেইই, কারণ, আমার এই একাটই থাকার জায়গা-।'

বাড়ির ডেতরে ছুকে প্রথমমই ড্রয়িিরুম—বেখানে বসে এখন ওরা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে।

জিশান সুধাসুন্দরীকে দেখছিল।
কালো রঙের একটা সালোয়ার। তার সঙ্গে নীল, কালো আর সাদার নকশাকাট্ একটা কামিজ। ফরসা বলে ওকে বেশ মানিয়েছে। তবে সবচেয়ে সুন্দর ওর বড় মাপের চোখ। ওগুলো এমন গভীর আর বুদ্ধিদীপু যে, মনে হচ্ছে চোখ থেকে এক অদ্রুত আলো ঠিকরে ছড়িয়ে পড়ছে।

## २०० <br> www.banglabôêk priff.t解ogspot.com

শর্মি নামের একটি মেয়েকে ডাকল সুধা। মেয়েটির বয়েস আঠেরো কি কুড়ি। শ্যামলা রং। রোগা, স্মার্ট।

ওকে কফি করতে বলল।
‘শর্মি আমার কন্বাইড হাভা। খুব চটপটে-অনেক কাজ করে। তার মধ্যে একটা হল রান্নাবান্ন।

কফি খাওয়া শেষ হলে সুধা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলন। বলল, ‘‘ইবার তোমার প্রশ্নের উত্তর দেব। আমার মতো সুপার লেভেলের একজন সায়েন্টিস্ট এই পোড়া নিউ সিটিতে কেন পড়ে আছে। তুমি শোনার জন্যে রেডি তো?’

জিশান কফির কাপ নামিয়ে রাখল সামনের টেবিলে। সুধার চোেের দিকে তকিক্রে হেলে বলল, ‘आাঁ, রেডি...'’
'আমি ইউ. এস. এ.-তে ছিলাম। নর্থ ক্যারোলাইনাত। সেখানে স্টেট বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে চাকরি করতাম। "এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট" পোল্টে। আমি বেসিক্যালি একজন ডক্টর এবং পরে বায়োকেমিষ্ট্রিতে পিএইচ. ডি. করেছি। তোমাকে আমার তেতাল্লিশটা পেটেন্টের কথা আগে বনেছি। সে ছাড়া আমার বাইশ-তেইশটা রিসার্চ পাবলিকেশান আছে-সবই ইন্টারন্যাশনাল জর্নালে। আমার রিসার্চের এরিয়া হল, প্রোটিন, আর-এন-এ,


‘মা ছাড়া আমার ফ্যামিলিতে আর কেউ নেই। তাই নর্থ ক্যারোলাইনাতে আমি মা-কে নিয়েই থাকতাম। কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাবল শুরু হল আমার একটা ডিসকাভারি নিয়ে। আমি চারবছর ধরে একটা কেমিক্যাল কস্পাউন্ডের ওপরে গরেষণা করছিলাম। ব্যাপারটা জেরান্টোলজি ওরিয়েন্টেড...’’
‘জেরান্টোলজি মানে?’ জননতে চাইল জিশান।
‘জেরান্টোলজি মানে জরাবিষ্ঞান্ন। মনে, আমাদের যে বয়েস বাড়ে সেই বাপাপ রিলেটেড সাল্যেন্স।...यাই হোক, জেরান্টোলজি বরাবরই আমার রিসার্চের সেকেন্ডারি ফোকাস। তো রিসার্চ করতে-করতে আমি এমন একটা কম্পাউল্ড আবিষ্কার করলাম যেটা কয়েকটা অ্যানিম্যালের এজিং প্রলেস ল্লো করে দেয়। অর্থাৎ, তাদের বয়েস چীরে-ধীরে বাড়বে।
‘বাপারটা খুব এক্সাইটিং বুঝতেই পারছ। তা ছাড়া, যদি সত্তি-সত্যি এরকম একটা কেমিক্যালের সন্ধান পাওয়া যায়, তা হলে সেটার ফরমুলা আর তৈরি করার সায়েন্টিফিক প্রসেস হাতে পাওয়ার জন্যে সারা পৃথিবী ছট্ট্ট করবে। ইন্টারন্যাশনাল কেয়স তৈরি হরে। কেজিবি, সিজাইএ, র’—সমস্তরকম ইন্টেলিজেন্স এজেলি মাঠে নেমে পড়বে।
‘সেইজন্যে রিসার্চের ভাইটাল ব্যাপারগুলো আমি কউকে জনাইনি।

নিজের কাছেই গোপন রেখেছিলাম। তবে ল্যাবের রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাট্টদের নিয়ে আমার নানান টেস্টিং আর এক্সপেরিমেট্টের কাজ চলছিল। কিন্তু এসব টেস্টের ঠিক কোন-কোন রেজন্ট আমার কাছে জরুরি সেটা আমি কাউকে জনাইনি। জেরান্টোলজি রিনেটেড অবজারভেশানের কাজগুেো আমি একাএকাই করতাম।
‘আমি ল্যাবে ইঁদুর, গিনিপিগ, বেড়াল আর কুকুরের ওপরে কেমিক্যান্টা টেস্ট করেছি। ততে অল্পবিস্তুর পজিটিভ রেজাল্টও পেয়েছি। কেমিক্যালটা মানুষের ওপরে অ্যাপ্লাই করা তথনও বাকি। তা ছাড়া এজিং প্রসেস ম্নো হওয়ার রেটটা ছিল বড্ড কম। আমি রিসার্চ করে সেই রেটটা বাড়ানোর চেষ্টা করছিলাম, আর কীভাবে কেমিক্যালটা নিয়ে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টেশানে যাওয়া যায় সেকথা ভাবছিলাম...।’
‘এরকম একটা সময়ে কীভাবে যেন রিসার্চ সেন্টারের কয়েকজন আমার রিসার্চের আসল ব্যাপারটা জেনে গেল। কয়েকজন আমকে অভিনন্দন জানানোয় आমি বলেছি যে, এখনও অভিনন্দন জনানোর মতো কিছু আমি করে উঠতে পারিনি। প্রািিদের এজিং প্রসেসের মিস্ট্রি নিয়ে আমি এখনও এঞ্সপ্লোর করে চলেছি এবং এখনও আমি অন্ধকারে। কিন্তু তাদের সবাই যে আমার কথা
 ফোন করেছিল তার গলাঢা একটু ফ্যাঁসফেসে, জড়ানো। আমি ফোন ধরতেই শুনলাম...'

৬৬ক্টর সুধাসুন্দরী স্পিকি??’ ইংরিজিতে কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে 'সুধাসুন্দরী' শব্দটা লোকটাকে কয়েকটা হোচট খাইয়ে দিল।
'ইয়েস-।' সুধা জবাব দিল।
‘কনগ্র্যাচুলেশান্স। তোমার চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা আমরা জনতত পেরেছি। এতে সন্দেহ নেই, মানবজাতির অনেক কন্যাণ হবে—।

সুধা অবাক হর্রে জানতে চাইল, আপনি কে বলছেন? কোথা থেকে বলছেন?’
‘এগুলো অপ্র<্যোজনীয় প্রশ্র, ম্যাডাম। আমি একটা সংগঠনের পক্ষ থেকে বলছি। তোমার আবিষ্কারের জন্যে সারা পৃথিবী তোমাকে অভিনন্দন জানাবে, আশীর্বাদ করবে।’
‘সেরকম কোনও আবিষ্কার তো আমি করিনি! আমি তো ছো-ছোট কয়েকটা রুঢ্নিনাফিক পরীক্ম-নিরীক্ষা চালাচ্ছি...।'

## २०2 www.banglaboêt pedf.bitogspot.com

‘আমরা সব জানি। তুমি আমকে ভুল বোঝাতে পারবে না, ম্যাডাম। আমাদের কাছে নির্ভরভোগ্য সূত্রে খবর আছে...।'
‘আপনি আমাকে ফোন করেছেন কেন? कী দরকারে?’
টেলিফেেনের ও-প্রান্ত গাসল নোকটা : ‘এখনও বুঝতে পারোনি? তোমার আবিক্ষারের সব কাগজপত্রের ফাইলটা আমাদের চাই। কারণ, আমরা মনে করি, এই আবিষ্কারটার সম্পূর্ণ নিয়ষ্ণণ আমদের হাতে থাকা দরকার। পৃথিবীর পক্ষে এই আবিষ্কারটা নিশ্য়ই খুব উপকারী—তবে আমাদের মনে হয়, এই মুহূর্তে এই আবিক্কারটার কথা জানাজানি হলে বিপদ হবে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। সেই লড়াই থেকে ব্যাপারটা হয়তো তৃতীয় বিশ্পযুদ্ধের দিকে এগোবে। আর সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ-বোটা পরমাণু-যুদ্ধ হবে বলেইই আমাের ধারণা-यদি হয় তা হলে মানবজাতির সর্বনাশ হয়ে যাবে।' এবটু থামল লোকটা। তারপর ঃ ‘সুতরাং, ম্যাডাম, বুঝততই পারছ, ঢোমার এই আবিষ্কারটা অত্ত্ত নিরাপদ হেফাজতে থাকা দরকার... ${ }^{\prime}$

সুধাসুন্দরীর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ হচ্ছিল। ভয়ডর ওর বরাবরই কম-কিক্তু, তা সর্ত্তে ওর একইু-একটু ভয় করছিন।


লোকটাকে বাজিয়ে দেখতে সুধা বলল, 'আপনি আমার কোন আবিষ্কারের কথা বলছেন বলুন তো? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—।

লোকটা হাসল—সবজাস্তার ব্যঙ্গের হসি। তারপর ঠান্ডা গলায় বলল, 'মনুষকে দীর্ঘাযু করার আবিষ্কার। আমাদের শরীরে বার্ধক্য বে-গতিতে প্রভাব ফেলে, সেই গতি কমিয়ে দেওয়ার আবিষ্কার। তুমি আমাদের হোমওয়ার্কে কোনও एাঁক পাবে না, মাযাড।’

সুধাসুন্দরীর গলা 巛কিয়ে যাচ্ছিলা। ও পাগলের মতো এই সমস্যার একটা সমাধান খুঁজ্জে বেড়াচ্ছিল, কিক্তু পাচ্ছিল না।

লোকটা ধীরে-৭ীরে বলল, আমি পরশ্দিন তোমাকে আবার ফোন করব, ম্যাডাম। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।’

সুধা হঠাৎই সাহস জুগিয়ে শক্ত গলায় বলল, ‘আমি যা-ই আবিষ্কার করে থাকি না কেন, সেটা যাকে-তকে দেওয়ার জন্যে নয়।’
‘একদম ঠিক বলেছ, ম্যাডাম। কিন্তু তোমার সামনে মাত্র দুটো পথ থোলা আছে: হয় ডুমি ওটা নিজে থেকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, নয় তো ওটা আমরা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব। আর সেই কাড়াকাড়ির সময় অল্পবিস্তর কোল্যাটারাল ড্যাম্ম হতে পারে-।’

## www.banglaboôkpadf.bilogspot.com

‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ মানে?’
‘তোমার মায়ের কথা ভুলে গেলে, ম্যাডাম?’ হাসল লোকটা।
সুধাসুন্দরী পাথর হয়ে গেল। ওর মাথা আর কাজ করছিল না।
উই উইল বি ওয়াচিং য়ু, ম্যাডাম। ওয়ান রং মুভ অ্যাড যু আর ডান আ্যালং উইথ ইয়োর মাম।

লোকটা ফোন ছেড়ে দিল।

শরীরের ভেতরে বয়ে চলা একটা ঠাভ্ডা স্রোত টের পাচ্ছিল সুধা। আর তার সঙ্গে অড্ুুত এক চিনচিন যম্ত্রণা।

মা! মায়ের কথা বলল লোকটা! আজকের বিখ্যাত বিষ্ঞানী সুধাসুন্দরী যা কিছু, তার সবটটই ওর মা়্ের জন্য। ওকে ভলো করে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তোলার জন্য ওর মায়ের চেষ্টা আর পরিশ্রম এক কথায় উদাহরণ। সেই মায়ের ক্ষতি করবে ওরা! কোল্যাটারাল ড্যাম্মজ!

সুধা উদল্রান্তের মতো হয়ে গেল। এই হুমিটা एাঁা আওয়াজ, না কি

 লাগে না।

ফোনটা এসেছিল রাত আটটা নাগাদ। তার পর থেকে সুধাসুন্দরীর মনের স্বস্তি উধাও হয়ে গেল। ওর উসখুস অস্থির ভাব দেখে মা বেশ কয়েকবার জিগ্যেস করলেন, ‘কী হর্রেছে? তখন থেকে ওরকম ছৃট্ট করছিস কেন?’

উত্তরে সুধা বলেছে, 'না, কিচ্ছু হয়নি—।'
রোজ ল্যাব থেকে বাড়ি ফিরে বেশিরভাগ সময়টাই সুধা পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আজ ও পড়াশোনাতেও মন বসাতে পারছিল না। একটা কাঁটা কোথায় যেন খচখচ করছিল।

ভয়ে-ভয়ে দিন কাটতে লাগল সুধার। মা-কে ও একা বেরোতে বারণ করে দিল। বলে দিল, সুধার ফোন ছাড়া অন্য কারও ফোন যেন মা কখনও না ধরে, সুধা ছাড়া আর কাউকে যেন কক্ষনো দরজা না থোলে।

এসব কথায় মা ভয় পেয়ে গেলেন। বারবার জিগ্যেস করলেন, এত সাবধান হওয়া কীসের জন্য।

উত্তরে সুধা শ্ধু বলল, আমাদের হয়তো এ-দেশ ছড়তে হবে, মা।'
ও মনে-মনে বুঝতে পারছিল, শত্রু যারাই হোক, তার হুট করে কিছু করবে না। সুধার কাগজপত্রগুলো ওরা গাতে পাবে, নাকি পাবে না—সে-ব্যাপারে

## २०8 <br> www．banglabiôek potff．t⿰习习 ogspot．com

সুনিশিত না হয়ে ওরা চরম ব্যবস্থা নেবে না।
ন্যাবে সুধা একটা অদ্ভুত কাজ করল। ওর জেরান্টোলজি রিসার্চের যত কাগজপ্র ছিল সেগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে তার প্রতিটি পৃষ্ঠায় কেমিস্ট্রির একটা করে ভুল সমীকরণ লিখল। তাও আবার পৃষ্ঠার নানান জায়গায়। তারপর সেই পাতাুলো ওর অন্যান্য রাফ কাগজের পৃষ্ঠার সঙ্গে মিশিয়ে দিল। ঠিক যেন তাস শাফ্ন করে মেশাচ্ছে।

সবমিলিয়ে প্রায় পাচশো পৃষ্ঠার এক ‘পাহাড়’ তৈরি হল। এর মধ্যে থেকে আসল কাগজগুলো একমাত্র সুধাসুন্দরীই খুঁজে বের করতে পারবে। ওই ভুন সমীকরণই ওর ‘সংকেত’।

কাগজের स্রূপটাকে কয়েকটটা ভাগে ভাগ করে ল্যাবের মধ্যে নানান জায়গায় রেখে দিল।

মনে－মনে বেশ শাত্তি পেল সুধা। এই ল্যাবে হানা দিয়ে কারও পক্ষে ‘আসল’ কাগজগুলো খুঁজে পাওয়া বোধহয় আর সম্তব নয়।

এর চারদিন পরেই একটা ঘটনা ঘটল।
দিনটা ছিল রবিবার। সেদিন বিকেলবেলা কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনতে পায়ে হেেটেই ও রাস্তায় বেরিয়েছিল।

রাস্তায় ল্লোকজন বেশি ছিল ন্｜। বয়স্ক नु－চারজন মহিলা কি পুরুষ ঢোথে
 বেরিত্যেছেন।

রাস্তাটা ফাঁকা হলেও এথান দিয়ে ভালোরকমই গাড়ি যাতায়াত করে। থেকে－থেকে ছুট্ত গাড়ি সুধাসুন্দরীর নজরে পড়ছিল।

সামনে একটা বাঁক घুরতেই ও দেখতে পেল রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা মেয়ে পড়ে আছে। গায়ে লাল আর কলো রঙের সুন্দর ছাঁদের পোশাক।

সুধাকে দেত্খেই মেয়েটা ‘হেল্প！হেল্প！’ বলে চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠन।

সুধা রাস্তার যেদিক ধরে হেঁটে যাচ্ছিল，মেয়েটা পড়ে আছে তার উলটোদিকে। তাই সাবধানে রাস্তা পার হয়ে ওপারে প্পৌছল। তারপর অসহায়ভাবে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে এগোল।

সুধা কাছে যেতেই মেয়েটি যস্ত্রণা মেশানো গলায় বলল যে，একটা গাড়ি ওকে ধাকা মেরে পালিয়েছে। ওর হাঁটু আর গোড়ালিতে অসছ যম্ত্রণ।। নিজে－ নিজে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। সুধা यদি，প্লিজ，ওকে একটু হেল্প করে তা হলে ভালো হয়।

সুধা আর দেরি করল না। ঝুঁকে পড়ে মেয়েটিকে তোলার চেষ্টো করতে লাগল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে দুজন তরুণ এসে হাজির হল। সুধাকে এবং পড়ে থাকা মেয়েটিকে জিগ্যেস করল, ‘হোয়াচ্স দ্য ম্যাটার? হোয়াট গাপেন্ড?'

সুধা সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলল। মেয়েটিও ‘উঃ ! আঃ’ করতে-করতে সাহায্য চাইল।

তক্ষুনি ছেলে দুটো কাজে নেমে পড়ন। আহত মেয়োটিকে তুলে নিয়ে রাস্তার পাশের ঘাসজমিতে খইয়ে দিল। তারপর সুধাকে বলল, 'মিস, তুমি তোমার কাজে যাও—আমরা ওর মেডিক্যাল ট্রিট্মেন্টের বন্দোবস্ত করছছ—P’

আহত মেয়েটি সুধাকে দুবার ‘থ্যাংক্স’ জানাল। সুধা সৌজন্যের দু-একটা কথা বলে রাস্তা পার হতে লাগল।

ঠিক তখনই একটা ছই রঙের পিক-আপ দ্রাক কোথা থেকে যেন দৈত্যের মতো ছুটট এল সুধার দিকে। ট্রাকটটে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়তে দেখে সুধা एকচকিয়ে গেন। পেটের ভেতরটা কেমন ফাঁকা মনে হল। ঠান্ডা घামের ভোঁটা আচমকা ওর কপাল, মুখ গলা ভিজিয়ে দিল। ও পাগলের মতো লাফ দিল একপাশে। ওর হাত থেকে মোবাইল ফোন ছিট্টে পড়ন রাস্তায়।

দ্রাকটা ওকে চাপা দেওয়ার জন্য ছুটে গেল। তারপর চাপা দিতে-দিতে

 রাস্তায় পড়ে দরদর করে ঘামতে লাগল। ওর আচ্ছন্ন চোখের সামনে রাস্তা, ঘর-বাড়ি, গাছপালা সব বনবন করে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

সেই অবস্থাতেই শরীরটাকে গড়িয়ে-গড়িয়ে রাস্তার কিনারায় নিয়ে এল। কোনওরকমে উঠে বসল। হাতে, কনুইয়ে আর হাঁটুতে ব্যথা। দু-জায়গায় ছড়ে গেছে। উঠ্ঠে দাঁড়িয়ে ও বাড়ি ফিরতে পারবে তো? মোবাইল ফোনটা কোথায় গেল? এই রাস্তাটা যে এত দুর্ঘটনাপ্রবণ সেটা সুধা জনত না।

এমন সময় ওর চোখ পড়ল সেই দুটি ছেলে আর আহত মেয়েটির দিকে। ওদের দিকে তাকিয়ে ও তাজ্জব হয়ে গেল।

ওরা তিনজনেই সুধার দিকে তাকিয়ে হাসছে, বিদায়ের ইশারা করে হাত নাড়ছে।

সুধা হতবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই একটা সাদা রঙের স্পোর্টস কার ওদের পাশে এসে ব্রেক কষল। ওরা তিনজনে চটপট গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়িটা সাঁ করে উধাও হয়ে গেল।

টলতে-টলতে উঠ্ঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে তিনজন পথচারী ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদর মধ্যে একজন ওর মোবাইল ফোনটা ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল : ‘তোমার মোবাইল ফোন, মিস। রাস্তার ওইখানটায় পড়ে ছিল...।’

সুধা চেতনাহীন রোবটের ঢঙে মোবাইল ফোনটা নিল। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমকে একটু বাড়ি পর্যষ্ত এগিয়ে দেবেন?’

বাড়ি ফেরার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সুধাসুন্দরীর নার্ভাস ভাবটা গেল না। আজ यদি ওর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যেত তা হলে ওর মায়ের কী হত! রাতে ওর মোবাইলে যে-ফোনটা এল তাত ঠিক এই প্রশ্মটই করল লোকটা। এই লোকটাই প্রথম ওকে ফোন করে জেরান্টোলজির বিষয় নিয়ে ওকে শাসিয়েছিল।
‘यদি আজ তোমার কিছু একটা হয়ে যেত, ম্যাডাম, তা হলে তোমার মায়ের কী হত সেটা ভেবে দেখ্খেছ। বয়স্ক মানুষ। এ-পৃথিবীত একা-একা कী করে থাকতেন? হয়তো...হয়তো রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে শেষ পর্যত্ত...।' কথা আর শেষ করেনি লোকটা।

সুধা ভয় পেলেও মনে-মনে সাহস তৈরি করছিল। ও বেশ বুঝতে পারছিন, ওকে মেরে এই লোকগুলোর কোনও লাভ নেই। তাতে ওরা যা চায় সেটা কোনওদিনও ওরা আর হাত পাবে না। ওরা শখু সুধাসুন্দরীকে নিয়মিত
 করবে।

ও ঠাড্ডা জেদি গলায় বলল, ‘আমি ভয় পাইনি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

লোকটা হাসল : "ভয় পাবে না মানে! ভয় তো তোমকে পেতেই হবে। কেন, ম্যাডাম, কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা ভুলে গেলে? ওই পিক আপ ট্বাকটা আজ ইচ্ছে করনে তোমাকে পিষে দিতে পারত-কিন্তু দেয়নি। কারণ, এটা আমাদের একটা ওয়ার্নিং।
‘এবার মনে করো, তোমার বদলে তোমার মা আমাদের টার্গেট হয়ে গেলেন। তারপর টার্গেট থেকে ভিকটিম। ভিকটিম থেকে মর্গ। তারপর মর্গ থেকে পোস্টমর্টেম...।' খুকথুক হাসি দিয়ে লোকটা কথা শেষ করল।

কেন জানি না, সুধাসুন্দরীর इঠাৎ কান্না পেয়ে গেল। ও কেঁদে ফেলল। মা-কে ছেড়ে থাকার কথা ও কখনও তেবে দেখেনি। কারণ, এটা ও কখনও ভাবতেই পারবে না।

ওর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শুনতে পেল লোকটা। অন্যায় করে ধরা পড়ে যাওয়া বাচ্চা ছেলের মতো অপরাধী গলায় বলল, আমাকে ক্ষমা করো, ম্যাডাম। आমি তোমার ঢোেে জল এনেছি। আসলে একটা কথা তোমাকে আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে চাই। তুমি, প্লিজ, এটা বোঝার চেষ্টো করো। তোমার জেরান্টোলজির

রিসার্চ যতই ভ্যালু<্রেব্ল ছোক, তোমার মায়ের চেয়ে নিশয়ই ভ্যালুয়েব্ল্ নয়। এই সিম্প্ল ট্রুথটা তুমি, ম্যাডাম, বোঝার চেষ্টা করো। গুড নাইট—’

সুধা চুপ করে থেকেছিল। কোনও জবাব দিতে পারেনি। ওর চোথে তখনও জল। লোকটার শেষ কথাটা ওর কনে বাজছিল। লোকটা খুব সত্যি কথা বলেছে। সুধার জেরান্টোলজির গবেষণা ওর মায়ের চেয়ে অবশাই ভ্যালু<্রেব্ল নয়।

এই কথাটা ওকে ভাবিয়ে তুলল বটে, কিক্তু গবেষণার জরুরি কাগজপত্রগুলো সরাসরি ওই লোকগুলোর হাতে তুলে দিতে ওর মন চাইল না।

সুধা ওর গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগল। আর একইসঙ্গে অন্তরের ঝড় তোলা টানাপোড়েনে প্রতিটি মুহূর্তে কষ্ট পেতে লাগল।

ও বেশ বুঝতে পারছিল, ল্যাবে যে-মনোযোেে ও সাধারণত কাজ করে, সেই মনোযোগে চিড় ধরছিল।

টেলিফোনের লোকটা কিন্তু ধৈর্য হারায়নি। সে পাচ-ছ’-দিন পরপরই সুধাকে ফোন করে। ঠাডা মাথায়, ঠাল্ডা গলায়; সুধাসুন্দরীকে বশ করার চেষ্টা করে। সুধার কোনও কথাতেই সে রাগ করে না, উত্তেজিত হয় না। শ্ু রোজ কথা শেষ করার আগে সুধাকে কোল্যাটারাল ড্যামেজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

 সেই খ্যাতিতে একাটু-আধটু চিড় ধরছিল।

টেলিফোনে ভদ্র ভাষায় হুকি দেওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও থানা-পুলিশ করতে পারেনি। কারণ, তার সঙ্গে ওর জেরান্টোলজির গবেষণার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে। এই গবেষণা নিয়ে ও এখনই ঢক পেটাতে চায় না।

রিসার্চ সেন্টারে ওর যারা কাছের লোক তারা শ্ধু লক্ষ করল যে, সুধাসুন্দরী আগের তুলনায় অনেক চুপচাপ হয়ে পেছে। যে-মেয়ৌা কথা বলতে ভলোবাসত সে আর কথা বলতে তেমন ভালোবাসে না।

আসলে একটা দমচাপা উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি সুধার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ছাড়া, ও এখানকার পাট গুট্যে ইড্ডিয়ায় ফিরে যাবে কি না, সেই চিন্তাটাও মাঝে-মধ্যেই ওর মাথায় ল্থোচা মারছিল। সেইজন্য কখনও-কখনও ল্যাবের ওর কাজে ভুল হয়ে যেত, অনেক কথা ঠিক-ঠিক সময়ে মনে পড়ত ना।

একদিন সন্ধেবেলা রিসার্চ সেন্টার থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সুধা একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে ছুকল।
‘ফোর স্কোয়ার’. নামের এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরটা ওর খুব চেনা। এখানে ও নিয়মিত আসে। খাওয়াদাওয়ার নানান জিনিসপত্র থেকে ওুু করে তেন,

## ২ot www.banglabiôk pcif.bitogspot.com

মশলা, শ্যাম্পু, সাবান—সবই ও এখান থেকে কেনে।
আজ যখন ও ট্রলি ঠেলে নিয়ে বিভিন্ন লেনের র্যাক থেকে দরকারি জিনিসগুলো বেছে-বেছে ট্রলির বাস্কেটে তুলছে তখনই ওর ফোন বেজে উঠল। অচেনা নম্বর। ছোট্ট আশঙ্কা নিয়ে ‘অ্যাকসেপ্ট’ বোতাম টিপে ফোন কানে দিল। 'গ্যালো—’'
ও-প্রান্ত থেকে একটা লোক কথা বলল। তার গলাটা সুধার ভীষণ চেনা। 'ম্যাডাম, আমাদের ব্যাপারটা কতদূর এগোল? তুমি কী ডিসাইড করলে?'
‘কী ব্যাপার?’ না বোঝার ভান করে জানতে চাইল সুধা।
লোকটা ছোট-ছোট শব্দ করে হাসল : ‘জেরান্টোলজি, ম্যাডাম।’
সুধার খুব রাগ হচ্ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায় সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ও বলল, ‘জেরান্টোলজি? জেরান্টোলজির ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ও নিয়ে আমি কোনও রিসার্চ করছি না।’
‘কী দুঃখের ব্যাপার, ম্যাডাম!’ আক্ষেপ করে বলল লোকটা, 'তুমি পৃথিবীর সব মানুষের আয়ু বাড়াতে চেষ্টা করছ, অথচ তোমার আর তোমার মায়ের আয়ু কমতে চেষ্টা করছ! ভেরি স্যাড। কিন্তু এটাই কী তোমার শেষ কথা ?'
> 'আমার কাছে কোন স অপশান নেই’' চোয়াল শক্ত করে বলল সাধা, আমি বিজ্ঞাन ছोड़ा आর কারত চাকির নই...?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল লোকটা। সুধা যখন ভাবছে যে, লোকটা ফোন ছেড়ে দিয়েছে, তখনই লোকটা কথা বলল।
‘গুড। গুড। সো উই অ্যাকসেপ্ট দ্য কোল্যাটারাল ড্যামেজ...।'
ফোন ছেড়ে দিল লোকটা।
নিজের টেনশন কাটাতে সুধা চুপচাপ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।
কিছুক্ষণ পর আবার ওর কেনাকাটা শুরু হল। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, ও প্রাণপণে ছন্দে ফিরতে ঢাইছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর সুধাসুন্দরীর কেনাকাটার পাট শেষ হল। ও জিনিস ভরতি ট্রলি নিয়ে একটা ক্যাশ কাউন্টারে লাইন দিল। চারপাশের লোকজনকে ও দেখছিল বটে কিন্তু তাদের 'ছবিগুলো' ওর মাথায় ঢুকছিল না। ওর বারবার লোকটার শেষ মন্তব্যটা মনে পড়ছিল, আর ময়ের কথা মনে পড়ছিল। মাকে ভীষণ দেখতেও ইচ্ছে করছিল। ওর মনের মধ্যে বাড়ি ফেরার তাড়া উথলে উঠল।

হঠাৎ বছর পঞ্চান-ছাজ্গান্নর একজন প্রৌঢ় সুধার ট্রলির কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে ওকে জিগ্যেস করল, ‘এই দুধটা কি স্বাস্থের পক্ষে ভালো, মিস?’

সুধা একটু অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল।
গোলগাল বেঁটে চেহেরা। লালচে সাদা গায়ের রং। মাথাজোড়া টাক। মুখটা ফোলা-ফোলা, গায়ে একটা স্ট্রাইপড কোট, পায়ে ময়লা সাদা প্যান্ট। সুধা আজ তিনটে দুধ্রে প্যাকেট কিনেছে-মা়়ের জন্য। রোজ সকালে মা-কে একগ্লাস দুধ থেতে বাধ্য করে সুধা। মায়ের শরীর যা রোগা আর দুর্বল ততে রোজ সকালে এই দূধঁুকু দরকার। চারমাস আগে মা-কে হসপিটলে ভরতি করিয়ে সবরকম টেস্ট করিয়েছিল। সেইসব টেস্টের রিপৌর্ট নিয়ে মেডিসিনের নামি একজন ডক্টরকে দেখিয়েছিল। তাত মা-কে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে রোজ হাফ লিটার করে দুধ থেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ডক্ট্র। সেই পরামর্শঢা মাকে মানতে বাধ্য করেছে সুধা। মা-কে বলেছে, 'তুমি মােে-মােে ডুলে যাও কেন যে, আমিও একজন পাশ করা ডাক্তা!’

তারপর থেকে রোজ দুধ্ধ খাওয়ার নিয়মটা দাঁড়িয়ে গেছে।
সুধা নিজের চিষ্তায় আনমনা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই ও থেয়াল করল,



সুধা ঘোর কাট্যে বলে উঠল, ‘आँাঁ-হ্যা। ইয়েস, ইয়েস-গুড ফর হেল্থ।
‘থ্যাংক্স-' ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমার ওয়াইফ খুব সিক্লি। ডক্টর রোজ ওকে দুধ খেতে বলেছেন। কিন্তু এখানে এসে এতরকম ব্র্যান্ডের সুইট মিল্ক প্যাক দেথে আমি বেশ কনফিউজ্ড। তখনই তোমাকে খেয়াল করলাম। ভাবলাম, তোমার কাছ থেকে সাজেশান নিলে হয়। তাই তোমকে বদার করলাম। প্লিজ ডোন্ট মাইভ্ড...।
‘না, না-মনে করার কী আছে!’
ভদ্রলোক একটু অতি-বিনয়ের সঙ্গেই সুধাকে বেশ কয়েকবার ধন্যবাদ জানালেন। দুধের প্যাকেটটা অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর ওটা সুধার ট্রলিতে রেখে দিয়ে আরও একবার ‘থ্যাংক্স’ বলে চলে গেলেন।

ঘটনাঢা ও বলতে গেলে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু পরে ওর মনে হয়েছিল, घটনাটাকে তুরুত্ব না দিয়ে ভুলে যাওয়াট ওর মষ্ত বড় ভুল ছিল।

বিপদা হল চারদিন পরেই।
তখন দুপুর সওয়া দুটো। লাঞ্চর্রেক থেকে ল্যাবে ফিরে সবে কাজের

ভেতরে आবার মাথা গলিয়েছে সুধা। এমন সম়় ফেনাত এল। মোবাইল কনে দিয়ে ‘গালো’ বলতেই চেনা গলা শুনতত পেল। ‘আমরা খুবই দूঃখিত, ম্যাডাম। তোমার কাছে আমরা ক্ষমা চাইছি’’ 'কমা চাইছি মানে? कोসের ক্ষমা? को रয়েছে?'
লোকটা সুধার একটা প্রশ্নেরও জবাব না দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, আমি হলে ল্যাব থেকে এখুনি বাড়ি চলে যেতাম...।

লোকটা কীসের ইশারা করছে? বাড়ি যেতে হবে মনে? সুধাসুन्দরীর হাত-পা ঠাভা হয়ে গেল। মা! মায়ের কিছু হল না কি? নাকি এটা নিছকই ওকে ভয় দেখানোর জন্য एাঁকা আওয়াজ?
'কী বলতে চান সোজাসুজি বলুন!' অধ্ধ্য গলায় বলল সুধা।
লোকটা খুক-খুক করে হাসল : 'মাডাম, আর বাচ্চা মেয়ে সেজে থাকার ভান কেরো না। তুমি বুঝরে পারহ না কী বলতে চইছি?’ একটু চুপ করে থেকে লোকটা প্রায় ফিসফিসে গলায় বলল, ‘কোল্যাটরাল ড্যামেজ। তোমাকে প্রথম থেকেই আমরা সাবধান করেছিলাম। শুধু তোমার বোকা-বোকা জেদের জনৌই এরকম একটা বাজে বাপার ঘটে গেল....।’

লোকটা তো অসহ্য! ভাবল সুধা। ওর গলা উদু পরদায় উঠে গেলঃ
 याও—’'

আর দেরি করেনি সুধাসুন্দরী। ল্যাবের কাগজপত্র গছিয়ে রেথে ছুটেছে বাড়ির দিকে।

ফ্য্যাটের দরজা থোলার আগে থেকেই সুধা 'মা! মা! বলে চিৎকার শরু করেছিল, কিন্তু কোনও সাড়া পায়নি। দরজা খুলে ফ্য্যাটে ঢোকার পর সাড়া না পাওয়ার কারণটা বুঝতে পারল।

ড্রয়িং-ডাইনিং স্পেসে একটা সোফায় মায়ের দেহটা এলিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো বোজা। ডান शতে টিভির রিমোট। টিভি চলছে।

মেঝেতে দুধের গ্গাসটা ভেঙে চেচির। দুধ ছড়িয়ে পড়ে কার্পেটের অনেকটা জায়গা ভিজে গেছে।
'घा!'
সুধাসুন্দরীর মুখ থেকে থে-চিৎকারটা বেরোল সেটা আর্ত হাহাকরের মজো লোনাল। তারপরই কান্নার ঢেউ ওর বুক ঠেলে উথলে উঠল। কোল্যাটারাল ড্যামেজ!

হাতের ব্যাগ ছুড়ে ফেলে ও ছুটে গেল মায়ের কাছে। মায়ের দেহটা জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল। না, মায়ের জৃৎপিতের ধুকপুকুনি ও টের পাচ্ছে

না। তখন শঙ্কা আর আশঙ্কা নিয়ে হাত বাড়াল মায়ের কবজির দিকে। পাল্স বিট দেখতে চাইল।

आছে! আছে!
আনন্দে খুশিতে সুধাসুন্দরীর ভেতরটা গলে গেল। ও যেন নতুন করে বুঝ্তে পারল, মা থাকা আর না থাকার মধ্যে কতটা তফাত। মা-কে জড়িয়ে ধরে ও আনল্দে কাঁদত লাগল।

একদু পরেই ও নিজেকে সামলে নিল। মায়ের এখন চিকিৎসা দরকার। কী করে এমন হল, সেটাও জানা দরকার।

চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। মায়ের অচেতন দেইটা ঠিকঠাক করে ఋইয়ে দিল সোফায়। রিমোটটা অসাড় হাতের মুঠো থেকে খুলে নিশ্রে বোতাম টিপে টিভি অফ করে দিল। রিম্মোট রেখে দিল টেবিলে।

ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল সুধা। সবকিছু জায়গামতোই রয়েছে। কোথাও কোনও হানাদরের ছাপ নেই।

আর দেরি না করে হসপিটালের ইমর্জেন্সিতে ফোন করে দিন। পেশেন্টের কথা বলল। বাড়ির ঠিকানা আর লোকেশান বলল।

এবার অপেক্小।

 এসি অন থাকা সত্জুও ঠোটের ওপরে ঘামের ফোঁাট।

ঝুঁকে পড়ে মা-কে পরীক্মা করল-যস্ত্রপাতি ছাড়া যতটা করা যায়। ব্লাড প্রেশারটা মাপত্ পারলে ভালো হত।

को করে মায়ের এমন হল? হার্ট অ্যাটাক? না সেরির্রাল অ্যাটাক? ঠিকমতো কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

এমন সময় সধাসুন্দরীর মোবাইল ফোন বেজে উঠল।
'ম্যাডাম, কেমন আছ?' মোলায়েম স্বরে প্রশ্নটা ভেসে এল।
উত্তরে একসল্গে অনেক কিছু বলতে চাইল সুধা। কিন্তু কথাগুলো ওর গলার ভেতরে আটকে গেন। ঠোট কাঁপত লাগল।

একটু পরে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'মা...! মা...!'
‘হাঁ, তোমার মা-’ একবার কাশল লোকটা : ‘তোমার মা বেঁচে আছে, ম্যাডাম। আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছি, তাই।’
‘কী হয়েছে মায়ের? মা-কে কী করেছেন আপনারা?’ উৎকঠ্ঠায় কেঁপে ওঠা গলায় জননত চাইল।
‘তোমার ময়ের হার্ট অ্যাটাক বা সেরির্রাল অ্যাটাক হয়নি। তোমার মা দूধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে...।'

## 222 www.banglabiơ̂k puatf.tīlogspot.com

## '乡ू४!

‘হাঁ-দুধ। হাসল সে : ‘তোমার মনে পড়ে, ম্যাডাম, কয়েকদিন আগে "ফোর স্কোয়ার" ডিপার্টেেট্টাল স্টোর থেকে তুমি তিন প্যাকেট দুধ কিনেছিলে ?’ ‘शाँ—’
‘তখন একজন টাকমাথা লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করে কথা বলেছিল। তোমার ট্রলি থেকে একটা দুধের প্যাকেট তুলে নিয়ে সেটার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল। প্যাকেটটট অনেকক্ষণ তার হাতে ছিল। মনে আছে?’
‘হাঁ-হাঁা—’ সুধার বুকের ভেতরের শব্দটা কয়েকগুণ বেড়ে গেল। ‘ওই ভদ্রলোক অ্যাকহুয়ালি আমাদের লোক’’ খুক-থুক করে হাসল : ‘তোমার ওই দুধের প্যাকেটে একটা হাই পোটেনশিয়াল টক্সিন ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছিন। ওই টাকমাথা লোকটার কাছে একটা আলা্র্রা-থিন নিড্লওয়ালা ইনজ্জেক্শান সিরিঞ্জ ছিল। খুব ছোট সিরিঞ্জ। তার মধ্যে ছিল ওই টপ্সিন। তোমার দুধের প্যাকেটটটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে তোমার চোখের আড়ালে ওই টক্সিনটা প্যকেটের মধ্যে প্পুশ করে দেওয়া হয়েছিল...।'

সুধাসুন্দরী কোনও কथা বলতে পারছিল না। মোবাইল ফোনটা আরএকটু হলেইই ওর হাত থেকে পড়ে যাচ্ছিল।
 खét

লোকটা হেসে বলল, 'ইচ্ছে করলেই আমরা ওই প্যাকেটে স্ট্রং ডোজের পয়জন ইনজেষ্ট করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। করলে তোমার মা ওপারে চলে যেত। সো কনসিডার ইয়োরসেল্ফ লাকি, মাডাম। আসলে আমরা খুব দয়ালু...।’

সুধা চুপ করে রইল।
‘বাট নেষ্ষেট টাইম উই মে নট বি সো কইড্ড। য়ু মে নট বি সো লাকি। এখন ছাড়াছি। পরে আবার ফোন করব। বাট ডোন্ট ফরগেট, উই উইল বি ওয়াচিং য়ু... ${ }^{\prime}$

ফেন ছেড়ে দিল লোকটা।
মাল্যের চিকিৎসা নিয়ে টানা দু-সপ্তাহ ব্যস্ত রইল সুধা। মা-কে সুস্থ করে তোলার জন্য হাসপাতালের ডাক্তর এবং নার্সরা প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগল।

হাই পোটেনশিয়ান টক্সিনটা মা-কে ভালোমরোই জখম করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তর-নার্সরা জিতে গেল। ওদ্দের সাহয্যে মা-কে শারীরিকভাবে সুস্থ করে তুলে বাড়িত নিয়ে এল সুধা। তারপর থেকেই ভয় আর উৎক্ধা ওর মনের ভেতরে বাসা বাঁধল। নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে পাট গোটনোর জন্য ও পাগলের মতো হয়ে উঠল। ওর বারনারই মনে হতে লাগল, আগে মা, পরে জেরান্টোলজি।

কয়েকদিনের মধ্যৌ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সুধাসুন্দরী। ইন্টারনেটে নানান জায়গায় রিসার্চ সায়ো্টিস্ট পোস্টে আ্যাপ্লাই করতে লাগল। আর সকলের চোখের আড়ালে জেরান্টোলজির রির্সাচের কাগ্পপত্রুলো সানফিউরিক অ্যাসিডে পোড়াতে লাগল।

প্রায় দিনদশেক ধরে নিজের প্রণের জিনিসগুলো ধীরে-৭ীরে পুড়িয়ে শেষ করল সুধা। পোড়ানোর সময়ে ওর চোখে জল এসেছিল। কিন্ত মায়ের নিরাপ্ত্তর কथা তেবে ও মন শক্ত করেছে, চোvের জল মুছে নিয়েছে।

ওর গবেষণার কেরিয়ারের জোরে পৃথিবীর অনেক জায়গা থেকেই চাকরির অফার পেল। অফার এল নিজের দেশ থেকেও। মা বারবার দেশে ফিরতে চাইছিল। বলছিল, ওন্ড সিটিতে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওন্ড সিটির যা অবস্থা সেখানে না আছে সুধাসুন্দরীর মতো বিষ্ঞানীর জন্য কোনও চাকরি, না আছে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা!

তাই ওই ছন্নছাড়া বিপজ্জনক হত্রী শহরটায় না ফিরে সুধা ফিরে এল তার খুব কাছাকাছি-নিউ সিটিতে। চাকরির অফারটা নেওয়ার ফইনাল স্টেজে ও কথা বলল সরাসরি শ্রীধর পাট্টার সন্গে। স্পষ্ট বলল, স্বাধীনভাবে গবেষণা করার জন্য ওর কী-কী চাই। কোন-কোন ধরনের ল্যাব ওর দরকার, কঁট ‘ক্লিন’ রুম দরকার, কী ধর্লের মানপাওয়র ওর চাই।
 সম্পর্কে খুঁটিয়ে ল্খোজখবর নেওয়ার পর তিনি ওর কেরিয়ার দেখে সुষ্তিত হয়ে গেলেন। তই ওর সব কথায় রাজি হয়ে গেলেন। তিনি জনততেন, সুধাসুন্দরী নিউ সিটিতে রিসার্চ কেরিয়ার নতুন করে শুরু করছে মানে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানের ম্যাপে নিউ সিটি জায়গা করে নেবে। তাই সুধাকে অসম্তব গুরুত্ব আর স্বাধীনতা উপহার দিলেন।

মা-কে নিয়ে দেশে ফিরে এল সুধা। শ্রীধর পাট্টার শহরে ও নতুন করে বিজ্ঞানী-জীবন खুরু করল। ওর তত্ত্রাবধানে বেশ কয়েকটা ল্যাবরেটরি গড়ে উঠল। সারা পৃথিবীর বায়োকেমিষ্ট্রি ফিল্ডের বিষ্ঞানীরা এবার নিউ সিটির দিকে চোখ ফেরাতে লাগল।

কয়েক বছরের মধ্ধেই সুধাসুন্দরী নিউ সিটির অংশ হয়ে গেল।

ওর কাহিনি শেষ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল সুধা। জিশানের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর বড়-বড় চোখে প্রত্যাশার ছায়া। যেন বলতে চাইছে, এবার জিশান কিছু বলুক।

জিশান চটপটে তেজি বিজ্ঞানী মেয়েটাকে দেখছিল। ওর ভয়ংকর

## २ゝ8 <br> www.banglaboêkk plat.błogspot.com

দিনগুলো ভাবতে চেষ্টা করছিল : জেরান্টোলজির গবেষণা, ওই ভয়-দেখানো টেলিযেেন, মায়ের ওপরে ওইরকম নৃশংস অ্যাটেম্প্ট...। সত্যি, অনেক সইনে হয়েছে সুধাকে! যেমন, জিশান এখন সইছে।

জিশান হেসে বলল, 'ডুমি একজন রিয়েল ফাইটার।’
‘তোমার মতো নয়। তুমি এখন একজন আইকন-নিউ সিটি আর ওন্ড সিটির সবার কাছে...।
‘তোমার মা এখন কেমন আছেন?’
দাঁত দিয়ে ঠোট কামড়াল সুধাসুন্দরী। को একটা বলতে গিয়েও বলল না। টেবিলের দিকে কয়েেক পলক তাকিয়ে রইল। তারপর মুখ তুলে জিশানের দিকে তাকাল : চলো, মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিইই। মা বেডরুমেই থাকে-খুব একটা বেরোত পারে না...।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুধা। জিশানও।
সুধা ছোট্ট করে বলল, ‘এসো...।'
সুধাসুন্দরীর পিছন-পিছন এগিয়ে চলল জিশান। সম্পর্কের টান আর তাকে জড়িয়ে থাকা ভালোবাসার কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল মিনি আর শানুর কথা। মিনি দোসরা সেপ্টেম্বর তারিখটার কথা প্লেট টিভির দ্ৗৈলতে জেনেছে। জিশান যখন ওকে এম-ভি-পি-ঢে কিল গেন্মর তারিখটার কথা বল্লে তখন মिने হिए कরে জবা দিয়েছিল, জनि-।

সেদিন মিনি বড্ড চুপচাপ ছিল। শু শানুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। হয়তো ভাবছিল, জিশান চলে গেলে ছোট্ট শানুকে ও একা-একা মানুষ করতে পারবে তো!

জিশান ওকে বলেছিল, 'দু-তারিখের ব্যাপারটা মিটে গেলে তিন তারিখ সকলে তোমাকে ফোন করব...।'

মিনির চোের দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হয়নি যে, মিনি ওর কথা বিশ্বাস করেছে।

সুধাসুন্দরীর বেডরুমের দরজায় দাঁড়াতেই ওযুধের মতো একটা গন্ধ জিশানের নাকে এল। সুধা তখন কাউকে লক্ষ্য করে একটু জোরালো গলায় ডেকে উঠেছে, 'মা!'

ঘরে দুকেই সুধার মা-কে দেখতে পেল জিশান।
ধপধপে সাদা বিছানায় বসে আছেন একজন ধপধপে সাদা মহিলা। পরনে ধপধপে সাদা শাড়ি।

সাদা বিছানার পটভূমিতে মহিলাকে প্রায় দেখাই যেত না, यদি না ওঁর মাথার চুলগুোো কলো হত।

রোগা ক্ষীণজীবী চেহেরা। সামনে টিভি চলছে, কিন্তু সেদিকে ওঁর মন
www.banglabookpdf.blogspot.com


## ২ゝ৬ <br> www．banglaboêkelf．bitogspot．com


 কথনও কারও চামড়ায় এত デজ पদ্খেন ও।
 বলে ছিন। জিশানকে লোওয়ার घরে দেখে ও কেমন ভ্যে এবু জড়োসড়ে হর্যে গেল। চট করে উঠ দাড়াল।
＇্য！！এই দ্যাধ্যা，জিশান তোমার সল্গে আनাপ করতত এলেছে। এই শে－ তাকাও এদিকে．．．।＇

 निख्यে এलে রাথল।








 শঁপল। জিশানের হন্তের ওপরে আালতো করে হাত বোলাতে－বোনাতে বনলেন， ＇সুধার খুব বিপদ। ওढে টেলিঢোন করে সবাই ভয় লেখায়．．．＇

জিশান সুষার দিকে তাকল। ঢোে আবছ প্রশ্ন।
সুধা ওকে হাতের ইশারায় চুপ করে থাক্তে বলল।
‘তোমাকে কৌ ভয় ূদখায় না ঢে，জিশান？’ কাঁপা গলায় পশ্ন করলেন｜

＇‘ুব जালো，খুব ভালো－＇জিশানের হাতে হাত বোলাতে－বোলাত্
 গাড়ি ব্লে তোমাক ধাকা না মারে．．．’

জিশান উজ্টে को বলাে বুমत্ পারঘিন ना।

 আর মাথা নেড়় সায় দিক্যে যাও। পরে তোমাকে সব বলছি．．．।

সুধা আবার ওর মায়ের পালে গিয়ে বসল।
বৃদ্ধা তথনও শূন্য চোখে জিশানের দিকে তাকিত্যে বিড়বিড় করে বলছেন, ‘দেথে-শেনে রাস্তা পার হবে, বুঝলে। নইলে কোথা থেকে গাড়ি-টাড়ি ছুটে আসবে—হ্ট করে ধাক্ণা মেরে দেবে....’

বৃদ্ধার হাতে চাপ দিল জিশান। বলল, আজ আসি, কাকিমা। আশীর্বাদ করুন যেন কিল গেমে জিততে পারি...।
'তুমি জিতবে...জিতবে...।'
বৃদ্ধার হাতটা আলতো করে ফিরিয়ে দিল জিশান। তারপর উঠে দাঁড়াল।
সুধার দিকে চোখ গেল ওর। চোখের কোণ চিকচিক করছে। মুথ্ে কাতর ছায়া।

জিশান একটু সরে আসত্তই সুধাসুন্দরী উঠে দাঁড়াল। জিশানের খুব কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'ওই মিসহাপটার পর মায়ের ব্রেন খানিকটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। বিশেষ করে অপটিক আর ভেগাস ক্রেনিয়াল নার্ভগুলো। এ ছড়া আর-একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার হয়েছে। মায়ের এজিং প্রসেসে একটা ডিজর্ডার দেখা দিয়েছে-মা খুব তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। মা-কে আর কতদিন ধরে রাখতে পারব জানি না...।' সুধার গলা ধরে এল।


সুধা হাতের পিঠ দিয়ে চোথ মুছল। গলা স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে ওর মা-কে লক্ষ্য করে নীহু গলায় বলল, 'মা, আসছি...।'

ইশারা করে শর্মিকে মায়ের কাছে এসে বসতে বলল সুধা। তারপর জিশানকে সল্পে নিয়ে বেডরুমের দরজার দিকে এগোল।

इঠাৎই পিছন থেকে কাঁপা গলায় ডেকে উঠলেন বৃদ্ধা, ‘জিশান...।’
জিশান घুরে দাঁড়াল : ‘বলুন, কাকিমা—’’
'তুমি কখনও দুধ খেয়ো না, জিশান...।'

গুনাজির কাহে নিয়মিত গাড়ি চালানো শিখছিল জিশান। এবং গাড়ির মধ্যে যেসব আধুনিক অটোমেটিক ব্যবস্থা রয়েছে তাতে গাড়ি চালানো শিখতে ওর সময় বেশি লাগল না। তারপর গুনাজি ওকে চালানোর নানান কায়দা, কসরত আর কেরামতি শেখাতে লাগল।

ঢাল বেয়ে নামার সময় কীভাবে গাড়ি চালাতে एয়। সাপের মতো आঁকাবাঁকা পথে কীভাবে স্টিয়ারিং আর ব্রেককে কন্ট্রোল করতে হয়। যদি দেখা

 গেলে জিশান কীভাবে নিজ্জেকে বাঁচবে। ব্যাক গিয়ার দিল্যে কীजােে গাড়ি পিছনদিক্রে জোরে ছেটিতে হয়।

बইরকম आরও কठ के!
 এতসব কায়দাকনুন ওর শেখার দরকারান कী?

একদিন ও অনাজ্রিকে প্রশ্া করেু বসল।
 বनো बে? आমি कि কার রেসিং-এ নাম লেখাcে यাচ্ছি নাকি?'

জিশানের দিকে তকিক্যে হাসল ওনাজি : দাদা, आপনাকে কার ড্রাইভিংএর সঙ্গে-সল্গে এসবঞ লেখাত হরে। করণ, মার্শাল স্যার আমাকে সেরকমই অর্ডা দিד্যেছ্রে...|

গুাজিকে ভালো করে লষ্ক করল জিশান।






জ্রিশা ওনাজির মুখ্র দিকে তকিক্রে রইল। ওর মনে হচ্ছিল, অনাজি
 ওনাজি গাড়ি চালান্ন লেখাচ্ম, গাড়ি নিয়ে নানান কসরত রপ্ত করাচ্ছতারই কথা বনঢু ఆনাজি। জার জিশান ఆনছে।

ইস, এমनण゙ यদि সणि হए!
গাড়িন একপালে পার্ক করে কথা বলছিি ঙুনাজি। জিশান গাড়ির জানলা দিड্যে বাইরে তাকা।

 গাড়ি এবং মোঢরবাইক চালানো শিখতে পারে। তও আবার কর্পোরেশনের অর্ডার পেলে তবেই।
 প্রতিটি দ্ব্যাকের এলাকায় রঙিন এল-সি-ডি প্যানেলে নানান নির্দ্র লেখা। তার


জন্য ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া প্রতিটি এলাকার জন্য রয়েছে বিশেষ ধরনের লোগো। সেই লোগোটা এলাকার নানান জায়গায় বেশ পরিকল্পনা করে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে কারও পক্ষে ভুন করে এক এলাকার বদলে অন্য এলাকায় पুকে পড়া মুশকিল।

কিন্তু তা সত্ত্তে যদি কেউ ঢুকে পড়ে তার জন্য রয়েছে বিপার এবং সিকিওরিটি গার্ড।

একটা গাড়ি যখন ‘ফ্লাই বাই’-এর কোনও জোনে पুকতে চায় তখন সেই গাড়ির ড্রাইভারকে সেই জোনের একটা বড় মাপের লোগো কার্ড দেওয়া হয় : স্পেশালি কোডেড ম্যাগনেটিক কার্ড। সেটা উইভ্ডশিন্ডে লাগিয়ে নিতে হয়। এই লোগো কার্ড লাগানো অবস্থায় অন্য কোনও জোনে গাড়ি দুকনেই বিপার বেজে ওঠে আর লোগো কার্ডটা ্্য্যাশ করতে থাকে। তখন সিকিওরিটি গার্ডরা গাড়িট থামিয়ে তার কন্ট্রোল হাতে নেয়।
‘ফ্যাই বাই’-এর গার্ডদ্রর পোশাকের রং নীল, তবে জোন অনুযায়ী তাদরর পোশাকে নানান লোগো লাগানো রয়েছে।

গুনাজির কাছেই জিশান জেনেছে, এই ট্রেনিং সেন্টারের রাস্তাণুলো একটা স্পেশাল টাইপের সিনথথেিক অ্যাসফাল্ট দিয়ে তৈরি। এর ওপর দিয়ে যত
 অথী গাড়ির ঢয়ারের গ্রিপের কোন সমস্যা হয় না

রাস্তা ছাড়াও ট্রেনিংーএর জন্য রয়েছে ধূ-ধ্ মাঠ। এবড়োখেবড়ো, পাথুরে, আগাছায় ভরা। এ ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড ঢিবি আর গর্ত। সবমিলিয়ে রাফ আ্যাড টাফ হেস্টাইল টেরেন। গাড়ি চালানো শিখতে হবে সবরকম রাস্তা আর জমিতে।
‘ফ্লই বাই’-এর চারপাশটা দেখে জিশান স্তভ্ভিত হয়ে গিয়েছিন। এত সুন্দর এবং আধুনিক ট্রেনং সেন্টার বুঝি স্বপ্নেই দেখা যায়! নাকি তাও দেখা যায় ना ?

কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে বিদেশি প্র্ুক্তি ব্যবহার করে গড়ে তোলা এই ট্রেনিং সেন্টার জীবন-মরণ নিয়ে জুয়া খেলার আধুনিক আয়োজন করে তা থেকে নিয়মিত কোটি-কোটি টাকা আল্যের কী চমৎকার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর পাট্ট!

গুনাজির কাছে তিনদিন ট্রেনিং নেওয়ার পর জিশানের দায়িত্ব নিল অন্য একজন ট্রেনার—यদিও গুনাজি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে সঙ্গে রইল।

এই ট্রেনিং-এর ধাপে জিশান বেটা শিখছিল সেটা হন, নিজেকে অক্ষত রেথে কী করে বেপরোয়াভবে গাড়ি ড্রাইভ করতে হয়-তা সেটা সামনের দিকেই হোক বা পিছনের দিকেই হোক। তার সঙ্গে শেখানো হতে লাগল গাড়ি

## ২२० www.banglabjôek pe̛tf.tölogspot.com

ছুটিয়ে ‘র্যাম্প’ বেয়ে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দেওয়া। ছুট্ত গাড়ি জলের মধ্যে পড়ে গেলে ডুবে যাওয়া সেই গাড়ি থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসতে হয়। চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে গেলে কী করে নিজেকে বাঁচাত হয়।

সোজা কথায়, গাড়ি নিয়ে যতরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি হতে পারে তার মোকাবিলা করার ট্রেনি চলতে লাগল।

জিশান বুঝতে পারছিল, ও একটা পেশিবহৃন যন্ত্র থেকে ধীরে-বীরে আরও নিখুঁত একটা পেশিবহল্ল যন্ত্রে পালটে যাচ্ছিল।

গাড়ি চালানোর ঘামঝরানো বেপরোয়া ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের কিন্তু ছুটি হল না। শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে ওকে তুলে দেওয়া হল প্যাসকো নামের এক মোটরবাইক ওস্তাদের হাত।

জিশানের সামনে অ্যাসফা্টের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল 'বুলডোজার-র্লু লাইন’ মডেলের চার হাজার সি.সি.-র একটা বাইক। তার পাশে হাসি মুঢে দাঁড়িয়ে ছিল প্যাসকে।

কালো রঙের বাইকটাকে মনে হচ্ছিল একটা বুনো মোষ। আর তার বাঁকানো দুটো গাতল যেন মোষের শিং।

জিশানের মনে হল, প্যাসকের মোটাসোটা ভারী চেহারাটাও বুনো মোষের চেহার্র্র্রুব ক্কাছাছ্ছি।
 কয়েক খাবলা লোম উঁকি মারছে। গা়্যের রং গাঢ় তামাটে। মোঢা-মোটা হাত দুটো যেন ইস্পাতের থাম। হাতের সব জায়গায় লাল-কালো-সবুজ রঙের উলকি। মাথার «াঁকড়া চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখটা লাউয়ের মতো ভারী। বাঁ-কানে একটা সোনার মাকড়ি। थুতনিতে যে-দাড়িইুকু রয়েছে সেটা ফ্রেঞ্ককাট আর ছগলদাড়ির মাঝামাঝি। তাতে আবার চক্চকে রুপোলি রং মাখানো।

প্যাসকো কী যেন একটা চিবোচ্ছিল-কারণ, ওর চোয়াল নড়ছিল।
প্যাসকোকে দেখেই জিশানের মনে হল, প্যাসকো কিল গেমের একজন পার্টিসিপ্যান্ট। ওর চোখ দুটো ছোট-ছোট—ডুমো-ডুম্মো গলের কেলে ঢোকাো। দুটো চোেের মণি যেন বরফের לুকরো। ঠান্ডা, মরা মাছের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে জিশানের দিকে।

প্রথম দিন সকাল নঢটার সময় জিশানকে মোটরবাইক ট্রেনিং জোনে প্পেঁছে দিয়ে গুনাজি ‘ভিজিটরস ওয়েটিং জোন’-এ চলে গিয়েছিল। সেখানে ও জিশানের জন্য বিকেল পাচটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

গাড়ি চালানোর কসরত শেখানোর সময় গনাজি বলেছিল, দাদা, শুধু কার ড্রাইভিং নয়, আপনাকে মোটরবাইক চালানোও শিখতে হবে...।'

উত্তরে জিশান বলেছে, ‘আমি মোটরবাইক চালাত জানি, গুনাজি...।'

গুনাজি হেসে বলেছে, ‘ওই শেখা দিয়ে কাজ হবে না, দাদা। গেম সিটিতে মোটরবাইক চালানো খুব সহজ নয়। অথচ সেখানে শব্রকেে প্রাণে মারার জন্যে...কিংবা নিজে প্রণে বাঁচার জন্যে...মোটরবাইক চালানোয় ওস্তাদ হওয়া দরকার... ${ }^{\prime}$

কথা বলতে-বলতে গুনাজি হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কোনওরকমে চোখ মুহে নিয়ে ভাঙা গলায় বলল, ‘সেটা আপনি দু-তারিত্যই বুঝতে পারবেন। গেম সিটির মধ্যে এবড়োেেড়ো পাথুরে জমি, পাহড়, নদী, জসল-সব আছে। আমাদের মার্শাল বলেন, এসব না থাকলে লুকোুরি খেলা জমবে কী করে! টিভিতে কিল গেমের প্রোমোে প্রায়ই এসব নিয়ে আলোচনা হয়, ছবি দেখয়। আমি দেখ্খেছি... ${ }^{\prime}$

কাঁধে হাত বুলিয়ে গুনাজিকে আশ্বাস দিল জিশান : 'তুমি আমার ওপরে डরসা রাখতে পারহ না, গুনাজি?’
'না, না—তা নয়...। গুনাজি ফুঁপिয়ে-ফুঁপিয়ে বলল।
'তুমি চিত্তা কেরো না, গুনাজি। আমি খুব মন দিয়ে মোটরবাইক চালানো শিখব। थুব মন দিয়ে লড়ব...।'

গুনাজি কোনও কথা বলল না। खধ্রু চোখের জল মুছে চোয়াল চেপে



ওর গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে জিশানের মনে হল, সত্যি কিল গেমের আর বেশি দিন বাকি নেই : মাত্র ঢোদ্দো দিন।

প্যাসকোর কাছাকাছি পৌঁছতেই ও হাত বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে। ওর সঙ্গে জানডশেক করার সময় জিশান টের পেল, ওর শক্তিও বুনো মোেের যথেষ্ট কাছাকাছি।
‘ওয়েলকাম, জিশান, ওয়েলকাম—’’ হেসে বলল প্যাসকো, ‘তোমার কাণ্ডারখানা টিভিতে রোজ দেখছি। তোমার জবাব নেই।’

জিশানের মনে হল, প্যাসকোর হাসিটা খুব সরল এবং আণ্তরিক। তা ছড়া, ওর মুখে হাসি ফুটে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে চোখের ঠাল্ড মরা মাছের দৃধ্টিটা কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল।

ওর হাসির উত্তরে জিশান অজান্তেই হেসে ফেলল।
‘সুপারগেম্স কর্পোরেশন তোমার ডোসিয়ার আমাকে পাঠিয়েছে। সামনের মাসের দু-তারিখ্ে তোমার কিল গেম। আমাদের এই "ফ্লাই বাই"-এ ছ’-জন মোটরবাইক ট্রেনার আছে। তবে আমি শুধু কিল গেমের ক্যাভ্ডিডেটদের ট্রেনিং দিই। সুতরাং তুমি আমাকে মোটরবাইক ট্রেনিং-এর সুপার ট্টেনার বলতে পারো। ...আচ্ছা, তুমি কি বাইক চালাতে জনো?’

## ২২২ www.banglabiôfk plff.błogspot.com

প্রশ্নঢা এমনভবে হল যে, জিশান ঠিক তৈরি ছিল না। একটু থতমত থেয়ে ও বলन, ‘হাঁ-জানি।
'তা হলে আমাদের ট্রেনিং-এ অনেকটা সুবিধে পাওয়া যাবে—’'
‘তোমার কাছে সুপার ট্রেনিং নিতে আমার ক’দিন লাগবে?’
জিশানের কথায় মজা পেয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে 'হা-হা’ করে হেেে উঠল প্যাসকো : ‘ভলো বলেছ! সুপার ট্রেনিং!...এই বে এই বাইকঢা দেখছ...,’ বলে কালো বাইকটার গায়ে হাত বোলাল প্যাসকো। তারপর রেসে জেতা ঘোড়ার পিঠঠ অহঙ্করের চাপড় মারার ঢঙে বাইকটার সিটে চাপড় মারল ঃ ‘বুলডোজার—রু লাইন বাইক। চারহাজার সিসি। ঘণ্টায় পঁচচশো মাইল স্পিডে ছুটতে পারে। এককথায় সুপারবাইক...।'
'তা হলে আর ভুল কী বলেছি, প্যাসকো! সুপার ট্রেনার আর সুপার বইক—সুপার ট্রেনিং তো হবেই হবে।

প্যাসকো বাইকে উঠে বসল। পিছনে উঠে বসার জন্য জিশানকে ইশারা করল।

জিশান চটপটে পা ফেলে বাইকটার কাছে এগিয়ে গেল। অভ্যষ্ত ভপ্গিতে প্যাসকেরের পিছনে চড়ে বসল। তারপর আবার জিগ্যেস করুল, ‘মার दেনিং ক’দিন চলবে?
 আছে। ও-দুটো শক্তু করে চেপে ধরে।। হাঁ, ঢোমার ট্রেনিং। আমার কাছে তোমার ট্রেনিং চলবে চারদিন। সকাল নত্টা থেকে পাঁচটা। ঝোড়ো ট্রেনিং। ক্র্যাশ কোর্স—’’

জিশান কোনও কথা বলল না। একদ্মু নজর করতেই ও কালো ফাইবারের গ্রিপার দুটো দেখতে পেল। শক্তু করে সে-দুটো চেপে ধরল। তখনই খেয়াল করল, একটু দূরে দাঁড়িয়ে একজন সিকিওরিটি গার্ড ওকে লক্ষ্য করে হাসছে। ট্রেনিং-এ আসছে বলে জিশান টুপি বা কালো চশমা পরে আসেনি। তাই গার্ডটা ওকে চিনতে পেরেছে।

গার্ডা হাত তুলে ওকে সেলাম জানাল।
জিশানও পালটা সেলাম ফিরিয়ে দিল।
তখন গার্ডটা দু-হত শূন্যে তুলে দুটো ‘ভি’ অক্ষর দেখাল।
জিশান প্রথমটা ভাবল, গার্ডটা ওকে ডবল ভিকট্রি সাইন দেখাচ্ছে। কিন্তু তার পরেই মনে হল, না, তা নয়। গার্ডের দেখানো প্রথম ভি’-টা আসলে দুই—সেপ্টেম্বরের দু-তারিখ। আর দ্বিতীয় ‘ভি’-টা ভিক্ট্রি।

বুলডোজার ছুট্তে তুরু করেছিল। স্টার্ট লেওয়ার পর মাত্র দু-তিন সেকেড্ডের মধ্যেই বইকটা হাই ভেলোসিট্তিে পৌঁছে গির্যেছিল। জিশানের চুল
www.banglabookpdf.blogspot.com


বাতসে উড়ছিন। বাইকের মসৃণ চলায় জিশান প্যাসকোর দক্ষতা টের পাচ্ছিল। ও ভেবেছিল, চারহাজার সিসি-র বাইক চলার সময় কানফাটনো আওয়াজ হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছিল না। বাইকের দুপাশে প্রকাণ মাপের দুটো সাইলেন্সার লাগানো রয়েছে। স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি সাইলেকারার দুটোয় বড়-বড় খাঁজ কাট, আর তাদের চেছারাও বিচিত্র। ওরাই বেশিরভাগ শব্দকে গিলে নিচ্ছিল।

পাঁচ-সাত সেকেঙ্ডের মধ্যেই ওরা ট্রেনিং জোনে এসে পড়ন। ট্রেনিং জোন, তবে সেটা প্রকৃতির তৈরি একটা বিশাল এলাকা। গাছপালা, উঁদু টিলা, উँू-নীহ রুক্ষ জমি, খানা-খन্দ-ডোবা-সবই আছে সেখানে।

জোনের একপাশে প্যাভিলিয়ন। সেখানে সবার জন্য ড্রেসিংর্মম, বাথরুম আর ক্যান্টিন রয়েছে।

জিশান জামাকাপড় পালটে তৈরি হয়ে নিল। তখন দেখল, সেখানে আরও কয়েকজন ট্রেনার আর ট্রেনি রয়েছে। এই ট্রেনিরা নিশতয়ই অন্যান্য গেমের পার্টিসিপ্যান্ট।

ওরা সবাই জিশানকে দেখতে লাগল, নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করতে লাগল।

জিশান লক্ষ করল, ট্রেনি কিংবা ট্রেনার, সবার চেহারাই সমীহ করার মত্া। এদ্র মধ্যে যে-কেউই কিল্न গেরেক পার্চিসিপান্ট হত্ পারে। কিন্তু
 তাই ও মনে-মনে হাসল। ও এখন জনে, কিল গেম্মর ফাইনালে উঠতে হলে जালো চেছেরা ছাড়াও আর কী-কী লাগে।

শক্তি, সাহস, ক্ষিপ্রতা, উপস্থিতবুদ্ধি, প্রতিপক্ষের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা, চুলচেরা বিচারের সূক্ম নজর, এক লহময় পরিস্থিতি আঁচ করে নেওয়ার দক্ষত, আর...।

আর পিছুটান। মিনি আর শানুর মতো জোরালো সুন্দর পিছুটান।
জিশান আগে ভাবত, যাদের কোনও পিছুটান নেই তারাই বোধছয় সবচেয়ে বেপরোয়া লড়তে পারে। এখন ও জা়ে, সেটা ঠিক নয়। বেপরোয়ার বেপরোয়া লড়তে পারে পিছুটানওয়ালা মানুষ। তার ভালোবাসার কছে ফিরে যাওয়ার জন্য।

সারাদ্রিনের ট্রেনিং যখন শেষ হল তখন জিশান সতিই কাহিল হয়ে পড়েছে। ও প্যাসকোর সঙ্গে ক্যান্টিনে গিয়ে বসল। আরামের গদিতে শরীরটাকে ছেড়ে দিল। তারপর গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যাভউইচ আর কন্লেনট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

ট্রেনিং-এর মাঝে ব্রেকের সময় একবার ওরা ক্যান্টিনে এসেছিল বটে কিন্তু তখন আয়েস করার সময় ছিল না। সেকেন্ড হফের ট্রেনিং শুরু করার

চাপ ছিল।
কিন্তু এখন সে-টেনশান নেই।
প্যাসকোর ট্রেনিং-এর কথা জিশানের মনে পড়ছিল। ওর মোটরবাইক চালানো দেখে মনে হচ্ছিল বুলডোজার বাইকটা ওর শরীরেরই অংশ। বাইক নিয়ে যে এরকম বিপজ্জনকভাবে এত কিছু করা যায় তা জিশান আগে কখনও কল্পনা করেনি। ও মোটরবাইক চালাতে জানে বলে প্যাসকোর ট্রেনিং খুব দ্রুত এগোচ্ছিল।

আজ ট্রেনিং-এর প্রথম ধাপে জিশান প্যাসকোর পিছনে বসেছে।
দ্বিতীয় ধাপে প্যাসকো বসেছে জিশানের পিছনে।
আর তৃতীয় ধাপে জিশান একাই বুলডোজার চালিয়েছে। তখন জিশানের কানে ছিল ইয়ারফোন। বহুদূরে দাঁড়ানো প্যাসকোর ইনস্ট্রাক্শন ওয়্যারলেসের মাধ্যমে জিশানের কানে এসেছে।

আজ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশানের মনে হচ্ছিল, ও যেন কতদিন ধরে ‘ফ্লাই বাই’-এ মোটরবাইক চালানোর ট্রেনিং নিচ্ছে।

ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর জিশান যে শুধু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, ওর ভীষণ খিদেও পাচ্ছিল। ক্যান্টিনে এসে ওর খিদেটা কেউটের ফণার মতো ঝটকা দিয়ে লাফিয়ে উঠলু।
 রঙিন আলোয় ভাসিয়ে দেওয়া ঠান্ডা মনোরম পরিবেশ। গোটা রেস্তোরাঁর ইন্টিরিয়ার ডেকরেশানে ব্যবহার করা হয়েছে শুধু রংহীন কাচ আর স্টেইনলেস স্টিল। রেস্তোরাঁর সামনে সুন্দর করে সাজানো সবুজ মাঠ, আর তাকে ঘিরে রঙিন ফুলের বাগান।

রেস্তোরাঁর কোথাও কোনও মেয়ের চিহ্হ নেই——ারিদিকে পুরুষ আর পুরুষ। তাদের বেশিরভাগই গেম্স পার্টিসিপ্যান্ট এবং তারা ওন্ড সিটির পাবলিক।

প্যাসকো হালকা গল্প করছিল। ওর চেহারা দেখে মনে হয় না ও কখনও কারও সঙ্গে এরকম ভেসে যাওয়া মুডে গল্প করতে পারে।

খেতে-খেতে ও হঠাৎই মুখ তুলে তাকাল জিশানের দিকে। আচমকা বলে বসল, 'জানো তো, আমি কিল গেমের পার্টিসিপ্যান্ট ছিলাম। চার বছর আগে। তোমার মতো ফাইনালেও উঠেছিলাম...।'

জিশান চমকে উঠল। ওর খাওয়া থমকে গেল।
অবাক रয়ে বলল, 'সত্যি?'
‘হাঁ, সত্যি...।' প্যাসকো বলল।
'তারপর? তারপর কী হল? তুমি কিল গেমে জিতলে?'

২২৬ www.banglaboôkpuelf.tölogspot.com
‘নাঃ...,’ মাথা নাড়ল প্যাসকে।। ‘खেঁাস’ করে একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বলन, ‘জিতিনি...।'

জিশান অবাক হয়ে গেল। না জিতলে প্যাসকো ওর সামনে বসে আছে को করে? বেঁচে আছে কী করে?

তিন চামচ গ্র্যানিউলার গ্রেভি স্যাভউউইচ মুত্ে পুরে দিল প্যাসকে।। সেটা চিবোতে-চিবোতে দুমুক দিয়ে কয়েক তোঁক এনার্জি ড্রিংক তাতে মিশিয়ে নিল। তারপর বলল, 'আমার পিকিউলিয়ার একটা মিস্ছাপ হয়েছিল...’ একটু থেমে ঙঁঃ’ করে বিরক্তির একটা শব্দ করল। মাথা াাঁকাল কয়েকবার ঃ "কিল গেমের ঠিক দুদিন আগে আমি হঠাৎ সেকলেস হয়ে গেলাম। আমাকে নিউ সিটির সেন্ট্রাল নার্সিং ইউনিটে ভরতি করে দেওয়া হয়েছিল। পরদিন জ্ঞান ফেরার পর নার্সদের মুট্েে খলাম, হাইপারটেনশান আর হই প্রেশার আমাকে আচমকা ধাক্কা দিয়েছে। কিল গেমের দিন যত এগিয়ে আসছিল আমার টেনশান নাকি ততই বাড়ছিল। তারপর আমি আর চাপ নিতে পারিনি...।
‘কিল গেমের कী হন?’
‘কী আবার হল! শ্রীধর পাট্টা আমার বদলে অন্য একজন পার্টিসিপ্যান্টকে মাঠে নামিয়ে দিলেন। ছেলেটা দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই বডি হয়ে
 ना NWNoaig eoookpolaologspotacin

জিশান এনার্জি ড্রিংক শেষ করে হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছল। হাঁ, কিল গেমে চব্Aিশ ঘণ্টা লড়তে গেলে টাফ হওয়া দরকার। প্যাসকোর গা থেকে টাফনেসের গন্ধ বেরোচ্ছিল। সেই সস্গে ঘামের গন্ধও।

একটু দূরে একটা টেবিল ঘিরে পঁচচজন ট্রেনির একটা দল বসে ছিল। নিজ্রের মধ্যে ওরা গল্শগ্জে করছিল, খাওয়াদাওয়া করছিল। আর থেকেথেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে জিশানকে দেখছিল।

জিশানকে ওরা চিনতে পারবে এটই স্বাভাবিক। কিন্তু ওরা এতবার তাক্ছ্ছিল যে, জিশানের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। ও বুঝতে পারছিল, শুধ্রু তাকনো নয়, ওকে নিয়ে কিছু একটা আলোচনাও চলছে। তা ছাড়া মঝো-মাঝেই ওরা জিশান আর প্যাসকোর দিকে আডুল দেথিয়ে চাপা গলায় কীসব বলাবলি করহে।

জিশান ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টায় প্যাসকোর দিকে তাকান। যে-প্রশ্নট কিছুক্ষণ ধরে ওর মনে লোচা মরছিন সেটাই করল ওকে।
‘কিন্তু এই চাকরিতে তুমি ঢুকলে কেমন করে? আর এইরকম ব্যাপক বাইক চালাতেই বা শিখলে কী করে? মার্শাল ঢো আর এমনি-এমনি তোমকে সুপার ট্রেনারের চেয়ারে বসাবেন না...।'

হাসল প্যাসকে। বলল, ‘ঠিই বলেছ। সে অনেক গল্প। তোমার ট্রেনিং

তো এখন চলবে। কাল শুনো...।'
‘ঠিক আছে-তাই হবে।’
ক্যান্টিন থেকে বেরোনোর সময় প্যাসকো জিশানের পিঠে চাপড় মেরে বলল, ‘তোমার মোটরবাইকের হাত ভালো—শিখছও তাড়াতাড়ি। একটা কথা মনে রেখো, জিশান। গেম সিটিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওয়েপন। খুব পাওয়ারফুল ওয়েপন। এটাকে ঠিকঠাক ইউজ করতে পারলে তুমি জিতবে-।'

জিশান প্যাসকোর চোখের দিকে তাকাল। একটা দিনের পরিচয়েই লোকটাকে ওর বন্ধু বলে মনে হল।

পরদিন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনেই ঘটনাটা ঘটল।
বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রেনিং শেষ হওয়ার পরে প্যাসকো আর জিশান ক্যান্টিনে বসে রিল্যাক্স করছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা কন্স্নট্রেটেড এনার্জি ড্রিঙ্কে চুমুক দিচ্ছিল। তখনই জিশান গতকালের ট্রেনির ঝাঁকটাকে লক্ষ করল।
 গতকালের তুলনায় অনেক কাছাকাছি। সুতরাং ওদের কথার্বাতার টুকরো জিশান আর প্যাসকোর কানে আসছিল। সেই টুকরোগুলোর মধ্যে ওদের নামও শোনা যাচ্ছিল। এ ছাড়া, গতকালের মতোই, ছেলেগুলো বারবার মুখ ফিরিয়ে জিশানদের দিকে দেখছিল। নিজ্রেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল।

জিশান উশখুশ করছিল। প্যাসকোও জিশানের সঙ্গে মন দিয়ে গল্প করতে পারছিল না-ওর় তাল কেটে যাচ্ছিল।

জিশান ভাবছিল যে, উঠে গিয়ে ওদের জিগ্যেস করবে, ব্যাপারটা কী? ঠিক তখনই ওদের দল থেকে লম্বা মতন একটা ছেলে উঠে এল, জিশানদের টেবিলের কাছাকাছি এসে দোঁড়াল।

জিশান বসেই রইল। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।
ছেলেটা কোন গেমের পাটিসিপ্যান্ট কে জানে! তবে পেটানো চেহারা। রং ময়লা। মুখের পেশি শক্ত। ঠোটটের ওপরে সরু গোঁ। গোঁফের দুপাশে ক্যালিপার্স-রেখা। আবছা ভেলভেট দাড়ি। চোখ দুটো টানা-টানা হলেেও তাতে অভিসন্ধির ছাপ আছে।
'তুমি তো জিশান-' ছেলেটা প্যান্টের পকেটের কাছটায় হাত ঘষতেঘষতে বলল।

## ২২৮ <br> www.banglabiôt pedf.tifogspot.com

জিশান কপালে ভঁজজ ফেলে বলল, 'হাঁ, কেন?’
ছেলেটা হাসল : ‘আমরা তোমকে আর ওকে নিয়ে কাল থেকে ডিসকাস করছিলাম...।’ প্যাসকোর দিকে আঙুলের ইশারা করল ছেলেটা।

জিশান কোনও কথা বলল না। চুপ করে অপেক্ষ করতে লাগল। প্যাসকেে কুতকুতে চোথে ঠান্ডা দৃষ্টি নিয়ে ছেলেটার দিকে শুধু তাকিয়ে রইল।

জিশানদের টেবিল ঘিরে দুটো খালি চেয়ার ছিল। কিন্তু জিশানরা ছেলেটাকে বসতে বলেনি।

তা সন্ত্রেও ছেলেটা হঠাৎ ‘বসছি-’’ বলে একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল।

প্যাসকোর ধৈর্য বোধহয় জিশানের চেয়ে কম। ও মাথা ঝাঁকিক্যে ছেলেটটকে জিগ্যেস করল, ‘তোমার কী দরকার তাড়াতাড়ি বলো। আমরা নিজেদের মধ্যে প্রাইভেট কথা বলছি...|’

ছেলেটা আবারও হাসল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বন্ধুদের দিকে। ওরা বেশ আগ্রহ নিয়ে জিশানদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

ছেলেটা জিশানের দিকে চোখ ফেরাল। হেসে বলল, "হাঁ, যা বলছিলাম। কাল থেকে আমরা তোমাদের নিয়ে ডিসকাস করছি...' সরু গোঁফের ওপরে
 रनে কে জিতবে...1

জিশান অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেড্ড ও কোনও কথা বলতে পারল না। প্যাসকোর অবস্থাও তাই।

আরও দুজন ট্রেনি ততক্ষণে নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে পড়েছে। জিশানদের টেবিলের কাছে এগিয়ে আসছে।

প্যাসকো ছেলোিির দিকে জরিপ নজরে তাকিয়ে ছিল। বুঝতে চেষ্টা করছিল, ছেলেটি কোনও নোংরা রসিকতা করতে চইছে কি না।

জিশান ঠাল্ডা গলায় ছেলেটটকে জিগ্যেস করল, 'তুমি ঠিক কী বলতে চইছ বলো তো?’

ছেলেটের মুহ্েে তখনও হাসিত লেগে রয়েছে। ও বলল, 'আমরা তোমাদের একটা ख্রি স্টাইল ফাইট দেখতে চাইছি। আমরা পাচচজন সে নিয়ে বাজিও ধরতে রাজি। সুপারগেম্স কার্পোরেশনের নানান গেমে আমরা বেশ কয়েকটা রাউল্ডে কোয়ালিফাই করেছি। তাতে অনেক টাকাও পেয়েছি। তাই...।'

প্যাসকো সামনে ঝুঁকে পড়ে ওর ডানহাতটা ছেলেটার দিকে বাড়াতে যাচ্ছিল, জিশান সাপের ছোবলের ক্কিপ্রতায় প্যাসকোর হাত চেপে ধরল। হাতের ওপরে আলতো করে চার আঙুলের চাপড় মেরে ওকে শাা্ত হতে ইশারা কর়ল।

# www.banglaboôen pitf.tiłogspot.com 

বাকি দুজন ট্রেনি এখন ওদের বন্ধুর দুপাশে দাঁড়িয়ে। মুতে কৌহূহল, উত্তেজনা।

প্রথম ছেলেটা দু-বন্ধুর দিকে একে-একে তাকিয়ে ইশারায় বোঝাতে চইল বে, বাপারটা সে জিশানকে বলেছে।

জিশান বলল, 'যদি ঠিক বুঝে থাকি তা হলে তোমরা চাইছ, আমি আর প্যাসকো ফ্রি স্টাইল ফাইটে মোকাবিলা করি-।

উত্তরে তিনজনেই বলল, 'ইয়েস! ইয়েস!’
প্রথম ছেলেটট বলল, আমরা পাচচজনে মিলে তোমাদের ভলো টাকার প্রাজজ মানি দেব, জিশান—’

প্যাসকো চট করে উঠে দাঁড়াল।
জিশানও উঠ্ঠে দঁড়াল ঃ ‘প্যাসকো, প্লিজ... ’ প্যাসকেকে শান্ত হতে ইশারা করল।

জিশান ছেলেটটকে বলল, ‘তোমরা একটা ছোট্ট ভুল করছ। আমরা বন্ধু। আর জানোই তো, ফ্রেন্ড্স ডোন্ট ফাইট।

এ-কথায় ছেলেটার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তবে ও উঠঠ দাঁড়াল। তারপর বলল, ‘জিশান, ঢুমি কিল গেমে কোয়ালিফই করেছ বটে,
 यलলে-3 जোমার बেট্রে অनেক বেশি টাফ…

ওদের দলের বাকি দুজনও কখন যেন জিশানদের টেবিলের কাছে ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েহে।

ওদের আর-একজন বলল, ‘জিশান, লড়ে যাও! প্যাসকোকে দেখিয়ে দাও তোমাদের মধ্যে কে বেশি টাফ। কিল গেমে তুমি যখন কোয়ালিফাই করেছ তখন নিশ্চইই তোমার মধ্যে একটা কিলার রয়েছে-।

বন্ধুর কথার থেই ধরে নিয়ে প্রথম ছেলেটা বলল, ‘কাম অন, কিলার, শো আস ছ ইজ দ্য বস। কাম অন...।

ছেলেটা কথাগুলো ইংরেজিতে বললেও তার মধ্যে যে লড়াইয়ের ওসকানি রয়েছে সেটা জিশান ভালোই বুঝতে পারছিল। তা সত্জেও ও ঠাল্ডা গলায় বলল, ‘বললাম তো, বঙ্ধুরা কখনও ক্ষমতা দেখানোর জন্যে লড়াই করে না। অনেক কষ্ঠ করে একজন ভালো বন্ধু পাওয়া যায়...।'

ওদের মধ্যে একটা ছেলে বেশ মোঢেোটা, পালোয়ান গোছের। তাব ঘাড়ে লাল-কালোয় মেশানো উলকি आঁক।। সেই ছেলেটা তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে কয়েন টস করার ভঙ্গি করে বলল, 'আরে ভই, ঠিক আছেআমরা পাঁচজন মিলে ফিফটি থাউজ্যান্ড দেব। ছোট করে একটা ফাইট হয়ে याক... ${ }^{\prime}$

200 www.banglaboôk putf.tyłogspot.com
‘রেস্টুরেন্টের বাইরে ওই খোলা জায়গাটায় ফাইটটা হরে পারে-’’ ওদের মধ্যে উৎসাছী একজন রেস্ঠোরাঁর বাইরের মঠঠটা আঙুল তুলে দেখাল।

প্রথম ছেলেটা জিশান আর প্যাসকোকে হাতের ইশারা করে ডাকল : 'চলো, জিশান—ফাইট গেম শুরু করে দেওয়া যাক।'

যেটা জিশানকে অবাক করছিল সেটা হল, ছেলেগুলো ত্ধু নিজেদের কথ্থ বলেই যাচ্ছিল-জিশানের কথাকে এক<েঁঁাটাও পাত্তা দিচ্ছিল না। ওরা হয়তো ওন্ড সিটি থেকে এসেছে-পুরস্কার জেতার লোভে। কিন্তু এর মধ্যোই নিউ সিটির রীতিনীতির সঙ্গে দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছে। সেইজন্যই বন্ধুত্বকে টাকা দিয়ে টেক্কা দিতে চাইছে।
‘কাম অন, প্যাসকে! কাম অন, জিশান! লেট্স গো—’’ প্রথম ছেলেটা অধ্যৈভাবে প্যাসকো আর জিশানকে তাড়া লাগাল।

প্যাসরো অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে-ভেতরে ফুঁসছিল। ওর ভেতরে একটা ভূমিক্প তৈরি হর্রে সেটা রিথ্টির স্কেলে ক্রমশ বাড়ছিল।

এবার বিস্ফেরণ ঘটে গেল।
চোেের পলকে ছেলেটার মাথার চুল বাঁ-হাতে খাবলে ধরল প্যাসকে। এবং ডানহাতে সপাটে এক থাঞ্রড় কষিয়ে দিল গলে।



ওর ডান গালটা আড়াই ইঞ্চি লন্না হয়ে ফেটে গেছে। লালচে গালের ওপরে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে-ধীরে।

ওর চারজন সঙ্গ নানারকম চিৎকার করে উঠল। ওদের মধ্যে একজন প্যাসকোর ওপরে «াঁপিত্যে পড়তে গেল, কিন্তু জিশান কী এক কায়দায় যেন লাথি চালাল। ছেনেটা রেস্ঠোরাঁর মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

বাকি তিনজন বুদ্ধিমান। ওরা প্যাসকো আর জিশানের কাছ থেকে পায়েপায়ে পিছিয়ে গেল।

প্যাসকো কিন্তু প্রথম ছেলেটার চুলের মুঠি ছাড়েনি—এখনও খামচে ধরে রেখেছে। ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় বেঁকে গেছে। হাউমাউ করে চিৎকার করছে। অসহায়ভাবে শৃন্যে দু-হাত নাড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে, বাতাসে সাঁতার কাটছে।

রেস্তোরাঁয় আর যারা ছিল, তারা গোলমাল দেখে চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। রেস্তোরাঁর ম্যানেজার এবং কর্মীরা একপাশে এসে জড়ো হয়ে গেছে।

জোকারের মতো তিড়িংবিড়িং করা ছেলেটার গালে কয়েকটা আলতো চাপড় মারল প্যাসরে। মুথে 'চুক-ূুক’ শব্দ করে বলল, ‘যাঃ, পালা। আমাদ্রর

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## ২৩২ <br> 

দোস্তি বিক্রি নেই। আবার এরকম দুষ্ুম কি কলে একেবারে ফারফোর করে দেব... 1

কथা শেষ করে হত্ভাগা ছেলেটটকে পিছনে ঠেলে দিল প্যাসকো। ছেলেটটা উলটেে ডিগবাজি থেয়ে ছে-সাত হাত দূরে প্পাঁছে গেল। ওর সঙ্গীসাথীরা ওকে তাড়াতাড়ি আগলে ধরল। সোজা করে দাঁড় করাল। কাট গালে রুমাল চেপে ওকে মেরামত করতে চেষ্টা করল। তারপর ক্যান্টিনের বাইরে পা বাড়াল। যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে জিশান আর প্যাসকেকে বারবার দেখছিল ওরা।

এত ইইচই মুজ্জুতির মধ্যেও রেস্তুরাঁর ডেকরেশান বা ফার্নিচারের কোনও ক্ষতি হয়নি। প্যাসকো হাত-পা নেড়ে ম্যানেজারকে ঘটনাটা সবিস্তারে বলছিল।

জিশান রওনা ওওয়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ছিল। ম্যানেজারের সঙ্গে প্যাসকোর কथা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ম করছিল।

ক্যান্টিনের কাচের দেওয়ালের বাইরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। খুব হালকাভাবে মোটরবাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে আসছে। দূরে আধোঙাঁধারির মধ্যে হেডলাইটের ছুটে যাওয়া আলো দেখা যাচ্ছে।

 আছে—’’

জিশান বসল। প্যাসকো ওর মুঢ্ামুথি বসে পড়ন আবার। দু-হাতের চেটো চামড়ার জ্যাকেটে কয়েকবার ঘঠে নিয়ে বলল, ‘নিউ সিটিি; একদম গেছে! খুব কম সময়ে একটা মানুষকে নষ্ট করে দেয়। পলিউশান।’

বেয়ারাকে ইভ্ডিকেটর ল্যাম্প জ্রেলে কাছে ডাকন জিশান। দুটো এনার্জি ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল।

প্যাসকো ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'জিশান, আমি চাই তুমি কিল গেমে জিতে যাও। তা হলে যদি সুপারগেম্স কর্পোরেশনকে ঔুঁড়িয়ে দেওয়া যায়।' সামনে ঝুঁকে এল প্যাসকে। নীছ গলায় বলল, ‘কিল গেমের সব পার্টিসিপ্যান্টকেই আমি খুব খেটে মন দিয়ে মোটরবাইক চালাতে লেখাই। এই আশায় যে, ওরা কিল গেম্মে জিতে যাবে...’ আবার দীর্ঘশ্পাস ফেলল ঃ ‘কিন্ত সেটা হল কই? আমি আশা প্রয় ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু টিভিতে তোমার অ্যাকশান দেখে একেবারে ছাঁ হয়ে গেলাম। মনে হল তুমিই পারবে। ঢুমিই শালা পারবে—’’

বেয়ারা এনার্জি ড্রিঙ্ক সামনে রেথে গেল।
জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—।'

# www.banglabiôk pretf.t千logspot.com 

প্যাসকো মাথা <ুঁকিয়ে ধন্যবাদটা নিল। তারপর বলল, ‘তোমকে তো আগেই বলেছি, গেম সিট্তিতে মোটরবাইক হচ্ছে একটা বড় ওল্যেপন। খুব পাওয়াফুল ওয়েপন। তোমাকে আমি জান দিয়ে শেখাব, জিশান।'

জিশান এনার্জি ড্রিক্কে চুমুক দিল। প্যাসকোও।
জিশান হেসে বলল, ‘সে তো শেখাবে। তার আগে বলো দেখি, তুমি এরকম সুপার বাইক চালাতে শিখলে কোেেকে?’

প্যাসকো ঠোট ছড়িয়ে হাসল। বলল, ‘ছোটবেলা থেকেই আমি মোটরবাইকের পোক। কেন জানি না, শালা বাইক বাপারটাই আমাকে টানত। কিন্তু বাইক কেনার পয়সা ছিল না—কেশেকে থাকবে! বাপটা চাকরি করত বাড়ির কাছেই—নালাগড় কট্ন মিলে। আর আমরা চার-চারটে ভাই-বোন। ভাত-রুটি আর আলুসেদ্ধ-এই ছিল বলতে গেলে ডেইলি মেনু।
‘আমার মোটরবাইক কেনার পয়সা না থাকলে কী হবে, সুযোগ পেলেই পাড়ার দাদাদের বাইকের পেছনেে চড়ে বসতাম। ওদের বাইকগুলো ধোয়া-মোছা করতাম। ওরা আমকে হাত খরচের পয়সা দিত। তাই দিয়ে সিগরেট-বিড়ি «ুঁকতাম, নেশা করতাম।’ একটা বড় শ্বাস ছাড়ল প্যাসকে। ওর চোেে শূন্য দৃষ্টি। ও এখন ফিরে গেছে জীবনখাতার অতীতের পাতায়।
 ছিলাম—তবে বেশ ছিলাম। বিনাপয়সায় মোটরবাইক চড়তাম, গলা ছেড়ে গান গাইতাম, আর সকালবেনায় কটনমিলের মাঠে বন্ধুরা মিলে লোহালকড় নিয়ে ব্যায়াম করতাম।
‘বাইকের দেখভাল করতে-করতে আমি বাইক চালানো শিদ্যে গিফ্রেছিলাম। নিজের থেয়ালেই বইই নিয়ে নানান কসরত দ্রাই করতাম। তখন আমার কত আর বয়েস? বড়জোর যোলো-টোলো হবে। পাড়ার দাদারা আমার বাইক চালানোর তারিফ করত, আর আমি ভেতরে-ভেতরে ফুলে যেতাম।
‘ওরা আমাকে একটা বাইক ধরিয়ে দিয়ে নানান ফরমাশ করত : এখান থেকে ওখানে কোনও চিঠি বা প্যাকেট পাঠানো, কাউকে বাস স্ট্যাড্ডে কিংবা স্টেশনে প্পোছে দেওয়া, মালের বোতল কিনে আনা-আরও কত কী! আমি বাইক চালানোর সুযোগ পেয়ে মনের আনন্দে কাজগুলো করতাম।
'তবে একটা ব্যাপার, জিশান-যতই অভাব থাক, আমি কখনও চুরি করিনি-না বাইকের পার্টস, না বাইকের তেল। শুধু এক বার বাইক চালানোর সুযোগের জন্যে মনটা ছটফট্ট করত।
‘কিন্তু তুমি নিজের মোটরবাইক কিনলে কেমন করে?’ জিশান জিগ্যেস করল।

হাসল প্যাসকো : ‘সেটা একটা থ্রিলিং ব্যাপার। ওনলে তুমি অবাক रয়ে যাবে...।
‘কীরকম?’ কৌতৃহলে প্রশ্ন করল জিশান।
‘আমাদের এলাকায় অনেক দাদা ছিল। তাদের বেশ কয্রেকজনের বাইক ছিল।' টেবিলের দিকে তাক্য়ে ছোট্ট করে হাসল প্যাসকে। পুরোনো কথা মনে করে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল ঃ ‘আর...কী বলব তোমায়...বাইকওয়ালা দাদা হলেই আমি যেন তার কেনা গোলাম হয়ে যেতাম। ওই বাইক চালানোর মওকার লোভে আর কী!
‘তবে দাদাগুলো সবই দু-নপ্বরি লাইনের সজ্গে জড়িয়ে ছিল। বন্ধ কারখানার স্ক্র্যাপ যখন নিলামে উঠত তখন দাদারা সেখানে ডাক চড়াত। সেখান থেকে ভললো নোট আমদানি হত। আমদানির রাতগুলোতে ফুর্তি-ফার্তা হত। ওরা সব বেততলবাজি করত, সল্গে কষা মাংস, পরোট।। মদে আমার কোনও টান ছিল না। মদের গক্ধে আমার উলটি আসত। এর আসল কারণ কী জানো?’

 বেচারি মা!...ওই কাণ্ড দেখে ছোটবেলা থেকেই মদের ওপরে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিন। তো দাদারা ওসব খেত, নিজ্রেদের মধ্যে ইইচই করত...আর আমি একরোণে বসে কষে কষা মাংস আর পরোটা খেতাম। বাড়িতে তো এসব খাবার কथনও ভুটবে না!
‘खুধু স্ক্র্যপপের ডাক নয়, আমাদের পাড়ার বেশিরভাগ দাদাই আর-পঁচচটা কর্ডলাইনে লেনদেন করত। যেমন, ছুরি-বাটলি চালাচালি, ফোর শটার, সাদা ঔঁড়ো, চরস, গঁজা—আরও কতরকম জিনিসের কারবার! এ নিয়ে অন্য এলাকার দাদাদের সঙ্গে দুশমনি ছিল। দু-চারজন মার্ডারও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুরা লাইনে এসব ঝগড়া কাজিয়া তো থাকবেই!
‘বুরা লাইনে লেনলেনের কাঁচা পয়সা আমকে টানেনি। কেন জনো? আমার বাবাট মাল খেত, মা-কে পেটতত, কিন্তু বহুত সৎ ছিল, খাঁটি মাল ছিল। হেভি বড়-বড় স্বপ্ন দেখত। কিন্তু একটা স্বপ্নও সত্যি হয়নি। লাইফে ফেল মেরে গির্যেছিন। তাই হয়রো নিজের ওপরে খেপে থাকত। সেই খ্যাপা রাগটা আমার বেচারি মায়ের ওপরে ঝাড়ত।
‘যাই হোক, আমার অনেক দাদার মধ্যে একজন ছিন রিয়েল দাদা। তার নাম ছিল লালানি। আমরা সবই লানিদা বলতাম। বড়রা বলত, লানি। লানিদা

খুব ডেয়ারডেভিল ছিল। দারুণ মোটরবাইক চালাত। ওকে আমি বাইক চালানোয় আমার গুরু বলে মানতাম।
‘লানিদা বেটায় বেশি ইনভল্ভ ছিল সেটা হল আর্মৃসের বিজনেস। অনেক সময় সেই বিজনেসের কাজে কারও সজ্গে ভেট করতে গেলে মোটরবাইকের পেছনে আমকে বসিয়ে নিত।
‘লানিদার অনেক দুশমন ছিল। তাই সবসময় কোমরের পেছনদিকে মেশিন তঁজে রাখত। ঢেলা জামা পরত-বাইরে ঝুলিয়ে।
‘লানিদা আমায় খুব ভালোবাসত। কখনও চাইত না, আমি ওদের মতো খারাপ লাইনে নামি। তাই সবসময় বলত, "তুই কখনও আমাদের এসব বাজে লাইনে আসবি না। ঢুই ঠিকঠাক একটা বিজনেস করবি, নয়তো কোনও দোকান বসাবি। আমি তোকে কিছু টাকা দেব—।"
'আমি লানিদাকে বলতাম, আমি মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ করব। এ-কথায় লানিদা হেসে বলত, "একদম ঠিক বলেছিস। বাইক সারানোর গ্যারেজ। নাম হবে ‘প্যাসকো বইক ওয়ার্কশপ’। को বলিস?"
‘আমি হাসতাম। বলতাম, "তোমার বাইক আমার গ্যারেজে সারাতে দেবে তো লানিদ?"
"দেব না মানে" ঢারপরই লানিদাক্র এ্রকগাল হাসি।
 সিগরেট থেত। কিন্তু কখনও সিগরেটের প্যােেট কিনত না। দুটো করে সিগরেট কিনত। তার মধ্যে একটা ধরাত, আর অন্যটা জামার বুকপকেটে রেখে দিত।
‘লানিদার এই হাবিটের কথা সবাই জনত। এটা নিয়ে সিনিয়ার কি জুনিয়ার ইয়ারদোস্তরা লানিদাকে মােে-মাঝে চাটত। তো বাইক নিয়ে বেরোলে লানিদার সিগারেট এনে দিতাম আমি। মাঝরাস্তায় কোথাও সিগারেটের তেষ্টা পেলে লানিদা প্রথথমে জামার পকেটের ওপরে হাত চাপা দিত। তারপর সিগরেট নেই বুঝলে বাইক থামাত। আমার হাতে পয়সা দিয়ে বলত, "প্যাসকো, দুটো উইন্স ফিলটার।"
‘লানিদা কোন সিগারেট খায় আমি ভালো করেই জানতাম। কিন্তু দাদার ওই অভ্যেস-সবসময় ব্যান্ডের নামটা বলত।
‘সেদিন পাড়া থেকে অনেক দূরের একটা বাস-স্ট্যান্ডের কাছে লানিদা একজন লোকের সল্গে দেখা করতে গিত্যেছিন। লানিদা যখন ফোে লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল তখন কিছু לুকরো কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। অতে বুঝতে পারছিলাম যে, তিরিশটা ফোর শটার কেনাবেচার ব্যাপারে কথা হচ্ছে।
‘বাস-স্ট্যাভ্ডটা আমি তখন চিনতাম না। পরে জেনেছি ওটা ছিল নাগরা বাস-ট্যাড্ড। ওখান থেকে সব দূরপাল্নার বাস ছড়ে।
‘তো বিজনেসের কথাবার্ত বলতে লানিদা বাস-স্ট্যাড্ড ছাড়িয়ে একটা গলিতে একটা পুরোনো বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। আমাকে বাইরে বাইকের কাছে রেখে গেল।
‘ঘণ্টাখানেক পর দাদা ফিরে এল। দেখলাম খুব বিরক্ত আর রাগ-রাগ ভাব। বাইকে বসে লানিদা আপনমনেই গজগজ করছিল। তার কিছু-কিছু কথা আমি শনতে পাচ্ছিলাম।
"আমার সঙ্গে ছকবাজি করলে আমিও ছাড়ব না। আমার ফোর শটারের বিজনেসে যে পা বাড়াবে তার টেংরি আমি কেটে নেব।...আমাকে বুরবাক পেয়েছে!"
‘আমি পেছননের সিট থেকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলাম, "কী হয়েছে, লানিদা? এত গেপে গেছ কেন?"
""ও কিছু না। ছাড়...।" বলে বাইকে স্টার্ট দিল।
‘বাইক ছুটছিল। আমি চুপচাপ বসেছিলাম। হাওয়ায় চুল উড়ছে। চারপাশে রাত। বাতাসে কারখানার ধোঁয়ার গন্ধ। ছুটে যাওয়া গাড়ির হর্ন। ঝরঝরে রাস্তায় চাক্রর xi্h আমাদের ওভারটেক করে এগিয়ে যাচ্ছিল, আবার পিছিয়ে পড়ছিল। বাইকে বসা লোক দুটোর মাথায় হেনমেট।
‘বারতিনেক এমনি হওয়ার পর আমার একাঁ খটকা লেগেছিল। কিন্তু লানিদার মেজাজের অবস্থা দেখে কিছু বলিনি।
'হঠৎই লানিদা বুক পকেটের ওপরে হাত বোলাল। তারপরই বাইকের স্পিড কমিয়ে রাস্তায় ধারের একটা সিগারেট আর কোল্ড ড্রিংকের দোকানের কছে বাইক সাইড করল। প্যান্টের পকেট থেকে টাকা বের করে আমাকে দিয়ে বলল, "দুটো উইল্স ফিন্টার নে—।"
‘আমি বাইক থেকে নেমে সিগরেট কিনতে গেলাম। আর ঠিক তখনই কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ কানে এল।
‘আমি চমরে উঠে শব্দ লক্ষ্ করে ফিরে তাকালাম। দেথি লানিদা রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। বাইকটা কাত হয়ে পড়ে গেছে রাস্তায়। ওটার ইজ্রিন গরগর করহে। আর কালো বাইক আর সাদা গাড়িটা ছুটে চলে যাচ্ছে দূরে।
‘আমি "লানিদা" বলে চিৎকার করে উঠলাম। গোল্লায় যাক উইল্স ফিল্টার। ছুটে চলে এলাম লানিদার কছে।
‘লানিদার গায়ে অন্তত তিনটে গুলি লেগেছে। কিন্তু সেই অবস্থাতেই লানিদা উঠে বলেছে। ডানহাত পেছনদিকে বাড়িয়ে কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করার চেষ্টা করছে।
'আমি আর দেরি করলাম না। প্রথমে লানিদাকে টেনে দাঁড় করানোর চেষ্টো করলাম। "লানিদ!! লানিদ!!" বলে বারবার ডাকতে লাগলাম। কেন জানি না, আমি লানিদার জন্যে কাঁদতে শুরু করেছিলাম।
'দু-বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে কল্যেকবার টানাহাচড়া করতেই লানিদা অতিকষ্টে "উঃ! আঃ!" করতে-করতে কোনওরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখলাম, ওর কোমরে আর পাজরে রক্ত।
‘তাড়াতাড়ি মোটরবাইকটার কহে গেলাম। ওটাকে খাড়া করে চেপে বসলাম। লানিদাকে বললাম, পেছনের সিটে চড়ে বসতে। বললাম, শক্ত করে আমাকে জাপটে ধরতে।
‘ব্যস, বাইক স্টার্ট দিলাম। তখনই দেখলাম, কালো মোটরবাইক আর সাদা গাড়িটা ইউ-টর্ন নিয়ে আমাদের দিকে আবার ফিরে আসছে। তিনটে হেডলাইট চোখ ধঁধিয়ে জালছে।
‘আমার মাথার ভেতরে কে যেন বলে উঠল, "লানিদাকে বাঁচাতু হবে।"
 আমি বাইক ছুটিয়ে দিলাম। আমার দিকে তেড়ে আসা গাড়ি আর বইকের দিকে। কারণ, ওটই আমাের এলাকায় ফেরার পথ। তা ছাড়া তখন ইউ-টার্ন নিতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। ওই অবস্থায় এক সেকেন্ড বাড়তি সময়ও আমার কাছে মারাত্মক জরুরি।
‘শে-আাঁকাবাঁকা রেখায় আমার বাইক ছুটাছিল অতে সাপের চলার ঢঙও লজ্জা পেয়ে যাবে।
‘রাস্তার পাশের পাথর, গর্ত, ঢিবি এসবের ওপর দিয়ে আমি বাইক চালাচ্ছিলাম। কারণ, মনে হচ্ছিল, এতে আমার বাইক এলোমেলোভাবে লাফাবে, ডানদিকে বাঁ-দিকে ছিটকে যাবে। তাতে ওদের ফায়ারিং-এর নিশানা ফসকে যাবে।
‘ঠিক তাই হল। আমাদের লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাতে লাগল। বাইকে বসা লোকদুটো ফায়ার করতে লাগল। আর গাড়ির ভেতরে বসা দুজন জননলা দিয়ে বাইরে হাত বাড়িয়ে মেশিনের ঘোড়া টিপতে লাগল।
‘গুলির ঘন-ঘন আওয়াজে চারপাশটা কেঁপে উঠল বারবার। আমি সবকিছু ভুলে বডিটাকে বাইকের হাতলের গায়ে প্রায় সেঁটে দিয়ে পাগলের মতো বাইক ছোটতে লাগলাম। হঠাৎই মনে হন আমার ডান পায়ে একটা

## ২৩t www.banglabiôelk prif.billogspot.com

গরম ছাঁাকা লাগল। জায়গাটা জূলতে লাগল। কিন্তু তখন আর পরীক্ষ করে দেখার মতো পরিহ্থিতি নেই। ওধ্বু জানি, আমাকে বাইক ছুট্য়ে উধাও হয়ে যেতে হবে।
‘আধঘন্টা কি চল্লিশ মিনিট পর আমাদের এলাকায় বাইক ঢোকাতে পেরেছিলাম। অন্য দাদারা আমাদের দেখতে পেয়েই ছুটে এসে ঘিরে ধরল। তथनই জান্গ গেল, লানিদা অজ্ঞান হয়ে গেছে।’

জিশান মষ্ত্রমুগ্ধের মতো প্যাসকোর কাহিনি শুনছিন। আর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিনের সেই সতেরো বছরের কিশোরকে খুঁজছিল।

প্যাসকো যে শক্তিশালী সেটা ওকে দেখে বোঝা যায়। কিন্তু ওর মধ্যে যে সততা আর অন্য ওুণগুলো রয়েছে সেগুলোও জিশান এখন দেখতে পাচ্ছিল।

ও যেন নেশার ঘোরে জিগ্যেস করল, 'তারপর?'
'তারপরই তো আসল ব্যাপার-' হাসল প্যাসকে। জ্যাকেটে হাত ঘযল কয়েকবার। একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, ‘্র্রায় একমাস ধরে গাসপাতাল নার্সিংহোম করে লানিদা সেরে উঠল। ওর বডিতে তিনটে গুলি লেগেছিল। আর আমার পায়ে একটা। আমার সেরকম কোনও চোট লাগেনি-শুধু চামড়া আর মাংস ছিंড়েে গিয়েছিন। সাত-দশ দিনের মধ্ধেই আমার পা ঠিক হয়ে গেন। শু একটা দাগ থেকে গেল।
 গিফ্ট করে দিল। আমি আমার জীবনে প্রথমে মোটরবাইকের মালিক হলাম। সব দাদাদhর সামনে লানিদা বলেছিল, "প্যাসকো সেদিন আমার জন্যে যা করেছে সে শালা শোধ হওয়ার নয়। ওকে দেখলেই সবসময় আমার মনে পড়বে, আমি ওর জন্যে বেঁচে আছি।"
‘জিশান, এই হল আমার মোটরবাইক কেনার কাহিনি। লানিদা আমার একটা স্বপ্নকে সত্যি করে দিয়েছিল। তধু তাই নয়, লানিদা আমাকে চল্লিশ হাজার টাকাও দিয়েছিল—মোটরবাইকের গ্যারেজ খোলার জন্যে। আমি পাড়ার মধ্যেই একটা জায়গা খুঁজে বের করে ভাড়া নিয়েছিলাম। তারপর সেখানে সত্তি-সত্যি একটা মোটরবাইক সারাইয়ের গ্যারেজ খুলেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম "প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ"।
‘কিস্তু সবচেয়ে ভালো বাপার কী হয়েছিন জানো? যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল?
'को?'
‘ওই অ্যাকশানের পর লানিদা খারাপ লাইন ছেড়ে দিয়েছিল। থানকাপড়ের ব্যাবসা স্টার্ট করেছিল। ব্যাবসা ওপেনিং-এর দিন লানিদা সবাইকে কবজি ডুবিয়ে খইয়েছিল।'

## www.banglabookpdf.blogspot.com



জিশান প্যাসকেের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মনে-মনে ভাবছিল, মোটরবাইক সারানোর গ্যারেজ খুুে একটা ইয়াং ছেলে দিব্যি করে খাচ্ছিল। দশ-বারো বছর পর সে হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?

জিশানের স্যাটেলাইট ফোন ফ্ল্যাশ করে উঠন। গুনাজি ফোন করছে। দেরি হচ্ছে বলে ও চিন্তায় পড়ে গেছে।

জিশান ফোন ধরে ওকে বলল যে, আর দশ মিনিট—তার মধ্যেই ও ‘ভিজিটর্স ওয়েটিং জোন’এএ গুনাজির কাছে পৌছে যাবে।

ক্যান্টিনের বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ক্যান্টিনের লোকজনও প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে।

প্যাসকো উঠে দাঁড়াল : 'চলো, জিশান—লেট্স গো...'
জিশানও উঠে দাঁড়াল। ক্যা/্টিন থেকে বেরোতে-বেরোতে বলল, - "প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ" তো ঠিকঠাকই চলছিল। তা হলে তার মালিক দশ-বারো বছর পর হঠাৎ কিল গেমে নাম লেখাতে গেল কেন?’

বেশ জোরে হেসে উঠল প্যাসকে। কিছুহ্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল ‘জিশান, ওই ওয়ার্কশপের মালিকটা ছাব্বিশ বছর বয়েসে একটা মেয়েকে বিয়ে করে বসল—সংসারী হল—তোমার মতো... ${ }^{\prime}$
‘তারপর?
 তাকাল। সেখানে তখন কয়েকটা তারা ফুটছে। ওই তারাঔুলোর দিকে তাকিয়ে ও কী থুঁজল কে জানে! তারপর আলতো গলায় ধীরে-ধীরে বলল, 'তারপর... তারপর...বিয়ে করার বছরখানেক পর...ওই লোকটার জীবনে একটা সর্বনাশ ঘটে গেল। সব....কেমন যেন...পানটে গেল।

জিশান কোনও কथা বলল না। চুপ করে রইল।
প্যাসকো পায়ে চলা পথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল তোমাকে সব বলব। আজ, এখন, বলতে গেলে ভীষণ কষ্ট হবে-বিশ্পাস করো...।’

কোনও কথা না বলে জিশান প্যাসকোর হাত ধরল। আলতো করে চাপ দিয়ে বোঝাল, ও বিশ্ধাস করেছে।

আমার প্যাসকো ওয়ার্কশপ ভালোই চলছিল। আর কাজে-অকজজে বাইক চালানোর সুয্োগও মিলছিল -फ্রুর। কাজ নিয়ে আমি বেশ খুশি ছিলাম। পাশাপাশি ব্যায়াম-ট্যায়ামও চলছিল।

আমরা বন্ধুরা মিলে প্লেট টিভিতে নিউ সিটির মারকাটারি খেলাগুলোর

লাইভ টেলিকাস্ট দেখতাম। অনেক সময় নিজেরের মধ্যে বাজিও ধরতাম।
এইভাবে বেশ কয়েেক বছর কেটে যাওয়ার পর আমাকে ট্যাটুর নেশা পেয়ে বসল। সেই শতে হাতে－গায়ে নানান রঙের উন্কি আাঁকনাম। দু－হাত উল্কি आঁকা অবস্থায় যখন ল্লিভলেস জ্যাকেট পরে বাইক চালাতাম তখন নিজেকে বেশ একজন কেউকেটা বলে মনে হত।

আমার বন্ধুদের আরও অনেকে হাতে－পায়ে－বুকে－পিঠে উল্কি আঁকিহ্যেছিল। তদ্দর কেউ－কেউ আবার মোটরবাইকও চালাত। আমরা বন্ধুরা যখন চার－ পাঁচজন মিলে বাইক নিয়ে বেরোতাম তখন ওল্ড সিটির লোকরা আমাদের দেখে ভয় পেত। ভাবত আমরা ‘মোটরবাইক গ্যাং’।

কিন্তু কেন সেটা ভাবত আমি জানি না। কারণ，মোটরবাইক গ্যাংণুলোর দু－একটা বাইকে একটা করে প্ন্যাকার্ড থাকত। সেই প্ল্যাকার্ডে গ্যাং－এর নাম কিংবা লোগো আঁকা থাকত—কিংবা দুটোই। আমার মনে হয়，ঢুমিও এটা দেখেছ। তো আমাদ্রর দলের কারও বাইকে সেরকম কোনও লোগো আঁকা প্ক্যাকার্ড ছিল না। কিন্তু তা সজ্জ্𧰨ে অনেকে ভুল বুঝত।

তুমি তো জানো，জিশান，ওল্ড সিটির নানা জায়গায় এরকম মোটরবাইক গ্যাং घুরে বেড়ায়। তারা পারে না এমন কোনও খারাপ কাজ নেই। লুঠপাট， ডাকাতি，ছিনতাই，রেপ，মার্ডার－এক্রে কাহ্গ এসব নেহতই মামুলি ব্যাপার।
 ওদের নৃশংস তাণ্ব চলে।

এই ধরনের খতরনাক গ্যাং－কে সবাই এড়িয়ে চলে। তাই আমরাও এড়িয়ে চলতাম।

আমার বিয়ের প্রায় মাস ছয়েক পর একবার আমরা চারজন দোস্ত একটা মোটরবাইক গ্যা－এর মুথ্যেমুখি পড়ে যাই। রাস্তার একটা বাঁক ঘুরেইই ওদের সল্গে আমাদের দেখা হয়ে যায়। সোজা রাস্তায় থাকলে আমদের এই প্রবলেমটা হত না। দূর থেকে ওদের দেখামাই্র আমরা চারজন বাইক ঘুরিয়ে সরে পড়তে পারতাম। কিস্তু এক্ষেত্রে সেটা হু না। আমরা মুত্যেমুখি পড়ে গেলাম।

গ্যাংটতে প্রায় আট－দশজন ছিল। তাদর নানারকম বাইক，নানারকম চেহারা। তার মধ্যে তিনটে বাইকের সামনে প্ব্যাকার্ড লাগানো ছিল। প্রায় দেড়যুট লম্বা স্টিলের রডের মাথায় একটা ছইঞ্চি বাই ছইঞ্জি চৌকো মেটাল প্লেট। তার ওপরে লাল রঙের একটা মড়ার খুলি आঁকা। তার নীচে ইংরেজিতে লেখা ‘HELL＇।

আমাদের চারজনকে দেখ্থে দলটা বাইক থামাল－কিন্তু ইঞ্জিন থামাল না। ওদের ইঞ্জিনণুলো গোঁ－গোঁ শব্দ করতে লাগল। যেন অনেকগুলো বাঘ গজরাচ্ছে।

# ২৪२ www.banglabooekpetyf.tologspot.com 

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বুকের ভেতরে একটা ঠাডা স্রোত টের পেলাম।

ふদের দলের যে-লোকটা সবার সামনে বাইক এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার চেহারা ঢেখে পড়ার মতন।

লোকটা যে লম্বা সেটা বোঝা যায় ওর পা দেখে। বাইকের ওপরে বসেও ও অনায়াসে দুটো পা পোঁছে দিয়েছে মাটিতে-যেন খাটো টুল কিংবা মোড়ায় বসে আছে।

লোকটার মাথায় কদমছাঁট চুল। ধবধবে ফরসা মুখে এককণাও গোঁফদাড়ি কিংবা ভুরু নেই। সারা মুখটা মসৃণ, তেলতেলে, সাদা-বেগুনের পোকার মতো। ঠোটের জায়গায় একটা চেরা দাগ। গায়ে লাল টি-শার্ট-তাতে এলোমেলো কালচে ছোপ। তারই মাঝে ইংরেজিতে '১৩' লেখা। পায়ে শতচ্ছিন্ন র্নু জিনস আর কালো স্নিকার। ডান পায়ের জুতোর ওপরে মলের মতো একটা স্টেইনলেস স্টিলের বালা।

লোকটির গলায় কাল্গো সুতোয় গাঁथ নখ আর হাডের টুকরোর মালা।
 হতে পারে। দুটো মালার মধ্যে একটা মালায় লকেট লাগানো-স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি একটা মড়ার মাথা।

লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল ও-ই হচ্ছে ‘হেল' গ্যাঙের লিডার।
লিডারের বাইক ঘা খাওয়া জন্তুর মতো গোঁ-গোঁ করছিল। আর থেকেথেকেই ও বাইকের সামনের চাকাটা শূন্যে তুলে দিচ্ছিল-ছটটফটে তেজি ঘোড়া যেমন মাঝে-মাঝে সামনের পা দুটো শূন্যে ছুড়ে দেয়।
‘হেল' গ্যাঙের অন্য বাইকগুলোও গোঁ-গোঁ করছিল। ওদের সবক’টা বাইকের একঘেয়ে আওয়াজে আমাব বিরক্ত লাগছিল। মনে-মনে চাইছিলাম, আমাদের মতো ওরাও নিজ্রেদের বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে দিক। তারপর আমাদের কিছু বলার থাকলে বলুক। এবং বলার কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাই যার-যার পথে চলে যাক।

ওদের একজন বোধহয় লিডারকে লক্ষ্য করেই বলল, ‘থার্টিন, এখন কী করব?'

বুঝলাম, লিডারটার নাম ‘থার্টিন’। সেইজন্যেই ওর ময়লা ছোপ লাগা টি-শার্টে '13' লেখা।

থার্টিন ছোট করে ডানদিক-বাঁ-দিক মাথা নাড়ল। আমি ভাবলাম বোধহয়

মাথা নেড়ে ‘না’ বলছে কাউকে-কিংবা হয়তো আমাকেই। কিন্তু একাু পরে বুঝলাম, না, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়াটা ওর মুদ্রাদ্যেষ।

আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল থার্টিন। ওর ছোট-ছোট চোখ অনেকটা সাপের চোখের মতো লাগছিল।

তারপর থেমে-থেমে জিগ্যেস করল, ‘তোমরা কোন গ্যাং?’
आমি বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছপিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, আমরা কোন গ্যাং নই। আমরা চারজন বন্ধু। আমরা এমনি বাইক নিয়ে বেরোই...।’

বিকট শব্দ করে রাস্তায় থুতু ফেলল থার্টিন। বাইকের ইঞ্জিন অফ করে বাইক থেকে নেমে পড়ল। ওটকে স্ট্যণ্ডে দাঁড় করির্যে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এবার ঠিকঠাক বোঝা গেল ও কতটা লম্বা এবং চওড়া।
নিজের বুকে হাত ঘষল থার্টিন। ওর ডান হাতের আঙুলে তিনল' মেটালের আংটি চোেে পড়ন।

কয়েকটা পা ফেলে ও আমার বাইকের কাছে এগিয়ে এল।
আমি বাইকে বসেই ছিলাম-বাইক ছেড়ে নামিনি।
ঠাল্ড ঢোথে আমার দিকে তাকিয়ে থার্টিন বলল, 'গ্যাং তৈরি করেছ, কোনও নেমপ্লেট লাগাওনি।’

आমি ক্রানও ঝাগডাঝাঁাটি কিংবা মাবপ্পিট চাইছিলাম না। স্জার সেরকম
 তা ছাড়া, এই মোটরবাইক গ্যাংুুেোর সল্গে নানারকম অস্ত্রশস্్্র থাকে। তাই ওদের বাইকের কেরিয়ার কথনও খালি থাকে না। উলটোদিকে আমরা নেহাতই নিরস্ত্র নিরীহ পাবলিক। হিসেবমতো হেল গ্যাং-কে আমদের ভয় পাওয়ার কথা।

কিন্তু আমি মোেটে ভয় পাইনি। আমার বাকি তিন বন্ধুও তাই। আমরা বাইক চালানোর আনন্দে, পথে ঘুরে বেড়ানোর খুশিতে, ঘুরে বেড়াই। এটাই আমাদের স্বধীী পাগলামে।

যে-মেয়েেির সঙ্গে আমার ভাব হয়েছিল ওর নাম ছিল মেহেন্দি। আমি ওকে 'মাহি' বলে ডাকতাম। ওকে যখন বিয়ে করি তখন কথা দিয়েছিলাম, ওর সঙ্গে কখনও আড়ি করব না। আর ও যদি কখনও কোনও কারণে আমার সল্সে আড়ি করে, তা হলে আমি জোর করে ভাব করে নেব।

আমার বইকের নেশার কথা মাহি ভালো করেেই জননত। তাই বিয়ের পরেও আমার এই স্বধীন পাগলামমায় কখনও ও বাধা দেয়নি। তবে সবসময় বলত, রাস্তাঘাটে ঝামেলা মারপিট এড়িয়ে চলতে। তা না হলে ও আমার সজ্গে আড়ি করে দেবে।

হেন গ্যাঙের লিডরের সঙ্গে কথা বলার সময় মাহির কথা আমার মনে ছিল। তাই খুব শান্তভাবে জবাব দিলাম, ‘বললাম যে, আমরা কোনও গ্যাং নই।

তাই আমাদের কোনও নাম নেই। কোনও নেমপ্লেট নেই...।'
আমার কথা শুনে থার্টিনের ঠোঁটের চেরা দাগটা একটু চওড়া হল। নাকের দুপাশে দুটো ভাঁজ পড়ল। তার মানে থার্টিন হাসছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও বলল, 'স্-সালা ডরপোক!’
ওর গলার আওয়াজটা কেমন যেন চাপা 水সফেসে।
উত্তরে আমি কী বলব ভেবে পেলাম না। একটা কথ্থ যদি সত্যি হয় তা হলে যে সেটা অনেকবার বলতে হবে, এমনটা আমার জানা ছিল না। তাই反ু করে প্রতিদ্দন্দীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার তিন বন্ধুও চুপ করে রইল।

সময়টা বিকেল। রাস্তায় লোকজন চলাফেরা করছে। গাড়ি, সাইকেল, বাস, সাইকেল ভ্যান ব্যস্তভাবে ছুটে যাচ্ছে। যদিও রাস্তার করুণ অবস্থার জন্য ‘ছুটে’ যাওয়াটা অনেকটা ‘হেঁটে’ যাওয়ার মহো দেখাচ্ছে। কোনও গাড়ি জোরে ছোটার চেট্টা করলে তাকে শূন্যে লাফিয়ে উঠে মাখল গুনতে হচ্ছে।

রাস্তায় এতগুলো বাইক জড়ো হয়ে যাওয়ায় বেশ ভিড় জমে গেছে। কিন্তু ভিড়ের লোকজন মোটরবাইক গ্যাংদ্রর ভালো করে চেনে। তাই ওরা একটা ভয়-পাওয়া দূরত্ব বজায় রেখ্থো

জায়গাট্ যানজটের চেছারা নিয়েছি্লে বেশ কয়েকটা গাড়ি আর বাস
 করে জটলাটা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাদের চারপাশে জমায়েত হওয়া লোকজনের বেশিরভাগই ভিথিরি কিংবা ঝুপড়িবাসী। অন্তত তাদের পোশাকআশাক দেণ্যে তাই মনে হল। তুমি তো জানো, জিশান, শতচ্ছিন্ন শহরটায় এরকম বাসিন্দাই বেশি। হয়তো আমিও তার মধ্যেই পড়ি।

জটলার বৃত্তে একটা ইয়াং মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফরসা, ছিপছিপে। পরনে হলদে আর বাদামি রঙের নকশা কাটা চুড়িদার। সঙ্গে একজন ছেলে-বন্ধু।

ছেলেটের চুল জেল মাথিয়ে ঐমনভাবে সেট করা যে, প্লাস্টিকের নকল দूল বলে মনে হচ্ছে। গায়ে একটা কালো টি-শার্ট আর র্নু জিনস।

হেল গ্যাঙ্র সবচেয়ে পেছনে থাকা লোকটা হঠাৎই ওর বাইকটা নিয়ে মেয়েোকে তাক করে তেড়ে গেল।

মেয়েটে চমকে লাফিয়ে সরে যেতে চাইল। সরে ও গেল বটে, কিন্তু তাড়াহ্হড়ো করে সরতে গির্যে রাস্তায় পড়েও গেল।

মেয়েটার করুণ অবস্থা দেত্থে হেল গ্যাঙের চার-পাচজন হো-হো করে হেেে উঠল। হাসতেই লাগল। ইঞ্জিনের গরগর ছাপিয়ে ওদের হাসির হররা চলতে লাগল।

আমি ওদের কদাকার বিচিত্র চেহারাগুলো দেখছিলাম। কারও মাথা ন্যাড়া, কারও মাথায় খাবলা-খাবলা চুল। ভুরুতে, কানে, চেখের নীচে সোনার আংটা লাগানো। ঘাড়ে, গলায়, হাতে নানান উলকি আঁকা। তার মধ্যে একজনের গলায় আবার একটা খয়েরি রঙের সরু সাপ জড়ানো।

যে-লোকটা বাইক নিয়ে অসভ্যতা করেছিল সে বাইকের ওপরে প্রায় শুয়ে পড়ে ঝুঁকে ওর লোমশ হাত বাড়াল মেয়েটার দিকে। হাসতে-হাসতে বলল, ‘এসো, হাত ধরো, সোনামণ...।’

মেয়েটার ছেলে-বন্ধু কিন্তু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেনি। মেয়েোকে তোলার জন্যে ও উদ্দ্যোগ নিয়েছিল। বাইক গ্যাের নোংরা লোকটাকে ওর বান্ধবীর দিকে হাত বাড়াত দেত্থে ও থেপে গেল। একটা গালাগাল দিয়ে লোমশ হাতটাকে ও এক ঝটকায় চেলে সরিয়ে দিল।

সঙ্গে-সল্গে বাকি ঘটনাগুলো ঘটে গেল।
লোমশ হাতের মালিক এক ছোবনে ছেলেটার চুলের মুঠি চেপে ধরল। তারপর বাইক চালিয়ে দিল।

বাইকের গর্জন, ছেলেটার চিৎকার সবার কানে তালা ধরিয়ে দিল। মেয়েটঁও কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে ‘বাঁচাও! বাঁচাও!’ বলে চিৎকার করছিল।



একটা বাইক-গুভা বাইক নিয়ে মেয়েটার দিকে তেড়ে গেল। মেয়েটা ভয়ে চিৎকার করে তাড়াতাড়ি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। বোধহয় পালিয়ে বাঁচতে চাইল।

এদিকে ছেলেটার বডি রাস্তায় ছেচচড়ে-ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। কখনও-কখনও গরম সাইলেন্সার পাইপ ওর গা়্ে ঠেকে যাচ্ছিল। তাই ওর যন্ত্রণার চিৎকার কিছুতেই থামছিল না।

এতসব ঘটনা ঘটে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু একটা জিনিস আমকে অবাক করল। পেছন থেকে এত চিৎকার, চেচচামেচি, ইইচই শোনা গেলেও থার্টিন একবারও পেছ্ন ফিরে তাকায়নি—ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে ছিল আমার দিকেই।

আমার গোটা শরীরটা জ্বালা করছিল। বেশ বুঝতে পারছিলাম। গায়ের চামড়া যতটা মোটা হলে এসব নোংরা ঘটনা চোখের সামনে দেখেও দিব্যি নির্বিকার থাকা যায়, আমার চামড়া ততটা মোটা নয়।

আচ্ছ, মেহেন্দি यদি এখান হাজির থাকত তা হলে কী হত?
কী হত আমি জানি। কোনও বিপদ-আপদ কিংবা ভয়ের তোয়াক্কা না করে ও মেয়েটারে বাঁচাত দসুগুলোর ওপরে বাঁপিয়ে পড়ত।

থার্টিনের সাদাটে মুত্থে দিকে তাকিয়ে আমার মাথার ভেতরে একটা

## 284 www.banglaboêkplif.biogspot.com

সুইচ হঠাৎই অন হয়ে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরটা শদ্ট সার্কিট হয়ে গেল।

आমি বাইকে স্টার্ট দিয়ে ক্লাচ-গিয়ার দিকে যষ্ত্রঢাকে ছুটিয়ে দিলাম।
এত আচমকা ব্যাপারটা ঘটল যে, থার্টিন থতমত থেয়ে গেল। আমাব এই বোকা-বোকা সাহস আর আস্পর্ধার জন্যে ও মেটেই তৈরি ছিল না।

আমার বাইক ছুটে গিয়ে যে ওর তলপেটে আঘাত করল শুধু তই নয়, বাইকের গতি আর সংঘাত ওর লন্বা শরীরটাকে উঠিয়ে দিল আমার রাইকের হাতলের ওপরে।

সেই অবস্থাতেই আমি জেরে বাইক চালিয়ে দিলাম। থার্টিনের মুখ দিয়ে এককণা শব্দও বেরোল না। নিজেকে বাঁচাতে ও একহাত বাইকের হাতল आঁকড়ে ধরল, আর-এক গাতে আমার শরীর আর পোশাক খামচে ধরতে চাইল।

জনতার মুখ থেকে তুমুল ইইচই শোনা গেল। থার্টিনের দলের অন্য বাইক-Эুডাুলো হুপচাপ বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল-কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। যে-বাইক-ษুভাটা নিরীহ ছেলেটটকে চুলের মুঠি ধরে ঘোরাচ্ছিল, সে সর্দরেরের এই অবস্থা দেখে বাইক থামিয়ে ফেলেছে এবং ছেনেটারেও ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু আমি ছাড়িনি। থার্টিনকে বাইকে চাগিয়ে পাগলের মতো ছুটে

 আচমকা ব্রেক কষলাম। থার্টিনের বডিটা সাত হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

তখনই আমার প্রথম মনে হল, এ আমি কী করলাম। আবেগের মাথায় সাহস দেখাতে গিত্রে আমি বোধহয় নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করে বসে আছি।

একটু পরে বুঝলাম, মৃত্যু পরোয়ানা নয়, অর্ধ-মৃত্যু পরোয়ানা।
থার্টিন আর তার আট সঙ্গী মিলে আমদের চারজনকে প্রচণ মারধোর করল। ওদের সজ্গে লোহার রড আর স্টিলের পাঞ্চ ছিন। সেই অস্ত্রণুো ওরা আমাদের ওপরে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করল। নেহাতই দয়া করে ছুরি-টুরি কিংবা রিভলভার ব্যবহার করেনি।

आমি অজ্ঞান হর্রে গিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম, আমার এক বন্ধু জনার্দনও সেপ্সলেস হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের ফেনে রেখে হেল গ্যাঙের গুডগুলো চলে যাওয়ার পর পাবলিক আমাদের হেল্প করার জন্যে হাত বাড়ায়। চোখেমুখে জলের ছিটে দিয়ে ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা করে ওরা আমাদের পাড়ায় প্পৗঁছে দেয়।

থার্টিনদের রোষে পড়ে আমাদের বাইকণুলোও অল্পবিস্তুর ড্যামেজ হয়েছিন। সেগুলো সাইকেল ভ্যানে চাপিয়ে পাড়ায় নিয়ে আসতে হয়।

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## www.banglabiobfeptat.biogspot.com

না, জিশান, এভবে মারধোর খেয়ে আমরা কিন্তু ভেঙে পড়িনি। বরং আমার মনে একটা স্বপ্ন উঁকি দিচ্ছিল। অবশ্য স্বপ্ন না বলে সেটটকে দুঃস্বপ্নও বলা यায়।

ঠিক করলাম, আমরা বন্ধুরা মিলে একটা মোটরবাইক গ্যাং তৈরি করব। তার নাম হবে ‘অ্যান্টি-মোটরবাইক গ্যাং’-সংক্ষেপে এ-এম জি। আমাদের গ্যাঙের কাজ তো তার নামেই স্পষ্ট! অর্থাৎ, আমাদের কাজ হবে মোটরবাইক গ্যাঙের গুভাগর্দি রুখে দেওয়া, ওদের টরচার আর ক্রুইমের হাত থেকে ওন্ড সিটির মানুষকে বাঁচনো।

আমরা প্রায় ছ’মাস সময় নিলাম। ওই সময়ে নিজেরা তৈরি হলাম। কিছু অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করলাম। আরও চারজন বন্ধু দলে জুটে গেল। সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করলাম, আমাদের এ-এম-জি দলের লক্ষ্য কী। को হতে পারে তার ম্যানিফেস্টো।

এ-শহরের নানান জায়গায় আমরা টহল দিয়ে বেড়াব। কোনও মোটবাইক গ্যাংকে ক্রাইম করতে দেখলে আমরা রুৃ্থ দাঁড়াব, বাধা দেব। এ-কাজে অতি অবশ্ৰ আমরা পাবলিকের সাপোর্ট পাব।

প্রথমে আমরা প্রুর ঘোরাঘুরি করে শহরের মোটরবাইক গ্যাণুুলোকে
 थেজ্খবর निয়ে তথ্য জ্জোগ় করতে লীগলাম পর আমরা তৈরি হয়ে রাস্তায় নামলাম।

না, আমাদের কোনও নেমপ্রেট ছিল না। তবে আমদের আট্জনের পোশাক ছিল একইরকম—সবুজ টি-শাৰ্ট, আর কালো প্যান্ট।

আমরা সপ্তাহে দু-তিনদিন রাস্তায় টহল দিতে বেরোতাম। আমদের টহলের নির্দিষ্ট কোনও রুট ছিল না, সময়ের নিয়ম ছিল না কোনও। আমরা আটজন যখন একসঙ্গে সময় মেলাতে পারতাম, তখনই আমরা নজরদারিতে বেরোতাম।

মেহেন্দি আমাকে এ-কাজে ভীষণ সাপৌট্ট দিয়েছিল। থার্টিনদের সঙ্গে অ্যাকশনের পর যখন বাড়ি ফিরেছিলাম তখন আমার অবস্থা দেখে মাহি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমি সেরে ওঠার পর ও বলেছিল, 'ুুমি প্রেটেস্ট করে ঠিক করেছ। প্রোটেস্ট করার লোকজন তো দিন-কে-দিন কম্ম যাচ্ছে...।’

মাহির কাছ থেকে আর পাড়াপড়শিদের কাছ থেকে ব্যাপারটা নিয়ে এত সাপোর্ট পেলাম যে, আমাদের আটজনের কেউই পেছিয়ে আসার কথা আর ভাবল না। সুতরাং ছঢা মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর এ-এম-জি মাঠে নামল। আমার ‘প্যাসকো বাইক ওয়ার্কশপ’ যেমন চলতে লাগল, তার পাশাপাশি এটাও। আমরা আটজন সব লোকজনকে জানান দিয়ে সবুজ জার্সি’ পরে অপারেশানে

বেরিয়ে পড়তে লাগলাম। কখনও সকালবেলা, কখনও দুপুরে, কিংবা বিকেল, সন্ধে, অথবা রাতে।

এইরকমভাবে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় দু-মাস পর থার্টিনদের সঙ্গে আমাদের দেथা হল।

সময় তখন সকাল সাতটা। ওল্ড সিটি থেকে বাইরে চলে যাওয়ার যেতিনটে ইন্টারসিটি রাস্তা আছে তার দু-নম্বর সড়কটায় আমরা টহল দিচ্ছিলাম।

এর প্রথম কারণ দু-নম্বর ইন্টারসিটি হইওয়েটার একদু বেশি বদনাম আছে। এই রাস্তাটায় খুন-জখম-রাহাজানির মাত্রাটা বড্ড বেশি। আর সবক্ষেত্রেই ক্রিমিনাল হচ্চে কোনও-না-কোনও মোটরবাইক গ্যাং।

দু-নম্বর সড়কটা যে মোটরবাইক গ্যাপ্দের বেশি পছন্দ, তার কারণ আছে। সেটা হলন, সড়কটার একদ্দিকে ঘন জঙ্গল, আর অন্যদিকে নদী। এতে অপরাধীদের পালিয়ে যাওয়ারও যেমন সুবিধে, তেমনই লাশ লোপাট করতেও আামেলা কম। অনেক সময়েই দেখা যায় নীচে, নদীর খাতে, অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া গাড়ি উলটে পড়ে আছে।

দু-নম্বর সড়কটা যে আমরা বেছে নিয়েছিলাম, তার আরও একটা কারণ ছিল। সৌা হন্, গত একমসে এই রাস্তায় মোটরবাইক গ্যাংরা সাত-সাতটা

 থেকে আমরা থবর পেয়েছিলাম বে, একটা মোটরবাইক গ্যাং ভোরবেলার দিকে দু-ন্বর ইন্টারসিটির দিকে গেছে।

দু-নম্বর সড়কে দুকেই চোথে পড়ল কতকগুলো রং-চটা হোর্ডিং। তাত সাবধানে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে বেশ কয়েকটি সতর্কতার কথা লেখা রয়েছে। আর জ্ঞানসূচক বাণীমালার একেবারে নীচে বড়-বড় হরফে লেখা : গাড়িকে অবশ্যই মানুষ মারার অস্ত্র ভাববেন। বাক্যটির শেবে নিশয়ইই ‘না’ কথাটা লেখা ছিল, কিন্তু রং চটে যাওয়ায় সেই গুরুত্বৃপূর্ণ শব্দটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটা সুদীর্ঘ ময়াল সাপের মতো হাইওয়েটা ওয়ে আছে। তার জায়গায়জায়গায় ছোট-বড় ক্ষতচিহ্তুলো ময়াল সাপের গায়ের নকশা।
đাঁ-দিকে তাকালে ঢোেে পড়ে সূর্শ। সেই আলো নদীতে পড়েছে, রাস্তায় এসে পড়েছে। ডানদিকে চোখ ফেরালে ঘন জগ্গল। মনে হচ্ছে, গাছপালাগুলো হেঁটে এগোতে গিয়ে রাস্তাটাকে সামনে পেয়ে বাধ্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। নইলো ওরা হেঁটে-হেঁটে নদীর ঠিক পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াত।

হইইও্যের পাশে কোথাও-কোথাও বিকল ট্রাক দাঁড়িয়ে। আবার কখনও চোেে পড়হে অ্যাপ্সিডেন্টে বেঁকেমুরে তুবড়ে যাওয়া গাড়ি। এ ছড়া রয়েছে পরিত্যক্ত কয়েকটা টিনের চালাঘর—হয়তো কোনওকালে দোকান-টোকান ছিল।

## ২<० www.banglabrofk petyffologspot.com

রাস্তা ধরে বেশ কয়েক মাইল এগির্যে যাওয়ার পর দূরে এক্া নীল রঙ্ের গাড়ি ঢোখে পড়ল।

হাইওয়েতে গাড়ি চোথে পড়াটা মেটেট অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তার পশে, মাটির ঢলেের ওপরে। যে-ঢলটা জঙ্গ লে গিত্যে মিশেছে।

গাড়িটাকে ঘির্র কয়েকটা মোটরবাইক দঁাড়িয়ে রয়েছে। আর কয়েকটা বাইক গাড়িটাকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছ। আহত শিকারকে ঘিরে চিতাবাঘ যেমন ঘুরপাক খায়।

আমি হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করলাম। তারপর আমরা বাইক সাইড করে ঢাল বেয়ে নামিয়ে দিলাম। জभল ঘেঁয়ে যব্র্রতুলো দাঁড় করালাম।

গাছের আড়াল থেকে আমরা ব্যাপারটা লক্ষ করত়ত লাগলাম। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম নীল গাড়িটাকে ঘিরে রোন কর্মকাণ চলছে।

তৃবু তাই নয়। বিরাট লম্বা আর চওড়া একটি লোককে ঢোেে পড়ল।



লোকটাকে আমি অল্পবিস্তুর আঁচ করতত পারহিলাম। আর ঠিক তখনই ‘হেল’ গ্যাঙের সাইনবোর্ডটা আমার চোবে পড়ল।

থার্টিন আর তার দলবল দু-নম্বর ইন্টারসিটি হইওয়ের ওপরে শিকার ধরেছে।

ঢপা গলায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করে নিলাম।
আমরা আট্জন বাইক নিয়ে থার্টিনদের ওপরে ঝোড়ো বাতাসের মতো «াঁাপিয়ে পড়ব। ওঢের ছত্রভন্গ করে .দেব। আর বাইক থেকে কিছুতেই যেন আমরা না নামি-বা পড়ে না যাই। কারণ, আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র নেই—গতিই আমাদের একমাত্র অা্্ত্র।

আমদের আট্টা বাইক প্রায় একইসসল্রে স্টার্ট নিল। খ্যাপা यাঁড়ের মজো গোঁ-গগাঁ করতে-করতে উঠে এল হাইওয়ের ওপরে। তারপর ‘অকুস্থ' লক্ষ্য করে ছুটত্ খরু করল।

হাই এনার্জি সাইক্রোের মতো আমাদের আটটা বাইক চোেের পলকে থার্টিনের দলের ওপরে আছড়ে পড়ল। ওদের মধ্যে একজন একটা মোটা নলের শটগান বের করে ফায়ার করল। আমার দলের একজন ‘ওঃ!’ আর্তনাদ করে চলষ্ত বাইক থেকে ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ওর বাইকটা পাগলের মতো ছুটে

গিয়ে নীল গাড়িটার াঁ-দিকের হেডলাইটের কছে ধাক্কা খেল। লাফিয়ে দেবার পালটি থেয়ে থার্টিনের দলের একটা বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটাল। তারপর দুটো বাইক লাট খেয়ে রাস্তার ঢাল বেয়ে পড়ে গেল।

নীল গাড়িটকে ঘিরে একনা ডামাডাল eরু হর্যে গেল। বাইকের গোঁ-রগাঁ শব্দে সকালবেলার বাতাস অস্থির হয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠতত লাগল।

থার্টিন আఫ়রর্ম্নর চেট্টায় ছুটে ওর বাইকের কাছ় গেল। বাইকটা রাயায় কাত হর্রে প:ড় ছিল। সেটাকে দাঁ়় করিয়ে লাফিয়ে বাইকে উটে বাইক ছুটিয়ে দিল।

আমি বুকের ভেতরে গনগন্ে রাগ নিয়ে ওকে তড়া করলাম। তার আগে এক্মলক দেখলাম, থার্টিন্নে দনের অন্যান্যরা হঠাৎ এই ঝোড়ো আক্রমণের চাপে পড়ে ছত্রভস্গ হয়ে পালাচ্ছে। ওদ্রের একটা সোর্ড আর একটা শটোন রাস্তায় ছিটকে পড়েছে। নীল গাড়িটা সুর্যাগ বুঝেে স্টার্ট নিয়ে চলতে শরু করেছে। গাড়ির ভেতরে পুরুষ মহিলা মিলিয়ে চার-পাচজন বসে আছছ।

থার্টিনের বাইকের স্টিয়ারিং-এ বোধহয় কোনও গঔগোল হয়ে থাকবে। কারণ, ওর বাইকটা বারবার টাল খে<্যে মাতালের ময়ো এঁকেবেঁকে ছুঢছিল। আর আমাদের মধ্যে দুরত্ব ক্রমশ কমছিল।
 দ্রাক।

রাস্তায় গর্ত আর খানাখन্দ থাকায় ট্রাকটা বিপজ্জনকভাবে ডানদিক বাঁ-দিকে টাল খাচ্ছিল। দ্রাকটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরর্ধে সরে যেয়ে হলে হইওয়ের একেবারে বাঁ-দিক ঘ্রেষে বইক চালাতে হয়। তো আমি তাই করলাম। যতটা পারলাম বাঁ-দিকে সরে গেলাম। কিক্তু বেশি সরে গেলেই হালকা আগাছার ঝোপ আর ঢাল-নীচে নদীর দিকে গড়িয়ে গেছে।

থার্টিনও আমার মতো সাবধান হয়েছিল। তাই ওর বাইকটা ক্রমশ বাঁ-দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কিত্তু ওর কাছাকাছি এসে যাওয়া ফুল পাঞ্জাব ট্রাকটা হঠাংই খাড়া অবস্থা থেকে দশ-পনেরো ডিগ্রি হেলে গেল।

থার্টিন ভয়ে চিৎকার করে উঠল। ওর বইক াঁ-দিকে আগাছার बোপের দিকে ছুটে গেল। अধু ছুট্ট গেল নয়, তার ফাঁক দিয়ে ছুকে ঢাল বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চলল। ও প্রাণপণ চেষ্টা করেও বাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বাইকটাকে সামাল দিতে পারছিল না।

आমিও ঢাল বেয়ে বাইক নামিয়ে দিলাম। গগাঁ-গোঁ আওয়াজ করে আমার মোটরবাইক থার্টিনের মেশিনেন দিকে ছুটে চলল। তারপর আমি যা চাইছিলাম তা হন। দুটো মেশিনে প্রবল সংঘর্ষ হল। ওর বাইকের পেটের

## २ब२ www．banglab̄ook petf．$\ddagger$ togspot．com

 কাছাকাছি জায়ায় ধাকাট লাগन।


 থেকে জমিতে পড়ে ওর অবश্থ৷ও হল ওর বাইকের মতন। গড়িহ্রে－গড়ি়্র পঢ়ে গগन नीढ़।

আমার বাইক কিঙ্ঠ তথনও দ্－চাকার ওপরে ছিন। आমি কসরু করে ওটারে ঢালের ওপরে চালাচ্ছিলাম। आँকাবাঁকা পথে ওটাক নদীর পাড়ে নামিয়ে


থার্টিন ভে তেমন ঢোট পায়নি সেটা বুমడে পারলাম তথনই। লেখলাম，


आমি বাইক নিভ্যে ওকে তড়া করনাম।
 আমাকে লক্ণ করে চুঢ়ে মারল। जারপর আবার দেড়়ত লাগল।

পাথরটা আমার cেশ ক＜্য়ক হাত দूর দিত্রে 巨িট্টে গেল। आমি বাইক
 भाড़िך ठानाढ़ नाभनाम



आমিও স্টিয়ারিপ মুরির্যে ওর পিছू নিলাম বট，কিন্ুু বুমলাম，ওর বুদ্ধির কাহে आমি হেরে গোি।

यা ডেরেছিনাম তই হহ। थার্টিন নদীর জনে নের্ পড়ল। ছপছপ করে পা কেলে প্রাম কে小ের জলে চলে গেল।

দूশাটে আমার খুব অলৌকিক লাগছিন।
आমার গা্যে মাথায় রোদ। নদীর জলের গক্ধ। হালক বাতস। দूরের গাएপালার সারি। नाম－না－জানা भাথির ডাক। মাথার ওপরে আকাশের নীল।

এই রোমাদ্টিক পরিবেশে আমার পালে মাছি যদি থাকত ঢা হলে দার্ণ नाগす।




आমি অসহায়াব বাইকে বলে রইলাম। থার্টিন চথন মুথ বিকৃত করে

বলছে, আমাকে কবজায় পেলে ও কী হাল করে ছাড়বে। আমার নকশা ও বদলে দেবে। আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

আমি শুধু ওকে বললাম, যেখানেই তোমার গ্যাং-কে আমরা পাব, সেখানেই রুখে দেব। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—যেখানেই হোক।

থার্টিনের সঙ্গে নিশ্চয়ই কেনও রিভলভার কিংবা শটগান ছিল না। থাকলেে ও অবশ্যই আমাকে খতম করে দিত। তাই ও ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বড়-বড় শ্ব্যস ফেলে হাঁপাচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ আমরা একইভাবে স্থির রইলাম। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না এখন কী করব। আমার বন্ধুরা যদি আমাকে এখানে দেখতে পেয়ে নেমে আসে তা হলে হয়তো কিছু একটা করার কথা ভাবা যায়।

আমার পকেটে রাখা মোবাইল ফোন বাজছিল। কিন্তু আমার তখন ফোন ধরতে ইচ্ছে করছিল না। আমি যেন একটা ঘোরের মধ্যে থার্টিনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

হঠাৎই পেছন থেকে বাইকের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে চিৎকার।

থার্টিন সঙ্গে-সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর ওপার লক্ষ্য করে সাঁতার কাটতে শুরু করল।
 মোটরবাইক। ওপরে হাইওয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ডাকছে, হাত নাড়ছে।
'প্যাসকো! প্যাসকো!'
আমি হাত নেড়ে ওদের নেমে আসতে বললাম। একইসঙ্গে থার্টিনের আচমকা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার কারণও বুঝতে পারলাম।

বন্ধুদের কাছে জননতে পারলাম, আজকের অপারেশানে এ-এম-জি জিতেছে। আমাদের দলের দুজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছে-তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়। আর ‘হেল’ গ্যাঙের একজন গুন্ডা ভালোরকম চোট পেয়েছে। তার বডিটা জঙ্গলের মধ্যে গাছের আড়ালে শোয়ানো আছে। আর বাকি গুন্ডাগুলো পালিয়েছে।

থার্টিনের দিকে তাকিয়ে দেখি, ও তখন সাঁতরে অনেক দূরে চলে গেছে।
আমরা বাইক নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম।
হইইওয়েতে উঠে দেখি সেই ফুল লোড ট্বাকটা রাস্তার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে। তার মালপত্র ছড়িয়ে ছত্রখান হয়ে গেছে: ইস্পাতের তৈরি ছোটছোট মেশিনারি পার্ট্স। সেগুলোর ওপরে রোদ পড়ে ঝকঝক করছে। কাত হয়ে থাকা ট্রাকটার জন্যে ইন্টারসিটি হাইওয়ে জ্যাম হয়ে গেছে।

## www.banglabô̂kplaf.tø̋ogspot.com

আমরা সবই বাড়ি ফিরলাম বটে, কিত্তু থার্টিনের হুমকির কথা আমি ভুলতত পারছিলাম না।

রাতে মেহেন্দিকে আমি সকালের সব ঘটনা খুলে বললাম। ও ঔেে আমার গালে একঢা চুমু গেল। বলল, ‘ঠিক করেছ। লাইফে পভিটিভ কিছু করা দরকার—’’

কিন্ত থার্টিনের একটা কথা আমার মনে কাঁটা হয়ে খচখচ করছিলঃ আমার ফ্যামিলিকে ও থ্থঁতলে পিষে লেই বানিয়ে ছড়বে।

বিয়ের আগে মোহেন্দির সঙ্গে আমি প্রয় দু-বছর মিশেছি। আমার পছন্দঅপছন্দ অভ্যাস সবই ওর জানা। সবকিছু জেনেই ও আমার সঙ্গে মিশেছিল। আমার বন্ধুদের সবাইকেই ও চিনত। আমাদের ঘরে কখনও-কখনও চায়ের আসর বসত। সেই আসরে নানান বিষয়ে তর্কাতর্কি হত। যেমন, কোন উলকির নকশা ভলো, আর কোনট্ খারাপ। নিউ সিটির হইফফই রিসকি গেমগুলোর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে খতরনাক। নিউ সিটির গেমে নাম লিথিয়ে টাকা জেতার চেষ্টা করা উচিত কি না। মাট্রবাইক গ্যাংগুলোরু স্ত্বে ঠিক কীভাবে আমাদূর ফাইট কর উ

এইসব আলোচনার সময় মেহেন্দিও আমদের সঙ্গে গলা ফাটাত, মতামত দিত।

সেইসব হুল্লোড় আর তর্কাতর্কির সময় একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছিলাম : নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার ব্যাপারে ওর ঘোরতর আপত্তি ছিল। ও বলত, মননষকে গিনিপিগ বানিয়ে তকে নিয়ে নানান ডেঞ্জারাস খেলা খেলিয়ে মজা লোটার এই কায়দাট ভীষণ জঘন্য আর নোংরা। ও কোনওদিনই নিউ সিটির মার্শালকে ক্ষমা করতে পারবে না।

আমার বন্ধুদের কেউ-কেউ ওইসব গেমে নাম দিয়ে ‘ুয়াখেলা’য় জেতার কथा বললে মেহেন্দি তাদের বেধড়ক ঝাড়ত। আমি অনেক সময় ওকে খ্যাপানোর জন্যে নিউ সিটির গেমে নাম দেওয়ার কথা বলতাম, ওর সঙ্গে মজ করতাম। কিন্তু তাতত ও জেনুইনলি হেভি চটে যেত।

তখন জানতাম না, এই আমি সত্যি-সত্যি সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কোনও গেমে নাম দেব।

আমার জীবনে চরম দুর্ঘটনাটা একদিন ঘটল।
দু-নম্বর ইন্টারসিটি হাইওয়েতে থার্টিনদের সঙ্গে এনকাউন্টার হওয়ার পর প্রায় ছ’মাস কেটে গেছে। আমার জীবনের সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। সপ্তাহের

ছ'ঢা দিন বাইক ওয়ার্কশ্পর কাজ, আর একটা দিন নিজের জন্যে। আমার আর মাহির জন্যে।

একরমই একটা ছুটির দিনে-দিনটা রবিবার ছিল—আমি আর মাছি মোটরবাইক চেপে ঘুরতে বেরির্যেছিলাম।

আমার আস্তানা থেকে সাত কি আট কিলোমিটার দূরে একটা পার্ক ছিল। নাম হেও্সাগন পার্ক। বুঝতেই পারছ, পার্কের চেহারাটা হেস্সেইগনের মতো বলৌই ওই নাম।

পার্কটা মাপে প্রকাণ্ড। আর তার ঠিক মধ্যিখানে হেন্রাগন চেছারার একটা লেক ছিল। এ ছাড়া প্রুর গাছপালা।

কিক্তু পার্ক বলতে যেরকম ছবি মন্নে ভেতরে ভেসে ওঠঠ, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম ছিল না। অবহেলা আর অযত্নে পার্কের এককালের সুন্দর বাগান আর সাজনো গাছপালা অনেকটা জস্পলের চরিত্রে বদলে গিয়েছিন। লেকের নীল জলে একসময় লাল-নীল সব মাছ র্থো করত। কালে-কালে লেকের জনের রং বদলে শ্যাওলা ধরে ঘোनাটে সবুজ হয়ে গিত্যেছিন। একসময়ে পার্কের যে-আলোক্সজ্জার আমরা প্রশংসা করতাম, তখন সেই সজ্জার জাকজমক মৃত্হুশয্যায়।



পার্কের ভেতরে লেকের চারদিকের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে আমার খারাপ লাগত না। আর আমার যেটা পছন্দের সেটা মাহিরও পছন্দের ছিল। তা ছড়়া আমাদের গোটা শহরের যেরকম দশ দশা, তাতে তই হতমান হেজ্যাগন পার্কই ছিল আমাদের এলাকার অক্সিজেন সেন্টার। তাই ছুটির দিনে দুপুরে বা বিকেলে মোটামুটি ভিড় হত সেখানে।

পার্কটা হতমান হলেও সেখানে অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে আমার আর মেহেন্দির ভালো লাগত। এলোমেলো বেহিসেবি গাছপালা, শাা্ত লেকের ঘোলাটে জল, তাত বুড়বুড়ি কাটা চানাহুন্ো আর তেলাপিয়া মাছ—তার মধ্যেই আমরা আমাদের অা্প-অল্প ভালো লাগা খুঁজে পেতাম।

তো অভ্যাসমতো সেই ছুটির দিনটায় আমি আর মেহেন্দি হেক্সাগন পার্কে গিত্রেছিলাম।

সন্ধের মুথ্ে আমি আর ও হাসাহাসি করতে-করতে পার্কের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

হঠৎই একটি সত্তেরো-আঠেরো বহরের ছেলে আমার কাছে এগিয়ে এল। রোগাটে মুথ, চাপদাড়ি, বাঁ-দিকের গালে শ্বেতীর দাগ।

ছেলেটা জিগ্যেস করল, ‘দাদা, ক’ঢা বাজে?’

## 

आমি বাঁ-হতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখে বললাম, ‘পৌনে ছ’ঢা-।’ কথাটা বলতে না বলতেই ছেলেটট চকিতে ছোবল মেরে আমার জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোনটা তুলে নিল। তারপরই দে ছুট।

আমি আগ্গপছু চিন্তা না করেই ছেলেটাকে ধরতে তাড়া করলাম। তথনই লক্ষ করলাম, ছেলেটার ডানগাতের কবজিতে একটা ঘড়ি রয়েছে। সেটা আমি কেন যে আগে থেয়াল করিনি!

আমি ‘চোর! চোর!’ বলে চিৎকার করছিলাম, কিন্তু তাতে আশপাশের লোকজন তেমন গুরুত্ব দিল বলে মনে হল না। কারণ, ওন্ড সিটিতে ‘চোর! চোর!’ চিৎকারঢা এত বেশি চেনা যে, বলার কথা নয়।

কিছুক্ষণ ছোটর পরই বুঝলাম, আমার ভারী শরীর নিয়ে ওই রোগা দৌড়বাজ ছেলেটাকে আমার পক্ষে ধরা সম্তব নয়। তই আমি থেমে গেলাম। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে লাগলাম।

এমন সময় মেহেন্দির চিৎকার শুনতে পেলাম।
ও আমার নাম ধরে ডেকে উঠেছে। এই ডাকটা ভয়ের ডাক। বিপদ থেকে বাঁচতে চাওয়ার ডাক।

आমি ঘুরে মেহেন্দির দিকে তাকালাম। তাকিয়ে যা দেখলাম তাত একটা
 পলকক।

তিন-চারটে মোটরবাইক মেহেন্দিকে ঘিরে ফেলেছে। একটা লম্বামতন লোক ওকে টেনেহিচিড়ে একটা বাইকে তুলছে। আর মেহেন্দি আমার নাম ধরে চিৎকার করে চলেছে।

আমি শয়তানগুলোকে লক্ষ্য করে ছুটতে শুু করলাম। কিক্তু ততক্ষণে ওকে বাইকে বসিয়ে বাইক গতি নিয়েছে।

বাইকটা চালাচ্ছে একজন। তার পেছনে মাহি। আর মাহিকে প্রাণপণে জাপটে ধরে ওর পেছনে চেপে বসেছে আরও একজন। দুটো পুরুষের মাঝে মাহি স্যান্ডউইচ হয়ে আহে।

লন্বা মত্ন বে-ছেলেটা বাইক চালাচ্ছে, ছুটতে-ছুটতেই ওর পায়ের দিকে চোখ গেল আমার। ছেলেটটর বুট পরা পাল্যের গোড়ালির কাছে কী যেন একটা চক্চক করছে। ওর জিন্স-এর পায়াটা তার ভেতরে গোঁজ।

একটা স্টিলের বালা। ওর ডান পায়ে। থার্টিন। বলেছিল, আমার ফ্যামিলিকে ও থেঁতনে পিষে লেই বানিয়ে ছাড়বে।

থার্টিনকে চিনতে পারামাত্রই আমার মুখ দিয়ে একটা চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল। কসাইখানায় শুয়োর কাটার সময় যে-ধরনের চিৎকার শুনতে পাওয়া याয়।

জন্ত্রু মতো চিৎকার করতে-করতে আমি থার্টিনের মোটরবাইকের দিকে ছুটে গিত্যেছিলাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ভট্টট গর্জন হুলে দুশমনের বাইকটা দূরে মিলিয়ে গেল। সেইসল্গে মাহির চিৎকারও।

আমি রাস্তায় বসে পড়লাম। মাটি চাপড়ে কপাল চাপড়ে অসহায়ের মতো অনেক কান্নাকাটি করলাম। রাস্তার লোকজন হাঁ করে আমকে দেখতে লাগল। হয়তো ভাবল, একটা ভবঘুরে পাগল নিজের সুস্থত ফিরে পাওয়ার জন্যে হা পিত্যেশ করে কাঁদছে।

একটু পরে কান্নাকাটি থামিয়ে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। তারপর আমার বাইকে উঠে থার্টিনদের থ্ৰঁজজে বেরোলাম।

দিশেহারাভাবে সারাট রাত ওদের খুঁজে বেড়ালাম আমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার হাত শূন্য রয়ে গেল। ক্লান্ত শরীরে শূন্য হাতে ভোরবেলা বাড়ি ফিরে এলাম।

তারপর সারাদিন ধরে বন্ধুদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ করলাম। ওদের কথায় থানা-পুলিশ নিয়ে প্রুর দৌড়ূাঁপ করলাম। কিন্তু মেহেন্দির খেঁজ পেলাম না।

তবুও আমি থুঁজে চললাম। ওন্ড সিটির সম্ভব অসম্তব সব জায়গায় চবে বেড়ালাম

ना, মেरেন্দি ब্কে小
কয়েকদিন পর আমার কিছু বন্ধু হাল ছেড়ে দিল, কিন্তু আমি জেদ ছাড়িনি। মাত্র তিনজন বক্ধুকে সঙ্গী করে থোজ চালাতত লাগলাম।

আরও কিছুদিন পর বন্ধুর সংখ্যা কমে দাঁড়াল মাত্র একজন। কিন্তু তাও आমি থ্খাজ চালিয়ে যেতে লাগলাম।

শেষে, আরও পনেরোদিন পর, আমি একা। তথন আমি প্রায় পাগল रয়ে গেছি। কখন চান করি, কখন খই, আর কখন ঘুমোই—কিছুই মনে থাকে


তবুও মাহিকে পেলাম না।
এইভাবে টানা একবছর কাট্যেে তারপর বুঝলাম, মাহিকে আর কেনওদিনই আমি ফিরে পাব না।

ব্যস, তারপরই আমি কেমন যেন শান্ত পাথর হয়ে গেলাম। একা-একা চুপাপ সময় কাটাত লাগলাম। জীবন সম্পর্কেই আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

সেরকমই একটা সময়ে ঠিক করলাম, আমি নিউ সিটির কিল গেমে নাম দেব। यদি কিল্ গেম্ম জিততে পারি তা হলে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের সব খেলা আমি খতম করে দেব। ওদ্দের কোম্পানির ঝাঁপ বব্ধ করে চিরকালের জন্যে তালা লাগিয়ে দেব।

কারণ, মেহেন্দি এই থেলাগুলো একটুও পছন্দ করত না। তো আমি কিল গেমে নাম দিলাম।

প্যাসকের কাহিনি যখন শেষ হল তখন সুপার হাই-ফাই ক্যান্টিনের বাইরে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে।

জিশান প্যাসকোর দিকে তাকিয়ে ছিল। মানুষটার জীবনের ওাা-পড়া কল্পনায় দেখত্র চাইছিল।

প্যাসকো হঠাৎ বলন, ‘একটা জিনিস দ্যাখ্থা...।’ বলে পকেট থেকে একটা চ্যাপটা ছোট ডকুমেন্ট বক্স বের করল। সেটা খুলে একটা রঙিন ফটোগ্রাফ বের করে নিল। তারপর ফটোটা বাড়িয়ে দিল জিশানের দিকে।

ড়িশান দেখল।
একটা অक्পবয়ূসি রূপসি মেয়ে। চোেে অনেক স্বপ্ন।
প্যাসকো বলন, 'মেহেন্দি...মাহি...।'
মুখ তুলে তাকাল জিশান।
প্যাসকোর বাঁ-চোথে এক<্োঁটা জল। •:

## WNVW, banglabookodirologspotaon

৩) আগস্ট। ত্রবার। মাঝে আর একটা দিন—তারপরই রবিবার। কিল গেম।

শ্রীধর পাট্টা জিশানকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। চারজন গার্ড জিশানকে গ্রানাইট পাথরে ঢাকা করিডর ধরে হঁটিত্যে নিয়ে যাচ্ছিল। জিশান ওদের সঙ্গে పুকটাক কথা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওরা কেউই সেরকমভাবে কোনও জবাব দিচ্ছিল না। শখু ছোট করে 'হ-হঁ' করছিল।

জিশান বেশ অবাক হয়ে গেল। ব্যাপারট কী! নিউ সিটির গার্ডরা তো সবসময়েই জিশানের সঙ্গে কথা বলেছে, গল্প করেছে-এমনকী কেউ-কেউ ওকে হিরোর সম্মান পর্যন্ত দিয়েছে।

অবশেষে আর থাকতে না পেরে জিশান জিগ্যেস করেইই ফেলল, ‘কী ব্যাপার বলো তো! তোমরা কি আমার সস্গে কথা বলতে চাও না?’

জিশানের ডানপাশে যে-গার্ডটি হেঁটে যাচ্ছিল সে বলল, ‘না, স্যার। আসলে মার্শাল নিয়ম করেছেন, কিল গেমের আগে আটচল্লিশ ঘঞ্টা কেউ ক্যাভ্ডিডেটের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

জিশান হেসে বলল, 'কিল গেমের পরে কেউ কি আর আমার সল্গে

কথা বলতে পারবে?'
গার্ড মাথা নীহ করল। কোনও কथা বলन না।
ততক্ষণে ওরা একটা বন্ধ দরজার সামনে পোঁছে গেছে।
একজন গার্ড পকেট থেকে রিমোট বের করল। দরজার দিকে তাক করে বোতাম টিপল।

স্নইডিং ডোর। দরজর পাল্লা নিঃশব্দে পাশে সরে যাচ্ছিল।
গার্ড চারজন প্রায় একসঙ্গে বনে উঠল, 'গুডবাই, স্যার-।’
তখন থেকে ওরা ‘্যার-স্যার’ শুরু করেছে কেন? অবাক হয়ে ভাবল জিশান। কারণ, গার্ডদের মধ্যে অন্তত দুজন জিশানের চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। তার মধ্যে আবার একজনের গোঁফে পাক ধরেছে।

সামান্য হেসে ‘স্যার-স্যার’ রোগের কারণঢা জানতে চাইল জিশান।
একজন গার্ড মুখ নামিয়ে বলল, ‘বে যাই বলুক, স্যার। আমাের কাছে আপনি "স্যার"। আপনার মুখের দিকে আমরা সবাই চেয়ে আছি।’

আর-একজন গার্ড পাশ থেকে বলল, আমরা এখানে ভলো নেই, স্যার... ${ }^{\prime}$

ওরা আর দাঁড়াল না। অ্যাবাউট টার্ন করে চটপট হাঁট দিল।

 শূন্যে তিরিশ ডিগ্রি घুরিয়ে : 'পরশ কিল গেম / কী পাবে, শেম, না ফেম?’

জিশান কোনও উত্তর দিল না। ওর মধ্যে কেমন একটা থম-মেরে-যাওয়া ভাব কাজ করছিল। শ্রীধর পাট্টার ব্যঙ্গের ছুরি ওর গায়ে আঁচড় কাটতে পারছিল ना।

শ্রীধর ছোট ঘেরওয়ালা একটা সাদা প্যান্ট পরে ছিলেন। প্যান্টটা এমন যে, পায়ের সঙ্গে চোত্তাই পাজামার মতো লেপটে আছে।

গায়ে প্যান্টের সন্গে মানানসই খাপি সাদা কোট। শ্রীধরকে যেন আদর করে জড়িয়ে ধরেছে। কোটের কলারে আর হাতায় কবজির কাছে সোনালি রঙের পটি। বুকে মাঝারি মাপের সোনালি বোতাম।

জিশান ভাবলেশহীন মুদ্খে ঘরে ঢুকল। ওর আবেগ আর অনুভূতির জানলা-দরজা ও বন্ধ করে দিয়েছিল। নিজেকে পুরোপুরি একটা পোজিট্রিনিক রোবট বলে ভাবতে তরু করেছিল।

বিশাল ঘর। ঘরের সাজসজ্জা সবই সাদার কাছাকাছি রঙের। একদিকের দেওয়ালে একটা প্রকাঙ কম্পিউটার স্ক্রিন। ওটা খুলে মেঝেতে পেতে দিলে ডাবল বেড বিছানার ইলেকট্রনিক সং্করণ বলে মনে হতে পারে।

কম্পিউটার স্ক্রিনের বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে বসে আছেন

দুজন সাজুণুজু করা লোক-তাঁদের সামনে দুটো আর্ক কম্পিউটার। আর তাঁদের পাশে সার বেঁধে সাজানো চারটে সাদা সোফা।

ঘরের এসি এমন সেট পয়েন্টে চলছিল বে, জিশানের মনে হল ঋতুটা শীতকাল।

ইশারায় জিশানকে ডেকে নিলেন শ্রীধর। নিজে একটা সোফায় গিয়ে বসলেন। পাশেরটায় জিশানকে বসতে বললেন।
‘জিশান, তোমকে এখন ডেকেছি গেম সিটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। তুমি তো জানো, পরশ কিল গেম থেলাঢা গেম সিটিতে-ই হবে। শ্রীধর ডানপালে ফিরে ওঁর চাকরবাকর দুজনকে হাতের ইশারা করলেন। সঙ্গে-সল্গে কস্পিউটারের মেগা স্ক্রিন জীবন্ত হয়ে উঠল। সেখানে ধীরে-৭ীরে গুগ্ল ম্যাপের মতো একটা রঙিন মানচিত্র ফুটে উঠল।

চারদিক পঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা চোকো এলাকা। তার মধ্যে গাছপালা, নদী, घরবাড়ি—এরোপ্লেন থেকে নীচের দিকে তাকালে ঠিক যেমন দেখায়।

শ্রীধর বললেন, ‘এটা আমাদের গেম সিটি-টুয়েন্টি কিলোমিটার বাই নুল্রেন্টি কিলোমিটার। চররশো স্কোয়ার কিলোমিটির এলাকা। পরঙদিন ভোর ছণ্টা থেকে পরদিন ভোর ছঁট পর্যন্ত—মানে, চব্সিশ ঘণ্টা—এটা তোমার এলাকা। ছেট্ট করে মমকি হেসে আরু যোগে কর্লেন ঃo ‘ঐই এলাকায় ওই চব্রিশ


শ্রীধরের কথার নিহিত অর্থ বুঝতে জিশানের এতটুকুও অসুবিধে হল না। ওঁর দিকে তাকিয়ে দেখল, শ্রীধর ঠান্ডা চোে জিশানের দিকে চেয়ে আছেন, কিন্তু ওঁর ঠোঁটের কেণে হাসি।

কয়েক সেকেন্ড পর শ্রীধর কম্পিউটার অপারেটরদের দিকে তাকিয়ে আঙুলে টুসকি দিলেন। সল্গে-সল্গে একজন অপারেটর টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। একটা ক্যাবিনেটে-র ভেতর থেকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে নিল। অন করে নানান বোতাম টিপে সেট করে দিল। ট্যাবলেটের স্ক্রিটে গেম সিটির হই রিজোলিউশন কালার ইম্মে ফুটে উঠল।

লোকটি জিশানের কাছে এল। পাশে বসে ট্যাবলেটেটা ওর হাতে দিল। ঠিক যেন যোলো ইঞ্চি ডায়াগনালের একটা ও্রেমে বাঁধানো ফটো।

শ্রীধর পাট্টা বললেন, ‘এটা তোমার। তোমার কাছেই থাকবে। সোমবার ভোর ছট্ট পর্যন্ত। এতে গেম সিটির যে-কোনও অংশের ছবি দেখতে পাবে। ছবি তোমার ইচ্ছেমতো জুম করতে পারবে। তা ছাড়া ছবিগুলো সবই থ্রি ডায়ম্মেশন্যাল ইম্জে। তাই হাই-ফাই ভিডিয়োগেম্মের মতো তুমি যে-কোনও অবজেক্টের—মানে, ঘরবাড়ি, গাছপালার চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে পারবে। কোনও বাড়ির জানলা কিংবা দরজা দিয়ে খুশিমতো ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে।

বাড়ির ভেতরের লোকজন, সিচুয়েশান, সবই দেখতে পাবে। ফলে .োমার কিলাররা যদি কোনও বাড়ির ভেতরে पুকে লুকিয়ে থাকে, তুমি ইচ্ছে করলেইই তাদের খুঁজ্জে বের করতে পারো...।'

লোকটি তখন জিশানকে ট্যাবলেটের অপারেশন দেথিয়ে দিচ্ছে। জিশান ওর রোববারের ‘এলাক’’-র রঙিন ছবি খুঁটিয়ে দেখছিল। কী স্পষ্ট, নিথুঁত ছবি! হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে, এমন বাস্তব!

শ্রীধর খুকখুক করে কাশলেন।
'তবে, জিশান—মনে রেথো, একইরকম অপটিক্যাল ট্যাবনেটট ওই তিনজন কিলারের কছেও থাকবে। ওরাও তোমাকে সবসময় ওয়াচ করবে, চোে-চোখে রাখবে। তা না হলে থেলাটা ঠিক জমবে না-সমাে-সমাে হবে না। को বলো?' প্রশ্নট করে হাসলেন। তবে হসিতে কোনও শব্দ ছিল না।

জিশান কে小ও কথা বলল না। রোবটের মতো মুখ করে বসে রইল। আড়চোখে একবার শ্রীধর পাট্টার চোখের দিকে তাকিয়েছিল। তখন শ্রীধরের চোেে ও বিকৃত উল্লাস দেখতে পেয়েছিন।

অপটিক্যাল ট্যাবলেটের ডেম্মো চলছিল। জিশান ওর সমস্ত মনোযোগ একজোট করে ট্যাবলেটের অপারেশন শিখছিল। ওর মস্তিষ্কের সব নিউরোন

 দক্ষতায় ও অপটিক্যাল ট্যাবলেটের অপারেশন নিখুঁতভবে শিখতে চাইছিল।

ট্যাবলেটটর অপারেশন শেখার কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হওয়ার পর কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটটা অফ করে একটা ছোট ম্যানুয়াল জিশানের হাতে দিলেন। বললেন, ‘এই টর্ব্বে ম্যানুয়ালটা সল্গে নিয়ে আপনি যদি ঘণ্টাখানেক এই ট্যাবলেটটা অপারেট করেন তা হনে এর নানান অপারেশান আপনার চটজলদি রপ্ত হয়ে যাবে।'

জিশান শুধু ছোট্ট করে মাথা নাড়ল-কিছু বলল না।
টেবিলে নীল রঙের একটা পলিবাগ রাখা ছিল। তার গা়ে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের লোগে।। ট্যাবনেটের ম্যানুয়ালটা সেই পলিব্যাগে ঢোকানোর জন্য অপারেটর ভদ্রলোক জিশানকে ইশারা করলেন।

ম্যানুয়ালটা ব্যাগে ঢোকনোর পর জিশান ট্যাবনেটটটাও সেখানে ঢোকাতে যাচ্ছিল, কিন্তু শ্রীধর পাট্টা ওকে থামতে ইশারা করলেন।

ট্যাবনেটের কাজ এখনও বাকি আছে, জিশান।
জিশানের হাত থমকাল। শ্রীধরের মুখের দিকে তাকাল ও।
্ট্যাবলেটটট উলটে দ্যাধো-তা হলেই বুঝতে পারবে...।' ঘাড় অন্যদিকে ঘুরির্যে দ্বিতীয় কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকালেন শ্রীধর। আডুল নাচিয়ে

তাঁকে জিশানের কাছে আসতে বললেন।
ভদ্রলোক এগিয়ে এনেন। একইসল্গে প্রথম অপারেটর জিশানের পাশ থেকে উঠে নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন।

শ্রীধর কোটের পকেট থেকে ছোট একটা শিশি বের করলেন—ওঁর নেশার শিশি। ঘরের সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে দু-ফেঁঁটা তরল মুখে ঢাললেন। জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে শব্দ করলেন দুবার। ওঁর গাল আর নাকের ডগা লালচে হয়ে উঠল। চোেে ঝলসে উঠল নতুন দীপ্তি।

জিশান ট্যাবলেটটা উলেটে ফেলেছিল। অবাক হয়ে দেখল, উলটোদিকেও একটা পরদা। তবে সেটা এখন অন্ধকার।

ট্যাবলেটের দু-দিকেই পরদা থাকার ব্যপারটা জিশানকে বেশ চমকে দিয়েছিল। এরকম ‘দু-মুখ্যে কম্পিউটার’ ও আগে কখনও দেখেনি। ওল্ড সিটির মিউজিয়ামে একবার ও একটা জিনিস দেখ্খেছিল। খুব পুরোনো কালের একটা রাইটিং গ্যাজেট-বাচ্চাদের লেখার জন্য। গ্যাজেটটার নাম ‘ল্নেট’। তার ওপরে সাদা রঙের একটা রাইটিং স্টিক দিয়ে লেখা যায়। হ্যাক স্লেটের ওপরে হোয়াইট মার্ক পড়ে। সেইসব লেখা আবার ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা যায়।

এই ট্যাবলেটের ব্যাপারটা ঠিক যেন সেই স্লেটের মতো।


‘জিশান, ট্যাবলেটের এই দিকটা হচ্ছে একটা দ্ব্যাকার...’ ভদ্রলোক শান্ত মিহি গলায় বললেন, গহই-ফাই ইলেক্ট্রনিক ট্র্যাকার...।'
'্ব্যাকার?’ জিশানের অজান্তৈই ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।
‘হাঁ-द্র্যাকার।’ ভদ্রলোক ঠোটের কোণে হাসলেন : ‘স্টেট অফ দ্য আর্ট টেকনোলজি। কিল গেমের সময় এই ডিভাইসটা আপনাকে দারুণ হেল্প করবে। গেম সিটিতে যখন গেম স্টার্ট হবে তখন থেকেই এটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এর এল.সি.ডি. স্ক্রিনে গেম সিটির টোপোগ্রাফিক্যাল ম্যাপ ফুটে উঠবে। তার ওপরে সুপারইমপোজ্ড থাকবে কো-অর্ডিনেট গ্রিড...।' কथা বলতে-বলতে জিশানের হাত ধরা ট্যাবলেটের একটা বোতাম টিপে দিলেন ভদ্রলোক।

একটা ছেট্ট ‘বিপ’ শব্দ করে ট্ব্যাকার অন হয়ে গেল। সেখানে ফুটে উঠল গেম সিটির রঙিন মাপ-তার ওপরে সাদা উজ্জ্ল রেখা দিয়ে ছক কাটা গ্রিড ম্যাট্রিক। ফলেে গেম সিটির ছবিটা দাবার ছকের মতো ঢৌষট্টিটা চৌকো থোপে ভাগ হয়ে গেল।

ঠিক একই ছবি দেওয়ালের জায়ান্ট স্ক্রিনে ফুটে উঠল। জিশান সেদিকে একপলক তাকিয়ে আবার হাতের ডিভাইসটার দিকে চোখ রাখল।

ভদ্রলোক ছবিটার দিকে আডুল দেথিয়ে বলতে শুরু করলেন।
‘এটা টাচ স্ক্রিন অপারেটেড। স্রেফ আঙুলে ছুঁয়ে আপনি এর যে-কোনও একটা স্কোয়ার টাইলরে জুম করে ক্রোজ-আপ ভিউ পেতে পারেন। আবার ইচ্মেমতে নরমাল সাইজে ফেরাতে পারেন।' ভদ্রলোক আডুল ছুঁইয়ে ছবির দুটো স্কোয়ার ব্লককে ক্লোজ-আপ-এ নিয়ে এলেন, আবার নরমাল সাইজে ফিরিয়ে দিলেন।

জিশান খুঁটিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। রঙিন ম্যাপের নানান জায়গায় নানান রং। যেখানে গাছপালা জঙ্গন সেখানে সবুজ আর গা় সবুজের বহৃরকম শেড দিয়ে গাছপালার ছবি আঁকা আছে। পাহাড়ের জায়গায় ধূসর আর সবুজে आঁকা রয়েছে পাহাড়। এ ছাড়া রয়েছে নদী, বাড়ি-ঘর, রাস্তা, পার্ক, পুকুর, আরও कण के!

সবমিলিয়ে কুড়ি কিলোমিটার বাই কুড়ি কিলোমিটার একটা মিনি শহর।
জিশানের পাশে বসা ভদ্রলোক প্রায় সবক’ঢা খোপ জুম করে-করে জিশানকে সব বুঝিয়ে বলছিলেন। জিশান মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিল। ও থেয়াল করল, গেম সিটির নানান অঞ্চল সুন্দরভাবে ছবি এঁকে বোঝানো থাকলেও বাড়তি সুবিধে হিসেবে নীচে এক কেণে লেজেড্ড টেব্ল রয়েছেম্যাপে যেমন থাকে।

 আর কিল গেমের সময় ডিভাইসটা কীভবেবই বা ওকে হেল্প করবে?

জিশান যেন একটা হেলিকপটার থেকে গেম সিটিকে দেখতে পাচ্ছিল। একইসঙ্গে দেখতে পাচ্ছিল, গেম সিটিতে ও ছুটছে-ছুটে পালাচ্ছে-তিনজন কিলারের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে।

ভদ্রলোকের দেওয়া ডেমো শেষ হলে পর জিশান ওঁকে প্রশ্নটা করল।
‘ডিভাইসটার নাম দ্ব্যাকার কেন? ওটা কী দ্ব্যাক করবে?’
‘তোমাকে দ্র্যাক করবে, জিশান/তুমি হবে তিনজন খুনির প্রাণ।’ কথাগুলো বলতে-বলতে আচমকা উচে দাঁড়ালেন শ্রীধর পাট্ট। ঠোঁটে বাঁকা হাসি।

আয়েশি পা ফেনে টেবিলের ওপাশে চলে গেলেন। জিশানের ঠিক বিপরীত গিয়ে দাঁড়ালেন।
‘রোবট’ জিশান শ্রীধরের দিকে তাকাল। কারণ, শ্রীধরের বলা কথার মধ্যে থেকে কিল গেমের দরকারি তথ্যগুলো ছেঁকে নেওয়া দরকার এবং ঠিকঠাকভাবে সেগেলো মাথায় রাখাটা জরুরি।

শ্রীধর বলতে শরু করলেন। ঠোঁটের কোণ সামান্য বেঁকে গির্যে একটা তেরছ হাসির আভাস তৈরি করেছে।
‘আসলে, জিশান, তোমার প্রাণ ওই তিনজন খুনির প্রাণ। মানে, তোমার

প্রাণ নিতে পারলে ওরা তিনজনে প্রাণ ফিরে পাবে। ওদের ডেথ সেন্টেে মকুব করে দেওয়া হবে। ওদ্দে হাতে বাইশ ঘণ্টা সময় আছে তোমাকে মারার জন্যে। আর তোমার হাতে সেই বাইশ ঘন্টা-তবে বাঁচার জন্যে।’ অদ্রুত ভঙ্গিতে বাতাসে হাত নাড়লেন শ্রীধর। তারপর : ‘এবার ভালো করে শোেো। কিল গেম শুরু হওয়ামাত্র এই ইলেকট্রনিক দ্ব্যাকার অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে। তখন গেম সিটির ওই রঙিন ম্যাপের ভেতরে একটা সবুজ আলোর ফুটকি দেখা যাবে। ফুটকিটা কম্পিউটরের কারসরের মতো দপদপ করবে।
'ওই সবুজ আলোর ফুটকিটা হলে ঢুমি। তুমি গেম সিটির ঠিক যেলোকেশানে আছ ফুটকিটা ম্যাপে ঠিক সেই থোপের মধ্যে দপদপ করে জূনবে। তুমি চলতে শুরু করনে হ্বহ তোমার চলার পথ ধরে ফুটকিটাও চলতে শুরু করবে। মানে, ওই গ্রিন ডট্টা তোমার পজিশানকে দ্ব্যাক করবে। দারুণ টেকনোলজি, না?’ শব্দ করে হাসলেন মার্শাল। তারপর চুপচাপ টেবিলের দৈর্ঘ্য বরাবর আলরো পায়চারি করে চললেন।

কম্পিউটার অপারেটর ভদ্রলোক ট্যাবলেটের বোতাম টিপে একটা ডেমো প্রোগ্রাম চালু করে দিলেন। একটা সবুজ আলোর ডট ব্নিংক করতে-করতে দ্ব্যাকারের পরদায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

‘এইরকম द্ব্যাকার তিনজন খুনির হাত একটা করে থাকবে। ওরা এই द্ব্যাকারে তোমার ডায়ানামিক পজিশান সবসময় জনতত পারবে। তোমার পজিশান জেনে নিয়ে ওরা ট্র্যাকারের উলটোদিকের অপটিক্যাল ট্যাবনেট অপারেট করবে। এবং তখনই ওরা তোমাকে ছবিতে ধরে ফেনবে।
'ফর ইয়োর কইইড্ড ইনফরমেশান...আমাদের গেম সিটিতে এক লক্ষ চার গাজার তিনশো বত্রিশটা ক্যামেরা ফিট করা আহে, আর সেগুলো স্মার্ট নেটওয়ার্কিং-এ কানেক্টেড। গেম সিটির সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে ক্যামোরা নেটওয়ার্কটা অপারেট করা হয়। এসব এতই হাই-টেক ব্যাপার যে, ডুমি কখনওই ক্যামেরার চোখ আ্যাভয়েড করতে পারবে না। কোনও না কোনও ক্যামেরা তোমাকে ক্যাচ করবেই।’

জিশানের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছিল। সেটা লক্ষ করে শ্রীধর তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, ‘ঁঁा, তুমি ঠিকই বুঝ্রেছ, জিশান। ওই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার প্রাইভেসি বলে কিছু থাকবে না। উই ওয়ন্ট য়ু অন ক্যামেরা অ—ল দ্য টাইম। কারণ, সেই সময়টা নিউ সিটির শো-টাইম।

জিশান কিছু একটা বলতে গির্যেও থেমে গেল।
শ্রীধর হাতে হাত ঘষে শীত তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন। তারপর আড়চোথে

নাটকীয় নজরে জিশানকে দেখলেন।
‘তোমকে এখনও লাল ডটের কথা বলিনি, জিশান। গেম সিত্তিতে ঢোকার পর থেকেই ওই তিনজন খুনির পজিশানও ধরা পড়বে এই দ্ব্যাকরে। তিনটে লাল ডট-দপদপ করে জ়লবে-নিভবে। তিনজন মার্ডারারের ডায়নামিক পজিশান। তার মানে কী দাঁড়াল?' দু-হাতের আডুল ডগায়-ডগায় ঠেকলেন শ্রীধর। কম্পিউটার অপারেটরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করলেন।

সঙ্রে-সল্গে অপারেটর ভদ্রলোক ট্রাাকারের আর-একটা বোতাম টিপে দিলেন। আর-একটা ডেমো প্রো্র্রাম অ্যাক্টিতেটেড হয়ে গেল। তিনটে লাল ডট জন্ম নিল পরদায়। এবং সেণুলো ধীরে-ধীরে সবুজ ডটটার দিকে এগোতে লাগল।
‘আমাদের কিল গেম খুব ফেয়ার গেম। তাই তুমিও সবসময় খুনিদের পজিশান জানতে পারবে। অর্থাৎ, মোট চারটে ব্নিংকিং ডট ঘোরাফেরা করবে এই ট্ব্যাকরেーতিনটে লাল, আর একটা সবুজ। कী পছন্দ?' মুচকি হেেে সরাসরি জিশানের দিকে তাকালেন মার্শাল।

ফেয়ার গেমই বটে! যার নকল সারভাইভাল ফ্যাক্টর 0.07 আর আসল সারভাইভ্যাল ফাক্ট্ $0.0!$ চমৎকার! তার ওপর আবার একজনকে খুন করার জন্য তিনজন খুনি। একটা ইঁদুর ধরতে তিন-তিনটে বেড়াল!



শ্রীধর আবার নিজের আরামের সোফায় ফিরে গেলেন। অপারেটর দুজনকে বললেন, আরও অন্তত আধঘণ্টা ওঁরা যেন জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেটের আর ট্য্যাকরের ট্রেনিং দেন।

শ্রীধর সোফার হাতলে বসানো একটা ছোট্ট বোতাম চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে খুব আলতো ভলিয়ুম্ম মিউজিক বাজতে খুরু করল। বিলম্বিত লয়ের বিষঞ্ণ সুর।

সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেন শ্রীধর। কিল গেম আসছে। শরীরের প্রতিটি রোমকৃপে তার আগমনী বার্তা টের পাচ্ছেন। প্রতিটি রক্তকণিকায় যেন ফাগুনের আগুন—অথচ ফাগুন এখনও অনেক দূরে।

বড় করে শ্মাস টানলেন। চোখ বুজ্েও গেম সিটিকে দেখতে পেলেন। যেন খুন-খুন থেলা চলছে চোখের সামনে। আর শুনতে পেলেন উত্তেজিত জনতার উত্তেজনা উল্লাসের চিৎকার।

এবারের কিল গেমে আয়োজনের কোনও জ্রুটি রাখখননি শ্রীধর। প্রচারের জন্য সবরকম মিডিয়াকে চূড়ান্তভাবে ব্যবহার করেছেন। ফলে বিজ্ঞাপনও পেয়েছেন প্ররর-কম করেও কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। তার পাশাপশি দর্শকদের প্রত্যাশাও প্পাঁছে গেছে তুঙ্গে। এর আগে কোনও কিল গেমে প্রত্যাশার পারদ

## ২৬৬ www.banglaboock petf.tologspot.com

এতটা ওপরে চড়েনি। বিষ্ঞাপনের আয়ও হয়েছে এবারের তুলনায় অনেক কম। শ্রীধরের ধারণা এবারের কিল গেম হতে চলেছে সবার সেরা। এবারের কিল গেম ইতিহাস তৈরি করবে।

তার একটা বড় কারণ অবশাই জিশান। জিশান পাল চৌধুরী।
চোখ খুলে জিশানের দিকে তাকালেন। কিল গেমের জনপ্রিয়তার কিস্তিমাতের ঘুঁটি।

কম্পিউটার অপরেটর দুজন সিট ছেড়ে উঠে দঁডড়িয়েছেন। জিশনের আধঘণ্টার ট্রেনিং কয়েক মিনিট হল শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ওঁরা মার্শালের নির্দেশের অপেক্ষা করছিলেন। মার্শালের চোখ থোলার অপেক্ষা করছিলেন।

শ্রীধর ইশারায় ওদের ছুটি দিলেন। ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর সব ম্যানুয়াল পলিব্যাগে ঢুকিয়ে নिल।
‘জিশান, তুমি এবার আমার কাছে এসে বোসো-ল্লিজ।’ মার্শাল ইশারায় ওকে কাছে ডাকলেন, ‘তোমার সঙ্গে অনেকগুলো জরুরি কথা সেরে নেওয়ার आছে!’

জিশান পলিব্যাগটা সাবধানে টেবিলের ওপরে রাখল। তারপর শ্রীধরের
 দিয়ে কপালের পাশে কয়েকবার চাপ দিলেন।
‘তোমার সঙ্গে আজকে আমার শেষ মিটিং, জিশান...’ একটু থামলেন। जারপর : ‘...কিল গেম্মের আগে। আর...মান....কিল গেমের পর দেখা হবে কি না সেটা নির্তর করছে তোমার ওপর। তুমি यদি গেম সিট্তিতে চব্কিশ ঘণ্টা টিকে যাও তা হলে দেখা হবে। এ ছাড়া তুমি যদি তিনজন কিলারকে চব্বিশ ঘণ্টার আগেই খতম করতে পারো তা হলে আরও আগে আমাদের দেখা হতে পারে’

জিশান চুপ করে রইল।
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর শ্রীধর পাট্টা আবার বলতে তুু করলেন।
দ্ব্যাকারের লাল ডট আর সবুজ ডটের ব্যাপারটা তোমকে বুঝিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এটা বলিনি বে, তোমাদের ডায়নামিক পজিশন ওই ওয়ারলেস ট্ব্যাকারে ধরা পড়বে কেমন করে।
‘আসলে ব্যাপারটা খুব সিম্প্ল। আগামীকাল তোমাদের চারজনের বডিতে একটা করে মইইক্রেইলেক্ট্রনিক ট্রাস্সমিটার ঢুকিয়ে দেওয়া হরে। তারই সিগন্যাল দ্ব্যাকারে ধরা পড়বে। তবে চিন্তার কিছু নেই। খুব ছোট্ট অপারেশান। কী, ঠिক আছে?

জিশান কোনও কথা বলল না। শ্রীধরের ঠাডা চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পাচদিন আগেই ওর কন্ট্রোল্ ফ্রিডদ্মের ব্যবস্থাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর একইসঙ্সে শুরু হর্রেছে কড়া নজরদারি। জিশানকে কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্তরে শিফ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সিকিওরিটি গার্ডরা ওকে রাউড্ড দ্য ক্লক প্রোটেক্শন দিচ্ছে, যাতে কেউ ওর কোনওরকম ক্ষতি করতে না পারে। সকাল-বিকেন ওর অ্যানালগ জিম, ডিজিটাল জিম আর মেডিক্যাল চেক আপ চলছে। ট্রেনাররা ওকে ট্রেইন করছে। ডাশ্যেটিশিয়ানদের পরামর্শ মতো ওর খাওয়ার মেনু ঠিক করা হচ্ছে। ঘড়ির কঁঁটায়-কাঁটায় চলছে সবকিছু।
‘শোনো, জিশান। তোমার ওই ছেটট অপারেশানটা করা হবে কাল বিকেল চারটের সময়। অপরেোনটা এমন যে, তুমি কিছু টেরই পাবে না। ঢাঁর ব্যথাট্যাथাও কিছুই হবে না। তারপর আমাদের টেকনিক্যাল টিম আর মেডিক্যাল টিম দ্ব্যাকিং-এর ব্যাপারটা চেক করে দেখবে। ব্সস, তারপর তুমি রেডড!' কথাট বলে পাতলা ঠোটের ওপরে আডুল বোলাতে লাগলেন শ্রীধর। মনে-মনে বোধহয় তিনি ছুট্ত জিশানকে গেম সিট্তিত দেখতে পাচ্ছিলেন।
‘রোববার ভোর চারটের সময় কিল গেম অপারেশান টিম তোমার কোয়ার্টরে যারে। তোমাকে ওরা নিয়্যে যারে অমরমারি ইউনিট। সেখানে ত্ম
 তোমার মনের মতো পোশাক।
‘তারপর তুমি গিয়ে হাজির হবে "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে। গেম সিটিতে पুকে পড়ার আগে তুমি যাদের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে চাও তারা সেখানে আসবে তোমাকে উইশ করতে। তারপর আবার ফাইনাল মেডিক্যাল চেক আপ। সেটা শেষ হলেই তুমি গেম সিত্তিত ঢুকে পড়বে। শ্রীধর পাট্টা উঠে দাঁড়ালেন। হাতের একটা তঙ্গি করে বললেন, তুমি কোয়ার্টরে ফিরে গিয়ে তোমার দেখা করতে চাওয়ার উইশ লিস্টটা সিকিওরিটি চিফের হাতে দিয়ে দিয়ো। রোববার ভোর পাঁচটার সময়ে তাদের "লাস্ট স্টপ" চেম্বারে হাজির করানোর জন্যে আমি হার্ট আ্যাডড সোল চেষ্টা করব। তবে হাঁ-ন্ো ফ্যামিলি।’ হাসলেন শ্রীধর : ‘কারণ, তোমার ওয়াইফ আর ছেলেকে যদি তোমার সল্গে লেখা করানোর জন্যে ওল্ড সিটি থেকে নিয়ে আসা হয় তা হলে, আই আম শিয়োর, তোমার পক্ষে সেটা ডেঞ্জারাসলি হার্মयুল হবে-কারণ, তোমার কনসেনর্রেশান নষ্ট হবে...অ্যাড্ড দ্যাট মে কিল য়ু আর্লিয়ার ইন দ্য গেম।' শ্রীধর গাসলেন।

জিশান উইশ লিস্টটা মনে-মনে তৈরি.করা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু শ্রীধরের শেষ কথাটা শোনামাত্র ও থমকে গেল। লিস্টের গোড়া থেকে মিনি

আর শানুর নামটা ও মনে-মনে কেটে দিল।
পরপর অনেক নামই ওর মনে পড়তে লাগল। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ, পাডা, মৃর্তি, রিমিয়া, গুনাজি, ডক্টর রর্গপ্রকাশ বিশ্বাস, প্যাসকো, সুধাসুন্দরী, আর থেলার মাঠে আলাপ হওয়া সেই গার্ড-यার বাড়ি নাহাইতনা গ্রামে।

তবে এদের মধ্যে কেউ আছে, কেউ নেই। মনোহর সিং, ফকিরচাঁদ...আরও কে-কে আছে বা নেই কে জনে!

জিশানের মনে পড়ল, গার্ড বলেছিল, ওর গ্রাম ছবির মতো-সুন্দর, শান্ত, নরম।

ছেলেটা আরও বলেছিন, ভগবানের ভরসায় বসে থাকলে হবে না। যা করার মানুষকেই করতে হবে।

তেইশ-চব্বিশের ছেলেটার মুখটা জিশানের চেথের সামনে ভেসে উঠল। সত্যি, ও यদি শেষবারের মতো দেখা করতে আসে-শেষ সময়ে-তা হলে জিশানের খুব ভালো লাগবে। আর এই ভালো লাগাটা ওকে কিল গেমে লড়াই করার শক্তি জোগাবে।

একইসঙ্গে জেহাদি সিকিওরিটি গার্ড পাডার মুখটাও দেখতে পেল জিশান। বড়-বড় নেশাতুর চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে পাড্ড বলেছিল,


১ সেপ্টেম্বর। শনিবার। আর মাত্র চব্সিশ ঘণ্টা। তারপরই তুু হবে জিশানের তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিটের লড়াই। অথবা তেইশ ঘণ্টা ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেশ্ডের লড়াই।

কিল গেম ফাইনালিস্টের স্পেশাল কোয়ার্টরে চুপচাপ বসে ছিল জিশান। খোলা জানালা দিয়ে আকলের দিকে তাকিয়ে ছিল। আকাশটকে এক মনে উপভোগ করহিল।

আকাশট कী শান্ত, মসৃণ, নীল! कী সুन्দর!
জিশানের অবাক লাগছিল। আকাশটাকে কখনও ও এত মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করেনি। আজ মনে হচ্ছে, আকাশটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকনেও ওর দেখা ফুরোবে না। আজ ওর ঘণ্টা, মিনিট গোনা হয়ে গেছে। গোনা হয়ে গেছে নিশ্বাস-প্রশ্বাসও। তাই হয়তো আজ এই মুহূর্তের ভালো লাগাটা অফুরান।

বিছনায় এসে বসল জিশান। এমন আরামের বিছানা, যেন মেঘ দিয়ে তৈরি। আরাম আর বিনোদনের সমস্ত উপকরণ ঘরের মধ্যে হাজির। কী নেই

এখানে! মাত্র সাতদিনের অতিথিশালা হলেও এথানে প্রকাণ মাপের প্লেট টিভি রয়েছে। আর তার সল্গে কালার প্রিন্টার।

এই কোয়ার্টরে কোনও ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্ট্রনিক গ্যাজেটের কোনও সুইচ নেই। সবই ভয়েস অ্যাক্টিভেটেড। ঠিকঠাক সেল্সরের সামনে গিয়ে ‘অন’ কিংবা ‘অফ’ বললেই কাজ হয়ে যায়।

এই সাতদিন এই স্পেশাল কোয়ার্টরের আরাম, বিলাস বোধহয় শুধু রূপকথাতেই পাওয়া যায়! আর আগামীকালের ভয়ক্কর রুক্ষ নিষ্ঠুর লড়াই— সেটও বোধহয় আর-এক রূপকথা।

স্পেশাল কোয়ার্তারের চারিদিকে, আনাচেকানাচে, চোখ বুলিয়ে নিল জিশান। এই মনোরম মোলায়েম স্বচ্ছন্দ্য আর আরামের নামই কি সুখ? না, নিশ্যযই নয়। তাই যদি হত, তা হলে ওল্ড সিটির গরিব মানুষ্েে বত্তিতে জিশান, মিনি আর শানু যেখানে থাকে, সেখানে সুখ থাকত কেমন করে! ‘থাকত’, কারণ, এখন আর নেই। যেহেহু জিশান মিনি আর শানুর কাছে এখন নেই।

একটা কবিতার কথ্থা মনে পড়ল জিশানের। মাত্র দুটো লাইন :


বত্তির সেই হতদরিদ্র ঘরে ঠিক এইভাবেই সুখ খুঁজে নিত জিশান আর মিনি। কালকের চব্বিশ ঘণ্টার দিনট্ পার করে আবার ওন্ড সিটিতে ফিরবে জিশান। তারপর আবার ওরা দুজনে রোজ খুঁজে নেবে সুখের মণিকণা। গতকাল রাতে মিনির সঙ্গে শেষবারের মতো কথা বলেছে জিশান। কথা বলেছে শানুর সঙ্গেও।

মাইক্রোভিডিয়োফোনে অনেক টকট্টাইম তিল-তিল করে জমিয়ে রেখ্খেিিন। মনে-মনে ভেবে রেখেছিল, কিল গেমের আগে শেষবারের মতো যখন মিনির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে, তখন এই জমানো টকটাইম প্রাণ ভরে খরচ করবে।

গতকাল সকালে শ্রীধর পাট্টা জানিয়ে দিয়েছিলেন, শ্রববার রাত বারোটার মধ্যে এম-ভি-পি শেষবারের মতো ব্যবহার করতে হবে। আর শনিবারটা হচ্ছে ‘লাল পিরিয়ড’—সাইক্রোনের আগে খানিকটা সময় যেমন গমোট থাকে, থাকে থমথমে স্তু্ধত, ঠিক সেইরকম। তারপরই রবিবার, কিল গেমের সাইক্লোন।

শ্রীধর আরও বলেছিলেন, শনিবার দিনটা জিশানের মনোসংযোগের
জন্য। মন থেকে সমষ্ত আজেবাজে চিন্তা সরিয়ে ওকে শুধুই কিন গেমের কথা ভাবতে হবে।

## २৭० www.banglaboêkpłff.tołogspot.com

অথচ এখন, কাল রাতে মিনির সঙ্গে কথা বলার সময়াুকুর ছবি জিশানের মনে ভেসে উঠছিল।
'মিনি!
মাইক্রোভিডিয়োফোনের পরদায় মিনিকে দেখতে পাচ্ছিল জিশান। মিনিকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। ওর কোলে বসে আছে শানু। সেই কারণণই হয়তো মিনিকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

শানু কত বড় হয়ে গেছে! আধো-আধো কথার টুকরো বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

জিশান ছেলের নাম ধরে ডেকে উঠল : 'শানু! শানু!'
শানু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বুড়ো আডুল চুষছিল। জিশানের ডাকে ঘুরে তাকাল।

এম-ভি-পি-র পরদায় বাবা আর ছেলের চোখাচোি হল। জিশান আবেপে কেঁপে উঠল। ছেলের চকচকে চোের দিকে তাকিয়ে আদরের অথ্থহিন শব্দ করতে লাগল। শানুও বাবার অর্থইীন শব্দের উত্তরে আরও অর্থইীন, আরও দুর্বেধ্য সব শব্দ ফিরিয়ে দিল।

মিনির চোখ ভিজে উঠেছিল। ওড়না দিয়ে চট করে চোখ মুছে নিল ও।
 পারছি না!

মিনি অল্প হেেে বলল, 'ও বলছে, কিল গেমে তোমকে জিততে হবে। তারপর কিল গেমকে চিরকালের মতো খতম করতে হবে...।

জিশান ধরা গলায় বনল, ঢুমি মনে-মনে আমার সল্গে থাকলে নিশয়ইই পারব...'
'শানু তোমকে কাঁদতে বারণ করছে।’
জিশান চোখ মুছল আবার। দঁగতত দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করল।
‘না, আর কাঁদব না। শ্রীধর পাটা ঠিকই বলেছে : এতে আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হরে। কিল গেম্মে ভালো করে লড়তে পারব না...’’

আচমকা মিনি বলল, 'জিশান, আজ আর কথ্থা নয়...তোমার সঙ্গে পরে कथा বलব... |'

জিশান তাড়াতাড়ি বনে উঠল ঃ ‘মিনি, মিনি! কিল গেম্মের আগে আজই তোমার সঙ্গে শেষ কথা। শ্রীধর আমকে জানিয়ে দিয়েছে। কাল তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতত দেবে না—’’
'জানি। সুপারগেম্স কর্পোরেশন আমাকেও ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে’’ নিজেকে শক্ত করল মিনি ঃ ‘সেইজন্যেই আমি অনেক কথা বাকি রাখতে চাইছি।

বাকি কথাগুলো আমি বলতে চাই কিন গেমের পর...।
জিশান প্রথমটায় ব্যথা পেলেও পরে বুঝতে পারল মিনি আসলে কী বলতে চাইছে।

আমি এখন কানেক্শন কেটে দিচ্ছি, জিশান। সোমবার যদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে জীবনে তোমার মুখ দর্শন করব না। কথাটা মনে থাকে যেন!'

তারপর সত্যি-সত্টিই কানেকশন কেটে দিল মিনি।
মিনির না বলা গোপন কথ্া ভিশান বুঝতে পারল। এম-ভি-পি-র শূন্য পরদার দিকে তাকিয়ে জিশানের মনে হল, মিনি শেষ কথাট যা বলল তার বদলে এ-কথাও বলতে পারত : ‘...সোমবার यদি তুমি আমার সঙ্গে কথা না বলো তা হলে তোমার মরা মুখ দেখব।’

না, জিশান নিজের মরা মুখ মিনিকে দেখাতে চায় না। আর সেইজন্যই দরকার মনোযোগ-সূচিতীক্ষ্ মনোযোগ। যে-মনোযোগ থাকলে ওর সারভাইভাল ফ্যাক্টরটা ০.৫-এর বেশি হতে পরে।

এখন বসে-বসে সেই কথাই ভাবছিল জিশান।
মিনি। অর্কনিশান। জিশান। কনসেনট্রেশন। কনসেনট্রেশন।
এই পौচটট শব্দ জিশানকে মন্নে ভেত্ন সাইক্রিক অর্ডারে মুরছিল। আর
 দেবে।

সকাল ছ’া থেকে আটটা-এই দু-ঘণ্টা-গেম সিটি থাকবে জিশানের একার দখলে। তারই মধ্যে জিশানের লড়াইয়ের ময়দানটা দেখেখুনে নিতে হবে।

শ্রীধর পাট্টা বলেছেন, গেম সিটির নানান জায়গায় দাঁড় করানো থাকবে অনেক গাড়ি আর মোটরবাইক। সেগুলোর ফুহ্যেল ট্যাক্ক ভরতি থাকবে। ট্যাক্কের ঢাকনা সিল করা থাকবে। ইগনিশনে লাগানো থাকবে গাড়ির চাবি—সে-চাবি এমনই যে, কি-হোল থেকে কখনও বের করা যাবে না। সোজা কথায়, তেল না ফুরোনো পর্যষ্ত ওই গাড়ি আর বাইকগুলো ওরা চারজন ব্যবহার করতে পারবে। চারজন মানে জিশান, আর তিনজন কিলার।

গেম সিটিতে যেসব মানুষ চব্সিশ ঘণ্টার ‘সিটিজেন’ হয়ে আসবে তারা থাকবে যার-যার নির্দিষ্ট বাড়িতে বা দোকনে। অদের রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ানো বারণ। यদি কেউ সে-নিয়ম না মানে তা হলেে তার ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে সে-দায়িত্ব মোটেই সুপারগেম্স কর্পোরেশনের নয়। তবে যদি কখনও কোনও বাড়ি বা দোকানের ভেতরে জিশান এবং তার শক্রুদের কোনও মোকাবিলা হয় তা হলে সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রহীন মোকাবিলা। এ-নিয়ম না মানলে তার শাত্তি মৃত্যুদণ্ডের চেট্যেও মারা|্মক।

## ২৭২ www.banglabioêk petf.błogspot.com

শ্রীধর এইসব নিয়মের কথা বারবার করে চারজনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে এও বলেছেন, 'মনে রাখবে, লক্ষ ক্যামেরা প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদের লক্ষ করছে। সেইসঙ্গে রয়েছে দেশবিদেশের কোটি-কোটি দর্শক।

জিশান অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা হাত নিল। ওটা ‘অন’ করে গেম সিটির আনাচকানাচ ভীষণ মনোযোগে দেখতে লাগল। ঘন্টার পর ঘণ্টা দেখেই চলল। পরীক্শর পড়া মুখস্থ করার মতো গেম সিটির ভূগোল মুখস্থ করে চলল। কারণ, লড়াইয়ের সময় বারবার ট্যাবলেট দেথে ও দামি সময় নষ্ঠ করতে চায় না। তাই গেম সিটিকে ও মনের মধ্যে গেঁথে নিতে চায়।

গতকাল শ্রীধরকে জিগ্যেস করেছিল, 'ওই চব্সিশ ঘণ্টার জন্যে জল আর খাবার কি সল্গে নিতে হবে?’

শ্রীধর হেসে বলেছেন, 'না। আমি কোয়ালিটি টাইম নষ্ট করতে চইই না। তোমাদের চারজনের জন্যে জল আর খাবারের ব্যবস্থা করেছি ভারী অভিনব কায়দায়, বুঝলে বাবু জিশান! একেবারে হাই-ফাই সুপার-ডুপার টেকনোলজি...।
'তার মানে?’ জিশান ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল। মনে-মনে ভাবল, এই পাগল স্যাডিস্ট লোকটা হয়তো গেমের ফান আর এজ্যইটমেন্ট ফ্যাা্টর বাড়ানোর জন্য জন আর খাবারের কোনও ব্যবস্থাই রাথ্খনি। গেম সিটির জঙ্গলের গাছের ফল্ পাতা আর কচি ডালপালা হচ্ছে খাবানু আর জল খাও্যারূ জন্য রয়্রেছে नদोर जগী जन

কিন্তু জিশানকে ভুল প্রমাণ করে শ্রীধর পাট্টা অন্যরকম উত্তর দিলেন। অপটিক্যাল ট্যাবলেটের একটা লালরঙের চৌকো বোতাম দেথিয়ে বললেন, ‘জিশান, এই বোতামটা হচ্ছে ফুড বাটন। এটা টিপলেই তুমি দেখতে পাবে ফুড মাপ। গেম সিটির কোন-কোন পয়েন্টে তোমার ফুড আর ড্রিক্কের প্যাক রাখা আছে সেগুলো লাল হ্নিক্কিং ডট হিলেবে ক্কিরিনে ফুটে উঠবে। তুমি ইচ্ছে করলেই পিকচার জুম করে পয়েন্টুলোর ডিটেইল্ড লোকেশান দেতে নিতে পারবে... ’’
‘কিন্তু কিলাররাও তো এই ম্যাপ দেখতে পাবে। তখন ওরা...।’
হাত তুলে জিশানকে থামতে ইশারা করলেন মার্শাল। হেসে বললেন, ‘আমাকে ঢুমি বোকা ভাব কেন, জিশান? আমি থ্রিলিং ফাইট দেখতে চাইখাবার চুরির কায়দা-কানুন দেখতে চাই না-' জিভটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কয়েকবার বের করলেন, ঢোকালেন। সাপের মতে।। তারপর : ‘তোমার ফুড ম্যাপ কিলাররা কেউ দেখতে পাবে না। আর ওদের ফুড ম্যাপ ওরা তিনজন দেখত্ পেলেও তুমি দেখতে পাবে না-অলরাইট?'

জিশান স্তষ্ভিত হয়ে শ্রীধর পাট্টার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটা একইসঙ্গে শয়ততন এবং জিনিয়াস।

ফুড ম্যাপের ব্যাপারটা জিশানকে জলের মতো বুঝিয়ে দেওয়ার পর শয়তান এবং জিনিয়াসটা ওকে একটা ফাইন দেথিয়েছিন। সেটা আরমারি ইউনিটের হরেকরকম অস্ত্রশস্ত্রের চেক লিস্ট।

এক-একটা অল্ত্রের এক-একরকম কোড নম্বর। নম্বরের পাশে রয়েছে অন্ত্রের রঙ্Eিন ছবি আর বিবরণ। ততে লেখা আছে কোন অস্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার মাপ কত, ওজন কত, আর মারণ ফ্মুতই বা কত।

সেই লিস্টের মধ্যে আরও রয়েছে নানান যন্ত্রপাতির থোঁখবর। যেমন, অটোেোকাস ডায়মন্ড লেন্স, হাই পাওয়ার টেলিস্কোপ, সাউন্ড রিকগনিশন অডিয়োগ্রাফি সিস্টেম, বহু রকম্মের নাইট-ভিশন ইন্সট্রুেন্ট, আরও কত কী!

এগুলোর সঙ্গে আগেই জিশানের পরিচয় ছিল। ওর ট্রেনিং-এর সময় যখন ওকে নানান ধরনের লড়াইয়ের কায়দাকনুন শেখােো হচ্ছিল তখন একটুএকটু করে আরমারি ইউনিটের যন্ত্রপাতি আর অম্শ্রশস্ত্রের সঙ্গে ওকে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন ওকে খুব হিসেব করে যন্ত্র আর অস্ত্র বেছে নিতে হবে। কারণ, এগুলোর সংখ্যা যত বাড়বে, ওজন তত বাড়বে। আর ওজন যত বাড়বে, জিশানের ছোটাছুটি করতে ততই অসুবিধে হবে।

শ্রীধরের কথা মরো আরমারি ইউনিটের চেক লিস্টটার সফ্ট কপি

 শ্রীধর পাট্টার কম্পিউটার সিস্টেমে পাঠিয়ে দেবে। তা হলে কাল ভোেে আরমারি ইউনিটে ওর অস্ত্র আর যষ্ত্রপাতি বেছে নিতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ইউনিটের অফিসাররা আগে থেকেই সব বাছাই করে রাখবেন।

শ্রীধরের চেম্বার থেকে চলে আসার সময় মার্শাল ওকে পিছু ডেকেছেন, 'জিশান-!

জিশান পিছন ফিরে তাকিয়েছে ওঁর দিকে।
‘তোমার স্যাটেলাইট ফোন কিন্তু তোমর সল্গে থাকবে-আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যে। শধু আমি তোমকে ফোন করতে পারব, আর তুমি আমাকে—আর কেউ নয়। ওকে?' হাসলেন : ‘আসলে কিল গেমের প্রতিতি মোমেন্টে তোমার আর আমার যোগাযোগ থাকা দরকার—তাই না?’

উত্তরে জিশান শ্ধু মাথা নেড়েছে। কোনও কথা না বলে চলে এসেছে। সক্ধে ছ'টার সময় একটা মেডিকেল টিম জিশানের কোয়ার্তারে এল।
মোট চারজন লোক। প্রত্যেকের গায়ে সাদা ইউনিফর্ম। তার ওপরে বড়-
বড় হরফে ‘মেডিক’ কথাটা লেখা।
ওদের প্রত্যেকের হাত পোত্টেবল যন্ত্রপাতি। তার কয়েকটার মধ্যে মনিটর লাগানো রয়েছে।

## www.banglabork pact.titogspot.com

ওদের একজন জিশানকে সামন্য তোতলা স্বরে বলল, ‘Э-গুড ইভনিং, মিস্টার পাল চৌুরী। মা-মার্শাল স্যারের ইনস্ট্রাকশনে আ-আমরা একটা ছোছেট্ট অপারেশান করতে এসেছি। আ-আপনার বডিতে একটা মা-মা-...।
'মইজ্রোইলেকট্রননিক ট্রান্সমিটার?' জিশান হেসে থেই ধরিয়ে দিল।
‘হ্-্যাঁ। ছো-ছেটট 'রপারেশান। কিল গেমের জন্যে এ-এ-এসেনশিয়াল।’ জিশান জিগ্যেস করল, 'আমাকে কী করতে হবে?’
'আ-আপনি কইল্ডলি বিছানায় ঔ-শুয়ে পডুন—’'
জিশান বিছানার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ল।
তারপর ওরা চারজন মিলে ওর বাঁ-হাতের ওপরদিকটায় কী যে করল জিশান তার কিছুই টের পেল না, শ্ধু প্রথমে একটা আলতো পিন ফোটানোর ব্যাপার টের পেয়েছিল।

ঘড়ি ধরে ঠিক কুড়ি মিনিট। তারপরই প্রথম লোকটি জিশানকে বলন, ‘অ-অ-পারেশান কমপ্লিট, মিস্টার পাল টৌধুরী। এবারে আপনি সোজা হয়ে বসতে পা-পারেন।

জিশান বিছানায় উঢ্ঠে বসল। অপারেশনের জয়গাটায় হাত দিয়ে দেখল। নাঃ, কোনও ব্যথা-ট্যাথা নেই। তবে টিপলে একটু শক্ত লাগছে।
 কেনি ও ব্যী পাবিন ब्या

यন্ত্রপাতি গছিয়ে নিতে-নিতে লোকটি নীচ গলায় বলল, 'আ-আমাদের ক্ষ-ক্ষমা করবেন। মার্শাল স্যারের অর্ডার। আমাদের কিছু করার নেই—।'

জিশান শ্ধু বলল, 'থ্যাংক য়ু-।'
ওরা চলে যেতেই জিশান আবার ‘পড়াশোনা’ শুরু করল। এখনও ওর পড়া শেষ হয়নি। হাতে আর সময় বেশি নেই। সময় ক্রমশ কমছে।

অনেক রাতে জিশানের ‘পরীক্ষার পড়া’ শেষ হল।
ঘড়ির দিকে তাকাল জিশান ঃ ঘড়ির অর্ধবৃত্তাকার কালো অংশে ছোট কাঁটাট একের দাগে। রাত একটা ‘বাজে।

জিশানের হাই উঠল। উইশ লিস্টের কথা মনে পড়ল ওর।
কাল রাতে সিকিওরিটি চিফের হাতে ও উইশ লিস্টটা তুলে দিয়েছে। ‘লাস্ট স্টপ’ চেম্বারে লিস্টের ‘বন্ধুদের’ দেখা পেলে ওর খুব ভালো লাগবে। কিল গেম্মে আরও, আরও, বেশি করে জিততে ইচ্ছে করবে।

জিশান আবার হাই তুলল। পায়ে-পায়ে থোলা জানলার কাছে গেল। ওই তো আকাশে চাদ-দ্বাদশী অথবা ত্রয়োদশীর। कী অপরূপ লাগছে দেখতে! সকালের নীল আকাের মতো চাদদকে উপভোগ করতে লাগল জিশান। একইসঙ্গে মনে হন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও যখন গোনা হয়ে গেছে তখন সেটকেও


তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করা যাক।
জিশান বেশ ধীরে-ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগল। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার প্রক্রিয়ার দিকে তীক্స্র মনোযোগ দিল। একইসক্সে ভাবতে লাগল, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোটা যদি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আয়ু একধাপ-একধাপ করে কমছে।

জিশান মনে-মনে বেশ অবাক হন। শ্বাস টানা কিংবা ছাড়ার ব্যাপারটা নিয়ে ও আগে কখনও এমন করে ভাবেনি। কিক্তু ভাববেই বা কেন ? ওর জীবনে আগে তো কখনও কিল গেম আসেনি।

জিশান বেশ বুঝতত পারছিল, বাকি যে-তিন ঘন্টা সময় হাতে রয়েছে, সে-সময়াঁ ওর ঘুমোনো দরকার। কারণ, ভোর চারটে থেকে কিল গেমের তোড়জোড় শুরু। বলির পাঁঠাকে তখন তৈরি করে হাড়িকাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে এই হাড়িকঠটা হাড়িকাঠের মতো দেখতে নয়, আর এটার মাপ চারশো বর্গ কিলোমিটার। তফাত শধু এইটুকুই।

কিন্তু ঘুম আসবে কি না তা নিয়ে জিশানের বেশ সশশয় ছিল। বাবার কাছে শনেছিল, ম্ত্যুদণ্ডের আসামি শাত্তি পাওয়ার আগের রাতটায় কখনও ঘুমোতে পারে না। ওর বেলাতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই।

সে-কথ্ ভাবতে-ভাবঢে আরও একবার হাই তুলল জিশান।

আরমারি ইউনিটে এসে মনের মজো পোশাক বেছে নিল জিশান। তারপর নিজের পোশাক ছেড়ে নতুন পোশাক পরে নিল। পায়ে পরে নিল কালো রঙের স্নিকার।

পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের। ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্ট—কোমরে কাপড়ের বেল্ট। চক্চকে কালো রঙেের সিনথেটিক মেটিরিয়ালের তৈরি। খুব চাপা নয়, খুব ঢোলাও নয়। প্যান্টটায় ছ’তা নানান মপপর পকেট। আর টিশার্টের ঢারটে-দুটো বুক পকেট, দুটো সাইড পকেট।

পোশাক পরে নেওয়ার পর বাছই করা অস্ত্রশস্ত্র একটা বড়সড় রুকস্যাকে ভরে নিল। জামা-প্যান্টের পরেটও বাদ গেল না। অন্ত্রণুো মারাঘ্ঘক হলেও ওজনে বেশ হালকা।

জামার বাঁ-পকেটে জিশান রাখল মিনি আর শানুর রজিন ফটো। এই ছবিটা ও এম-ভি-পি-র মেমোরি থেকে নিয়ে ওর স্পেশাল কোয়ার্টরের কালার প্রিন্টারে প্রিন্ট করে নিয়েছিন। তাই মিনি আর শানু এখন থাকবে ওর হৃদয়ের কাছাকাছি।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম দ্র্যাকারটা জিশান হাত্ইই রাখল। গেম সিটিতে ঢেকামাত্রই ওটা কাজে লাগবে।

আরমারি ইউনিটের একজন কর্মী একটা বড় মাপের কালো রিস্টওয়াচ জিশানের বাঁ-হাতের কবজিতে স্ট্রাপপ দিয়ে বেঁেে দিল। কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচ। ও গেম সিট্তিত ঢোকামাত্রই ওকে ঘড়ির একটা নীল বোতাম টিপতে হবে। তা হলেই চব্সিশঘণ্টা থেকে কাউন্টডাউন শুরু হবে। আর তার পাশাপাশি স্বাভাবিক ঘড়িও চলতে থাকবে। এই কাউন্টডাউন দেখে জিশান বুঝতে পারবে কিল গেম শেষ হতে আর কতক্ষণ বাকি।

তৈরি হয়ে নিজেকে আয়নায় দেখল জিশান। নিজেকে চিনতে পারল না। তবে ওর মনে হচ্ছিল, ছাঁ, এই লোকটার ওপরে বাজি ধরা যায়। কিল গেমে এই লোকটা সহজে হারবে না।

ও তৈরি হয়ে যখন ‘লাস্ট স্টপ’ চেম্বারে যাওয়ার জন্য রওনা হচ্ছে, তখন আরমারি ইউনিটের সাতজন কর্মী আর অফিসার ওকে উইশ করল। জিশান হেসে বলল, 'থ্যাংক য়ু—’'

পিস ফের্সের চারজন গার্ড ওকে রোবটের ভঙ্গিতে নিয়ে গেল লাস্ট স্টপ’ চেম্বারে। ওদের মুঢে কেনও কথা নেই। কালো কাচের মেঝেতে পা ফেলে ওরা এগিক্যে যাচ্ছিল
 করল নा।

দুপচাপ হেঁটে ওরা একটা বিশাল দরজার সামনে এসে দাড়াল।
ঘষা কাচের তৈরি দরজার পাল্লায় সোনালি হাতল বসানো। একটা চওড়া এল-সি-ডি ডিসপ্লে প্যনেলে ইংরেজি হরফে লেখা : লাস্ট স্টপ।

দরজা ঠেলে ভেতরে চুকে পড়ল জিশান। পিছনে তাকিয়ে দেখল, চারজন গার্ড নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। ওরা জিশানকে বিদায় জানাচ্ছে, নাকি শোকপ্রস্তাব জানিয়ে একমিনিট নীরবতা পালন করছে?

একা-একা কয়েক পা হঁটটেই একটা কাচের ঘরে পৌঁঁছে গেল জিশান। ফুওরেসেন্ট আলোয় ঘরটা ঝকঝক করছে। সেখানে টিপটপ ড্রেস পরে দুজন অফিসার দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখে একজন অফিসার বলল, 'আপনার সঙ্গে অনেকে দেখা করতে এসেছেন। ওঁরা একজন-একজন করে ওই কিউবিক্লে আসবেন। আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তবে প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার কথা বলার টাইম লিমিট হচ্ছে একমিনিট...।

কিউবিক্লটার দিকে তাকিয়ে দেখল জিশান।
ওর কাচের ঘরের লাগোয়া আর-একটা ছোট কাচের ঘর। দু-ঘরের মাঝ্েের

## २q४ www.banglaboorkpdf.bjogspot.com

দেওয়ালে একটা ছেটট জনলা—বড়জজার আট ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি।
এলেছে? সবাই এলেছে? সিক্ওওরিটি চিফ্সর হাতে বে-টইশ লিস্ট্টা ও গত পরঙ ডুলে দিক্যেছে তারা সবাই এল্সেহে?

घড়িন দিকে তাকাল জিশান। সাড় পঁচচা বাজ্জ।
घরের ডনদিকের ূেওয়ালে একটট টাচ ক্র্রিন পালেন ছিন। বেঁট মতन
 একটা মিষ্টি ইলেক্ট্রনিক সুর বেজে উ১ন। আর তার ক্্রেক সেকেড পরেই ছৌট কচের ঘরচায় এলে দাড়াল প্যাসরে। ওর চোেে घুম লেগে আছে।

জিশানের ঢোেে তাক্কে প্যাসকে একগাল হাসল: 'হই, জিশান!' 'शई!
जরপর প্যাসকো অনেকক্স্ জিশানের দিকে চেয়ে রইল। দুজনুই চুপাপ।

একসময় ছেট জনनলার ডেতর দিয়ে হাত বাড়াল প্যাসকে। জিশান ওর হাত ধরল। চাপ দিন। উঈ্ৰणর আদান্রান হন।

প্যাসকেন বনল, 'শালারা ঢোক্রর সময় এষ-রে আর মেটাল ডিটেট্ট্র

 नেनও टडरिक्न नः

জিশান সায় দিয্যে घাড় নাড়ন।
'গেম সিটিতি দুকেই আগে একাঁা বাইক হাত্যে নেবে। जারপর ওই চররশা স্কেয়ার কিলোমিणির তোমার—একা ঢেমার...|

জিশান आবার ঘাড় নাড়़।
একজন অফিসার টাচ ক্ক্রিন্ন আiুুন হোয়ানেন। মিষ্টি সুর বেজ্জ উঠন আবার।

Cিইম শেষ’ জनা অফিস্যার বলে উ১ললন।
প্যাসকো বলन, 'ఆভ লাক’' তারপর 'थাম্স आপ’-এর जপ্চিতে

 लানা গেन ना।
 নোে্যে তকিক্রে হপ করে রইল।
 কरছছ।
 www.facebook.com/groups/banglabookpdf

একে অপর্রে হাত ধরে রইন। ঢরপর সুধা মাথাঢ ওপর-নীঢ6 নাড়ান யষু। জিশানের হাতা ছো়ে দিয়ে ও আবার জিশানের দিকে অপলকে তাকিত্রে
 চট করে চলে গেন।



ওনাজির পর পাজ এন কিউবিক্লে ! ওর ঢোখ লাল। শরীরণা অল্পঅब্প টनছছ।
 ঢারপর একটা সেলাম ל্रকन।
পাভার পর মৃর্তির পালা। মূর্তি মাথা নীए করে কঁদছিল। কোন ক্থা বनত্ত পারল না। কিদিল্ণ পর, চলে যাওয়ার সময়, জিশানকে বুক চিতিয্রে एেজ ঢোধে স্যানুট করন।

মূর্তির পর ‘লাস্ট স্টপ’ চে্বোরে फুকল লেই নাম-না-জনা গার্ড—याর याড़ि নাহইত্লা গ্রাল্।।

 आপপศ।

গার্ড বনन, ‘‘ঙ, ঢোমার জন্যে এনেशি-।’
জিশান আপপলঢা নিল। তারপর ওপর হাতে হাত লেলান।
গার্ড বनল, ভগবানের ভরসায় থোো না। মনে রেণ্থো, ভা, তোাকে ছেলের কাতু खিরে শ্যেত হের...'
 কথाई।
 দাও जा হলে নোমাক্ আমার লেলের বাড়িতে বেড়াতে নিল্রে যাব—P'
‘্যা।। जिশान বলन।
 গেল।

একজন অফিসার বনলেন, আার কেনও ভিজিটর নেই। চনুন, এবার ফইইাল ম্মড়েকে ঢেক আপ...।

अফিসারের গ্খান্া করিডর ধরে জিশান এগিত্রে চলন।
একট্ট ছেট ঘরে ওর মেডিকেন ঢেক আপ হল। মা্র সাত মিনিটেই

হাই-টেক চেক আপ শেষ। তারপর ওকে নিয়ে যাওয়া হন একটা দরজার সামনে। দরজাট স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি। দেত্যেই বোঝা যায়, যথেষ্ট শক্তপোক্ত এবং ভারী।

একজন অফিসার একমনে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।
হঠাৎই দরজার ওপরে লাগানো একটা প্লেট টিভি চালু হয়ে গেল। টিভিনা যে ওখানে বসানো আছে সেটা জিশান আগে থেয়ালই করেনি।

টিভি থেকে শ্রীধর পাট্টা জিশানের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন। তবে ওঁর চোয়ালের রেখাতুলো নিষ্ঠুর।

শ্রীধর বললেন, ‘বেস্ট অফ লাক, জিশান...।’
সঙ্গে-সল্গে কোথায় যেন একটা সুরেলা ঘণ্টি বেজে উঠল। আর স্টেইনলেস স্টিলের ভারী দরজাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যেতে লাগল।

সকাল থেকে এই প্রথম প্রকৃতির আলো দেখতে পেল জিশান।
শ্রীধর পাট্টা টিভি থেকে আবার বললেন, দ্য গেম সিটি ইজ ইয়োর্স—’'

খোলা দরজা পেরিয়ে জিশান গেম সিটিতে पুকে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের নীল বোতাম টিপে দিল।

## WVNW, Danglabookodirologspotaon

মাথার ওপরে ডোরের নরম আকাশ। আর সামনে মসৃণ পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় ছড়িয়ে রয়েছে নীলচে মোলায়েম ভোরের আলো। কারণ সূর্य এখনও ওঠেনি।

রাস্তার ডানিকে, বেশ খানিকটা দূরে, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা সুন্দর-সুন্দর বাড়ি : কোনওটা গোলাপি, কোনওটা হালকা বাদামি, কোনওটা হালকা নীল অথবা চোখ-ধাঁধানো রুপোলি।

আর াঁঁ-দিকে বড়-বড় গাছের বাগান। সেই বাগান যতই ছড়িয়েছে ততই ঘন চেহারা নিয়েছে।

চো্থের সামনে এই দৃশ্যটা দেখ্থে জিশানের মনে হচ্ছিল যেন ফ্রেমে বাঁধানো একটা সুন্দর ছবি। যেন কেনও অলীকনগরীতে পা দিয়েছে ও। অথচ এখানেই মৃত্যু লেখা আছে।

জিশানের হাতে গার্ডের দেওয়া আপেলটা ছিল। একহাতে আপেল, অন্য शাত অপটিক্যাল ট্যাবলেট। চারপাশের সুন্দরকে দেখতে-দেখতে ও আপেলটায় কামড় বসাল।

कী, মিষ্ট!

## www.banglaboork patf.tologspot.com

একইসঙ্গে ওর মনে হল,লড়াইয়ের জন্য জরুরি এক জীবনীশক্তি ওর শরীর আর মনে ঢুকে পড়ন। আপেলটা খেতে-খেতে ও রাস্তা ধরে পা চালিয়ে হঁটতে লাগল। ওর দু-চোখ একটা মোটরবাইক খুঁজছিল-কিন্তু সেটা দেখা यাচ্ছিন না।

আপেলটা খাওয়া শেষ হতেই জিশান ছুটতে খরু করল। তখনই ঠিকঠাক টের পেল ম্নিকারটা কত আরামে ওর পা-কে জড়িয়ে রেখেছে।

ছুটতে-ছুটতেই বাড়িগুলোর কাছাকাছি চলে এল জিশান। তখনও ও মোটরবাইকের থোঁজে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল, তাই বাড়িগুলোর দিকে ততটা মনোযোগ দেয়নি।

একটা হইচই চিৎকার কানে যেতেই ও ওপরদিকে মুখ তুলল। কয়েকটা বাড়ির বারান্দা আর ছদ্র বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে-জিশানের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে, হাত নাড়ছে। ওরা জানে, ভোর ছ'টাতেই কিল গেম শুরু হর্যে গেছে।

ছুটতে-ছুটতে পালটা হাত নাড়ল জিশান। তারপর একটা বাড়ির কাছে এগির্যে গেল। ট্যাবলেটটা বগলে চেপে মুত্রের কছে দ-হাতের তালুর চোঙা তৈরি করে চেঁচিয়ে বলল, ‘মোটরবাইক! মোটরবাইক!’



জিশান হাত নেড়ে ধন্যবাদ জানাল। এবং ছুট্তে শুরু করল।
দশ-বারো সেকেন পেরোতে না পেরোতেই ও মোটরাবইকগুলো দেখতে পেল। রাস্তার ধার ঘেঁষে সাত-আটটা রভিন বাইক দাঁড় করানো রয়েছে। যেন সাত-আটটা রঙিন চিতাবাঘ। তারপাশে ছ'টা প্রইভেট কার। মাপে ছোট, তবে নিশ্যইই হাই-টেক।

দেড়ে গিয়ে একটা কালো চিতাবাঘের পিঠে চড়ে বসল জিশান, অপটিক্যাল ট্যাবলেটটা কেরিয়ারে রাখল। তারপর চিতাবাঘ গর্জন করে উঠল। ছুটতে শুরু করল।

এর মধ্ধেই কখন যেন সূর্य উঠে গেছে। বাড়ির মাথায়, গাছের মাথায় রোদের হোঁয়া লেগেছে।

জিশান পিচের রাস্তা ধরে বাইক চালাতে লাগল। দেখা যাক এই রাস্তাটা কেথায় গেছে!

বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বারান্দা কিংবা ছাদের দিকে তাকিত়্ে উৎসাझী লোকজনকে দেখতে পাচ্ছিল। তারা হাত নাড়ছে। জিশানকে দেখার আশায় ভোর ছ’ঢা থেকেই অপেক্ষা করছে। টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট ওুরু হয়ে গেনেও খালি চোথে সরাসরি দেখতে পাওয়ার আনন্দই আলাদা।

२৮২ www.banglabjofk pêtf.tᄒilogspot.com
বাড়ির সারির ফাঁকে-ফাঁরে বেশ কয়েকটা টিভি ক্যামেরা জিশানের চোখে পড়ল। বাঁ-দিকে তাকিয়ে একইরকম দৃশ্য দেখতে পেল জিশান। গাছে-গাছে লাগানো টিভি ক্যামেরার চোখ। নাঃ, শ্রীষর পাট্টার প্ক্যানিং-এ কোনও গণ্ডগোল নেই!

প্রায় পনেরো মিনিট বাইক চালানোর পর গেম সিটির একটা বাউঙারি ওয়ালের কাছে পৌছে গেন। কলো পাথরে তৈরি শক্তিশালী পাঁচিল। দেখামাত্রই জেলখানার কথা মনে পড়ে।

রাস্তাটা াঁা-দিকে ঘুরে গেছে। জিশানও রাস্তা ধরে বাইক ঘোরাল। একপলক হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ছ'ঢাঁচিশ। জলতেষ্টা পাচ্ছে-তার সঙ্গে খিদদেও।

একটু পরে রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করাল। কেরিয়ার থেকে অপটিক্যাল ট্যাবনেট বের করে লাল রঙের চৌকো বোতামটা টিপল। পরদায় কতকণুলো লাল ব্লিংকিং ডট ফুটে উঠল। জিশানের ফুড ম্যাপ। পটাপট বোতাম টিপে সবচেয়ে কাছাকাছি ফুড পয়েন্টা কোথায় দেতে নিল জিশান। তারপর ট্যাবলেট কেরিয়ারে ঢুকিয়ে আবার বাইকে চড়ে দেড়।

ন্যাবলেটের নিশানা বারবার চেক করে রাস্তা ছেড়ে গাছপালার মধ্যে

 পেয়ে গাছের পাখিরা ডেকে উঠল। এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল।

একটা ফুড পয়েন্টের কাছে পৌঁছে বাইক থামাল। নেমে পড়ল বাইক থেকে।

ঢারপাশে বড়-বড় গাছ। তাদর ঘিরে ছোট-বড় আগাছ। চোথে পড়ল, প্রজাপতি আর ফড়িং উড়ে বেড়াচ্ছে।

ট্যাবলেট্টা হাতে নিয়ে ফুড পয়েন্টটার ন্লিংকিং ডটে আডুল ছোয়াল জিশান। সক্গে-সঙ্গে খুব কাছাকাছি কোনও লুকোনো জায়গা থেকে পিপ্-পিপ্ শব্দ শোনা গেন। চারপাশে তাকাল। কোথা থেকে আসছে শব্দটা?

নাবলেটট হাতে নিয়ে শব্দের উৎসের লোঁজ করতে লাগল। এবং একমিনিটের কম সময়েই ひ্থাজ পেয়ে গেল।

একটা বিশাল গছের গোড়ার কাছ থেকে শব্দটা আসছে। পিপ্-পিপ্, পিপ-পিপ।

দৌড়ে সেখানে গেল জিশান। হাঁুুগেড়ে বসে পড়ল। পড়ে থাকা ক<্যেকটা পাতা সরাত্ই চোেে পড়ল ঝুরো মাটি।

পকেট থেকে একটা অন্ত্র বের করল ঃ হান্টিং নাইফ। টেম্পার্ড স্টিলের

সাত ইঞ্চি লম্বা ব্রেড। একদিক ধারালো, অন্যদিকে কুমিরের পিঠের মতো খাঁজকাটা। ছুরিটা বাগিয়ে ধরল। তারপর মাটি খুঁড়তত শুরু করল।

একটু পরেই দেখা গেল একটা স্টিলের বড় বাক্স। তার গায়ে অড্ভুত ধরনের সব ভাঁজ। সেটা টেনে বের করল। ঝুরো মাটি ঝেড়েবুরে বাক্স খুলল। ওর খাবার দেখতে পেল জিশান।
ছ’ঢা চিকেন স্যাভ্উউচ। চারটে ডিমের ওমলেট। আর দু-লিটার জলের একটা বোতল।

মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। চটপট খাওয়া শুরু করল।
খেতে-খেতেই জিশানের মাথায় একটা আইডিয়া এল। আচ্ছা, ফুড পয়েন্টগুলোকে আর্ম্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হয়!

কথাটা মাথায় আসামাত্রই জিশান দুরন্ত স্পিডে খাওয়া শেষ করল। বোতল থেকে ঢক্ক করে জল থেল। ছিপি টইইট করে এঁটে বোতলটা আবার রেখে দিল বাক্সের ভিতরে।

জিশান চারটে স্যাঙউউইচ খেয়েছিল। দুটো বাক্সে রেখে দিয়েছিল। কারণ, ওর মনে হর্যেছিল, বাক্সের খাবার শেষ করে দিলে ফুড ম্যাপে এই নির্দিষ্ট ফুড পয়েনটটা ন্নিংকিং ডট হিসেবে আর নাও দেখা যেতে পারে। শ্রীষর পাট্টার দুষ্ম বুদ্ধিকে বিশ্যাস নেই।
 ও ঠিক করেছে এই পর্রেন্টুলোতে ও রুকস্যাকে ভরা নানান আর্ম্স লুকিয়ে রাথবে। তা হলে ফুড ম্যাপের বোতাম টিপলেই ও একইসক্গে ফুড পয়েন্ট আর আর্ম্স পয়েন্ট দেখতে পাবে। অথচ ওর শক্ররা এই লোকেশনগুলোর একট্াও দেখতে পােে না।

সুতরাং কাজ খরু করলল জিশান।
র্রুকস্যাক থেকে বের করে নিল লেজার পয়েন্টার লাগানো হাই-রেঞ্জ টুয়েন্টি ঐটার অটোেেটিক পিস্তল। সেটাকে মাটির নীচে ফুড বর্সের পাশে তৃয়ে দিল। তারপর মাটি চাপা দিয়ে তার ওপরে শুকনো পাতা আর ডালপালা কুড়িয়ে আগের মতোই ছড়িয়ে দিল।

জিশানের হঠাৎই মনে পড়ল টিভি ক্যামেরার কथা। ক্যামেরার চোখগুলো নিশ্চয়ই ওর ওপরে সর্বক্ষণ নজর রাখছে। তা হলে কোটি-কোটি মানুবের কাছে জিশানের এই কাণকারখানা লাইভ টেলিকস্টের মাধ্যমে এই মুহূর্তে পোঁছে यাচ্ছে!

সে যায় যাক! ত না হলে ইঁদুর আর বেড়ালের লুকোচুরি খেলা জমবে কেমন করে! তা ছড়া ওর তিন শত্রু কখনওই জিশানের এই কৌশলের কথা জনতত পারবে না। কারণ, ওরা কোনওভবেই টিভির লাইভ টেলিকাস্ট দেখতে

পাবে না। জিশানের হিলেব অত্তত তাই বলছে।
গেম সিটির ‘নাগরিকরা’ তখন কিল গেম্মের লাইভ টেলিকাস্ট দেখছিল। চলমান ছবির পাশাপাশি চলছিল উত্তেজনা আর উৎকঠার মশলা ঠাসা ধারাভাষ্য। ধারাজাষ্য যিনি দিচ্ছিলেন তিনি আবেগ মাখানো জেেরালো গলায় জিশানের বুদ্ধির তারিফ করছিলেন। বলছিলেন, কিল গেম শুধু শারীরিক শক্তি আর দক্ষ্ততর মোকাবিলা নয়, বুদ্ধির উদ্ভাবনী ক্ষমত আর ধারেরও লড়াই।

কাজ শেষ করে উঢে দাঁড়াল জিশান। চারপাশে তাকান। গাছপালা, আলোছায়া। শোনা যাচ্ছে দু-তিনরকমের পাথির ডাক।

एঠাৎই অড্রুত একটা শব্দ জিশানের কানে এল। কেউ যেন মিহি গলায় কাশছে। অথবা হাসছে।

একটা গাছের ঔঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। কই, কেউ তো কোথাও নেই!

শব্দটা আবার শোনার জন্য জিশান দম বন্ধ করে অপেক্ষ করতে লাগল।
হঠাৎই বাঁ-দিকের একটা নড়াচড়া ওর চোের কেণে ধরা পড়ল। চকিতে চোখ ফেরাল জিশান। সঙ্গে-সঙ্গে আশঙ্কর ঠাভ্ডা ছোবল টের পেল বুকের ভেতরে।



বাদামির ওপরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। কুকুরের চের্যেও বড়সড় চেহো। কানতলো ভোঁতা। গলার বেশ কিছুটা জায়গায় কালচে রং।

এমনিতে হায়েনা যে মানুষকে আক্রমণ করে না সেটা জিশান জানে। কিন্তু এই তিনটে লোভাতুর প্রানীকে দেথে ও তেমন একটা ভরসা পাচ্ছিল ना।

গত কয়েক মালে জিশান বহৃবার গেম সিটি নিয়ে ত্রীধর পাট্টার সল্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু ত্রীধর একটিবারের জনাও ওকে বলেননি যে, গেম সিটির জঙ্গনে হিহ্র প্রাণী রয়েছে।

তা হলে কি হয়েেনার চেয়ে বড়সড় প্রাণীও থাকতে পারে এই জঙ্গলে?
তা ছাড়া এই হা্রেনাণুলো স্বাভাবিক হা্রেনা কি না কে জানে! হয়তো শ্রীষরের পোষা বিজ্ঞানীরা এদের শরীরে নানান কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে এদের আরও হিহ্র, আরও বেপরোয়া করে তুলেছে।

জিশান আড়চোেে দেখল, বাইকটা ওর যথেষ্ট কাছাকাছি রয়েছে। সুতরাং আর দেরি না করে ও দ-ল্াাফে বাইকের কাছে প্পৗঁছে গেল। চোখের পলক ফেনতত না ফেলতেই বাইকে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছুট্টিযে দিল।

আশর্য! হায়েনা তিনটে লাফ মেরে বেরিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে।
www.banglabookpdf.blogspot.com


এবং রাস্তার নেড়ি কুকুরের মতো জিশানের বাইকটটকে তাড়া করতে শুরু করল। यদিও জিশানের বাইকের হাই মোটিভ পাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যোই হায়েনাগলোকে পিছনে ফেলে দিল।

জিশান ঠিক করল দু-ঘণ্টার মধ্যে বৌুকু সময় হাতে আর বাকি আছে তার মধ্যে ও যতগুলো ফুড পয়েন্ট পারবে কডার করবে।

গেম সিটির মধ্যে জিশানের বাইক ছুটে বেড়াতে লাগল। কখনও জঙ্গলে, কখনও রাস্তায়, কখনও বা নদীর ওপরে ফ্লাইওভারে। আবার কখনও পাহাড়ে।

যতই घুরে বেড়াচ্ছিল ততই অবাক হচ্ছিল জিশান। চারশো বর্গ কিলোমিটরের মধ্যে কীভবে একটা বিচিত্র শহর তৈরি করেছেন শ্রীধর! এখাে বাড়ি-ঘর আছে, নদী আছে, জঙ্গল আছে, পাহাড় আছে-এমনকী বন্গপ্রণীও ঘুরে বেড়াচ্ছে গছের আড়ালে! এরকম নকল শহর সিনেমার শুটিং-এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কিংবা অবসর বিন্নেদনের রিসর্ট হিসেবে। কিক্তু শ্রীষর পাট্টা এই শহরটা তৈরি করেছেন বধ্যভূমি হিসেবে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি টাকা রোজগারের জন্য বিনা ঝুঁকির বিনিয়োগ।

রাস্তা ধরে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল জিশান। পথ ঘেঁষে অনেকগুলো বাড়ি
 आর মেটরববইইな

কয়েকটা বাড়ির দরজায় লোকের ভিড় চোথে পড়ল। ওরা বোধহয় টিভির লাইভ টেলিকস্টে দেখতে পেয়েছে জিশান এই পথ দিয়েই আসছে।

জিশানকে দেখামত্রই ওরা সবাই ইইচই করে উঠল, হাত নাড়তে লাগল। হঠাৎই ভিড় থেকে ছিটকে বেরির্যে এল একটা বাচ্চা ছেলে আর একটা ছোট মেয়ে। ছেলেটার বয়েস বোধহয় ছয় কি সাত, আর মেয়েটার ন’দশ। ওদের বাবা-মা আর অন্যান্য মানুষজন দরজার কাছটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওদের ডাকছিল, ‘রাস্তায় যাস না! চলে আয়! শিগগির ফিরে আয়!

কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলেটা আর মেয়েটা একেবারে জিশনের বাইকের পথ আটকে দাঁড়াল। ‘জিশান! জিশান!’ বলে চিৎকার করতে লাগল।

জিশান ঘড়ি দেখল। আটটা বাজতে এখনও কুড়ি মিনিট বাকি। এই কুড়ি মিনিট গেম সিটির পথঘাট নিরাপদ-কারণ, কিলাররা এখনও মাঠে নামেনি। জিশান ইচ্ছে করলে ওদের পাশ কাটিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু সেটা করল না। ও বাইক থামাল। कী বলতে চাইছে বাচ্চা দুটো? ছেলেটার মুঢের সঙ্গে ছেলে শানুর মুখের মিল খুঁজে পেল। জামার বাঁ-পকেটের ওপরে হাত ছোয়াল। মিনি আর শানুর ফটো অনুভব করল।

জিশান বাইক থেকে নামল। বাচ্চা দুটো তীরবেগে ছুটে চলে এল ওর

কাছে। একসঙ্গে বনে উঠন, 'অটৌগ্রাফ দাও, জিশানকককু-অটোগ্রাফ।'
তখনই থেয়াল করল, দুজনের হাতেই একটা করে পাতলা খাতা, আর পেন।

জিশান ফুটফুটে বাচ্চা দুটোর মুখ্ের দিকে তাকাল। তারপর পেন নিয়ে খাতা দুটোর পাতায় পরপর সই করল। তারপর বড় করে লিখ্ে দিল, 'ভালোবাসা নাও—’

বাড়িগুলোর দরজার কাছে আর দোকনের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন চিৎকার করতে লাগল, ‘জি-শান! জি-শান!’

জিশান সেদিকে তাকিয়ে হাত নাড়ন। তারপর বাচ্চা দুটোকে নাম জিগ্যেস করল।

মেল্রেটার নাম টুকটুকি, আর ছেলেটটর নাম কাঞ্চন।
কাঞ্চন বলল, 'জিশানকাকু, আমরা তোমার সঙ্গে ফটো তুলব—।’
এ কী আবদার! সময় যে বড় কম! আর-একটু পরেই কিলাররা গেম সিটিতে ঢুকে পড়বে!

টুকদুকি জিশানের হাত ধরে টানতে শুরু করল : ‘এসো না! এসো! ওইখানটায় দ্যাখো—টিভিতে তোমকে দেখচ্ছে। চলো, দেখবে চলো...।'



জিশান যেন কোন এক জাদুমন্ত্রে অবশ হয়ে গেল। নাকি বলা ভালো, বশ হয়ে গেল। টুকটুকির ওপরে নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছেকে ছেড়ে দিল। পায়েপায়ে এগোতে ুরু করল রাস্তার ধারের একটা ফাস্ট ফুডের দোকনের দিকে।

আশপশের ভিড় করা জনতা ইইইই করে উঠল। ‘জিশান! জিশান!’ বলে চিৎকার করতে লাগল। לুকদুকি আর কাঞ্চন জিশানের দু-হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। ক্যামেরার আলোর ঝলক দেখা গেল বারবার। ওদের ফটো উঠতে লাগল।

দোকানের কাছে যেতেই জিশানকে ঘিরে ভিড় জমে গেল। ওকে একবার হেঁয়ার জন্য লোকজন পাগলামি শুরু করে দিন। টুকটুকি দোকান থেকে একটা কেক নিয়ে জিশানকে দিল : ‘কাকু, এটা থেয়ে নাও-श্লিজ!’

জিশান ছোট মেয়েটার চোখের দিকে তাকাল। ওর চোেে মায়ের মমতা।
জিশান 'না’ বলতে পারল না। কেকটা থেতে লাগল। তখনই কে একজন একটা জলের বোতল বাড়িয়ে ধরল ওর দিকে।

জিশান জল খেল। তখনই ওর প্রেট টিভির দিকে চোখ গেল। দোকনের একটা দেওয়ালে প্রকাণ মাপের প্লেট টিভি। সেখানে জিশানকে দেখা যাচ্ছে। চারপাশে মানুযজনের ভিড়।

২৮৮ www.banglaboôkpetf.tologspot.com
টিভির কর্মেন্টেঁর তখন বলছেন, ‘...আপনারা দেখুন, একটা ছোট্ট মেয়ে ওর "Eিশানকাকু"-কে একটা কেক খাওয়াল। আমরা এই মেয়েটিকে তিরিশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেব। যারাই আমাদের সুপারহিরো জিশানকে সাপোর্ট দেবে, হেল্প করবে, তাদের জন্যে রয়েছে নানা অ্যামাউন্টের প্রাইজ মানি। ওয়েল ফেক্স, আর-একাু পরেই তরু হবে কিল গেম্মের অ্যাকশন...।'

নিজ্রেকে টিভির পরদায় লাইভ টেলিকল্টে দেখতে পেয়ে জিশানের বেশ মজা লাগছিল। ও ঝুঁকে পড়ে এক হাঁচকায় কাঞ্চনকে কোেে তুলে নিল। সল্গে -সল্গে টিভির পরদায় সেই ছবি চলে এল। ছবির পাশাপাশি ধারাবিবরণী।
‘‘েখুন—আপনারা জিশানকে দেখুন! কী পারফেক্ট্ট! কী সাংঘাতিক কুল!’ এবার কমেন্টেটরকে দেখা গেল। চশমা চোখে পোড়খাওয়া একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক। কপালে ভাঁজ, মাথায় টাক। গলায় একটা সোনার চেন। তাঁর পাশেই বসে আছে অল্প পোশকের একজন তরুণী। মুখে চড়া মেক-আপ।

কম্মেন্টেটর তখন বলছিলেন, 'আমার পাশেই বসে রয়েছেন কিল গেম আরকাইভের সিইও শবনম। ঠিক-ঠিক সময়ে শবনম আপনাদের পুরোনো কিল গেমের নানান ক্লিপিংস দেখাবেন, যাতে পুরোনো কিল গেম্মের সিচুয়েশানের সঙ্গে আপনারা নতুন কিল গেম-মানে, জিশানের কিল গেম কম্পেয়ার কর্তে
 মাখানো। আপনারা নিশ্যয়ই জনেন, ওর বছর দেড়েকের একটা ছেলে রয়েছে—ভলো নাম অর্কনিশান। আর ডাকনাম শানু। দেখুন, দেখুন, কেলে তুলে নেওয়া বাচ্চা ছেলেটিকে জিশান কীভবে আদর করছে। অথচ....অথচ এই জিশান—জিশান পাল টৌধুরী—একটু পরেই হয়ে উঠবে নির্মম, নিষ্ঠুর। ঠান্ডা মাথায় ও তখন কিল গেমের তিন-তিনজন কিলারের সঙ্গে সশস্ত্র মোকাবিলা করবে।

আটটা বাজতে এখন পাঁচমিনিট। আর পাচমিনিট পরেইই খুনিরা भা রাখবে গেম সিটিতে। ๗ুরু হবে ইঁদूর আর বেড়ালের লড়াইয়ের থেলা। কিন্তু কে ইঁদুর আর কে বেড়াল সেটাই প্রশ্ন। এখন নিচ্ছি একটা বিষ্ঞাপনের বিরতি। চারমিনিট পরেই আবার ফিরে আসছি। টিভির সামনে থেকে কোথাও যাবেন ना, প্লিজ...।’

শুরু হয়ে গেল বিভ্ঞাপন।
জিশান ঘড়ির দিকে তাকাল। আটটা বাজতে চার মিনিট।
না, আর দেরি করা যাবে না। কাঞ্চনকে কোল থেকে নামিয়ে দিল। আকাশের দিকে তাকাল। ঝকঝকে নীল আকাশ। তবে তার পশ্চিমদিকে হালকা মেঘের চাদর। বাতসে বসন্তের ছোয়া। জিশানের শ্বাস নিতে ভালো লাগছিল।

ও চারপাশের ভিড়ের দিকে তাকাল। মানুষগুলোকে দেখেও ওর ভালো লাগছছ। মনে হচ্ছে ও জীবনের অনেক কাছাকাছি রয়েছে।

কিস্তু না। এখনই ওকে মোটরবাইকে চড়ে ছুট লাগত্ হবে। আর এই মানুষগুলোও দোড়ে চলে যাবে ওদের বাড়ি কিংবা দোকানের ভেতরে-ওদের নিরাপদ আশ্রয়ে।

बুঁকে পড়ে কাঞ্চন আর টুকুুকির মাথায় চুমু গেল জিশান। আর তারপরই দৌড়ল রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ওর বাইকের দিকে।

ভিড় থেকে দু-তিনজন চিৎকার করে বলল, ‘জিশান, আমরা তোমার পাশে আছি। আমরা তোমার ফ্যান!’

ততক্ষণণে জিশানের বাইক ছুটতে শুরু করেছে।
কিন্তু কিছুটা পথ গির্যেই একটা ফাঁকা মাঠে পোঁছে গেল। ধু-ধু প্রন্তর। তেউখ্থোনো উচু-নীচ মাঠ। আর কোথাও সবুজ ঘাস, কোথাও ধুলো আর মাটি। এ ছাড়া কয়েকটা বড়-বড় গাছ—এএদিক-ওদিক ছড়িয়ে।

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বেজে এক মিনিট।
বাইক থামাল জিশান। বইইকের আওয়াজ থেমে যাওয়ামাত্রই চারপাশে স্ত্দতা নেমে এল। শুধ্রু বহ্দূর থেকে ভেসে আসা কয়েকটা পাখির ডাক।
 তারপর দ্রাপার অন করল।

ওই তো দেখা যাচ্ছে তিনটে লাল ডট! যে-দরজা দিয়ে জিশান গেম সিটিতে ঢুকেছিল সেই দরজা দিহ্যেই তিনজন কিলার গেম সিটিতে ঢুকেছে। তবে তিনটে ডট এখনও খুব কাছাকাছি। তার মানে, ওরা হয়তো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে গেম প্ৰ্যান তৈরি করছে।

জিশান টাচ স্ক্রিনে আডুল ছেঁয়াল। লাল ডট তিনটে যে-স্কোয়ার টাইলের মধ্যে ছিল সেটা বড় হয়ে ক্লোজ আপ ভিউ দেখাল।

জিশান ঠিকই ভেবেছে। গেম সিট্তিতে पুকে ওরা এখন পিচের রাস্তায় রয়েছে। द্বাকাকরে জিশানের সবুজ ডটটটা ওরা দেখতে পাচ্ছে। হয়তো ভাবছে, রাস্তায় পার্ক করা গাড়ি আর বাইকগুলোর মধ্যে কোনটা নেবে এবং ক’তা নেবে।

ইস, জিশানের সঙ্গে একটা প্লেট টিভি থাকলে ভালো হত! ও সরাসরি কিলারদের দেখতে পেত। ওরা কোন অস্ত্র ব্যবহার করতত চলেছে সেটাও জননতে পারত।

আপনমনেই মাথা নাড়ল জিশান। নাঃ, একটা প্লেট টিভি দরকার। কিন্তু কীভাবে সেটা পাওয়া যায়?

আচ্ছা, একটু আগেই বেসব মানুষজনের সঙ্গে ওর দেখা হল তাদের

## 

কাছে চাওয়া যায় না? একটা ছোট টিভি চাইলে জিশানকে ওরা দেবে না? নিশ্চইয় দেবে।

জিশান বাইক ঘোরাল। এখন শ্ধু দরকার স্পিড...স্পিড।

ধু-বু ফ্লইওওারের ঠিক মাঝখানটিতে পোঁছে মোটরবাইক থামাল জিশান। বেলা বেড়েছে। রোদ অনেক চড়া হয়েছে। বাতাস বইছে। জিশানের লম্বা চুল উড়হে।

ফ্মাইওভারের রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে তাকাল। অনেক নীচে ঠাডা জলের নদী। কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দেখলেই মনে হয়, এ জগতে সবকিছু শাষ্তি-কল্যাণ হয়ে আছে।

ফ্বাইওভার বরাবর দু-দিকে তাকাল। অনেক দূর পর্যত্ত দেখা যাচ্ছে। ফ্নাইওভারের মাঝাখানটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁদ হওয়ায় নজর চালানোর সুবিধে হয়েছে। বাইক নিয়ে গেম সিটির সর্বত্র দুরন্ত ছুটোছুটি না করে কোথাওকোথাও বাইক দাঁড় করিয়ে চুপচাপ বিশ্রাম নেওয়াটা অনেক বেশি কজের। তাত্ হাপিত্রে यাওয়া শরীরে নতুন শক্তি ফিরিরে आসে। আর একইসল্গে কিন
 দ্র্যাকারের দিকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে-কিলারদের কাছ থেকে জিশানের দূরত্ব খুব বেশি কমে না যায়।

নদীর দৈর্ঘ্য বরাবর চোখ মেলে দিল জিশান। कী নাম এই মিষ্টি নদীটার? কে জানে! যতদূর চোখ যাচ্ছে তুধু গাছপালা। তারই মাঝে হঠাৎ করে মাথাচড়া দিয়েছে দুটো পাথুরে পাহাড়। আবার ডানদিকে চোখ সরালেই চোথে পড়হে ঘর-বাড়ি-বে-ঘর-বাড়িগুলো শুধু আজকের জন্য মানুশে-মনুুে জমজমাট। কাল সকালের পর আবার সব ফাঁকা! তখন এই গেম সিট্টিা খাঁ-খাঁ করবে।

আকাশে কয়েকটা চিল উড়ছিল।। ওরা বাঁশি বাজনোর শব্দ করে ডাকছিল। সেদিকে ভুরু কুঁচে তাকাল জিশান। शতের পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তারপর বাইকের কেরিয়ার থেকে ট্রাাকারটা বের করে নিল।

ওই তো তিনটে লাল ডট! একে অপরের কাছ থেকে দূরে চনে যাচ্ছে।
জিশান বুঝ্রত পারল, তিনজন কিলার কী করতে চাইছে। ওরা তিনদিক থেকে সবুজ ডটটাকে ঘিরে ফেনতে চাইছে। যাতে সবুজ ডটটা সবসময় তিনটে লাল ডট দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের মধ্যে থাকে। তারপর তিনটে লাল ডট ক্রমশ ত্রিভুজটাকে মাপে ছোট করতেে থাকবে। একসময় লাল ডট্তুলো হিস্র্রভাবে সবুজের ঘাড়ে এসে পড়বে।

## www.banglaboofk padf.bitogspot.com

ফ্যাইওভারের যা কো-অর্ডিনেট তাতে লাল ডটুুলো এদিকটায় সরে আসতে বেশ সময় নেবে। আর যদি আচমকা ওরা এসেও পড়ে তা হলে জিশান ফ্লাইওভারের উক্তর দিকের রাস্তা ধরে নেমে আসবে। ফ্লাইওভার শেষ হওয়ার পাচচ-ছ’ হাত পরেইই একটা কাঁচা রাস্তা ঢলু হয়ে নেমে গেছে বাঁ-দিকে। তারপর সোজা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। জিশান সেই কাঁচা রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়বে জঙ্গ লে—গাছপালার আড়ালে গা-ঢাকা দেবে।

এবার টিভিটা একবার সুইচ অন করে দেখা যাক।
যে-প্লেট টিভিটা গেম সিটির ‘সিটিজেন’রা জিশানকে ইইইই করে গিফ্ট করেছে সেটার মাপ মাত্র আট ইঞ্চি। জিশান ইচ্ছে করেই সবচেয়ে ছোট মাপের টিভিটা চেয়েছে। ওটা দেখারও সুবিধে, ক্যারি করাও সুবিধে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে আবার প্লেট টিভিটা বের করে নিল জিশান। তারপর সুইচ অন করল।

কয়েক সেরেঙ্ডের মধ্যেই রভিন ছবি ফুটে উঠল টিভিতে। আর সেই ছবি দেখামাত্রই জিশান হত্বাক হয়ে গেল।

কারণ, টিভির পরদায় তখন অপাশি কানোরিয়াকে দেখা যাচ্ছে। নিপ্পাপ, গোলগাল ফরসা মুখ। গাল আর থুতনিতে হালকা দাড়ি। এই খুনিকে জিশান টিভির পরদাত্ আগগ দ্খেছে। কিন গেলের তিনজন কিলারের পরিচয় নিয়ে


সেই প্রতিযোগিত্তার শেষে দুজন কিলারের পরিচয় দর্শকদের জানানো रয়েছিল। আর তিন নম্বর কিলারের পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল-শ্রীধর পাট্টার নির্দেশে। ফলে প্রতিয্যোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়নি, আর পুরস্কারও মুলতবি রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে, কিল গেমের সময়েই তিন নম্বর কিলারকে প্রথম দেখা যাবে, আর তথনই প্রতিযোগিতার পুরস্কর বিজ্জোদের নাম টিভিতে ঘোষণা করা হবে। সারপ্রাইজ।

না, এসব ব্যাপারের জন্য জিশান অবাক হয়নি। কারণ, এসব তথ্য ওর আগে থেকেই জনা।

ও অবাক হয়েছে, কিলার অপাশি কননোরিয়ার হাতে একটা স্যাটেলাইট ফেন দেণ্ে। खে-ফোনে অপাশি এখন কথা বলছে আর-একজন কিলার সুখারাম নস্করের সঙ্গে।

তিনজন খুনি যে নিজেদের মধ্যে স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করবে একথা শ্রীধর পাট্টা জিশানকে জানাননি। কারণ, সারপ্রইজ!

জিশান বুঝরত পারল, স্যাটেলাইট ফোনের একটনা সাহায্য নিয়ে তিনটে লাল ডট অত্যত্ত সাবলীলভাবে সবুজ ডটের নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আর জিশানের স্যাটেলাইট ফোনটা শধুমাত্র শ্রীধর পাট্টার সঙ্গে কথ্থা বলার জন্য।

## ২৯২ www.banglabroêk pợf.błogspot.com

## অনেকটা যেন শ্রীধর আর ওর মধ্যে ইন্টারকম ফোন।

কিলার অপাশি গাড়ি চালাচ্ছিল। গাড়ি চালাতে-চালাতেই ফোে কথা বলছিল।

আর কিলার সুখারাম একটা চলন্ত বাইকের পিঠঠ বসে আছে। লাল আর কলো রঙের বাইক। বাঁ-গতে একটা হাতল ধরে রয়েছে। ডানহাতে ফোন। টিভিতে ধারাবিবরণী চলছিল।
পোড়খাওয়া মোটসোটা কমেন্টেটর তখন বলছেন, ‘কিলারদের কথাবার্তা আমরা ভালো করে ওনতে পাচ্ছি না, তবে ওদের প্ল্যানটা মোটামুটি গেস করা যাচ্ছে। ওরা জিশানকে ট্রায়াঙ্গুলার ট্র্যপপে ফেলতে চায়। তাড়াহড়োর কোনও ব্যাপার নেই...ওদের হাতে এখনও অনেক সময় আছে...।'

এবার টিভির ক্যামেরা অপাশি কানোরিয়ার সিটের ওপরে ফোকাস করল।

কানোরিয়ার পাশেই সিটের ওপরে রাখা আছে কয়েকটা অস্ত্র। जার মধ্যে একটা অড্রুত ধরনের বন্দুক। রিভলভারের চেয়ে মপে একটু বড়, তবে নলটা একটু বেশি মোটা আর লম্বা। ধারাভাষ্যকার অস্ত্রটার পরিচয় দিল : মিসাইল গান। এ থেকে যে-বড় মাপের বুলেট বা শেল বেরোয় সেটা ইনফ্রারেড রশ্মির উৎস লক্ষ্শ করে ছটে যয়। জীবন্ত মানুয্যের শরীর হল তাপেরু উৎস। লেই
 একজন মানুযকে এই মিসাইল গানের বুলেট আঁকাবাঁকা পথে তাড়া করে হিঁট করতে পারে।

মিসাইল গানের পাশেই রয়েছে নানান মাপের তিনটে চপার। কানোরিয়ার ‘বাউড্ডারি’ মারার ‘ব্যাট’। কিন্তু আজ ওর সামনে বাউঙ্ডারি মারার সুযোগ নেই। আজ শু জিশান-মানে, একটা ‘xর্ট রান’। কিন্তু এই শর্ট রান নিতে গেলে শক্রুর কাছে পৌঁছতে হবে। দুশমনটাকে পেতে হবে চপারের নাগলে।

কানোরিয়া সম্পর্কে টিভিতে অনেক কথই শুনেছে জিশান। জেনেছেও অনেক কথা। কিন্তু সেইসব ভয়ংকর তথ্য জানার পরেও ওর কোনও হেলদোল হয়নি। কারণ, ভয় পাওয়ার বাপারটা জিশানের মধ্যে থেকে কয়েক মাস আগেই উধাও হয়ে গেছে।

কিলার অপাশির সঙ্গে কিল্ার সুখারামের ফেনে কথাবার্তা চলছিল। টিভি ক্যাচেরা পালা করে একবার একে আর-একবার ওকে দেখাচ্ছিল-ঠিক সিনেমার মতन।

ছোটমাপের এই প্লেট টিভিটা হাতে না পেলে জিশান খুনিদের স্যাটেলাইট ফোনের বাপারটা জনতেই পারত না। ভাগ্যিস একটা টিভি জোগাড় করার কথা ওর মনে হয়েছিন!

টিভির ল্থোজ করতে কাঞ্চন আর টুকটুকিদের বাড়ির কাছেই আবার ফিরে গিত্যেছিল জিশান। ওকে ফিরে আসতে দ্থে জনতা ইইইই করে উঠেছিল। ওর মোটরবাইক ঘিরে ধরেছিল চোেের পলকে।

দু-হাত তুলে ওদের হুল্লোড় আর উৎসাহ থামিয়ে একটা ছোট টিভির জন্য আবেদ্ করেছিল জিশান। ব্যস, তততেই কাজ হল। এক মিনিটের মধ্যেই নানান মাপের ছ’-ছ'টা প্লেট টিভি এসে হাজির হন ওর সামনে। তার মধ্যে থেকে আট ইঞ্চি ডায়াগনালের ছোট প্লেট টিভিটা জিশান বেছে নিয্যেছিল।

জিশান আর দেরি করল না। ট্ব্যাকার আর টিভি গুছিয়ে রেথে বাইকে স্টার্ট দিল। ফ্লাইওভার পেরিয়ে বাঁ-দিকের ঢলু রাা্তা ধরে নেমে গেল।

একটু পরেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেন। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে প্যাঁালো সুঁড়িপথ। তার ওপর পথটা আবার ডাল, পাত আর আগাছায় ঢাকা। তারই ওপর দিয়ে জিশানের বাইক কোনওরকম্মে এগিয়ে চলন।

বাইকের গর্জনে গাছে বসে থাকা পাখিরা চঞ্চল হয়ে ডাকতে লাগল, ডানা ঝাপটে এ-গাছ থেকে ও-গাছে ওড়াউড়ি করতে লাগল। ছোট চেহারার গোলাপি বানরের দল চি-চি শব্দ করে ডালে-ডালে ছোটাছুটি করতে লাগল। ছইইরেের দুটো খরগোশ চমকে উঠে ছুটে পালাল।

 রেরে ও যে কোনও একটা গোপন আস্তানায় লুকিয়ে পড়বে তারও উপায় নেই। দ্র্যাকারের সবুজ ডট ওর নিথুঁত কো-অর্ডিনেট শর্রুদ্রের জানিয়ে তো দেবেই, উপরন্তু ওর ছেড়ে যাওয়া বাইকটাঁ নিঃশ্দ চিৎকারে জানিয়ে দেবে যে, ও কাছাকাছিই কোথাও লুকিত্যে আছে।

তা হলে শক্রুদের চোথে ধুলো দেওয়ার উপায় কী?
এসব কথা ভাবতে-ভাবতে জিশান বোধহয় একাু আনমনা হয়ে পড়েছিল। হঠাৎই ও দূরে গাছের আড়ালে দুটো হরিণ দেখতে পেল। হরিণ দুটোর গায়ের রং সোনালি-বাদামি আর সাদা। পেটের কাছ বরাবর লম্বা গা়় বাদামি দাগ। মোটরবাইকের আওয়াজে ওরা চমকে তাকিয়েছে জিশানের দিকে। তারপরই জঙ্গলের মধ্যে ছুট লাগিত্রেছে।

জিশান বাইক থামাল। আর কতক্ষণ ও এই বাইকটা নিয়ে ছুটবে? কারণ, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো এই মেশিনটার তেল ফুরিয়ে যাবে। তখন?

জিশানের বিভ্রান্ত লাগল। নানান চিষ্তা ওর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল।

একটু পরেইই ট্ব্যাকারটা বের করে দেখল ও। একটা লাল ডট ওর সবুজ ডটের বেশ কাছে এসে গেছে। সেটা কে? অপাশি কানোরিয়া? না সুখারাম

## ২৯8 <br> www.banglabiôt pedf.bitogspot.com

নস্কর? নাকি তিন নম্বর কিলার?
আর ভাবার দরকার নেই। ট্র্যাকার উলটে অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেখল। ওর মনে হন, ঘর-বাড়ির এলাকা়় গগলেই ওর লড়াইয়ের কাজটা সহজ হবে। সুতরাং ও সেদিকে বাইক ছুট্য়ে দিল।

কিছুটা পথ চলার পরই জঙ্গলের মধ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা দেখতে পেল। জায়গাটা গছের পাতায় ঢাক। টাটকা আর শুকনো গাছের পাতা কেউ যেন সেখনে बেঁচিয়ে এনে জড়ো করেছে।

জিশান বাইক চালাতে-চালাতেই এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময়েই দুর্ঘটনাট ঘটে গেল।

ওর বাইক চলে এসেছিল গাছের পাতায় ঢাকা জায়গাটার ওপরে। আর সঙ্গে-সন্গে গাছের পাতাগুো চোরাবালির মতো বাইকসম্মে জিশানকে গিলে ফেলল।

জিশান নীচের দিকে পড়তে লাগল। গাছের পাতাগুলো বৃষ্টির মতো ওর শরীরের ওপরে ঝরে পড়ছিল। একটু পরেই নরম মাটিতে ও বাইক্সমেত আছড়ে পড়ল। এবং বাইক থেকে ছিটটে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে

 দাঁড় করানোর আর চেষ্টা করল না। কারণ, বাইক নিয়ে এই গর্ত থেকে বেরোনোর কোনও গল্প নেই।

গর্তা অনেকটা গন্ডার বা হাতি শিকারের ফাঁদের মতো। শ্ধু গর্তের নীচে শূলের মতো কাঠের গজাল প্পাঁতা নেই এই যা! কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এরকম ফাঁদের ব্যবস্থা কেন্ন

ঠিক সেই মুহূর্তে জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠন।
ফোন ধরল জিশান। শ্রীধর পাট্টা।
‘এই গর্তটা সারপ্রাইজ, জিশান। গেম সিট্তিতে এরকম আরও অনেক সারপ্রাইজ তোমার জন্যে ওয়েট করছে...।'

জিশান বিরক্তভবে ‘থ্যাংক যুু ভেরি মাচ’ বলে ফোন কেটে দিল। এখন এই সাইকোপ্যাথটার সক্গে বাজে বকার সময় নেই। আগে এই গর্তটা থেকে বেরোনো দরকার। কে জনে, হয়তো কোনও কিলার এই মুহৃর্তে ওকে খতম করতে গর্তটার দিকেই এগির্যে আসছে। প্লেট টিভিটা একবার দেখা যাক। সেই সঙ্সে ট্ব্যাকারটাও।

পড়ে থাকা বাইকের কেরিয়ারের দিকে হাত বাড়াল। যন্ত্র দুটো এখনও ঠিকঠাক আছে তো!

দ্যাকাকরের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠন জিশান। একটা লাল ডট সবুজ ডটের মারাশ্মক কাছাকাছি। সঙ্গে-সস্গে ট্র্যাকার রেথে প্লেট টিভি অন করল। পরদায় অপাশি কানোরিয়ার মুখ। कী যেন একটা করছে ও। একটু পরেই দেখা গেল ও কী করছে। একটা বড়সড় জেরিক্যান থেকে জলের মতো কী যেন ঢালছে জঙ্গলের ঘাস-পাতার ওপরে। একটু দূরে একতা মোটরবাইক দাঁড় করানো রয়েছে।

কম্মেন্টেটর তখন বলছেন, ‘ফোক্স, শিকার আর শিকারি এখন অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। পরিভাষায় যাকে বলে স্ট্রাইকিং ডিসট্যান্স। জিশানকে জঙ্গলের মধ্যে দ্যাযক করার জন্যে কিলার অপাশি কনোরিয়া একটু আগেই গাড়ি ছেড়ে দিয়ে মোটরবাইক নিয়েছে। এখন ও বাইক থেকে নেমে অভিনব অপারেশান ুরু করেছে। জেরিক্যান থেকে অপাশি কী একটা লিকুইড যেন ঢলছू... 1

তখনই পেট্রলের গন্ধ পেল জিশান। শুকনো গছের পাতা ভেজাতেভেজাতে তরল জ্রালানি নেমে আসহে গর্ত্রের ভেতরে। জিশানের মরণকৃপে। এরপর শ্ু দরকার একটা দেশলাই-কাঠি।

অপাশি তা হলে অম্ত্র হিসেবে পেট্রলল ভরতি কয্রেকটা জেরিক্যানও নিয়েছিল!
 তারপর ছাচড় পাচড় করে গর্ত বেয়ে উঠে আসতে চাইল। কিক্তু বারবার হাতপা স্নিপ করতে লাগল। তবে চারবারের চেষ্টায় খানিকটা উঠতে পারল। আর তখনই পেট্রেনের ভেজা পথ ধরে আগুনের লকলকে শিখা ছুটে এল গর্ত্রের দিকে।

জিশান একটা গাছের শিকড় ধরে এক হাঁচকায় শরীরটাকে টেনে তুলল ওপরে। তখনই দাউদাউ শিখা ডিঙিয়ে অপাশি কনোরিয়াকে দেখতে পেল। নির্বিকার শান্ত মুত্যোঁড়িয়ে রয়েছে। হাতে লম্বা একটা চপার। তার চকচকে ফলা থেকে কমলা রঙের আগুনের ছায়া ঠিকরে বেরোচ্ছে। অপাশির বেশ কিছুটা পিছনে দাঁড় করানো রয়েছে একটা মোটরবাইক।

আগুনের তাপ আর শিখায় ভয় পেয়ে গেল গছের পাখিরা। ওরা গাছের আশ্রয় ছেড়ে ছিটকে গেল আকাশে। একটা খরগোশ আর একটা বনবেড়াল কোন আড়াল থেকে বেরিয়ে দিগল্রান্তের মতো ছুট লাগাল।

জিশানও ঘাবড়ে গিয়ে ছুটতে তুরু করল। বিদ্যুৎঝলকের মতো ওর মনে পড়ল, অপাশি কানোরিয়ার ফেরোসিটি কোশেন্ট 9.4 ।
‘জিশা-ন!’ বলে মিহি গলায় ডেকে উঠন অপাশি। আর একইসঙ্গে আদিবাসী যোদ্ধাদের ক্ষিপ্রতায় ওর গাতের চপারটা জিশানকে লক্ষ্য করে ছুড়ে

## ২৯৬ www.banglaboôk patf.błogspot.com

দিল। ইস্পাতের অস্ত্রঢা শূন্যে লাট খের্যে তিরবেগে ছুটে এল জিশানের দিকে। ছুটতে-ছুটতেই জিশান আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মাট্তি। চপারটা ওর শরীরের ইঞ্চিছয়েক ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। গেঁথে গেল একটা গাছের গুঁড়িতে। থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আবার উঠল জিশান। আবার ছুট। গছছালার আড়ালে-আড়ালে, এঁকেবেঁকে। নাকে আসছে গাছ-পাতা পোড়ার গন্ধ। সেইসঙ্গে শরীরে টের পাচ্ছে গরম বাতাসের ছোঁয়া।

ছুটতে-ঘুটতেই পকেটে হাত ঢোকাল। টিনে বের করে নিল মিসাইল গান। থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে অপাশিকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল। এক মিলিসেকেড্ডের মধ্যে অপাশি সরে গেল একটা গাছের খঁড়ির আড়ালে। ৫ যে শখু সেজন্য বেঁচে গেল তা নয়। এখানে-সেখানে আগুন তখনও জূলছিল। ফলে মিসাইলের ইন্রারেড ট্ব্যাকিং সিস্টেম বিল্রান্ত হয়ে পড়ল। মিসাইলটা জলন্ত গাছপাতার আগুনের মধ্যে पুকে পড়ল।

এ-অঞ্চলের বাড়ি-ঘরগুলো কোনদিকে আছে জিশানের সেটা ভালোই আন্দাজ ছিল। ও মোটামুটি সেদিক লক্ষ্য করেই দৌড়তে লাগল। এক্ষুনি আরএকটা মোটরবাইক ওর দরকার। এক্ষুনি।

পিছন নথেকে স্রপাশির ম্যেটরবাইক্গস্টার্ট করার শব্দ কানে এল।
 গাছপালার গোলকধ্ধাধার মধ্যে অপাশি কখনই খুব জোরে বাইক ছোটাতে পারবে ना।

একটু পরেই জিশান বেরিয়ে পড়ল ফাঁকা রাস্তায়।
বেলা প্রায় দশটা। কংক্রিটের রাস্তা রোদে ঝকঝক করছে। রাস্তার দুপাশে ফুলের বাগান। जতে ছবির মতো ফুল। সেই ফুলের টানে বেশ কয়েকটা প্রজাপতি ওড়াউড়ি করছে।

রাস্তা ধরে একটু এগোতেই বেশ কিছু দোকানপাট আর অনেকগুলো বাড়ির র্লক। বাড়িগুলোর সামনে সার বেঁধে গাড়ি আর বাইক পার্ক করা রয়েছে।

জিশান ছুটতে-ছুটতে একটা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কংক্রিটের রাস্তা ধরে অপাশির বাইক ছুটে আসছে।

শ্রীধরের কথা জিশানের মনে পড়ল : কোনও বাড়ি কিংবা দ্গোকনের ভেতরে যদি জিশান আর কিলারদের কোনও মোকাবিলা হয় তো সেটা হবে পুরোপুরি অস্ত্রুন মোকাবিলা। অপাশির যা চেহারা জিশান দেখেছে তাতে খালি গতের লড়াইয়ে ও জিশানের কোনও প্রতিদ্দন্টী হতে পারে না। সেটটই এবার পরখ করে দেখা দরকার।

জিশান ঢুকে পড়ামাত্রই বাড়িটায় ইইচই হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। এwww.facebook.com/groups/banglabookpdf

## 

ঘর সে-ঘর থেকে ‘জিশান! জিশান!’ রব উঠল। কেউ-কেউ আনব্দে সিটি বাজাল।

কিন্তু জিশানের কোনওদিকে নজর ছিল না। ও লোকজনকে ঠেলে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, 'অপাশি কানোরিয়া আমার পেছনে তাড়া করে আসছে। আমি ছদ্দ যাচ্ছি—’’
'চারতলায়! ছাদ চারতলায়!' उপরদিকে আঙুল দেথিয়ে চেঁচিয়ে উঠল দুজন ‘সিটিজেন’।

গেম সিটিতে যেসব ‘সিটিজেন’রা আজ হাজির রয়েছে তারা প্রত্যেকেই হাজিরা দেওয়ার জন্য পুরস্কার পাবে। এ ছাড়াও নানান অ্যাক্টিভিটির জন্য রয়েছে ‘সারপ্রাইজ প্রাইজ মানি’। তাই এই মনুষজনের উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই।

জিশান তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। একবার ছদে পোঁছতে পারলে ও অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেখানে ও অনেকটা খোলা জয়গা পাবে। তা ছাড়া মার্শালের নিয়ম অনুযায়ী সেখানে সশস্ত্র লড়াই করা যাবে না। সুতরাং ছদে শেষ পর্যন্ত যেটা হবে সেটা অপাশির সঙ্পে ওর হাতাহাতি লড়াই। সেলড়াইয়ে অপাশি নস্যি।

ছাদে এসে প্পেঁঁল জিশান। বিশাল বড় খোলা ছাদ। আকাশের দিকে



জিশান ছুটে গেল বাঁ-দিকের পাঁচিলের কাছে। ঝুঁকে পড়ে নীচের রাস্তার দিকে তাকাল। অপাশি এখন কোথায়?

প্রল্নের উত্তর দিল মিসাইল গান। অপাশি মিসাইল গান গাতে তোলার সঙ্গে-সল্গেই বসে পড়েছিল জিশান। তাই ছদের পাঁচিল বর্ম হয়ে ওকে বাঁচিত়ে দিল। কিন্তু বিকট শদ্দ হল। भঁচিলের একটা অংশ ভেঙে চৌচির হয়ে খসে পড়ল। জিশান ছুটে সরে এল ছাদের ঠিক মাঝখানে। এখান থেকে ছাদের দরজার দূরত্ব অনেকটট। ফলে অপাশি ছাদ্দ এলে ও তৈরি হওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাবে।

তারপর হাতাহাতি লড়াই।
রুক্য্যাকটা পিঠ থেকে নামাল জিশান। চটপট দ্ব্যাকার আর টিভি বের করে দেখল।

দ্বাকারে একটা লাল ডট সবুজ ডটের খুব কাছাকাছি। ওটা বোধহয় অপাশি কানোরিয়া। বাকি দুটো ডট তার তুলনায় মোটামুটি দূরে।

এবার টিভি অন করল জিশান। অপাশি একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে-সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। কিন্তু ওর হাত ওগুলো কী?

শ্রীধর পাট্টা তো নিয়ম করেছেন বাড়ির ভেতরে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে

না！কারণ，তাত গেম সিটির ‘সিটিজ্রেন’দের বিপদ হবে। তা হলে অপাশির দু－হাত্র দুটো অন্ত্র কেন ？বাঁ－হাতে একটা ধারালো চপার，আর ডানशতত টুয্রেন্টি এমএম টেন শটার নিউক্লিয়ার পিস্তল।

টিভি আর দ্ব্যাকার চটপট রুকস্যাকে ঢুকিয়ে নিল জিশান। পকেট থেকে স্যাটেলাইট ফোন বের করল। স্পিড ডায়াল মোডে শ্রীধর পাট্টাকে ফোন করল।

ও－প্রান্তে একবার রিং বাজতেই শ্রীধর ফোন ধরলেন।
‘বলো，জিশান—ছাউ আর য়ু？’
‘এসব कী হচ্ছে！বাড়ির মধ্বে আর্ম্স নিয়ে ঢুকেছে অপাশি। গেমের রুলে তে এটা বারণ ছিল！’
‘সারপ্রইই！সারপ্রাইজ！’ ও－প্রান্তে চিবিয়ে হাসলেন শ্রীধর ：＇তা ছাড়া কানোরিয়া বিল্ডিং－এ আরু আর্ম্ নিয়ে पুকেছে－ইউজ তে করেনি। তাই অফিশিয়ালি ও এখনও ক্লিন। আর সেকেড্ড পয়েন্টটা হন，তোমাদের মোকাবিলা यদি হয় তো সেট হবে ছাদ্। সেটাও অফিশিয়ালি＂বাড়ির ভেতরে＂হল না। শ্রীধর ছোট করে দুবার কাশলেন ：‘সুতরাৎ এসব ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে লড়াই করো，জিশান। ফইট। সারভাইভ। আচমকা ফোন কেটে দিলেন ख্রীধর।

 ధุ邓ア।

সঙ্গে－সল্গে রুকস্যাকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিশান। ডেতরে হাত पুকিহ্যে একটা মিনি গ্রেনেড বের করে নিল। তারপর শোওয়া অবস্থাতেই সেটার পিন দাঁত টেনে অপাশিকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দিল।

জিশানকে অবাক করে ওই মোঢা শরীর নিয়েও অপাশি আশ্চর্য কিপ্রতায় বাঁ－দিকে লাফিয়ে পড়ল। নিউক্লিয়ার পিস্তল ফায়ার করল জিশানকে তাক করে।

আপেক্ষিক গতিবেপের জটিলতায় স্বাভাবিক কারণেই অপাশির নিশানা তাকতুট হয়ে গেন। আর জিশানের মিনি গ্রেনেডও অপাশির গায়ে লাগেনি। তবে বিকট শব্দ，আগুন আর ধোঁয়া বাড়ির সবাইকে বিস্ফেরণণের খবর পাঠিয়ে पिल।

অপাশি তখনও ছদের মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর জিশান সবে হাঁটুগেড়ে উঠে বলেছে। হঠাৎই ছাদের দরজা দিয়ে পাঁচ－ছ’জন ‘সিট্রিজে’ पুকে পড়ল খোলা ছাদে। ওরা ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে অপাশির ওপরে ঝঁঁপিয়ে পড়ল। ওকে এলোপাতাড়ি কিল－চড়－घুসি মারতে লাগল।

ওদদরই মধ্যে দুজন চেঁচিয়ে বলে উঠল，＇জিশান，পালাও！পালাও！＇
জিশান রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে ছুট লাগাল ছদের দরজার দিকে।

সিঁড়ি নামতে-নামতে জিশান সদ্য-হওয়া অভিজ্ঞতাটর কথা ভাবছিল। এই আবেগমাখানো সমীকরণটার কথা নিশয়ইই শ্রীধর পাট্টা ভাবতে পারেননি। জিশানের পাবলিক ইম্মেজ আসল জিশানের চেয়ে রোধহয় অনেক বড়। নইঢ়ে এইরকম নিয়ম-ভাঙা ঘটনা কখনও ঘটে!

শ্রীধরকে ফোন করে জিশানের বলততু ইচ্ছে করলল, 'সারপ্রজজ! সারপ্রাইজ!

দোতলা থেকে একতলার দিকে নামতে-নামতে টিভির ধারাবিরনী কনে এল ওর : আশ্র্য! অবাক কাণ! চমকে দেওয়া ঘটনা। গেম সিটির ছ'জন "সিটিজেন" কিলার অপাশির ওপরে ঝাঁাপিয়ে পড়ে তাকে প্রবল পেটাচ্ছে। জিশানকে ওরা নিউক্নিয়ার পিস্তলের মুখ থেকে কান vেঁষে বাঁচিত্যে দিয়েছে। আপনারা তো জানেন, বন্ধুগণ, কিল গেমের দিন গেম সিটিতে যেসব মক "সিটিজেন" হাজির থাকে তারা প্রত্যেকেই পুরস্কার হিলেবে পঞ্চাশ হাজার টাকা পায়। কিন্তু এই মুহূর্ত্ত জিশানকে বাঁচননোর জন্যে ওরা প্রত্যেকে কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার পাবে। কিল গেম জনে উঠেছে, বন্ধুগণ-দারুণ জমে উঠেছেছ...'

বাড়িটা থেকে বেড়িয়ে এসেই আবার ছুট, ছুট, ছুট। একটা মোটরবাইক চাই। এক্মনি। ওই তো ল্রে যাচ্ছ!
 পুশবাটন স্টার্ট দিতেই বাইকটা গর্জন করে উঠল। সাইলেন্সার পাইপ দিয়ে অন্প বোঁয়া বেরোল। তারপর ‘ফউশ’ করে ছু:ট গেল সামনের দিকে।

নিউক্লিয়ার পিস্তল আর চপারের ভয় দেখিয়ে অপাশি ‘সিটিজেন’দের জটলা থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে এল।

রাগে ওর ভিতরটা গরগর করছিল। তিনতলার একটা ঘরের ভিতর থেকে টিভির আওয়াজ ছুটে আসছিল : "অপাশি কানোরিয়া ব্যর্থ হয়েছে। দ্য সুপার কিলার গ্যাজ ফেইল্ড। এখন অপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামছে...তড়া করছে জিশানকে। কিন্তু মনে হয় না এ-দফায় ও কিছু করতে পারবে। কারণ, জিশান এখন বাইক নিয়ে ছুটছে...।'

কানোরিয়া দুকে পড়ল ঘরটার ভেতরে। সেখানে দুজন বয়স্ক পুরুষ প্রেট টিভির দিকে তাকিত্রে বসে ছিল। হাতে ঙ্লাফি কুকিজের প্যকেট। ওদ্দর হাত আর মুখ চলছিল।

একটা নোংরা গালাগাল দিল অপাশি। তারপর এক ঝটকায় টিভির কাছে গিয়ে যন্ত্রটার ওপরে চপারের কোপ বসিয়ে দিল। আগুনের স্শুলিঙ্গ ছিটকে বেরোল টিভি থেকে। শর্ট সার্কিটের ‘ফটফফ’’ শব্দ হল। টিভির পরদা দপ করে आঁধার হয়ে গেল।

## www.banglaboôk pactf.tölogspot.com

‘সিটিজেন’ দুজন ভয়ে চিৎকার করে উঠন। অপাশি সেটাকে আমল না দিয়ে তাড়াহ্হড়ো করে বেরির্যে এল বাইরে। ওর পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি সম্তব তত তাড়াতাড়ি সিंড়ি নামতে তুরু করল। জিশান-জিশানকে এখন ওর চাই। জিশানের রক্ত চাই।

জিশান বাইক ছুট্টিয়ে দিয়েছিল নদীর দিকে। সেখানে ফ্লাইওভার পেরিয়ে ও চলে যেেে চায় গেম সিটির পশ্চিমদিকে। সেখনে একটা বিশাল এলাকা জুড়ে ঘন জঙ্গল রয়েছে। দিনেরবেলাঢা ও জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সময়টা কাটিয়ে দিতে চায়। তারপর সন্ধে হলে, অন্ধকার নামলে, ওর লুকিয়ে থাকার কাজাা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

পথে বাইক দাঁড় করিয়ে ও একবার দ্ব্যাকার দেথে নিয়েছে। তিনটে লাল ডটের অবস্থান এখন খানিকটা এলোমেলো। কারণ, জিশানের গতিবিধি ওদের হিলসবকে গুলিয়ে দিয়েছে। তাই ওরা চক্রবৃহ্েের মতো সবুজ ডটটাকে ঘিরে ধরতে পরেনি।

আরও কিছ্রুক্ষণ বাইক ছোটানোর পর জিশানের টিভি দেখতে ইচ্ছে করলল। তিনজন কিলার এখন কী করছে?

কৌতৃহল মেটতত বাইক দাঁড় করাল জিশান। ঢ़িভি বের করে অন করল।

 মাথায় এমনভাবে এঁটে বলেছে যে, সেটা আদতে টুপি নাও হতে পারে-হয়তো চুলের একটা অড্রুত স্টাইল। তবে দেখে মনে হচ্ছে, দুলটা ঞ্গাস্টিক অথবা মেটালের তৈরি। কিংবা প্লাস্টিক আর মেটালের প্লাজ্মা মিহ্সচার ব্যবহার করা रয়েছে।

চোেে কালো চশমা। চশমার কাচ অথবা পলিমার যেন ছোট-ছোট দুটো আয়তক্সেত্র—চোখ দুটোকে রোদ কিংবা অন্যান্য ক্রতিকারক রশ্মির হাত থেকে বাঁচাচ্ছে। দু-কানে মেটালের মোটা রিং। ভাঙা চোয়াল। ফিন্িিনে পাতলা ঠোটঠিক যেন মসৃণ চামড়াকে ब্রেড দিয়ে চিরে মুখ্রের রেখা তৈরি করা হয়েছে।

লোকটির গায়ে পলিমারের তৈরি আঁটোসাঁটো চকচকে ফুলহাতা পোশাকযেন দ্বিতীয় চামড়া, অনেকটা স্কুবা ডাইভারলের মতন। দু-হতে কালো দ্সানা। পা়ে কালো স্নিকার। আর পিঠঠ একটা কালো রুকস্যাক।

ক্যামেরা একটু দূরে সরে যেত্ই লোকটার পুরো চোরাটা দেখা গেলঃ ছিপছিপে, লম্বা—চাবুকের মনো।

টিভির ভাষ্যকার তখন বলছে, ‘বন্ধুগণ, আসুন-কিলার প্রোটনের সল্গে আপনাদ্রে পরিচয় করিয়ে দিই। প্রোটনের রক্ত ঠালা, বরফের মতো। চেখের নজর দিনে শকুনের মতো, রাতে প্যাচার মতো, কারণ, ওর আই গিয়ারে
www.banglabookpdf.blogspot.com


নাইটভিশান ইন্ট্রুন্ট ফিট করা আছে। ওর হাতের নখ চোখা এবং শজ্ত। বাঘ এবং সাপের সঙ্পে এই নখের মিল রয়েছে, কারণ, তই জোরালো এবং ধারালো নখ্থর ডগায় বিষ মাখানো আছে। ওই নখের এক আঁচড়ে একটা জোয়ান মানুষ পলকে ছটফটিয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।
‘কিলার প্রোটন এতক্ষপ ধরে জিশানের স্ট্রাতটেজি ওয়াচ করহিন, আর নিজের স্ট্রাাটেজি ক্যালকুলেট করছিল, তৈরি হচ্ছিল মনে-মনে। এবার কিলার প্রোটন অ্যাকশানে নেমেছে। সো কনটিনিউ ওয়াচিং দ্য কিল গেম, ফোক্স। খেলা ক্রমশ আরও এক্সাইটিং হয়ে উঠছে...।'

জিশান দশ-পনেরো সেকেন্ড ধরে কিলার প্রোটনকে দেখল। যে বারোজন সুপারকিলারের ছবি নিয়ে টিভিতে ‘সুপারকিলার কনটেস্ট’’ শুু হয়েছিল তাদ্রের মুখগুলো জিশানের আবছাভাবে মনে আছে। কিন্তু ঐই মুখটা সেই বারোজনের মধ্যে ছিল বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য এই লোকটার পোশাক-আশাক মেকাপ এমন যে, আসল চেহোাট ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

জিশানের বেশ মনে আছে, ‘সুপারকিলার কনটেে্ট’ প্রতিয়োগিতায় প্রথম পুরস্কর ছিল পঁচিশ লক্ষ টাকা। ওর আরও মনে আছে, কনটেস্টের বারোজন খুনির মধ্যে আটজন পুরুষ, আর চারজন মেয়ে ছিল। কিন্তু প্রোটনের সঙ্গে তাদের কোনও মিল...নাঃ, মাথা নাড়ল জিশান্দ দিভির সুইচ অফফ করে দিল।
 সঙ্গে ওর দূরত্ব বেশ কম্মে এসেছে। মনে হয় অপাশি মরিয়া হয়ে বাইক চালিয়ে ওকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে চাইছে।

দ্যাকার রেথে বাইক ছোটাল জিশান। রিয়ারভিউর কনভেক্স মিরারে ওর নজর বারবার ছিট্টে যাচ্ছিন। নাঃ, এখনও কোনও গাড়ি বা বাইক দেখা যাচ্ছে ना।

চড়া রোদ্রে জিশান ঘামছিল। বাঁ-ছততর কবজিতে বাঁধা কাউ•্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল। এখনও ज়নেক সময় বাকি। আজ মনে হচ্ছে, সূর্य থুব چীরে আকাশপথে হঁটছে-সন্ধে হতে আজ অনেক দেরি হবে। ফাঁকা রাস্ভায় বাইকের গোঁ-গোঁ আওয়াজ ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। কোথা থেকে শব্দগুলো ধাক্কা খেয়ে আবার কানে ফিরে আসছে কে জানে! एঠাৎই রিয়ারভিউ মিরারে একটা বাইক দেখতে পেল। একটা কালো ফুটকি। ফুটকিটা ক্রমশ মাপে বড় হচ্ছিল।

জিশান অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল। বাড়তি আওায়াজ তুলে ওর বাইক এক ঝটকায় আরও জোরে পিছলে গেন সামনের দিকে।

াঁ-দিকে জগ্গল, ডানদিকে কয়েকটা বাড়ি-ঘর। দ্রুত ছুটে যাচ্ছে পিছনে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দূরে ফ্লাইওভারঢা দেখা গেল। উঁু হয়ে

# www.banglab̌ơk putf.t̄logspot.com 

আকাশের দিকে উঠেছে।
জিশান ঠিক করল, ফ্নাইওভার পেরিয়ে ও বাঁ-দিকের জঙ্গলে ঢুকে পড়রে। তারপর দ্ব্যাকার দেথে ফুড পয়েেট্ট বের করবে। ভীষণ খিদ্দ পের্যেছে। জল তেষ্টাও।

বাইক ফুলস্পিডে ছুটছিল। বাতসের টুকরো দুরষ্ত বেগে ছুটে এসে জিশানের মুত্ গায়ে বিধখছিন।

ফ্যাইওভারে পৌঁছে গেল জিশান। তথনই ও আকাশের দিক থেকে ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দ পেল। ওপরদিকে তাকতেই একান হেলিকপ্টার দেখতত পেল। অনেক উঁমুতে পাক খাচ্ছে।

তা হলে আকাশ থেকেও কিল গেমের দিকে নজর রাখার বন্দোবস্ত করেছেন শ্রীধর!

বাইক চালাতে-চালাতেই মুখ তুলে গোট আকাশটায় ঢোখ বুলিয়ে নিল জিশান। উত্তরের আকাশে অন্নে দূরে আর-একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেল। এত দূরে বে, ওটার আওয়াজ ভলো করে ঠাহর হচ্ছে না। উড়ন্ত মেশিনটার আশেপালে কয়েকটা চিল উড়ছে। অন্তত প্রক্ষিপু দর্শনে আকাের পটভূমিতে সেরকমই মনে হচ্ছে।

 ফ্লাইওভারের দিকেই ধেয়ে আসছে।

কে আছে এই গাড়িতে? কিলার সুখারাম? নাকি প্রোটন?
রিয়ারভিউ মিরারে তাকাল জিশান। ও ब্রেক কষার ফলে পিছনে ছুটে আসা ফুটকিটা এখন মাপে অনেক বড় দেখাচ্ছে। অপাশি কানোরিয়াকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গোলগাল মোটাসোটা চেহারাট উত্তল দর্পণে আরও মোটা আর বিকৃত দেখাচ্ছে।

ঋটিতি সিদ্ধাষ্ত নিল জিশান। সামনে থেকে ছুটে আসা অটোমোবিলটার সঙ্গে যদি ওর কলিশন হয় তা হলে মোটরবাইকটার আশ্ত থাকার সষ্ভাবনা খুবইই কম। তার সঙ্গে জিশানেরও।

তার চেয়ে বরং অপাশির মোটরবাইকের সঙ্গে কিছু একটা করার চেষ্টা করা অনেক ভলো।

সুখারাম নস্কর এর মধ্েেই বাইক পালটে গাড়ি নিয়েছে।
নীল গাড়িটার জননলা দিয়ে একটা আলট্রা হাই-পাওয়ার রাইফেলের নল বেরিয়ে এল। जারপর জিশানের বাইক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল কিলার সুখারাম। ‘ক্র্যাক’ এবং ‘সঁঁ’ শব্দ হল। হেভিওয়েট বুলেট ছুটে গেল জিশানের দিকে।

## www.banglaboôk padf.bitogspot.com

ব্রেক কষলেও জিশান একটিবারের জনাও বাইক থামায়নি। প্যাঁালো পথে নকশা বুনে ফ্লাইওভারের ওপরে বাইকটাকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছিল। কারণ, ‘সিটিং টারগেট'-এর চেয়ে 'মুভিং টারগেট’ অনেক ভালো। ও বেশ বুঝতে পারল, একটা গরম বুলেট ওর বাইকের কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তারপরই ও রাইফেলের শব্দা শুনতে পেল।

সঙ্গে-সল্গে অপাশিকে লক্ষ করে বাইক ছোটাল জিশান। ইজ্জিনে ‘গোঁ-ওঁ-ওঁ’ শপ্দ তুলে বাইকের স্পিড তুলে দিল চরমে। তারপর স্টিয়ারিঙের কায়দায় সাপের মতো অাঁকাবাঁকা পথথ ছিটকে গেল অপাশির দিকে।

কিলার অপাশি মিসাইল গান ফায়ার করতে সাহস পাচ্ছিল না। কারণ, यদি ও টগগ্গে মিস করেও তা হলে মিসাইলের ইনফ্রারেড দ্র্যাকার ওর বাইকের ইজ্জিন লক্ষ্য করে ছুটে আসতে পারে।

সুতরাং ও চলন্ত অবস্থাতেই বাইকের কেরিয়ার থেকে মেশিন পিস্তল বের করে পরপর দুবার ফায়ার করল।

কিন্তু মিস করল। কারণ, জিশনের বাইক বলতে গেলে সার্কসের কসরত দেখাতে-দেখাতে এদিক-ওদিক হেলে অপাশির দিকে ছুটে আসছিল।

মেশিন পিস্তল ফেলে একটা চপার তুলে নিল ও। ততক্ষণে লং রেঞ্জ পিত্তল তুলে ন্নিয়ে অপাশিকে লক্ষ ক্রে দেষার ফায়ার কবেছে জিশান। কিত্ত
 দিल।

ততক্ষণে অপাশির ছুড়ে দেওয়া চপার বাতসে লাট থেয়ে জিশানের দিকে ছুটে আসছে। জিশান নিমেষের মধ্যে ছুটন্ত বাইকটাকে কাত করে একটা চোখা বাঁক নিল। অপাশির চপার ওর পিছনের সিটে কেটে বসে গেল।

অপাশি দাঁত থিচিয়ে মিহি চিৎকার করে উঠল। আবার মেশিন পিস্তল তুলে নিল হাতে। শর্রুকে এত কাছে পাওয়া গেছে! এইবার খতম।

আর উত্তরে জিশান নিখুঁত লক্ষ্যে ওর বাইকের চাকা দিয়ে অপাশির বাইকের পিছনের চাকায় আড়াআড়ি ধাক্কা মারল।

দুরষ্ত গতির সংঘর্ষ। ফলে যা হওয়ার তাই হল।
অপাশির বাইক লাট্রুর মতো ঘুরপাক থেতে-খেতে শূন্যে উঠে পড়ল। সরাসরি গিয়ে ধাক্কা খেল ফ্যাইওভারের রেলিঙে। ‘দড়াম’ শব্দ হল। রেলিং আর বাইকের মাঝে পড়ে অপাশির মাথা থেঁতলে গেল। ওর হাতে তখনও মেশিন পিস্তল ধরা রয়েছে।

একটা মিহি আর্ত চিৎকার শোনা গেল। অপাশি এবং ওর বাইক ছিটকে গেল আকশশ। তারপর অড্ডুত এক কক্ষপথে বাতাস কেটে পড়তে লাগল নদীর দিকে।

সংঘর্ষ্যে পর জিশানের বাইকও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিল। অপাশির বাইকের সংঘর্ষ্বের জায়গা থেকে প্রায় বারো-তেরো ফুট বাঁ-দিকে ওর বাইক ফ্লাইওভারের রেলিঙে ধাক্কা মারল। ঠিক তার আগের মুহূর্তে জিশান বাইক ছেড়ে শূন্যে লাফিত্রে উঠন। বইইকটা রেলিঙের খানিকটা অংশ ধসিয়ে দিয়ে বোমার স্ল্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল বাতসে। জিশান তখন ওর বাইক থেকে কয়েক হাত দূরে বাতাস কেটে নদীর দিকে পড়ছিল। ওর মনে হচ্ছিল, ওর কোনও ওজন নেই। আর সেই অড্রুত সময়ে প্যাসকোর কথা মনে পড়ে গেল ওর।

অপাশির বাইকটা নীচে পড়তে-পড়তে আচমকই শূন্যে বোমার মতন ফেটে গেল। বিস্ফোরণের শব্দে কানে তালা লেগে যাওয়ার জোগাড়। বাইক আর অপাশির ছোট-বড় לুকরো ভয়ংকর গতিতে ঠিকরে গেল চারিদিকে। বিস্ফেরণের আগুনের তেজ আর ঝলক জিশানের চোখ ধঁধিয়ে দিল।

বাতাসে পোড়া গন্ধ, কালো ধেঁঁয়া। ও চোখ বুজে ফেলল। ভাসতেভাসতেই হাঁটু মুড়ে দু-হাতে হাঁটুজোড়া জাপটে ধরল। ওর শরীরটা শূন্যে কয়েকবার লাট খেল। তারপরই চোখ খুলল জিশান। দেখল, নদীর ঘোলাটে জল ওর দিকে ছুটে আসছে। সঙ্গে-সল্গে দক্ষ ডাইভারূের মতো হাত দুটো

 পিছ্ন ঢুকে পড়ল জিশানের শরীর।

একটা চাপ। একটা ঠান্ডা অনুভূতি। চেখের নজর ঘোলাটে। মুখে কিছুটা জল ঢুকে গেল। নদীর জলের ঘাত-প্রতিঘাতে জিশানের শরীরটা বেসামাল হয়ে গেল।

কিক্তু একদু পরেই জলের ওপরে ‘ভু-উ-স’ করে ভেসে উঠল জিশান। তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে স্যাটেলাইট ফোনটা বের করল। বেশ কিছুটা ভিজে গেছে। অকেজো হয়ে গেল কি না কে জানে!

ফোনটাকে ডানহাত শূন্যে তুলে ধরল। জল ঝরানোর জন্য ওটা ক<্যেকবার জেরে-জোরে ঝাঁকাল। তারপর ঢোখ তুলল ফ্লইওভারের দিকে। সেখানে একটা মানুষের সিলুয়েট দেখতে পেল। ভাঙা রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়ে নদীর জলের দিকেই তাকিয়ে আছে। মনে হয়, জিশানকে দেখছে কিলার সুখারাম।

মানুষটার পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা নীল রঙের গাড়ি।
জিশান লক্ষ করল, আকাশের দুটো হেলিকপ্টার এখন মাথার ওপরে ব্যস্তভাবে চক্কর কাটছে। বোধহয় ওরা অপাশি আর জিশানের মোকবিবিাটা দেখতে পেয়েছে।

নদীর স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে জিশান সাঁতার কাটতে লাগল। একইসঙ্গে

## ৩০৬ <br> www．banglaboofk pexf．tílogspot．com



 স্যাটটলাそট ঙেनটার कী शা কে জনে！

গशন ও খাবার ֶুঁজ্র भाবে কোথায়？
তবে জালো খবর হন，এখন ওকে তিনজনের বদলে দুজন কিলারের সল্গে লড়ত্ত হরে। লড়া করে বাঁচত্ত হবে।

জিশান একটা शাত আর দুঢো পা বববহর করে কেনওরক্ম সাঁতর কাঢছিন। চেষ্টা কাহিন，নদীর াঁ－দিকের পাড়ের কাহে সরে বেতে। তথনই ও দ্খে পেল লম্মা ছিপের মহে অনেকখেো মেটাল লিভার নদির দিকে
 লক্শ কোটি－কোটি দর্শক্রে ঢোেের সামন্ে রয়েছে।
 বোষ্য：কেটে－ছফ়ে গোছ，কারণ，জ্রালা করたে।

ধপ করে বলে পড়ল আগাছ আর বুল্lে ঘালের ওপরে। বড়－বড় শ্মাস


 দরকার ।

ふোনের বোতম টিপতে লাগল জিশান।

ডায়ান করত্তই একটা घড়ঘড় শদ্দ জিশানকে অভর্থনা জনান। जর ওপরে সুপারইমপোজ্ড হর্রে রিং বাজতে লাগन।
 भुलढ़ लाभল जिxान।
 এত দেরি করাছেন কেন ？

ভেজ，সপসপে রুক্ল্যাক থেকে ন্যাবলেট বেরোন। ছেট ঢিভিটাও বেরোল। সব ইলেক্ট্রনनিক পরদা অభ্ধকর। কেনও আলোর চিছ্ নেই সেখান্।

জিশানের বুকের ডেতর বেকে একটা দীর্শপ্পা বেরিক্র এল। চারিদিক


চালাবে! কী করে কিলারদের লোকেশান দ্য্যাক করবে! কী করে খাবার খুঁজে পাবে?

ফোন কানে চেপে ধরে জিশান অধ্ধর্য হয়ে পড়ছিল। মনে-মনে শ্রীধরকে বলছিল, ‘শ্রীধর...ধর...ধর...।’

একটু পরেই শ্রীধর পাট্টার গলা পাওয়া গেল : ‘জি-জি-শ্-শান্!’
শ্রীধরের গলায় স্বর কেটে-কেটে যাচ্ছিল।
স্যাটেলাইট ফোনটা বে অল্পবিস্তর কাজ করছে সেই প্রমাণটুকু জিশানকে আশাভরসা দিল। ও ফোের সনিক রিসিভরের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রায় চিৎকার করে বলল, আমাকে এখুনি একটা অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন, ট্ব্যাকার দিন। আমার ট্যাবলেট, ট্র্যাকার, টিভি, সব জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে-1’

ও-প্রান্তে খলখল করে হাসলেন শ্রীধর। আওয়াজটা ফাটা ডায়ায়ামের কাঁপুনির মতো শোনাল। তার ওপরে ফোনের কথা কেটে-কেটে যাওয়ায় শ্রীধরের হসি শনেে মনে হচ্ছিল কোনও পিশচের হাসি।

এরপর শ্রীধর কথা বলতে শুরু করলেন। বারবার ইলেকক্ট্রনিক হোচট থেলেও কথাগুলো বুঝ্ত পারছিল জিশান।
 নাম কিল গেম—কেনন ছেলেগেলা নয়!’

জিশান বুঝতে পারছিল গাতে সময় কম। কিলার প্রোটন আর কিলার সুখারাম হয়তো এই মুহূর্ত্র নির্ডুল লক্ষে ওর দিকে কনভার্জ করছ্, ওর সক্গে দূরতত্ব কমিয়ে আনছে।

জিশানের প্রঢণ রাগ হন। শ্রীধর পাট্টাকে কাঁচা চিবিয়ে থেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। আচ্মকা খেপে গিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে চেচচিয়ে উঠল ও।
‘শ্রীধর....পাট্টা! এই মুহূর্তে কোটি-কোটি মানুষ টিভিতে আমাকে দেখছে। আমি জানি, ওরা আমার সঙ্গে আছে। আমার অপটিক্যাল ট্যাবনেট চাই, চাই, চাই! এট আমকে না দিলে কিল গেমের সারভাইভাল ফ্যাক্টর জিরো হয়ে যাবে। তাই আমি নিউ সিটির জনতার আদালতে বিচার চাইছি। কथা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল জিশান। দু-হাত শূন্যে তুলে টিভিতে লাইভ টেলিকাস্ট দেখা দর্শকদের উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলল, 'আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন! আপনাদের কাছে আমি বিচার চাইছি! আপনারা মার্শালকে বলুন, যেন উনি একুনি আমাকে একটা অপটিক্যাল ট্যাবনেট দেন...এক্ষুनि...!

ভেজা রুকস্যাকটা তুলে নিয়ে জঙ্গলের দিকে ছুটল জিশান। এবার গা-

ঢকা দেওয়া দরকার। টিভির দর্শকরা নিশতযই ওর আবেদন ঠিকঠাক শনতে পেয়েছে, ওকে সরাসরি দেখতেও পেশ্যেছে। এখন দেখা যাক কী হয়।

সঙ্গে-সঙ্গে যেটা হল সেটা শ্রীধর পাট্টাকে একটা বিশাল ধাক্কা দিল। সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কিল গেম কন্ট্রোল রুহের হেল্পলাইনে একের পর এক ফোন আসতে লাগল। নিউ সিটির সিটিজেনরা সবই যেন জিশানের জন্য পাগল হয়ে গেছে। ওরা শুধু ফোনের বোতাম টিপছে। কন্ট্রোল রুমে কেউ ফোন ধরামাত্রই শুনছে, ‘এক্মুনি জিশানকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর ট্ব্যাকার দিন। ডোন্ট স্পয়েল দ্য গেম, য়ু ড্যাম ফুল!'

হড়ুমুড়িয়ে ফোন আসতে লাগল আর ফোনের ভাষা ক্রমশ রুক্ষ আর নোংরা হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই, ভাষাটা কাঁচা থিস্তির পর্যায়ে পৌছে গেল।

শুধু যে ভয়েস কল তা নয়। তার সঙ্গে ঝাঁকে-বাঁাকে ই-মেল আর ভিডিয়ো কল। কন্ট্রোল রুমের সব কর্মীর একবারে পাগল হৃয়ার জোগাড়।
 পাটীকে ( <िन করनেन।

সেখানে শ্রীধরের তখন প্রায় একই অবস্থ। ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের সুনামিতে একেবারে খাবি খাচ্ছেন। সবাই একই দাবি জানাচ্ছে ঃ ‘জিশানকে এক্ষুনি অপটিক্যাল ট্যাবলেট দিন। কিল গেমের থ্রিল আর স্ট্যাডার্ড নষ্ট করবেন না।' অসংখ্য ই-মেল আর কলের মধ্যে কেউ-কেউ শ্রীধরকে দু-চারটে বাজে কথাও বলেছে। কিন্তু এই চাপের সময়ে সেইসব নচ্ছার মানুষণুলোকে লোকেট করে শায়েস্তা করা অসম্তব। তবে শ্রীধর অবাক হয়ে মননুষগুলোর মাথাচাড়া দেওয়া স্পর্ধার কথা ভাবছিলেন। জিশান ছেলেটা নিউ সিটির সিটিজেনদের স্পর্ধা উসকে দিয়েছে। জিশানের জনপ্রিয়তার যে এরকম মাখেল দিতে হবে সেটা শ্রীধর পাট্টা ভারেননি।

শ্রীধরের একটা বড় જুণ হচ্ছে, পরিস্থিতি आঁচ করে তিনি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

এখনও তাই নিলেন। স্যাটেলাইট ফোন তুলে পরপর তিনজন কর্তাকে ফোন করলেন। চটপট কতকগুলো ইন্স্ট্রাকশন দিলেন। তারপর ফোন পকেটে রেথে একটা দীর্ঘপ্বাস ফেললেন।

অন্যান্য কিল গেমে কখনও এরকম ব্যাপার হয়নি। শ্রীধরের কপালে চিত্তার ভাঁজ পড়ন। যাক, এখনকার মতো তো কেসটাকে সামলে নেওয়া গেছে।

জিশানের দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন। জিশানের জন্য নতুন একটা স্যাটেলাইট ফোন আর অপটিক্যাল ট্যাবলেট কাম ট্য্যাকার নিয়ে একটা রটার রওনা হচ্ছে। তাও আবার একটা ট্যাবলেট নয়-দু-দুটো ট্যাবলেট। কারণ, এই মুহূর্তে পাবলিক আনরেস্ট গুরু হয়ে গেলে কিল গেমের তেরোঢা বেজে যাবে। হাজর-হাজর লক্ষ-লক্ষ কোটি টাকার লোকসান হয়ে যাবে।

শ্রীধর হাতघড়ির দিকে তাকালেন। তাঁর ডায়রেক্টিভ পাওয়ামাত্র সিভ্ডিকেট বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে ওটার রওনা হয়ে গেছে। দুটো ফ্যালকন হেলিকপ্টার অনেকক্ষণ ধরেই গেম সিটির ওপরে কড়া নজরদারির কাজ চালাচ্ছে। ওদের সল্গে ওটারের সিকিওরিটি অফিসার ওয়াকিটকিতে কথা বলে নেবে। জিশানের এগজ্যাক্ট লোকেশন কো-অর্ডিনেট জেনে নেবে।

টেনশনে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিলেন। দু-হতত মুঠঠা করলেন, খুললেন। পরপর কয়েকবার। তারপর ভাবলেন, শ্ধু তো আজকের রাতটা! কাল সকলে জিশান থাকবে কি না ঠিক নেই। তারপর খীরেসুম্থে পাবলিক আনরেস্ট প্রবলেমটার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন।

পকেট থেকে ফোন বের করলেন শ্রীখর। জিশানের নম্বর লাগালেন। খেয়াল করলেে, ওঁর আঙুলগুলো অল্প-অল্প কাঁপছে।
WVExilvanglabookplirblogspoticom
উত্তরে কয়েক সেকেন্ড ঘড়ঘড় শব্দ শুনতত পেলেন। সেই আওয়াজটা কমতেই প্রয় চেঁচিয়ে বললেন, ‘জিশান! তোমার অপটিক্যাল ট্যাবনেট అটারে করে রওনা হয়ে গেছে। একটা নয় দুটে।। তার সঙ্গে একটা নতুন স্যাটেলাইট ফোন। ডোন্ট উয়ারি...।

ও-প্রন্তে জিশানের হাসির শব্দ শোনা গেল। হয়তো জিশানের গান্ডসেটের সমস্যার জন্য শব্দটা খুব চাপা শোনাল। হাসির শেষে উনতিরিশ বছরের লড়াকু ছেলেটা বে-ভল্গিতে ‘থ্যাংক...য়ু’’ কথাটা উচ্চারণ করল তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, কথাটর ওপরে ব্যঙ্গের নুন-মরিচ বেশ ভালো করেই ছেটানো রয়েছে।

জিশানের বাঁ-হাতে লাগানো মাইর্রোইলেক্ট্রননিক ট্রাসমিটারের সিগন্যাল ট্ব্যাক করে খটারটা খুব সহজেই জিশানকে খুঁজে পেল। ওর বেশ কাছাকাছি একটা ছোট্ট মাপের ফাঁকা জায়ায় আকাশযানটা শিস দিয়ে ভারটিক্যালি ল্যাড্ড করল। জিশান সেদ্কিকে এগিয়ে গেল।

অফিসারটির সঙ্গে ওর কোনও কথ্থা হল না-শুধু জিনিস বিনিময় হন। www.facebook.com/banglabookpdf

ডেজা রুকস্যাক, বিকল অপটিক্যাল ট্যাবলেটট আর স্যাটেলাইট ফোন চলে গেল শটারে। আর ๗টার থেকে পাওয়া গেল নতুন রুকস্যাক-যার ভেতরে রয়েছে একজোড়া নতুন অপটিক্যাল ট্যাবলেট আর স্যাটেনাইট ফোন।

犭টারটা শূন্যে উঠে পড়তেই একটা অড্ডুত ঘটনা ঘটল। ক্যামেরার লেস্সকে আড়াল করে সিকিওরিটি অফিসার জিশানের দিকে তাকির্যে মুচকি হেসে মাথা নেড়ে চোখ মারল। যার অর্থ একটটাই : ‘লড়ে যাও, ভাই।’

জিশানের শরীরে নতুন শক্তি ঝলসে উঠল। ও জঙলের গভীরে ছুট লাগাল। ছুটতে-ছুটতেই অপটিক্যাল ট্যাবনেটের লাল চৌকো বোতামটা টিপল। ফুড ম্যাপ ফুটে উঠল পরদায়। খাবার চই, খাবার। জিশানের পাগলের মতো থিদ্দ পাচ্ছে।

একটুও সময় নষ্ট না করে নিয়ারেস্ট ফুড পয়েন্টের দিকে.ছুটল। মাটি খুঁড়ে খাবারের বাক্স বের করে ফেলল চটপট।

খেতে-খেতে জিশানের মনে হন, থিদের শক্তি অন্যান্য অনেক শক্তির চেয়ে জোরালো।

একটু পরে খাওয়া প্রয় শেষ করে ট্ব্যাকারে দুজন কিলারের পজিশন দেখল। মোটমমটি দূরে রয়েছে ওরা। ত ছাড়া ওরা সংখ্যায় একজন কমে যাওয়ায়
 বাড়ানোর জন্য জিশান জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকতে লাগল। তখনও ওর চোয়াল নড়ছে-খাওয়া তখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি।

এদিকটা শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। সূর্ত্রে আলো ভেতরে প্রায় ঢুকতেই পারছে না। শুধু গাছের পাতা থেকে ঠিকরে আসা অথবা ঈষদচ্ছ পাতা ভেদ করে আসা মোলায়েম এক আলো চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও-কখনও পশু-পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। घুঘুর ডাকও खনতে পেল জিশান। ডাকটার মধ্যে কেমন যেন দুপুর-দুপুর গন্ধ।

ঘড়ি দেখল। আর তিন কি চার ঘণ্টা। তারপরই আঁধারের ছায়া নামবে আকাশে।

ঠিক তখনই মোটরবাইকের শব্দ শুনতে পেল জিশান। শব্দটা ভয়ংকর রকমের কাছাকাছি।

অবাক হয়ে তাড়াতাড়ি ট্ব্যাকার দেখল। নাঃ, কিলার দুজন তো বেশ দূরে। তা ছাড়া ওরা রয়েছে একেবারে অন্যদিকে।

জিশান গাছের আড়ালে-আড়ানে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ডানহাতে তুলে নিল মিসইল গান। জলে ভিজে গেলেও অস্ত্রঢা দিবি ঠিকঠাক আছে। কারণ, এর বুলৌতুুলোর প্রোপাল্সিভ ফোর্স বারুদ্দর বদলে নিউক্লিয়ার পাওয়ার
r.থকে তৈরি হয়।

খানিকটা পথ পেরোতেই গাছের ফাঁক দিয়ে মোটরবাইকটাকে দেখতে ৎ.পল জিশান। কালো আর হলদে রঙের গাড়িটার ওপরে সওয়ার হয়ে রয়েছে. একজন মাঝবয়েসি ভদ্রলোক। মোটসোট। মাথায় টাক। গালে চাপদাড়ি। গায়ে ছালকা নীল রঙের ফুল স্লিভ শার্ট আর গা় নীল জিন্স। মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে জঙ্গলের এদিক-ওদিক তাকচ্ছে, উঁকিৰুঁকি মারছে।

আড়াল থেকে লোকটিকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।
কে এই লোকটা? কিলার অপাশির রিপ্লেসমেন্ট কিলার? শ্রীষরের নতুন সারপ্রইজ?

নাঃ, সেরকম মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া লোকটির সঙ্গে কোনওরকম অস্ত্রশস্ত্র আছে বলে ঠাহর হচ্ছে না।

গাছের আড়াল থেকে প্রকাণ এক লাফ দিল জিশান। মাটিতে একবার পাক খেয়ে বলের মতো গড়িয়ে লোকটির কাছে প্ৗौছে গেল। বাঁধন ছেড়া গোটনো স্প্রিং-এর মতো ছিটকে সোজা হয়ে দঁড়াল এবং মিসাইল গানের লম্বা নলটা লোকটার মাথার পিছনে ঠেকাল। থেমে-থেমে বলল, ‘ট্রিগার টেপামাত্রই তোমার কপাল щুঁড়ে ওলি বেরিয়ে চলে যাবে...।'
 হেল্প করনেকো আয়া। তেরে লিয়ে টিভি লায়া...।'

কথাটা শোনামাত্রই জিশান ব্যাপারটা বুঝতে পারল। লোকটা লাইভ টেলিকস্ট থেকে জনতে পেরেছে, জিশানের টিভি অকেজো হয়ে গেছে। তাই ওর জন্য টিভি নিয়ে এসেছে।

বাইকের কেরিয়ার থেকে একটা ছোট টিভি বের করল চাপদাড়ি লোকটা। জিশানকে দিল। জিশান ওটা তাড়াতাড়ি রুক্যযাকে ঢুকির্যে নিল।

কিন্তু লোকটট জিশানকে খুঁজে পেল কী করে?
এই প্রশ্নের উত্তরে লোকটা হিন্দিতে যা বলল, তার সারাংশ হন এই :

লাইভ টেলিকল্টে জিশানের টিভির সমস্যা জানার পর গেম সিটির 'মক’ সিটিজেনরা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন একটা বাড়িতে জড়ো হয়ে জিশানকে সাহাযা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বাইশ জন সিট্টিন বাইশটা মোটরবাইকে চড়ে বসে। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে টিভি। ওরা ঠিক করে যে, পুরো গেম সিটি চষে বেড়িয়ে যে করে হোক জিশানকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর বাইশজনের মধ্যে যে প্রথমে জিশানের দেখা পাবে, সে ওর হাতে কালার টিভিটা তুলে দেবে।

טs www.banglabiofledf.biogspot.com
লোকটির নাম রউফ লালা। রউফ সবার আগে জিশানকে খুঁজে পেয়েছে বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করছে। যে-বাইশজন জিশানের থ্াোজে বাইক নিয়ে বিপজ্জনক অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে সুপারগেম্স কর্পোরেশন ইতিমধ্ধেই তাদের জন্য কুড়ি হাজার টাকা করে বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করেছে। আর রউফ যেহেতু জিশানের দেখা পেয়েছে, ওর হাতে টিভিটা দিতে পেরেছে, ততত মনে হয় রউফের জন্য আরও উঁুদরেরের বোনাস পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

রউফ লালা জিশানের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। হাতজোড় করে নমস্করের ভপ্গি করল ঃ ‘জিশান ভাইয়া, ম্যাঁয় বহত লাকি হঁ। কিঁউ কে তেরে সাথ আচানক মেরা সব্সে পহেলে ভেট হো গিয়া...।'

এমন সময় গাছের পাতায় আওয়াজ তুলে একটা বড়সড় ইটের টুকরো অথবা পাথর ওদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে এসে পড়ল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ বিস্ফোরণের শব্দ। এবং কয়েকটা গাছে আগুন ধরে গেল। গুরু হল পাখপাখালি আর নানান প্রাণীর চিৎকার।

জিশানের মনে হল, এটা বোধছয় হাই-এনার্জি রকেট লঞ্চারের কীর্তি। ও রউফকে কিছু বলে ওঠার আগেই রউফ বলল, ‘ডেঞ্জার, জিশান ডাইয়া!


পলকে তাই হন। জিশান রউফের বাইকে চড়ে এঁকেবেঁকে রওনা দিল। আর রউফ একটা গাছের ঔঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে জিশানের চলে যাওয়া দেখতে লাগল। দেখতে-দেখতে বিড়বিড় করে বলল, 'সরফরোশি কি তমন্ন অব হামারে দিল মে হায়/দেখনা झায় জোর কিত্না বাজু-এ কাতিল মে झায়... ${ }^{\prime}$

আগুন এর মধ্ধেই বড়সড় চেহারা নিয়েছে। রউফ সতর্কভাবে চারপাশে তাকাল। গছের আড়ালে-আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ও ফেরার পথ খুঁজতে লাগল।

কয়েক পা যেতে না যেতেই কী একটা যেন আচমকা ছুটে এসে ওর বুকে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল। পিছনদিকে ছিটকে পড়ার সময় ও অবাক হয়ে দেখল, ওর বুকে হঠাৎ করে একটা প্রকাণ গর্ত গজিয়ে উঠেছে। গচ্ত্তর ভেতরটা টকটকে লাল।

রউফ লালা মারা যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ওর সবচেয়ে প্রিয় নামটা ধরে চিৎকার করে উঠল : ডা-ল্-ললা-...আ...আ...!

ওর মুখ দিয়ে শব্দ আর রক্ত একইসঙ্গে বেরিয়ে এল।
ঠিক তथনই দূরের একটা পিপুল গাছের আড়াল থেকে কিলার

প্রোটনের মুখটা দেখা গেল। চোখে আইগিয়ার থাকায় চোখ দেখা যাচ্ছে না। তবে ওর ঠোটের কেণে এক চিলতে হাসি নজরে পড়ছে।

জঙ্গল পেরিয়ে জিশান আবার রাস্তায় নেমে পড়ল। কিছুক্ষণ ধরেই ও বাতাসে পোড়া গন্ধ পাচ্ছিল। জন্গল পুড়হে। এই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা জঙ্গলকে না শেষ করে দেয়!

ও রউফ লালার কথা ভাবছিল। হাসতে-ছাসতে ঝুঁকি নেওয়া এক আশ্চর্য মানুষ! জিশানকে একবার সামনাসামনি দেখতে পেয়েই যে-মানুষটা নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতে পারে। ওর 'তুই-তুই’ সম্বোধনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা ভালোবাসার, আন্তরিকতার, টান ছিল।

ওই ভাগ্যবান মানুষটা ভলো থাকুক। মনে-মনে বলল জিশান। তারপর রাস্তা ধরে বাইক ছোটাল।

ひাঁ-খাঁ গেম সিটির সব জায়গা যেন একইরকম। ধুধু পথঘাট। কোথাও থোলা মাঠ, কোথাও গাছপালা জঙ্গল। আবার কোথাও থোকা-থোকা ফুনের

 তাই। শ্ধু অল্প কিছু মানুষের বুকের ভেতরে সত্যিকারের মানুষ রয়েছে।

জিশান ভীষণ জোরে বাইক চালাচ্ছিল। কখনও রাস্তিয়, কখনও থোলা মাঠের ওপর দিয়ে, কথনও গেম সিটির সিটিজেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে, কখনও টিলার ওপর দিয়ে, কথনও-বা ফ্লাই ওভারের ওপর দিয়ে। তবে পথ চলার ফাঁকে-ফাঁকে ও থামছিল। ফুড ম্যাপ দেখছিল, দ্বাযাকার দেখছিল, টিভি দেখছিল। আর থিদ্দে পেলে থেয়ে নিচ্ছিল।

টিভিতে ভায্যকারদ̆র গলায় স্বরে উত্তেজনার পারদ বেশ কয়েক ধাপ চড়ে গেছে। কিল গেমের ইঁদুর-বেড়াল থেলা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নানান মতামত শোনানো হচ্ছে। তারই মঝেে-মাঝে ছুকে পড়হে পুরোনো সব কিল গেমের ক্লিপিংস। আর এসবের ফাঁকফোকরে রুট্নমাফিক বিষ্ঞাপনের ব্রেক তো আছেই!

মাথার ওপরে সূর্य অত্তত পনেরো ডিগ্রি হেনে গেছে পশ্চিম দিকে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা-তারপরই অন্ধকার। যেটা ভগবানের দেওয়া জিশানের কালো পোশাক। তখন ওকে সুখারাম আর প্রোটন দেখতে পাবে না। অবশ্য জিশানও ওদের দেখতে পাবে না। কিন্তু তা সত্ত্রে জিশান মাথা তুলে সূর্থ্যের দিকে তাকাল। সূর্যদেবকে তাড়াতাড়ি অস্ত যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

এক ঝাঁক বাড়ি-ঘরের পাশ দিয়ে জিশানের বাইক ছুটে যাচ্ছিল।

 করছছ। বেলা বাড়ার সক্স-সল্গে ওদ্রু সাহসও বেড়েছে।

জিশানের বারার মিনি আার শানুর কथা মনে পড়ছিন। কিন্ু ও জ্েের

 ওর দ্বলত দ্ধে ঞ্লেকু।

জিশান মনকে শক্ত করহছিন। বনহ్হি, মনে-মনে, আার তো মাত্র পনেরো


 भाष्ह।

কিষ্ঠ এখन घুম পেলে চলবে না। পলেরো ঘণ্টা পর ও घুল্জোে।

 বড়জ্জের একলো মিটlর। প্রথম পাহাড়টার পাক্লটী বেয়ে জিশান্নে বাইক ওপরে ђऐळ्ज नाभन
 অनाদিকে নকन পাথর্রে গ্য়ান। লেই দওয়ালের ফাট্ থথেক ছো--বড়
 जসংখ ছেট-ছেট ফুল।

জিশানের মনে হল, কত্তিন পর একজন মানুম ফুলখাোেে লেখতে এল। जও আবার ওন্ড সিটির দूরের শহহ থেকে। ওর আরও মনে হল, ওকে


অপাশিরা কথাও মনে পড়ছিন জিশানের। অপাশিকে ও চেনে না, জানে
 यাদ্রর মধ্যে এককণাও जালোবাসা কিংবা ঘূণা বিনিয়ম হ্য়ন, তারা একে অপরের भাণর জন্য পাগল!

 সুখারাম্রে ক্ষেণ্রে তা।

পাহাড় অন্রকটা উঠে আসার পর জিশান থামল। এই উচ্চে থেবে
 ঘাস আর আগাছার ওপরে ও বলে পড়ন। কহ্যুক মুহূর্ত্র জন্য কিল গোের

কথা ভুলে গেল। ভুলে গেল, ওর নাম কী, ও কোথায়, কী করতে এই পাহড়ে বসে আছে।

চোখের সামনে সাদা আর নীল মেশানো আকাশ। কয়েকটা কালো পাথি। চিড়িক-চিড়িক করে ডাকতে-ডাকতে জিশানের চোথ বরাবর উড়ে গেল। শব্দ করে বাতাস বইছে। জিশানের মনে হচ্ছিল, বাতাস ওর সঙ্গে কথা বলছে।

জিশান কেমন উদাসীন হয়ে গেল, আনমনা হয়ে গেল।
হঠাৎই এক্টা চিলের চিৎকরে ও বাস্তবে ফিরে এল। পোশাকের হাতা দিয়ে কপাল আর গালের ঘাম মুছল। াঁ-ছাতের অপারেশনের জায়গাট অল্পঅল্প ব্যাথা করছে। ট্য্যাকারের মাইক্রোট্রান্সমিটারটা এই জায়গায় মাংসের আড়ালে আস্তানা গেড়ে আছে।

উঠে দাঁড়াল। ক্লান্ত পায়ে রুকস্যাকের দিকে এগোল। হাত দুটো শূন্যে তুলে কয়েকবার ঘোরাল। পা টানটান করে কাল্পনিক শক্রুর দিকে কয়েকবার লাথি ছুড়ন। জড়তা কাটিয়ে চাঙ্গা হওয়া দরকার।

রুকস্যাক থেকে টিভি বের করল। অন করামাত্রই উত্তেজনাময় রানিং কমেন্ট্রি। আর ক্রোজ-আপ ছবিতে প্রোটন। পাথর থোদাই করা নিষ্প্রাণ মুখ।
‘...ফোক্স, হাই অ্যাড্রিনালিন গেম এখন পিক-এ প্ৗৗছে গেছে। কারণ,


‘হিল নাম্বার ওয়ান থেকে নামার পথ তিনটে। তার মধ্যে দুটো রাস্তা প্রোটন গাড়ি দিয়ে ব্লক করে দিয়েছে। আর অন্য রাত্া ধরে ও এখন মোটরবাইক নিয়ে পাহড়ে উঠবে। সো, হেড আু হেড এনকাউন্টার ইজ ইনএভিটেব্ল। মোকাবিলা হচ্ছেই...।

কিস্তু গাড়ি দিয়ে প্রোটন দুটো রাস্তা র্রক করল কেমন করে! ও একা দুটো গাড়ি আর একটা মোটরবাইক হিল নাম্বার ওয়ান পর্যষ্ত নিয়ে এল কেমন করে! সুখারাম বা আরও কেউ কি ওকে হেল্প করেছে? এটও কি শ্রীধর পাটার একটা সারপ্রাইজ?

এসব কথ্থা ভাবতে-ভাবতে জিশান চটপট ট্র্যাকার বের করল। তারপর द্ব্যাকরের দিকে চোখ রেত্খই হান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান বের করে নিল রুক্যস্যাক থেকে।

द্ব্যাকরে সবচেয়ে কাছের লাল ডটটা ওর কাছ থেকে প্রায় একশো মিটার দূরে রয়েছে। না, ‘দূরে’ রয়েছে না বলেে ‘কাছে’ রয়েছে বলাটই বোধহয় ভালো। জিশান পাহড়ের কিনারায় এসে খাদের দিকে তাকান। পাহড়ে ওঠার রাস্তাগুলোর শুরুর দিকটা দেখতে চাইল। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে না। গাছপালায় আড়াল হয়ে গেছে।

টিভিতে তখন ভিশানের ছবি। পাহড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সঙ্গে রানিং কন্ন্ট্রি চলছে : ‘...निজের মোটরবাইকের সঙ্গে দুটো গাড়ি চেন দিয়ে বেঁধে প্রোটন টো করে হিল নাম্বার ওয়ান পর্যষ্ত নিয়ে এসেছে। তারপর রোড র্রক করেছে। ঠিক যেন কোনও মানুযের মেইন আর্টারি র্বক করে দেওয়া। সত্যি, বন্ধুগণ মানতেই হবে প্রোটনের ব্রেন সুপারকুল...।'

জিশানের ঠিক পিছনে পাহড়ের পাথুরে দেওয়ালে সংঘর্ষের শব্দ শোনা গেল।

ওর কানে তালা লেগে গেল। পাথরের ছোট-বড় টুকরো স্প্লিন্টারের মতো ছিটকে গেল চারিদিকে। ও চট করে একটা বোল্ডারের আড়লেে চলে গেল। প্রোটনের অস্ত্রা কী হতে পারে? লেসার টেলিশটার? নাকি হালকা, লং ডিসট্যান্স রাইফেল?

কয়েক সেকেন্ড পর গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে দেখতে চেষ্টা করন। সঙ্গে-সঙ্গে ‘ক্র্যাক’ আওয়াজ। জিশান এক ঝটকায় মাথা নামাল। ওর পিছনের পাথর থেকে আবার স্টোন চিপ্স উড়ে গেল নানান দিকে।

জিশানও পালটা জবাব দিল মিসাইল গান দিয়ে। নীচের দিকে আন্দাজ করে চকিতে পরপর তিনবার ট্রিগার টিপল। তারপর ছুটে চলে গেল টিভি

 आँটছে।

এবার জিশানের ক্লোজ-আপ দেখা যাচ্ছে। সারা মুখে ঘাম। কোথাওকোথাও রক্তের ছিটে। চুলে ধুলোর আস্তরণ।

কিন্তু সুখারাম এখন কেথায়? কতটা দূরে?
ন্ব্যাকার দেখল। সুখারামের লাল ডট্টা বেশ কিছুটা দূরে, কিন্তু এগিয়ে আসছে সবুজ ডটের দিকেই।

না, আর দেরি নয়। চটপট রুক্য্যকে ট্র্যাকার, টিভি সব গুছিয়ে নিল। গান্টিং নাইফ আর মিসাইল গান কোমরে তুঁজে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে ব্ৰঁধে পাহড়ের গা বেয়ে নামতে শুরু করল। ছোট-বড় বোন্ডারকে ডিঙিরেরে বা भাশ কাটিত্রে, গাছের ঝুঁটি ধরে নিজেকে সামলে জিশান নামতে লাগল। নামার সময় প্রেটনের পজিশন আন্দাজ করে নিজেকে পাথর কিংবা গাছের আড়ালে-আড়ালে রাখতে লাগল।

নামতে-নামতে ভাবছিল জিশান। পথ দিয়ে নয়, বিপথ দিয়েই ওকে পালাতে হবে, কিলার প্রোট্নকে এড়াতে হবে। তারপর অন্ধকারের অপেক্ষ। কিন্তু জিশান যেরকম ভাবল, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম হল না।
নামার সময় বেশ বিপজ্জনক ঢাল ওকে ম্যানেজ করতে" হচ্ছিল। ওর

## www.banglabookpdf.blogspot.com



## 

হঠাৎই মনে হল, यদি কোনওভাবে ওর পা 户্লিপ করে তা হলে বিপদ তো হবেই, তার ওপর রুকস্যাকের টিভি, দ্ব্যাকার, স্যাটেলাইট ফোন সবকিছুর বারোঢা বাজবে। নতুন করে টিভি আর ট্ব্যাকার জোগাড় করার ঝঞ্ঞাটের ব্যাপারটা মনেমনে ভাবল। তারপর রুকস্যাকটা খুলে নামিয়ে দুটো বড় পাথরের খ゙জে লুকিয়ে ফেলল। জায়গাট ভালো নোট করে মাথায় গেঁথথ নিল। এবার মিসাইল গান আর হান্টিং নাইফ সম্বল করেই নামা যাক।

জিশান নামতে লাগল। পড়ে যেতে-বেতে টাল সামলাতে লাগল বারবার। আর দু-চোখ সরু করে প্রোটনকে থুঁজতে লাগল।

প্রোটনও জিশানকে খুঁজছিল। কিন্তু ও ভেবেছিল, জিশান তিনটে পাকদণীর একটা বেয়ে নামবে। ও যে পাহড়ের ঢাল বেয়ে নামার ঝুঁকি নেবে সেটা ভবেনি। তাই জিশানকে প্রোটন ট্র্যাক করতে পারেনি। মিনিট কয়েক ল্রেঁজখুজির পর প্রোটন চুপ করে ভাবতে শুুু করল। জিশানের বুদ্ধির সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাপ খাওয়াতে লাগল। জিশানের স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে সেটা आँচ করতে লাগল। আর চিবুক তুলে শকুনের চোেে পাহাড়ের ঢলেের প্রতিতি কণা ছানবিন করতে লাগল।

প্রোটন ভাবতে লাগল, 'আমি জিশান হলে কোন এসকেপ রুট ব্যবহার

 গেল। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে প্রোটন উঠতে শুরু করল। পিঠে রুকস্যাক। স্যাটেলাইট ফোনটা রুকস্যাকে চালান করে দিয়েছে। লেসার টেলিশটার আড়াআড়িভাবে দাঁতে চেপে ধরা। চোয়ালের রেখা উঁদু হয়ে চেয়ে আছে। লম্বালম্বা হাত-পা ব্যবহার করে এমনভাবে ও পাহাড় বেয়ে উঠছে যেন একটা কালো রঙের মাউন্টেন লায়ন।

পাহড়ের কালচে পাথরের মাঝে কালো পোশাক পরা প্রোটনকে খুঁজে পাচ্ছিল না জিশান। তাই ও সামন্যত়ম নড়াচড়া দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় রইল।

কিন্তু হঠাৎই একটা অঘটন ঘটল।
পাহাড়ের পাথরের খাঁজে বোধহয় একটা চিল বাসা বেঁধেছিল। জিশান আচমকা ওটার সামনে হজির হয়ে পড়তেই মা-চিলটা ডানা ঝপটে তেড়ে এল ওর দিকে। এবং সাপের ছোবল মারার কিপ্রতায় জিশানের কপালে বাঁকানো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে দিল।

জিশানের কপাল কেটে রক্ত বেরিয়ে এল। শক্ত ঠোটটর আঘাতে কপালে বেশ ব্যথাও টের পেল। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতি হল অন্যভাবে। জিশান ব্যালান্স হারিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে পড়তে লাগল।
www.banglaboék pect.tilogspot.com $\quad$ טג
পাহড়়র ঢাল গড়িয়ে নেমে আসা শরীরটাকে প্রোটন সহজেই দেখতে পেল। একাঁা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে ও জিশানকে তাক করে লেসার টেলিশটার পরপর দুবার ফায়ার করল।

মুভিৎ টারগেট। তা প্রোটন লক্ষ্টষ্ট হল। আশপাশের পাথরের ছিলকা উড়ে গেল। এবং জিশানের গড়িয়ে পড়া শরীর একেবারে প্রোটনের ঘাড়ে এসে পড়ল।

দুটো শরীর জড়াজড়ি করে নীচে পড়ছিল, কিন্তু একটা পাথরের চাতাল ওদের বাঁচিয়ে দিল।

ওদের সংঘর্ষের জায়গা থেকে কয়েক মিটার নীচে একটা পাথরের চাতাল ছিল। তার শরীরে অনেক ছোট-বড় ফাটল, কিস্তু পাথরটা চেহারায় ঠিক যেন একটা বড় মাপের ডাইনিং টেবিল। তার গায়ের চারপাশে আর নানান ফাটলে শ্ধু আগাছা আর ঘাস।

জিশান আর প্রোটন সেখানে এসে পড়ল। একটা শাখামুটি সাপ চাতানটায় শুয়ে বোধহয় রোদ পোছচ্ছিল, চমকে উঠে সড়সড় করে একটা ফাটলে গিয়ে पুকে পড়ল।

নিজেকে সামলে নিতে জিশানের এক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি।
 সেকেন্ড।

প্রোটনের লেসার টেলিশটার ওর হাত থেকে ছিটকে গিক্রেছিল। পাহাড়ের ঢলেের পাথরে-পাথরে ঠোক্কর থেয়ে ওটা নীচে পড়ে গেছে। রুকস্যাকের দশাও তই। স্ট্রাযপ ছিঁড়ে কখন যেন আশপাশে ছিটটে পড়েছে।

আর জিশানের হানও একইরকক। ওর কোমরে গোঁজা মিসাইল গান চিলের আচমকা আক্রমণে নীচে পড়ার সময় কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। শুধু হান্টিং নাইফটা কোমরে তখনও ছিল। ওটার ফলার থোঁচা খেয়ে কোমরের বাঁদিকটায় কোথাও একটা চোট লেগেছে। জায়গাটা বেশ জালা-জ্লালা করছে।

প্রোটনের কিপ্র প্রতিবর্তী ক্রিয়া জিশানকে অবাক করে দিল। বেজির তৎপরতায় ও জিশানের লাথির সংঘাতটা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ এড়িয়ে গেল। সার্কাসের পেশাদার অ্যাক্রোব্যাটদের মতো দুবার সামারসন্ট খেয়ে পলকে চলে গেল জিশানের হাত-পায়ের নাগালের বাইরে।

এরপর যে-লড়াইটা হল সেটা কারাটে আর কিক বক্সিং-এর অড্ুুত মিশেল। এই সব লড়াইল্যের আধুনিক নাম জিশান না জানলেও লড়াইটা জানে। আর প্রোটনও তার চেয়ে কিছু কম জানে না।

ওদের দুজনের হাত-পা চলতে লাগল বিদ্যুৎগতিতে। আর সংঘর্ষের

চোখাচোখা শদ্দ হতে লাগল। ওর ছিপছিপ্প লম্বা প্রতিদ্বনদ্মীকে দেণে জিশান তার শক্তি যতটা হওয়া উচিত বলে आঁচ করেছিল, এখন বুঝতে পারছিল প্রোটনের শক্তি তার চেয়ে অনেকটা বেশি।

ঘুরত্ত চাকার মতো শরীরটাকে শৃন্যে পাক খাইয়ে দিল প্রোটন। একইসঙ্গে ওর ডান-পা একটা বৃক্টাপ এঁকে দিল বাতসে। আর পায়ের গতিপথে জিশানের চোয়ালকে পেয়ে গেল।

জিশান একটা ঝটকা দিয়ে মাথাট সরিয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু সেটার টাইমিং বে ঠিক হয়নি সেটা চোয়ালের আঘাত ওকে জানিয়ে দিল। ও পিছনদিকে টাল খেয়ে পড়ে গেল পাথরের দেওয়ালে। কিত্তু এক সেকেডের মধৌই নিজেকে আবার সামলে নিল।

প্রোটন ওর পোশাকের কোনও একটা পকেট থেকে একটা ইস্পাতের স্টার বের করে নিয়েছিল। সেটার প্রান্তগুলো ক্ষুরের মতো ধারালো। স্টারটা মপে একটা বিস্কুটের মতো। সেটা ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমার মাঝে চেপে ধরল—যেন জিনিসটা একটা চ্যাপটা সিগরেট।

জিশান হান্টিং নাইফট্টা কোমর থেকে খামচে বের করে নিল। কিন্তু ততক্ষণে প্রোটন পা ভাঁজ করে সামান্য ক্রঁজো হয়ে ইম্পাতের ঝকঝকে তারাটা


ছোট্ট অস্ত্রচা বাতাস চিরে ধেয়ে গেল জিশাের দিকে, ওর ছুরি ধরা গতের পিঠঠ গিয়ে প্রথম আঘাত করল, কিন্তু সেখানেই থামল না। দুরন্ত গতিতে চাকার মতো গড়িয়ে হাত বেয়ে ছুটে গেল। তারপর ছুচোবাজির মতো এলোমেলো বাঁক নিয়ে জিশানের বুকের ওপরে আড়াআড়িভবে ধারালো ফলার দাগ টেনে দিল।

জিশানের হাত, বুক, জূলে গেল। রক্তের রেখা ফুটে উঠল হাতে, বুকে। হান্টিং নাইফ হাত থেকে খসে পড়ে গেল।

আচমকা আঘাত আর যম্ত্রণায় জিশান হয়তো কয়েক সেকেড্েের জন্য কাবু হয়েছিল, সেই 《াঁকে প্রোটন এক बাঁক ইস্পাতের পিন জিশানের চোখমুখ লক্ষ্য করে ছুড়ে দিয়েছে।

পিনগুলো মাপে ইঞ্চিচরেক। চকচকে। ডগাগুলো সূক্ম।
জিশান ঝাটিতি বসে পড়েছিল। কিন্তু তা সভ্জেও ও সবক'্ট পিন এড়াতে পারল না। তিনটে ইস্পাতের পিন ছুটে এসে ওর কপালে আর গালে বিંধে গেল।

সেই অবস্থাতেই জিশান একটা মাঝারি মাপের বোল্ডার তুলে নিয়ে শট পটের ভঙ্গিতে ছুড়ে দিল। ওর শরীরটা চক্কর খেয়ে দেড়পাক ঘুরে গেল। এবং

ভারি পাথরটা প্রচণ ডরবেগ নিয়ে প্রোট্ের পেটে গিয়ে ধাক্কা মারল। সংঘর্ষের অভিঘাতে প্রোটন পিছনদিকে টাল খেয়ে গেল। ব্যালান্স রাখার জন্য ও দুগাত চরকির মতো শুন্যে ঘোরাতে লাগল। এই পড়ো-পড়ো অবস্থায় তিন-চার সেকেন্ড বাতালে চিত-সাঁতার কাটল। তারপর টলে পড়ে গেল পাথরের চাতাল থেকে।

জিশান এত সব কাণ্ড দেখার জন্য মেটেট্ই অপেক্ষ করেনি। মসৃণ পাথরটা শক্রকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও বুঝতে পেরেছিল লক্ষ্যভেদ হবেই। নিউ সিটির সুদীর্ঘ ট্রেনিং ওর আঅ্মবিশ্বাসকে অকল্পনীয় ভিতের ওপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাই ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে পাহড়ের ঢলের দিকে। তারপর শ্ধু হাতে রক ক্লাইম্বিং শুু করে দিয়েছে। মাকড়সার মতো তরতর করে বেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

ও জানে, প্রোটনের হাতে এই মুহুর্তে কোনও লং ডিসট্যান্স অন্ত্র নেই। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্তব ওকে মোটরবাইকের কাছে পৌঁছতে হবে। জলদি! জলদি!

প্রেট্ন চাতাল থেকে প্রায় দশ-বারো যুট নীচে পড়ে গিয়েছিল। ওর মাথা ঠুকে গিফ়্েছিল একটা বড় বোল্ডারে। ওর শরীরটা সেই বোন্ডারের খাজ্ে
 আইগিয়ার আশ্রর্যভাবে বেঁচে গেছে-তাতে এতটুকু চিড় ধরেনি। তাই চিত হয়ে পড়ে থাকা প্রোটনকে বিকেলের রোদ্রে ভারি বিচিত্র দেখাচ্ছিল। ওর দুটো কালো ‘চোখ’ নিষ্পলকে তাকিয়ে ছিল আকশের দিকে।

জিশান পাগলের মতো ওর মোটরবাইকের কাছে প্পাঁঁতে চাইছিল। ওর এখন মোটরবাইবটা দরকার। ওটই এখন ওর সবচেয়ে বড় অন্ত্র।

পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে জিশান সুখারাম নস্করের কথা ভাবছিল। সুখারাম এখনও অকুস্সলে এসে প্পৗঁছে পারল না কেন? ওর তো এতক্ষণ দেরি হওয়ার কথা নয়! তা হলে কি ও ট্র্যাকার দেখে জিশানের কাছাকাছি কোথাও এসে গেছে, কিন্তু পাহাড়ের ঢলে সঠিক জায়গাটা খুঁজে পায়নি?

আর বেশি ভাবার দরকার নেই! হাঁপাতে-হাঁপাতে জিশান ওর পুরোনো জায়গাটায় বেয়ে উঠল। ওই তো ওর রুকস্যাক! ওই তো ওর মোটরবাইক!

বিকেলের আলোয় জিশানকে ভারী অড্ডুত দেখাচ্ছিল। ওর মুঢ্,ে, গলে, চিবুকে ঘাম আর রক্ত। হাত আর বুকের ওপরে আঁকা হয়ে গেছে রক্তের রেখা। সারা শরীরে জ্রালা-পোড়া। তিনটে ইস্পাতের পিন লম্বজাবে বিঁধে রয়েছে কপালে আর বাঁ-গালে। এতক্ষণ পিনগুলো খোলার কথা মনে হয়নি।

এখন টান মেরে খুলে ফেলন। নতুন জ্বালার অনুভূতি হল ফোটাল তিনটে বিন্দুতে। ভাগ্যিস এগুলোর ডগায় বিষ মেশানো নেই! আর হাতাহাতি লড়াইয়ের সময় প্রোটনের নখের আঁচড় থেকে ও নিতান্ত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে।

রুকস্যাক পিঠে নিয়ে মোটরবাইক ছুট্য়ে দিল জিশান। তার আগে বাইকের কেরিয়ারে রাখা প্লেট টিভিটা অন করে দিল। ছবি দেখা না যাক, অন্তত রানিং কম্মে্ট্রিঢা শোনা যাক। তা থেকে যতটুকু খবর পাওয়া যায়। ‘এইমাত্র আপনারা যা দেখলেন সেটা একটা অবিশ্পাস্য লড়াই। এইরকম থ্রিলিং টেব্ল-টপ ফাইট এর আগে কেনও কিল গেমে দেখা যায়নি। কিলার প্রোটন এখনও অষ্ঞান হয়ে আছে। আশা করি আর কিছুক্ষণের মধ্যে ও জ্ঞান ফিরে পাবে। তারপর আবার নতুন এনার্জি নিয়ে লড়াইয়ে নামবে।
‘বন্ধুগণ, আপনাদের জানিয়ে রাখি কিল গেমের নানানরকম ইভেন্ট নিয়ে যেসব "ফোরসি দ্য আউট্কাম"-এর সুইপস্টেক-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে এ পর্যষ্ত বাজি ধরেছেন চোদ্দোশো তিরিশ মিলিয়ন দর্শক। এরকম বিশাল নাম্বারের পার্টিসিপেশান আগে কখনও কেনও কিল গেমে দেখা যায়নি। দিস ইজ অ্যান অল টাইম রেকর্ড, ফোক্স, অল টাইম সুপারডুপার হিট!
 রোড ব্লক রয়েছে। একটা গাড়ি সেখানে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে গেছে কিলার প্রোটন। দেখা যাক, আমদের সুপারহিরো কী করে! আপনারা ভুলে যাবেন না, জিশান এখন উন্ডেড আর টায়ার্ড। সেটা ওকে দেখেই আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারছেন।
‘আর-একটা প্লাস পয়েন্ট ফর জিশান। কিলার প্রেটন এখন টেম্পোরারিলি ডি-অ্যাক্টিতেটেড হয়ে গেছে, কিন্তু তা সত্তেও জিশান ওর মোটরবাইকের কাছে এসে রুকস্যাক থেকে ওয়েপন নিয়ে আবার প্রোটনের কাছে ফিরে যায়নি। ওকে পারমানেন্টলি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দেয়নি। সো, ফোক্স, থ্রি চিয়ার্স ফর জিশান, থ্রি চিয়ার্স ফর হিজ সফ্ট হার্ট-।’

জিশান এসব তনতে পাচ্ছিল আর পাকদণী বেয়ে নামছিল। একইসঙ্গে ভাবছিল, কী করে ও রোড্বকটা পেরোবে। ওর সামনে পশ্চিমে ঝুঁকে পড়া সूর্য। সরাসরি যেন তাকিয়ে আছে জিশানের দিকে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ও পাহাড়ের প্রায় নীচের দিকে চলে এল। আর তখনই ওর চোখে পড়ল, সরু রাস্তায় প্রায় আড়াআড়িভাবে একটা রুপোলি রঙেে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার দুপাশে এমন কোনও ফাঁক নেই যা দিয়ে একটা মোটরবাইক গলে যেতে পারে।

জিশান বাইকের গতি কমাতে বাধ্য হল। এবং থামল। রুপোলি গাড়ির ‘পাঁচিল'ঢার দিকে তাকিয়ে রইল।

সুখারাম নস্করের ভালো লাগছিল না। ও জানে, ওর ফেরোসিটি কোশেট্ট 8.9। জানে, ও বেজির মতো ক্ষিপ্র, চন্দ্রবেড়ার মতো সতর্ক, তৎপর। আর ছুটতে পারে হরিণের মতো—সৌাও আবার একটানা, অনেকক্ষণ ধরে।

নিয়মিত শরীরর্চা করাটা সেন্ট্রাল জেলের কয়েদিদের রুটিনের মধ্যে পড়ে। তা ছাড়া দোড়ের অভ্যেসটা ও জেলের মধ্যেও বজায় রেখেছে। ফলে এখন ও বদনোয়ার গ্যাঙের তিন-চারজনের সঙ্গে খালি গাত দিব্যি মহড়া নিতে পারে। তা সত্ত্ৰও শ্রীধর পাট্টা ওর সারা শরীরে নানান মারণাস্ত্র সাজিয়ে দিয়েছেন। আর বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দিয়েছেন স্যাটেলাইট ফোন।

কারণ একটটই : গেম সিটির সীমানার মধ্যে ওকে জিশানকে শিকার করতে হবে।

এইখানেই হয়েছে যত মুশকিল!
কিল গেমে নামার আগে জিশান্নর -্ञানান গেমের ক্ৈিপিংস স্খারাম
 ওম্ড সিটির এই লড়াকু ছেলেটার প্রতি ওর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। বারবার মনে হয়েছে, জিশান ওর ভাই—ওরা একই শহরে মননুষ হয়েছে। এই নিউ সিটিতে আসার পর থেকে জিশান ওর শহরের হয়ে লড়াই করছে, ন্যায়ের হয়ে লড়াই করছে।

সুখারামের মনে পড়ল, মনোহর সিং-এর হয়ে জিশান রুণ্খে দাঁড়িয়েছে, জাব্বাকে পিট ফাইটে নিকেশ করতে-করতেও ও ছেড়ে দিয়েছে, অন্যায়ের সক্গে কখনও আপস করেনি।

এসব কথা ভাবতে-ভাবতে সুখারামের মনের ভেতরে শ্রীধর পাটার মুখটা বদনোয়ার মতো হয়ে গেল, আর জিশানের মুখটা ওর মতো। সুখারামও তো ন্যায়ের জন্যাই লড়াই করেছিল!

সুখারাম যদি জিশানকে খতম করতে পারে তা হলে তার বিনিময়ে ও কী পাবে? মৃত্যুদণ রদ। সেইসঙ্গে মুক্তি। আর হয়তো অনেক টাকা পুরস্কার। কিন্তু সেগুলো নিয়ে ও করবে কী? কোথায় যাবে? মা নেই। চোলিও নিশ্য়ই আর নেই। তা হলে ও যাবে কোথায়? অনিশ্চিত জীবনের পথে শুধু দৌড়বে, আর দৌড়বে!

বরাট স্যারের কথা মনে পড়ন। স্যারের খদ্দরের পাঙ্জাবি থেকে ঘামের

গन্ধ ডেসে এল ওর নাকে। স্যার প্রায়ই বলতেন, তুই একদিন বড় কিছু একটা করে দেখাবি....। বদনোয়া আর ওর চারটে চুন্মুকে খত্ম করে ও পৃথিবী থেকে পাচ-পাঁচটা পাপীকে মুক্তি দিয়েছিল। একটা ‘বড়’ কাজ করে দেথিয়েছিল।

আজ আবার একটা সুয্যোগ এসেছে-একটা ‘বড়’ কিছু করে দেখানোর। তই ও শ্রীধরের পোষা অন্ধ কুকুরের মতো জিশানকে তাড়া করে ছুটে বেড়াতে পারছিল না। ওর ভেতরে ভীষণ তীব্র একটা অনিচ্ছার ब্রোঁ কাজ করছিল। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ওর আর জিশানের মধ্যে দূরত্বের ফারাক তেমন একটা কমছিন না।

এর জন্য বেশ কয়েকবার শ্রীধর ওকে ফোন করে ধমক দিয়েছেন : ‘কী ব্যাপার, সুখারাম? তুমি কি ভুলে গেলে তোমার ফেরোসিটি কোশেন্ট 8.9? তোমার অ্যাক্টিভিটি দেখে তো মনে হচ্ছে ওটা $2.5-এ র ও ~ ক ম!’ ~ ' ~$

শ্রু শ্রীধর পাট্টা নয়, টিভির কম্নেন্টেররাও ওকে ঘন-ঘন সমালোচনা করেছে। ও গেম সিটির কয়েকটা দোকনে দাঁড়িয়ে দোকানের ঢিভিতে নিজের কনে সেইসব সমালোচনা শুনেছে। কন্েেট্টেররা কখনও ওকে ‘সুখী সুখারাম’ বলে সম্বোধন করেছে, আবার কখনও বা বলেছে, 'ওর নাম মনে হয় সুখারাম নস্কর নয়, সুখারাম গদইলশকর!

কিন্তু না-তাতেও সুখারামের ভেতরের ইচ্ছেটা কিংবা অনিচ্ছাটা, পानঢ゙য়न চায়। ওর আবার একটা ‘বড়’ কাজ করে দেখাতে ইচ্ছে করছে। বরাট স্যার যেখানেই থাকুন, নিশ্চয়ই ওর এই কাজের কথা জানতে পারবেন।

ওর নাকে স্যারের ঘামের গন্ধটা আবার ভেসে এল।
জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল সুখারাম। হাতে ধরা হাই-ফই ইলেকদ্ট্রনিক দ্রাযাকার। একটা সবুজ ডট, আর দুটো লাল ডট। সবুজ ডটটা নড়ছে বটে, কিন্তু লাল ডট দুটো স্থির।

অপাশি যে আর নেই সেটা সুখারাম জানে। সুতরাং দুটো লাল ডটের একটা ও নিজে, আর অন্যটা প্রেটন। সুখারাম চুপচাপ একজায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই ওর লাল ডট স্থির। কিন্তু প্রোটনও কি তা হলে চুপচাপ দাডড়িয়ে রয়েছে! কিন্তু কেন?

প্রেটনকে ফোন করল সুখারাম। রিং বাজতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে বাজতেই থাকল-কেউ ধরল না। অবশ্য ধরলেও প্রোটন এত কম কথা বলে যে, সেগুলোকে ‘কথা’ না বলে 'ছু-হাঁ’ গোছের ‘শব্দ’ বলাই ভালো। ফোন কেটে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। গাছপালার পাতার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যাচ্ছে। সন্ধে নেমে আসতে আর খুব বেশি দেরি নেই—অন্তত আকাশ তাই বলছে। একটা হেলিকপ্টার আকাশ চিরে উড়ে গেল।

ওটার ‘ডোমরার ডাক’ হালকাভাবে ভেেে এল।
সুখারাম এবার নড়েচড়ে উঠন। ছল-ছूতোয় ও অনেক সময় ‘নষ্ট’ করেছে। আরও বেশিরকম গা ঢিলে দিলে শ্রীধর পাট্তা হয়তো তিতিবিরক্ত হয়ে শুটারে করে রিপ্লেসনেন্ট কিলার পাঠিয়ে দেরেন।

সুখারাম জঙ্গলের বাইরে পা চালাল। কাছেই পিচের রাস্তা। সেখানে দাঁড়িত্রে রয়েছে ওর সোনালি রঙের হাই-শ্পিড অটোমোবিল। চ্যাপটা, ছ’চাকাওয়ালা। আগের নীল গাড়িটা সুখারাম বদনে নিয়েছে।

গাড়িতে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিল সুখারাম নস্কর। শেষ পর্যন্ত যা-ই হোক না কেন, জিশানের সঙ্গে ওর দেখা হওয়াঢা দরকার—ভীষণ দরকার।

জিশান বাইক থামাল মাত্র কয়েক সেকেঙ্ডের জন্য। ও প্যাসকোর কথা ভাবল। ভাবল রুপোলি গাড়ির ‘পাঁচিল’ ডিঙ্েেনোর একটা স্ট্র্যাটেজির কথ্য। তারপর বাইকে আবার স্টার্ট দিল। এবং ওই ‘পাঁচিল’ লক্ষ্য করেই গোঁগ্গাঁ করে বাইক ছুটিয়ে দিল।

 ওর বাইক কোলাব্যাঙের মতো লাফাতে-লাফাতে ছুটে চলল। পাহাড়ের ঢালে বাইকটা হেলে থাকলেও ওটার স্পিড মাধ্যাকর্ষণের টানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। জিশানের বারবার মনে পড়ছিল প্যাসকেের কথা ঃ গেম সিটিতে মোটরবাইকটা এবটা অন্ত্র। এখন জিশান সেই অন্ত্র ব্যবহার করছে।

গাড়িটার কাছে পৌঁছে জিশান মোটরবাইকের স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেমে পড়ল গাড়ির বনেটের ওপরে। তারপর সেখান থেকে বাইকের চাকা লাফিয়েলাফিয়ে রাস্তায়। তারপর জিশানের বাইক স্বচ্হন্দে ছুটে চলল।

একটু ফাঁকা জায়গায় প্ৌঁছে বাইক থামল। বাঁ-দিকে অনেকটা ফাঁকা জমি। তার পরেই একটা বিশাল জলা। এদিক-ওদিক তাকালে ঢোথে পড়ে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ।

বিকেলের ঢলে পড়া আলোয় জায়গাট কী সুন্দর, শান্ত আর নির্জন! রুকস্যাক থেকে দ্ব্যাকার বের করে দেখল জিশান। দুটো লাল ডটটই এখন নড়ছে। তার মানে, কিলার প্রোটন জান ফিরে পেয়েছে।

ইস, এই ট্যাকারারা यদি না থাকত।
जা হলে জিশান ওই জলার মধ্যে গল্গা পর্যন্ত ডুবিয়ে লুকিয়ে থাকত। সুখারাম আর প্রোটনের চোখে ধুলো দিয়ে রাত কাবার করে দিত।

৩২৬ www.banglabiook palf.błogspot.com
হঠাৎই ওর মাথায় একটা নতুন চিত্তা খেলে গেল : ওর বাঁ-হাতের শে-জায়গায় শ্রীধর পাট্টার মেডিকরা অপারেশন করে মাইর্রোট্রানমিটারটা ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে-জায়গার মাংস খুবলে ট্রান্সমিটারটাকে বের করে এখানকার জমিতে কোথাও পুঁতে দিলে হয় না! তা হলে দুই কিলারের দ্ব্যাকারে দেখাবে জিশান এখানেই কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে, অথচ জিশান তখন এখান থেকে অনেক দূরে কোনও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

সুতরাং বাইক থেকে নেমে পড়ল জিশান। রুকস্যাকে ট্ব্যাকার রেখে দিয়ে বের করে নিল হান্টিং নাইফ। আর প্যান্টের পকেট থেকে বের করল স্পার্কার। এর বোতাম টিপলেই ছিট্ে বেরোবে আগুনের নীল শিখা।

স্পার্কার অন করে হান্টিং নাইফের ইস্পাতের ফলাটা ও গরম করতে শুরু করল। শরীরে ঢোকনোর আগে ছুরির ফনাটাকে স্টেরিলাইজ করে নেওয়া দরকার।

জিশান চারপাশে একবার তাকাল। তারপর বাইকের পশে রাস্তায় বসে পড়ল। ডানহতত ছুরিতা বাগিয়ে ধরে বাঁ-হাতটা উঁচিয়ে ধরল চেখের সামনে। অপারেশন করে দ্রান্মমিটার ঢোকনোর জায়গাট জিশানের স্পষ্ট মনে আছে। এই তো! এই জায়গাটায়! টি-শার্টের কললো চকচকে সিনথেটিক মেটিরিয়ালের ठিক পিছ্রেই বুঝতে পেরে গেছে ওর প্ন্যান?

এমন সময় জিশানের স্যাটেলাইট ফোন বেজে উঠল।
ফোনের আওয়াজে জিশান চমকে উঠল। ওর ছুরি ধরা হাত থমকে গেল। বাঁ-হাত এগিয়ে গেল বাইকে রাখা রুকস্যাকের দিকে।

ফোন বের করে কলটা রিসিভ করতেই চেনা গলা শোনা গেল।
‘বাবু জিশান, কোনও দুষ্টুমি কোরো না।’ খুকখুক হাসি : 'তা হলে আমকেও দুষ্ূুমি করতে হবে—’’
'আমি...মানে...।'
‘গাঁ, জানি। তুমি গরম গান্টিং নাইফ দিয়ে বগল চুলকোতে যাচ্ছিলে।’ কিছুদ্কণ চুপ করে থাকার পর ঃ 'আমি ওল্ড সিটিতে ফোর্স পাঠাচ্ছি-তোমার বউ আর ছেলেটটকে নিউ সিটিতে তুলে আনার জন্যে। ওরা হবে আমার সিকিওরিটি ডিপোজিট। তোমার কোনও দুষ্ূুমি দেখলেই আমি ওদের নিয়ে অল্পস্বল্প দুষ্ুমি করব...।'

শ্রীধরের ঠাল্ডা গলা শুনে জিশানের হাত থেকে হান্টিং নাইফ পড়ে গেল। ওর গলা চিরে একটা যন্ত্রণার চিৎকার বেরিয়ে এল, 'না! না! আমার ওয়াইফ আর ছেলেকে আপনি টাচ করবেন না। প্লিজ! প্লিজ...!’


## ৩২৮ <br> www.banglaboekpdf.blogspot.com

ততক্ষণে শ্রীষর ফেনের লাইন কেটে দিয়েছেন।
জিশান কয়েক সেকেন্ড হাঁটুগেড়ে বসে রঁইল। ওর ঢোে জল এসে গেল। শ্রীধর পাট্টা ওর সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছেন। শালা, বাস্ট্ার্ড! হঠাৎই জিশানের থেয়াল হল, লাইভ টেলিকাস্টে দর্শকরা ওর চোথের জল দেখতে পাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল। शাতের পিঠ দিয়ে চোেের জল মুছে নিল। চটপটে ভঙ্দিতে গান্টিং নাইফ রুকস্যাকে ঢুকিত্রে বাইকে চড়ে বসল।

বাইক চালাতে-চালাতেই টের পেল, ইঞ্জিনের আওয়াজ ছপির্যে ওর বুকের ভেতরে ধকধক শব্দ শোনা যাচ্ছে। এইরকম একটা সময়ে মিনি আর শানুর কथা তুলে শ্রীধর পাট্টা সত্যি-সত্যি ওকে ভয় পাইয়ে দ্যিয়েছেন।

ঝকঝকে মসৃণ রাস্তায় বাইকের চাকা পিছলে যাচ্ছিল-লাল ডট দূটোর কাছ থেকে দূরে, আরও দৃরে। রাস্তার দুপাশে গাছপালা আর উফ-নীুু প্রান্তর। জিশানের ক্লান্ত লাগছিল। শরীরের বেশ কয়েক জায়গায় জ্াল্া করছিন। মুত্যে, হাত ধুলোর আস্তর-তার সঙ্গে ঘাম। ও বেশ বুঝতে পারছিল, এখন ওর একাটু বিশ্রাম দরকার।

হঠাৎই ওর চোথে পড়ল, দূরে রাস্তার ধারে দুটো বাড়ি পাশাপাশি দাঁড়ির্যে



জিশান লক্ষ করল, বাড়ি দুটেের বারান্দা কিংবা জানলায় কোনও উৎসুক .মানুভের ভিড় নেই। ব্যাপারটা ওকে একদু অবাক করল। গেম সিটির কোন মক সিটিজেন কি এ-দুটো বাড়িতে নেই?

জিশানের বাইক বাড়ি দুটোর সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির একতলার দুढো দোকানঘর খাঁ-খাঁ করছে। জননলা আর বারান্দাও তাই।

জিশান বাইকটা একটা দোকানঘরে ঢুকিয়ে আড়ালে দাঁড় করাল। রুকস্যাক পিঠঠ নিল। বাইকের কেরিয়ার থেকে তুলে নিল দ্ব্যাকার। তারপর মিসাইল গান হাতে বাগিয়ে ধরে খুব সাবধানে ধীরে-丹ীরে পা ফেলে ঢুকে পড়ল একটা বাড়িতে।

বাড়িটার সবক’ঢা ঘর ঘুরে লেখল। আশর্চ! বাড়িতে কেউ নেইই!
এই বাড়িটায় কোনও মক সিটিজেন নেই কেন ? অপটিক্যাল ট্যাবলেট থেকে বাড়িটার লোকেশন দেখল। গেম সিটির পশ্চিম প্রাচ্তের দিকে। হয়তো মক সিটিজ্জেের তুলনায় বাড়ির সংখ্যা অনেক বেশি। তাই পশ্চিমদ্দেকের এই দুটো বাড়ি সুনসান—খঁখঁ।

ঠিক তখনই পাশের বাড়ি থেকে টিভির কথাবার্তা শুনতে পেল। দোত্লার একটা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে পাশের বাড়ির খোলা জানলা দিয়ে একটা ঘরের

ভেতরে নজর চালাল জিশান। কিক্তু কাউকে দেখতে পেল না।
তখন ও চটপট সিঁড়ি নেমে রওনা হল পাশের বাড়ির দিকে।
নতুন বাড়িটায় দুকে এ-ঘর ও-ঘর ল্থেঁজ করে কাউকে না পেয়ে জিশান উঠে গেল দোতলায়। টিভির শব্দ লক্ষ্য করে পৌঁছে গেল একটা ঘরে।

ঘরে ঢুকেই অবাক হর়ে গেল।
আশি কি নব্বই বছর বয়েসি একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ একটি আরামচেয়ারে বসে রভিন টিভির পরার্রিকে তাকিয়ে আছেন। ফরসা মনুষটার চোথে কোনও চশমা নেই। মাথায় অক্রবিত্তির টাক-বাকিটা শোনপাপড়ির আঁশের মতো লন্বা-লম্বা চুল। গালে আর থুতনিতে র্খোচা-র্ৰাচা দাড়ি। গা়়ের চামড়া গিলে করা। পরনে একটা সাদা কুর্তা আর ছাই রঙেে পাজামা।

জিশান ঘরে ঢোকার সময় দরজায় শব্দ হয়েছিল। বৃদ্ধ টিভি থেকে চোখ সরিয়ে জিশানের দিকে তাকালেন। কাঁপা গলায় বললেন, ‘এসো, জিশান... ${ }^{\prime}$

জিশান ঘরের ডেতরে দু-পা ঢুকে জিগ্যেস করল, ‘বাড়িতে আর কেউ নেই?
‘ना, নেই। आমি একা—डীষণ একা। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল

 ওখানে—’

कী যে হল জিশানের—-বৃদ্ধের অনুরোধ ফেলতে পারল না। হঠাৎ বাবার মুখটা ভেসে উঠল সামনে। ও চেয়ারটায় বসে পড়ল। মিসাইল গানটা পকেটে पूকিত্রে নিল।

তারপর অবাক হয়ে বলল, «াঁাকা বাড়িতে আপনি একা-একা বসে টিডি দেখছেন!
‘দেখছি আর কে小ায়! তুছি-’ করুণ হাসলেন : ‘আমি ঢোেে দেখতে পাই না। ছান...ছানি...।’

জিশান বৃদ্দকে দেখঘিল। দুটো চোের মনিই ঘোলাটে—যেন চোখের মণির ওপরে মছের আঁশ বসানো। ঢোেের কেণে পিচুটি। ওপরের ঠোঁট বসে গেছে তেতরে। বোধহয় ওপরের পাটির সামনের কয়েকটা দাঁত নেই। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে। ঠোটেের একপাশ দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

লহ্ষ করল, ওর बেয়ারের পাশে একটা ছোট টেবিলে অনেক ওষুধপত্র।
জিশান জিগ্যেস কর্রল, 'আপনার এত বয়েস! চোথে দেখতে পান না! তা সত্জেও গেম সিটিতে মক সিটিজ্জে হয়ে এসেছেন!' একাঁ থেমে

তারপর ঃ ‘যদি আপনার কোনও বিপদ-আপদ হয়!’
হাসলেন বৃদ্ধ। কয়েকটা দাঁত দেখা গেল। কয়েকটা নেই। খসখসে কাঁপা গলায় বললেন, 'আমার তিন কুলে আর কেউ নেই। এই বয়েসে তাই আমার আর কেনে ভয় নেই। তা ছাড়া...তা ছাড়া...আমার ছেলে সংগ্রামজিৎ-আমার বৃদ্ধ বয়েলের ছেলে—এই কিল গেমে হেরে গিৰ্রেছিল। শেষ সং্রামটায় আর জিততে পারেনি বেচারা...। কিচুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে বসে রইলেন। তারপর : ‘কিল গেমের আগে অনেকগুলো গেমের রাউড্ড জিতেছিল সঙ্গু-সঙ্গু ওর ডাকনাম।
‘আপনি...আপনি কি ওল্ড সিটিতে থাকতেন?’
'হাঁ-' ধীরে-ষীরে ওপরে-নীচে মাথা নাড়লেন। কাশলেন দুবার। ঘোলাটে দু-চোখ মেলে জিশানের চোেে তাকালেন : ‘সগগ্রাম হেরে যেতেই ওর মা চোখ বুজল-ধাক্কাট নিতে পারল না। ফলে সংসারে আমি একা হয়ে গেলাম। সে বহ্ףদিন আগের কথা...।
‘সংগ্রামের পাওয়া প্রাইজ-মানি নেহাত কম ছিল না। তাই একা আমি একটা ডিসিশান নিলাম-নিউ সিটির ইকনমিক ইনডেক্সের প্চিলিল ডিভিয়ে গেছি বলে ওন্ড সিটি ছেড়ে এখানে চলে এলাম। তারপর থেকে প্রত্যেকটা

 বলতে হাপপাচ্ছিলেন : ‘আমি...আমি এই...গেম সিটির সিনিয়ারমোস্ট সিটিজেন...।'

জিশান বৃদ্ধের কথা শনছিল আর মােে-মােেই টিভির দিকে তাকাচ্ছিল। টিভিতে কম্মে্টেটররা জিশানের লোকেশনের কথা বলছিল। আর এও বলছিল যে, দুজন কিলার ক্রমশ জিশানের কো-অর্ডিনেটের দিকে এগির্যে আসছে।

সুতরাং হাতে আর খুব বেশি সময় নেই।
জিশান চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।. সূক্ম শব্দ হলেও বৃদ্ধ সেটা টের পেলেন। বললেন, ‘शঁা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে...তোমাকে তো আবার...ঘটতে হবে।’

চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে উঠেে দাঁড়ালেন। জিশানের কছে এগিয়ে আসতত-আসতে বললেন, 'সঙ্গু খুব চেষ্টা করেছিল...কিন্তু পারেনি। আমার খুব আশা...কেউ না কেউ পারবে। এই বয়েসে মরার ভয় করি না। তাই...আশায়আশায় আসি...।

আन্দাজে ভর করে জিশানের গায়ে হাত দিলেন বৃদ্ধ। সেখান থেকে হাতড়ে-হতড়ে ওর মুখে চলে গেলেন। তারপর ওর চিবুকে আডুল ছুঁইয়ে কাঁপা গলায় বললেন, 'সঙ্ু, এবার তোকে জিততেই হবে! মনে থাকে যেন...।'

জিশান বৃদ্ধকে দেখছিল। ভাঁজ-ホাঁজে ঝুলে পড়া চামড়া় তৈরি এক প্রাগৈতিহসিক মূর্তি। সেই মূর্তির ছানি পড়া চোেের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

জিশান আলতো গলায় বলল, ‘চেষ্টা করবব...থুব চেষ্টা করব...’’ তারপর পকেট থেকে মিসইল গান বের করে থোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আবার পথ চলা। তবে আশার কথা, সূর্य এখন পশ্চিনে চলে পড়েছে। একুু পরেই নেমে আসবে অন্ধকার। প্রিয়তম অন্ধকার।

অন্ধকার যখন জিশানকে কালো চাদরে জড়িয়ে নিল তখন জিশান নতুন করে আবার অবাক হল। ওর গায়ের ফুল স্লিভ টি-শার্ট আর প্যান্টের কালো কাপড়ের ওপরে জূলজ্রল রঙিন রেখায় ফুটে উঠেছে নানান হিজিবিজি নকশা। এরকম লুকেনো ফুওরেসেন্ট কলারের কথা জিশান কখনও শোনেনি। এটা শ্রীধর পাট্টার আরও একটা সারপ্রাইজ। অন্ধকারের মধ্যেও জিশানকে তাক করে গোলাখলি ছুড়তে প্রোটন বা সুখারামের কোনও অসুবিধে হবে না। আর জিশান
 কেনি শিড्ন ভুওরেল্গে কালারের নকশা নেই

অন্ধকার নেমে আসার পর আরও একটা ঘটনা ঘটল গেম সিট্তিেঃ গেম সিটির নানান জয়গায় জোরালো আলোর বন্যা বয়ে গেল-রাস্তায়, মাঠেঘাটে, নদীর দু-পাড়ে, ফ্লইওভারে, পাহড়ে, এমনকী জঙ্গলেও।

তবুও তারই মধ্যে জিশান ছোটখাটো ছায়ার আড়াল খুঁজতত লাগল।
ও জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখল, দু-একটা জন্তু-জানোয়ার উদ্রান্তের মতো ছুটে পালাচ্ছে অন্ধকার অঞ্চলের দিকে।

জিশান একটা ছোট আঁধারি অঞ্চল বেছে নিল। তারপর রুকস্যাক পিঠে बোলানো অবস্থায় একটা ঝুপসি গাছ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

অনেকটা ওপরে ওঠার পর ও একটা শক্তপোক্ত ‘ওয়াই’-এর মতো ডালের খাঁজ থूঁজে পেল। শরীরটাকে ভাঁজ-টাজ করে মানিয়ে সেই খাঁজে জুত করে বসল। রুক্যাক থেকে বের করে নিল ট্ব্যাকার আর প্লেট টিভি।

জঙ্গনের বুনো গন্ধ জিশানের নাকে ঝাপটা মারছিল। কানে আসছিল পাথির ডাক, অজনা পশুর ডাক। আর সব ছাপিয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক।

द্ব্যাকার দেখল জিশান। লাল ডট দুটো সবুজ ডটের কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নেই। কিন্তু জিশান কী করবে? এই ক্লাষ্ত শ্রাষ্ত শরীরে আর কত দৌড়বে? সাংঘাতিক থিদে না পেলে ও কখনও ফুড পয়েন্টের লেঁজে যায়নি।

একটু আগগই ও ফুড পয়েন্ট থেকে থেয়ে নিয়েছে। তার সঙ্গে পেট ভরে জল খেয়েছে। ঘাড়ে মাথায় ভালো করে জল দিয়েছে। আশায়-আশায় বারবার ভেবেছে, রাত পোহালেই লড়াই শেষ। তখন ওর, মিনির আর শানুর জীবনে সত্যিকরের ভোর আসবে।

কিন্তু এই গাছে ও কত্ষণ লুকিয়ে থাকবে? লাল ডট্ডলো আরও কাছে এগিয়ে এলে ও তখন বরং গাছ পালটে নেবে। কিংবা ভেবে-টেবে যা হোক কিছু করবে।

द্র্যাকার রেথে প্লেট টিভি অন করল জিশান। ভলিয়ুম খুব কমিয়ে দিল। দেখল, টিভিতে ও আর সংগ্রামজিতের বৃদ্ধ বাবা। তার সঙ্গে ধারাভাষ্য চলছে। আর মাঝে-মাঝে জাম্প কাট করে पুকে পড়ছে সংগ্রামজিতের কিন গেমের ক্লিপিংস।

একটু পরেই বৃদ্ধের মুখ্থর ক্রোজ আপ দেখা গেল। জিশানের মনে হল, বৃদ্ধ যেন ঘোলাটে চোখ মেলে সরাসরি ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন।

টিভি জফ করে নিজ্ের দিকে তাক্সল্ল জিশান
 এরকম ‘‘্রাইট টারগেট’ একজন কালার ব্বাইড ঔটারও মিস করবে না। আর সুখারাম এবং প্রেটন তো সুপারকিলার!

হঠাৎ জিশানের মনে হল টি-শার্টणা খুলে ফেললে কেমন হয়! তা হলে অত্তত রঙের রোশনাইয়ের গাত থেকে বাঁচা যাবে। তারপর প্যান্টের পালা।

টি-শার্টের বুকপরেট থেকে মিনি আর শানুর ফট্টোটা বের করে নিল। অন্ধকরে ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাই একটা লম্বা শ্বাস ফেলে প্যাট্টের কোমরের পটি টেনে ঢিলে করে জাভিয়ার ই্লাস্টিকের পিছনে ফটোটা চালান করে দিল। এটjই এখন সবচেয়ে সেফ জায়গা।

তারপর রুকস্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে টি-শার্টের চার-পাচ জায়গায় লম্বা করে ছুরি টেনে দিল। হাতে কয়েক টনে টি-শা屯্টের খোসা চটপট ছাড়িয়ে ফেলল। কাপড়ের ছেঁড়া לুকরোওুেো ছুড়ে দিল অন্ধকারের দিকে।

কিন্তু একইসক্গে জিশান চমকে উঠল।
ফুল ল্লিভ টি-শার্টের নীচে ওর আর কোনও পোশাক ছিল না। ও অবাক হয়ে দেখল, ওর গা্রে ঠিক জামাটার মতোই ফুওরেসেন্ট রূের জূলজূলে ডিজাইন आঁকা। টি-শাট্টা ও না ছিঁড়ে ফেললেই পারত। কিন্তু এই নকশা ওর গায়ে কে, কখন आঁকল? কেউ তো आঁকেনি!

## www.banglaboôk petf.t̄logspot.com

শ্রীধর পাট্টা বোধহ়় জিশানের দিকে লক্ষ রাখছিলেন, মজা দেখছিলেন। কারণ, তখনই জিশানের স্যাটেলাইট खোন বেজে উঠল।

ফেন ধরতেই ওপাশ থেকে নিষ্ঠুরতার হিশ্র্র কারিগর বলে উঠলেন : 'সার্র্জজ, জিশান—আবার সার্পইজ...।'

জিশান দুপ করে রইল। ওর অবাক ভাবটা তখনও কাটেনি।
‘শোনো, জিশান / এই রזের ফান। এই রঙে আঁকা ড্রেস এক ঘণ্টা গায়ে দিয়ে থাকলেইই তোমার বডি টেম্পারেচারে রঙের কেমিক্যালটা অদ্রুত এক রিয়্যাকশন ইনিশিয়েট করে তোমার ড্রেলের ফ্যাব্রিক চুইইয়ে তোমার গায়ে চলে যাবে। তোমার পোশাকের নকশার ফোটোকপি এঁকে দেবে তোমার চামড়ায়। হাসলেন : ‘এক্সট্রিমিলি সুপার-সারপ্রাইজিং টেকনোলজি-তাই না?’

জিশান চুপচাপ ভাবছিল। তাই শ্রীধরের কথাবার্তার সময় একুুকরো জবাবও দিচ্ছিল না। এখন ওর সামনে আর कী-কী পথ থোলা রয়েছে সেটাই চিষ্তা করছিল। আধো-আাঁধারিতে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিজেকে রঙ্লিন উলকি आঁকা আদিবাসী বলে মনে হচ্ছিল।
‘থ্যাংক—ইউ—মার্শাল’ কাটা-কাটা সুরে বলল জিশান এবং ফোন রিসেট করে দিল।

জিশান বুঝতে পেরেছ্রিল, খানিকক্ষণ প্দরপরই ওকে লুর্যেন্নোর জায়গা
 চায় না। কারণ, খোলা জায়গায় গেলে ওর একটা বাহন দরকার—গাড়ি কিংবা মোটরবাইক। সেটা কীভাবে খুঁজে পাবে ও জানে না। গেম সিটিতে এখন কোথাও আলো, কোথাও অন্ধকার।

গাছ থেকে নেমে পড়ল জিশান। জঙ্গলের মধ্যে এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে আস্তানা পালটতত লাগল। কখনও গাছের ওপরে, কখনও বোপঝাড়ের আড়ালে, কখনও বা এবড়োথেড়ো পাথর কিংবা ঢিবির খাঁজে।

উড়ন্ত জোনাকির আলো ওর চোথে পড়ছিল। চোথে পড়ছিন জোড়াজোড়া জ্রলন্ত সবুজ চোখ।

নানান জায়গায় আলো জূলে ওঠায় জগ্গলটা ভারী অদ্রুত লাগছিল। দুটো লাইটেড জোনের মাঝামাঝি জায়গাটা অনেক বেশি গাঢ় অন্ধকরে ঢাকা বলে মনে হচ্ছিল।

জিশানের কবজিতে বাঁধা কাউন্টডাউন ওয়াচে সময় ক্রুমই জিরো আওয়ারের দিকে এগোচ্ছিল—সেটেই জিশানের একমাত্র আশা-ভরসা-আনন্দ। তবে ও বুঝতে পারছিল, এভাবে পালিয়ে-পালিয়ে লাল ডটজোড়ার হাত থেকে ও বেশিক্ষণ বাঁচতে পারবে না। কিছু একটা ওকে করতে হবে-এবং সেই ‘করাঢা শ্রীধর পাট্টার পছন্দ হোক বা না হোক।

## ৩৩8 <br> www．banglaぁ̄o\％k pêff．tilogspot．com

জঙ্গলের মধ্যে ছুটে－ছুটে নতুন একটা আস্তানা খুঁজে পেল। একটা বেঁটে মোটা গাছ। সার্চনাইটের আলো ছিটকে পড়েছে তার খঁড়িতে，পাতায়। গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে হাপাতে লাগল। শরীরে আর কতইুহু শক্তি বাকি আছে কে জনে！

রুক্য্যাক থেকে হান্টিং নাইফ বের করে নিল। পকেট থেকে স্পার্কার বের করে হান্টিং নাইফের ফলাটা গরম করতে শুরু করল। গাঁ，মাইক্রোদ্রান্সমিটরটা এবার শরীর থেকে ও বের করবেই। লাল ডটজোড়ার সঙ্গে সবুজ ডটটটা আর লুকোচুরি খেলতে পারছে না।

জিশানের চোয়াল শক্ত হল। যন্ত্রণা সহ করার জন্য তৈরি হল।
বাঁ－হাতের বিশেষ জায়গাটার দিকে তাকাল। ওর শরীরটা হাঁটুর পর থেকে নীচের দিকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আলোয় আলো। ওপরদিকটা অন্ধকারে ঢাকা－ তবে সে－অন্ধকার আলোর ছটায় কিছুটা ফিকে।

বিশেষ জায়গাটা অনুমান করতে জিশানের খুব একটা অসুবিধে হল না। কিন্তু হান্টিং নাইফের ফলা সেখানে বসাতে না বসাতেই ওর ফোন বাজতে শুরু করল।

শ্রীধর পাট্টার ফোন নিশয়ই।
জিশান গাছের আড়ালে রাখা রুকস্যার্কে দিকে তাকাল। কিষ্ত স্যাটেল্লাইট
 কাজ করে চলল।

ওঃ！আঃ！মিনি！শানু！
মিনি আর শানুর কথা ভেবে জিশান যম্ত্রণাটাকে মনে－মনে কমাতে চেট্টা করল। একইসঙ্গে মাইজ্রোট্রান্সমিটারের ৰোঁজে াাঁ－হাত্তর মাংস খুঁড়ততে লাগল। একুু পরেই ছুরির লোচায় চট্টটে আঠালো লাল রঙের তরল মাখা দ্রান্সমিটারটা বেরিয়ে খসে পড়ল মাটিতে। হাতড়ে－হাতড়ে সেটাকে তুলে নিল জিশান। ওটকে গাছের গ゙ঁড়ির গায়ে চেপে ধরে হান্টিং নাইফের ধারালো ফলার পোচে দু－ఫুকরো করে দিল।

এখন ওই খুদ্দ যষ্ত্রঢা কাউকে আর কোনওরকম সিগন্যাল পাঠাতে পারবে না। সুখারাম আর প্রোটনের ট্র্যাকার থেকে সবুজ ডট্টা নিশ্য়ই এই মুহূর্তে নিভে গেছে।

आ—আ—：！
যন্ত্রণার মধ্েেও জিশানের বুকে ঠেলে একটা স্বস্তির দীর্ঘপ্পাস বেরিয়ে এল। ও রুকস্যাক খুলে একটা ‘ফার্স্ট এইড’ প্যাক বের করে নিল। প্যকের বোতাম খুলে চটপট বের করে নিল একটা কেমিক্যালের তঁড়ো—‘্্াাড কে小যাগুলেটর’। সেটা একখাবলা তুলে নিয়ে চেপে ধরল বাঁ－হতের ক্ষতস্থানে। সঙ্গে－সঙ্গে টের

পেল, যন্ত্রণা কমতে ওরু করেছে। একটু পরে রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে যাবে। রুকস্যাকের ভেতরে স্যাটেলাইট ফোন তখনও একঘেয়েভাবে বেজে यাচ্ছিল। ख্রীধর পাট্টা সহজে ক্ষন্ত হওয়ার পাত্র নন।

জিশান যখন ফোন ধরল ততক্ষণে প্রায় দশমিনিট কেটে গেছে। এবং ফোন ধরামাত্রই শোনা গেল শ্রীধর পাট্টার হিশ্রে एছ্কার।
‘জিশান, য়ু বাস্টার্ড! সন অফ আ বিচ! হাউ ডেয়ার য়ু...!'
জিশান উত্তরে শব্দ করে হাসল : ‘এ ছড়া আমার আর কোনও পথ নেই রে, শ্যোরের বাচ্চা!
'তুই তোর বউ আর ছেলের কথা কি ভুলে গেছিস?' একটা থিদে পাওয়া বাঘ যেন গর্জন করে প্রশ্নটা করল।
'ना, ভুলিনি—’'
‘ঠিক আছে। তুই যেভাবে খেলতে চাস সেভাবেই খেলব। আমি তোর বউ আর ছেলেকে ওন্ড সিটি থেকে এখুনি তুলে নিয়ে আসছি। তারপর দেথি...তোর পাগলামো বন্ধ করা যায় কি না!’

শ্রীধর হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু জিশান ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে।

 যাওয়ার নেই মানা’। কারণ, খুনিদের ট্ব্যাকারে আর কোনও সবুজ ডট নেই। আর টিভির কমেন্টেটররা কখনও ওর পজিশন কো-অর্ডিনেট কমেন্ট্রিতে বলবে না। সেটাই নিয়ম। তবুও শ্রীধর যদি ওদের নিয়ম ভাঙতে বলেন, ঢা হলে আর-এক মুশকিল। কারণ, লক্ষ-হাজার ক্যাম্রোর নম্বর আর লোকেশন চেক করে, সেখান থেকে জিশানের পজিশন কো-অর্ডিনেট ব্লক কম্পিউট করে, রানিং কনেন্র্রিতে বলতে-বলতে অনেকটা সময় পেরিয়ে যাবে—ততক্ষণে জিশান হয়তো অন্য কোথাও ছিটকে যাবে। তা ছাড়া কমেন্টেটররা এত টেকনিক্যাল কারিকুরিতে অভ্যস্ত নয়। ফলে ওরা খুনিদের সাহাयা করার বদলে বিভ্রান্ত করবে, এই সষ্ভাবনাটই বেশি।

সুতরাং, হাতে বেশ যম্ত্রণা হলেও জিশানের নিজেকে এখন ‘স্বধীন’ মনে इচ্ছিল।

একটা ঘন গাছগাছালির অন্ধকরে আস্তানা গেড়ে প্রথমে ট্ব্যাকার খুলল জিশান। ত্ধুমাত্র দুটো লাল ডট ট্ব্যাকরের মানচিত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে ওরা বে ঠিক কোথায় সেটা বোঝা গেল না। আর সবুজ ডট থেকে ওদের দূরप্ধই বা কত কে জানে!

এই অসুবিধেটার কথা জিশান ভাবেনি।

একটু পরেই টিভি খুলল।
‘...স্টানিং নিউজ, ফোক্স। কিলারদ্রের ট্য্যাকার থেকে জিশান পালচৌধুরী গারিয়ে গেছে। ওই দেখুন—প্রোটনের ট্র্যাকার! স্ক্রিনে কোনও গ্রিন ডট নেই! এবার দেখুন কিলার সুখারাম্রে দ্ব্যাকার—ন্নে গ্রিন ডট। তা হলে তো কিলার দুজন এখন অন্ধ! ওরা জিশানকে কী করে দ্যndক করবে কে জানে!
‘নিশয়ই জিশান মাইজ্রেইলেেকদ্ট্রনিক দ্রান্সমিটারটা কোনও না কোনওভাবে অকেজো করে দিয়েছে। তখন জিশান নিশ্য়ই আমাদের ক্যামেরা নেটওয়ার্কের "ব্বাইভ স্পট"-এ ছিল। তাই টিভিতে ব্যাপারটা আপনাদের আমরা লেখাতে পারিনি। তবে আমদের মাননীয় মার্শালের কন্ট্রোল রুমে অনেক হাই পাওয়ার ক্যামেরা নেটওয়ার্কের কানেকশান রয়েছে। ফলে জিশানের কীর্তি মাননীয় মার্শালের চোখ এড়ানোর কথা নয়। মার্শালের কন্ট্রোল রুম থেকে ফিডব্যাক পেলেই আমরা সেই পোরশানের-মানে, ভে-পোরশানটা আমরা দেখাতে পারিনি-সেটার ভিডিয়ো ফুটেজ আপনাদের দেখিয়ে দেব। জানিয়ে দেব, জিশান কীভাবে কিলারদের ট্যাাকারকে ফাঁকি দিয়েছে...।

একটু পরেই জিশান সেই ফুটেজ দেখতে পেল। এবং আরও দেখতে পেল, অগ্সিশর্মা শ্রীষর পাট্টা হিশ্রেভবে পিস ফোর্সের কমান্ডারদের নির্দেশ

 নিয়ে আসবে-শ্রীধর পাট্টার কাছে।

টিভিতে শ্রীধরের পাগল করা চিৎকার শোনা গেল : 'গো! গো! গো !...গো-ও-ও-ও!'

তারপরই পরদায় ভেসে উঠল ওন্ড সিটির ছবি। ভাঙাচোরা নোংরা পথঘাটের নানান জায়গায় মানুভের ভিড় আর জটলা। সবাই প্লেট টিভিতে কিল গেম দেখছে। এত রাতেও ওন্ড সিটির সব দোকানপাট খোলা-বিশেষ করে খাবারের দোকান। ফুটপাথের এখানে-সেখানে তেলেভাজা, ঝালমূড়ি, শোনপাপড়ি, মানাই বরফ নিয়ে বসে আছে বহ হকার। মাঝো-মােেই শোনা যাচ্ছে জনতার উত্তেজনা আর উল্লাসের চিৎকার।

দশশ্য বদলে গেল।
রাতের আকশে ছিটটে লাফিফ্রে উঠল আটটা ఆটার। দুরন্ত গতিতে শুটারবাহিনী ছুট লাগাল ওন্ড সিটির আকাশের দিকে।

জিশানের মাথায় আগুন জূলে গেল। রক্তের অণুতে-অণুতে ঘটে গেল আণবিক বিস্ফেরণ।

ও এরপর যা করল শ্রীষর পাট্টা সেটা ভাবতে পেরেছিলেন কি না কে জনে!

রুকস্যাকে সব গুছিয়ে নিল-হাতে রইল শুধু প্লেট টিভি। তারপর ও ছুট লাগাল।

আলো আর অন্ধকার দাবার ছকের মতো চারপাশে ছড়িয়ে আছে। এদিকওদিক তাকিয়ে একটা পছ্দ্দই জায়গা খুঁজতে লাগল জিশান। এমন একটা জায়গা যেখানে আলো কটকট করছে—আলোয়-আলোয় জায়গাটা প্রয় দিনের মতো।

দু-তিন মিনিটের মধেেেই সেরকম একঁটা জায়গা খুঁজে পেল। তখন লাইটেড জোনের কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াল। কারণ, ও জানে, এখানে অনেক ক্যামেরা লাগানো আছে। টিভির লাইভ টেলিকাস্ট কোটি-কোটি দর্শক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

সুতরাং এইবার!
জিশানের খালি গা। আলোর তেজে শরীরের ফ্লুওরেসেন্ট রঙের ডিজাইন বেশ ফিকে দেখাচ্ছে। ওর বুকে, হাতে, এখানে-সেখানে রক্কের দাগ। গায়ে ঘামের পরত। ততে শুকনো পাতার টুকরো-টাকরা লেগে আছে। আর বাঁ-হাতের বাহ্ গড়িয়ে রক্তের ধারা নামছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গাছের গায়ে লাগানো বেশ কয়েকটা ক্যামেরা


প্লেট টিভিটা একটা গছের ঔঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেথ্ে শূন্যে দু-হাত ছুড়ে দিল জিশান। ক্বান্ত-শ্রান্ত শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চিৎকার করে কথা বলতে ๗রু করল।
'আমার ওন্ড সিটি আর আর নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! কিল গেমের খেলার নিয়মে কোথাও লেখা নেই বে, হাতের মাংস কেটে মইক্রোইলেকদ্রনিক ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে দেওয়া যাবে না! নিয়মে এ-কথা বলা নেই বে, কিল গেমে কোনও পার্টিসিপ্যান্ট যদি এই ট্রান্সমিটার খুলে ফেলে খুনিদের ধোঁকা দেওয়ার চেট্টা করে তা হলে নিউ সিটির মার্শাল শ্রীধর পাট্টা সেই থেলোয়াড়ের বউ আর ছেট্ট ছেলেকে ওন্ড সিটি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসবেন। তারপর তাদের টরচার করার ভয় দেখিয়ে কিল গেমের সেই প্লেয়ারকে ন্ব্যাকমেল করে খতম করার চেষ্টা করবেন।
‘আমার নিউ সিটি আর ওন্ড সিটির বব্ধুরা, আমিই সেই হতভাগ্য প্লেয়ার। ওই দেখুন, আটটা ওটার রওনা হয়ে যাচ্ছে ওন্ড সিটির দিকে-আমার বউ মিনি, আর ছোট্ট ছেলে শানুকে তুলে নিয়ে আসার জন্যে।
‘এতদিন ধরে টিভিতে, রোলার সাইন আর মুভি-বোর্ডে, মার্শাল প্রচার করে এসেছেন বে, কিল গেম ভীষণ ফেয়ার গেম। এই সেই ফেয়ারনেসের

টিভি সেন্টার তখন দারুণ তৎপরতায় আটটা শটারকে দেখিয়ে চলেছে। যেন আটটা হানাদার বাজপাথি। তটারণুলো ওল্ড সিটির আকাশে পৌঁছে গেছে। ওরা একসল্গে শিস দিয়ে ধেয়ে চলেছে নীচের দিকে। ওরা নামছে।

সেই ছবিতে জাম্প কাট করে ঢুকে পড়ছে ভিশানের চলচ্চিত্র এবং মার্শালের মুখ-শক্ত চোয়াল, কপালে ভাঁজ। আর তার ফাঁকে-ফঁঁকে মিনি আর শানুর সুন্দর মিষ্টি ছবি।
‘আমার ওল্ড সিটির বন্ধুরা, আমার নিউ সিটির ভাই-বোনেরা! আপনারা আমাকে ন্যায়বিচার দিন। অবিচারের এগেইন্স্টে আপনারা রুথ্খে দাঁড়ান! আপনাদের ঘরেও তো মা, বাবা, বোন, ভাই, ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। আপনারা এই নোংরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুথে দাঁড়ান! আপনাদ্রে কাছে আমি...আমি...আমাব বঊ আর ছেলের প্রাণভিক্ষা চাইছি। ওদেরকে বাঁচান! আমকে...আমাকে...সৎভাবে লড়তে দিন! প্লিজ! ওদের বাঁচন! আর কিছু আমি চই না...কিচ্ছু চাই না...'

কথা বলতে-বলতে জিশান প্যান্টের কোমরের আড়াল থেকে মিনি আর শানুর ফটোটা শূন্যে তুলে ধরল। কান্না ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলল, 'ওদের



জিশান কান্না চাপতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। মিনি আর শানু যে ওর সবচেয়ে বড় দুর্বল জায়গা!

কিন্তু একইসঙ্গে ও চোয়াল শক্ত করে রেখেছিল। চোয়ালের রেখা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, কিল গেমে ও মোটেই হারতে চায় না।

জিশানের মরিয়া আবেদন লক্ষ-লক্ষ টিভি দর্শকের কাছে পৌঁছে গেল। গেন শুধু নয়, তাদের অনেকেরই বুকে গিয়ে বিঁধল। তারা ওল্ড সিটির মনুষ। তারা নিউ সিটির মানুষ।

নিউ সিট্তিতে যে-ঘটনা ঘটল সেটা এককথায় অভিনব। যেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ ব্যাপারটা দিব্যি বেঁচেবর্তে রয়েছে, হঠাৎই তারা আবেগের একটা ঢেউ টের পেল। সেই ঢেউটা যেমন বিশাল, তেমনই শক্তিশালী। আর বেসব মানুষ ভাবত তাদের মধ্যে আবেগ-টাবেগ খুব একটা বেশিটেশি নেই-টেই...নিউ সিটিতে থাকতে-থাকতে সেই ব্যাপারটা বলতে গেলে শকক্যে-টুকিয়ে গেছে, তারাও হঠাৎ টের পেল তাদের শরীরে, মনে কিংবা

মাথায় একটা হিমশীতল পোকা কী এক অলৌকিক ম্যাজিকে আচমকা যেন নড়ে উঠল।

নিউ সিটির মানুষদের অনেকেই ফোন তুলে নিয়ে তাদের চেনা বৃত্তের মানুষজনকে ফোন করতে করু করল। কিল গেম থেলায় এই অবিচার কিংবা ব্যিিচার তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। শ্রীধর পাট্টা যতই ক্রিমিনাল রিফর্ম ডিপার্টমেন্ট আর পিস ফের্স্সের মার্শাল হেেন না কেেন এই অন্যায় তিনি করতে পারেন না।

নিউ সিটির মানুষদের মধ্যে ఆষ্বু কথার দেওয়া-নেওয়া চলতে লাগল। অন্ধকার রাতের সাইবারস্পেসে মানুষ্বের ক্ষোভ আর অসন্তোষের ৰাঁজ ক্রম্মেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুপারগেম্স কর্পোরেশনের কন্ট্রোল রুম্রের হেনপ্লাইনে ফোনের সুনামি বাঁপিয়ে পড়ল। তার পাশাপাশি ই-মেল আর ভিডিয়ো কলের বন্যা। আগের বারের তুলনায় এবারের ক্ষোভবিক্কেভ বোধহয় কম করেও একলো ুুণ বেশি।

সিভ্ডিকেট বিল্ডিং-এ শ্রীষর পাট্টা রাগে দাউদাউ করে জূলছিলেন। দুটো আর্ক কম্পিউটার মাথায় ওপরে তুলে সপাটে আছড়ে মারলেন মার্বেল মোড়া মেঝেতে। ওঁর শরীর রাগে থরথর করে কাপছিল।
 গেছে। ওদের টেলিফোন, ই-মেল আর ভিডিয়ো কনের ভাষা এতটাই নোংরা হয়ে গেছে যে, শ্রীধরের মাথার শিরা দপদপ করছিল—সেইসল্গে বুকে আর মাথায় অসহ যন্ত্রণ।। এই বুঝিি হার্টফেল হয়ে যাবে!

আকাশ থেকে নিউ সিটির দিকে তাকালে তখন একটা অড্যুত দৃশ্য শ্রীধর দেখতে পেতেন। রাতের রাস্তায় ক্রমশ গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। ওপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, অসংখ্য নেংটি ইঁদুর মুত্ে মিনি টর্চ কামড়ে ধরে ছুটে চলেছে।

কিন্তু ওরা ছুটে চলেছে কোনদিকে?
কিছু গাড়ি ছুটে যাচ্ছে গেম সিটির দিকে, কিছু গাড়ি ছুটে চলেছে সুপারগেম্স কর্প্রোরেশনের বিল্ডিং-এর দিকে, আর বাকি গাড়ির ঝাঁক ছুটে यাচ্ছে সিঙ্ডিকেট বিল্ডিং-এর দিকে।

নিউ সিটির বেশ কয়েকটা রাস্তায় গাড়ির ঢলের এই অস্বাভাবিক দৃশ্য পিস ফোর্সের নাইটগার্ডদ্রে নজর এড়ায়নি। তারা খবরটা ফোন করে হেডকোয়ার্তারে জানিয়ে দিচ্ছিল। সেখান থেকে খবর পৌঁছ যাচ্ছিল ওপরের স্তরে, তারপর আরও ওপরের স্তরে, এবং আরও ওপরে...।

শেষ পর্যন্ত সর্ব্বোচ্চ স্তরে-অর্থাৎ, ত্রীধর পাট্টার কনে-খবরাা পৌঁছে


তখন এই বিচিত্র ‘কার র্যালি’-র ফুটেজ দেখানো হচ্ছিল। বাপারটা কী? একটা মনুমের আবেদনে এত মানুষের চঞ্চল হয়ে ওঠার ঘটনা নিউ সিটির ইতিহলে কখনও ঘটেনি।

এটকে কি ‘বিপ্লব’ বলা যেতে পারে? কীভাবে কন্ট্রোল করা যায় এই চঞ্চলত?

ওন্ড সিটিতে সেই সময়ে যা ঘটছিল, ওন্ড সিটির ইতিহসে কখনও সেরকম ঘটেনি।

ওল্ড সিটির হাজার-হাজার মানুষ পাগলের মতো চিৎকার করছে, ‘শ্রীষর পাট্টা, মুর্দাবাদ! জিশান, জিশান, জিন্দাবাদ! শ্রীধর পাট্টা, মুর্দাবাদ!..।’ আর অন্ধকার খানাখন্দে ভরা রাস্তা ধরে তারা ইইহই করে ছুটে চলেছে জিশানের বস্তির দিকে। তাদের কারও-কারও হাতে জননত্ত মশাল। মােে-মােে তাদের কেউকেউ আকাশের দিকে চোখ তুলে ঔটারবাহিনীর দিকে দেখছে। দেখছে ওদের লেজ থেকে বেরোনো আগুনের হলকা। ওনছে ওদের তীক্ষ্ শিস।
 ছয়লাপ। তাদের সমবেত স্বরে জিশানের জয়ধ্বনি, আর শ্রীধরের নৃশংসতার প্রতিবাদ।
‘‘্রীরর পাট্ট, নিপাত যাক!’
‘আমার ভাই, তোমার ভাই / জিশানকে ফেরত চাই!
‘নিউ সিটি, মুর্দাবাদ!’
'ওন্ড সিটি, জিন্দাবাদ!'
‘কিল গেম / শেম-লেম!’
‘কিল গেম, নিপাত যাক! শ্রীধর পাট্টা নিপাত যাক!’
ফেটে পড়া আওয়াজে স্লোগান চলতেই লাগল। রাতের ওল্ড সিটি জনতার রাগী চিৎকরে ফেটে চৌচির হয়ে যেতে লাগল।

ওটারগুলো যখন জিশানের বস্তির কাছাকাছি ল্যান্ড করতে চাইল, তখন ওরা কেননও জায়গা খুঁজ্জ পেল না। রাস্তার ওপরে ওধু মানুষ্রে মাথা আর মানুষের মাথা! আর তারই মােে-মােে মশালের আলোর এলোমেলো যতিচিহ্ন।

শিস দিয়ে কিছুক্ষণ ওড়াউড়ি করল ওরা। স্যাটেলাইট ফোনে ঘন-ঘন খবর পাঠাতে লাগল ওপরওয়ালাকে।
‘এখন को করব, স্যার?’
‘犭ট ডাউন দ্য র্লাডি ক্রাউড, য়ু মোরন! শট রাইট নাও! ওদের ছড়িয়ে ছিটকে ছত্রখান করে দাও! ছুরুুর করে দাও! যেভাবে হোক জিশানের ওয়াইফ আর সানকে আমাদের চাই-ই চাই! আমাদের মার্শালের স্পেশাল অর্ডার। গো অ্যাহেড...রাইট নাও!

একটা টটরের একজন গার্ড জনতার দম আটকনো ভিড় লক্ষ করে ওর অটো-পিস্তুল ফায়ার করল।

কয়েক ঝলক আলো। কয়েকটটা ‘ফট-ফ্ট’ শব্দ।
জনতার ভিড়ে কারও গায়ে গুলি লাগল কিনা না বোঝা গেল না। তবে দশ-বিশজন মানুষ চিৎকার করে ভয়ে ছুটে পালাল। বাকি কয়েক হাজার মানুষ কিন্তু নড়ল না। দু-চারজন চেচচচিয়ে উঠল, '犭ुয়োরের বাচ্চাদের কাছে কত গুলি আছে? একশো? দু-শো? আর আমরা হাজার-হাজার। মিনি আর শানুকে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না!’
‘ছাড়ব না, ছাড়ব না!’ জনসমুদ্রগর্জনে সেই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল।
আর একইসঙ্গে জনতার াঁাক থেকে বেশ কয়েক ডজন ঔলি ছুটে গেল ऊটারবাহিনী তাক করে। দুজন গার্ডের হাতে আর কোমরে গেি লাগল। বাকি গুলিগুলো ছিট্কে গেল আকশে। আর কয়েকটা ঔটারের মেটাল বডিতে ধাক্কা


বেশ বোঝা গেল, ওন্ড সিটির জনগণ মোটেই নিরস্ত্র নয়।
এটা ঠিকই বে, ওল্ড সিটির রিভলভারের মডেলগুলো বেশ পুরোনো, কিন্তু তা থেকে এখনও ঠিকঠাক গুলি বেরোয়, আর সে-গুলি কারও গায়ে লাগলে সে আহত কিংবা নিহত হতে পারে।

সুতরাং, আটটা ఆটার মুখ ঘোরাল। উড়ে গেল জিশানের বতি থেকে অনেকটা দূরে। ওরা হেডকোয়াত্তের সঙ্গে উন্তেজিতভাবে ফেনে কথা বলেই यাচ্ছিল।

মিনি বাড়ির কাছেই একটা সরু গলিতে দাঁড়িয়ে প্লেট টিভিতে জিশানের কিল গেম দেখছিল। মরণ থেলাটা শেষ হতে আর দু-ঘণ্টা মতন বাকি। এবুু পরেই হয়তো ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠবে। তাই বারবার মুখ তুলে আকশের দিকে দেখছিল ও।

ওঃ ভগবান! আর একটু! আর একমু!
অর্কনিশান বাড়িতে অঘোরে ঘুম্মেচ্ছে। বস্তিরই একটি কিশোরী মেয়ে ওকে পাহারা দিচ্ছে। মেয্যেটি জনে যে, মিনিবউদির আজ সারারাত টিভি দেখা দরকার। তাই ও মিনির হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে।

হঠাৎই জনতার গর্জনের বিস্ফোরণে বস্তির সবাই চমকে উঠল। মিনিও।

ও এতক্ষণ ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল, কাঁপছিল। ఆটরের শিসের শব্দ শোনার জন্য কান পেতে ছিল। কিন্তু সেই শব্দটা ওনতে-না-ওনতেই ভেসে এল ক্ষিপ্ত জনতার ভয়ংকর গর্জন।

তারপর খুব দ্রুত কীসব যে ঘটে গেল!
ফিসফাস। কানাকানি। কথা চালাচালি।
তারপরই মিনিকে আর শানুকে পিস ফের্স্রে হাত থেকে বাঁচাতে অসংখ্য জেহাদি নারী-পুরুষ মিনির ঘর আর মিনিকে ঘিরে বস্তির সব অলিগলিতে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওরা বে যেমন পেরেছে হাত অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ওদের ঠোঁটে উত্তেজনা আর প্রতিরোধের জিগির। দূর থেকে কানে আসা জনতার গর্জনের সঙ্গে ওদের গর্জন মিলে গেল। যেন দু-দুটো সমুদ্রের দুরন্ত ঢেট হাত হাত মিলিয়ে কোলাকুলি করল। ওদের স্নোগান ওনতে-ওনতে মিনির ঢোে জল এসে গেল।

জিশানকে এত মানুষ ভালোবাসে!
ওরা বলছে, ‘জান দেব, তবু জিশানকে দেব না! জিশান জিন্দাবাদ! জিশান আমাদর ছিল, আমাদের থাকবে!...।

ওল্ড সিটির বড়-বড় রাস্তাগুলোয় তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য ঃ কাতারে-
 ওন্ড সিটিকে আলাদা করে রেখেছে। জিশান-পাগল মনুষেের দল এখন আর পিস ফোর্সের গার্ডদের গুলির পরোয়া করে না। ওরা পরিখার পরোয়া করে না। পরোয়া করে না পিরান্হা মাছ কিংবা বিষধর সাপের। ওরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলহে যে, আজ ওরা মাস্টার ব্রিজের প্রতিরোধ ভাঙবেই।

আজ ওরা জনসমুদ্রের জোয়ারে রাতের নিউ সিটি ভাসিয়ে দেবে। দেবেই।
নিউ সিটি আর ওন্ড সিটিতে দু-রকমের দুটো আগ্নেয়গিরির বিস্ফেরণ ঘটে গেল। বেরিয়ে এল দু-রকমের দুটো লাভাম্রোত।

কিন্তু সেই লাভা্্রোত দুটো .ীীরে-ধীরে মিশে যাচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে|

একইু পরেই দুটো স্রোতকে আর আলাদা করে চেনা গেল না।

জিশানের পাগল-পাগল লাগছিল।
এরপর को? এরপর কী?
বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল ও। কালো আকাশটাতে খুব সামান্য www.facebook.com/groups/banglabookpdf

## www.banglabookpdf.blogspot.com



WWWW.banglabookpdi:blogspotacom


## www.banglabర尾plf.bilogspot.com

হনেও ধূসরের ছোয়া লেগেছে না? হে ভগবান! আর কিছুটা সময় আমকে বাঁচিয়ে রাখো। মিনি আর শনুুকে আমি একবার দেখতে চই। একবার—মাত্র একবার...।

যন্ত্রণা আর ক্লান্তির সন্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করছিল আর এলোমেলোভাবে এদিক-ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছিল। তখনই জিশান দেখতে পেল, গেম সিটির ভেতরে একটা ব্যস্তুা শুরু হর্রেছে। অনেক মোটরবাইক আর গাড়ি নানান দিকে ছুটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কিছু চিৎকার চেচচামেচি।

বাইকের কয়েকজন মানুষকে লক্ষ করল জিশান। ওদের গয়ে কোনও স্পেশাল ইউনিফর্ম নেই। ওরা বোধহয় সিভিলিয়ান-গেম সিটির মক সিটিজেন।

কিন্তু ওরা এতাবে গেম সিটির রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে কেন?
একটু পরেই প্লেট টিভির পরদায় এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল। গেম সিটির সিটিজেনরা জিশানকে খুঁজে বের করে আগলে রাখতে চাইছে। ওরা চইছে জিশানের গায়ে আর যেন আঁচড়টিও না লাগে। তাই ওরা নিয়ম ভেঙে প্রণের ঝুঁকি নিয়ে পথে নেমে পড়েছে।

রউফ লালার কথা মনে পড়ে গেল জিশানের। কিত্তু ওর বেলায় তবু একটা প্রইজ-টাইজের ব্যাপার জড়িয়ে ছিল! এখানে তো তা নেই-বরং কুটিল শাফ্রি V পাগলামো করছে কেন? ওদের ভয়ডর নেই!

জঙ্গলের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছিল জিশান। কখনও গাছের আড়ালে, বা কখনও গাছের ওপরে বেয়ে উঠে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিল। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা তাতে গাছ বেয়ে ওঠার কাজাা মারাঢ্মকরকম কঠिন হয়ে পড়ছে।

ঘাম আর রক্ত মিশে গিয়ে জিশানের কাটা জায়গাগুলো জ্বলছিল। ও বারবার সেগুেোর ওপরে হাত বোলাচ্ছিন। আলো আর অন্ধকরের জাফরির মধ্যে দিয়ে এদিক-ওদিক নজর চালাচ্ছিল।

इঠাৎই ও দেখতে পেল দুটো হনদেটে সবুজ চোখ। তাদের ঘিরে গাঢ় কালো ছায়া।

জিশান একদুও দেরি না করে হাঁটুর কাছে লাগানো হোনস্টার থেকে লেজার ব্নাস্টার বের করে নিল। এবং ফায়ার করল।

কলো ছায়াট শূন্যে লাফ দিয়েছিল। একইসজ্গে চাপা গর্জন করে উঠেছিল। সেটা এখন ‘উড়ে’ এসে জিশানের কাছাকাছি আছড়ে পড়ন। ওটার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে হিত্র্র গজরানি।

প্রকাণ্ একটা কলো বাঘ। আর্রোশে লেজ আছড়াচ্ছে। পাগলের মজো

থাবা ছুড়ছে শূন্যে। ফুঁসছে।
কলো বাঘ যে এত বড় মপেে হয় জিশান জানত না। আর ও এও জনত না, এরা এত জানদার।

তবে কয়েক সেকেডের মধেৌ বাঘটা বেশ নিস্তেজ হয়ে পড়ল।
জিশান বাঘটাকে লক্ষ্য করে আবার ফায়ার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক তখনই একাঁা গরম কিছু ওর াঁ-কাঁধ ছুয়ে বেরিয়ে গেল। আর সেই ‘ছেঁয়ার’ অভিঘাতটা এতই মারাত্মক হল যে, জিশনের দেহটা পলকে দুটো পাক খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। ওর বাঁ-কাঁধটা আগুনের আঁচে জূলে-পুড়ে যাচ্ছিল।

তখনই প্রেটনকে জিশান লেখতে পেল। ওর কাছ থেকে প্রায় সাতআট হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরু ছিপছিপে একটা ইশ্পাতের চাবুক। ঢোখের ওপরে ঢাকা কালো কাচ থেকে জঙ্গলের আলোর ঢেউ ঠিকরে পড়ছে। ওর দু-হাতে দু-দুটো অস্ত্র।

জিশানের মনে হল, এইমাত্র প্রোটন দুটো অস্ত্রই ব্যবহার করেছে : একটা জিশানের ওপরে, আর-একটা কালো পশ্টার ওপরে।

এবার তা হলে সব লেষ। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম, এত লড়াই—সব শেষ! জিশানের শরীরের এখন যা অবস্থা অতে ও কী পালটা কিছু করে
 বেড়ে গেছে বে মনে হচ্ছে, কেউ যেন মাংসের ভেতরে তুরপুন গেঁথে নিষ্ঠুরভাবে মোচর দিচ্ছে।

কিন্তু প্রোটন কী করে ওকে খুঁজে পেল? ট্ব্যাকরে তো ওর পজিশন প্রোটন দেখতে পায়নি!

সেটা দেখতে না পেলেও প্রোটন হাল ছড়েনি। বুদ্ধি খাটিয়েছে, পরিশ্রম করেজে, আর ওর আই গিয়ারে লাগানো নাইটভিশান ইসদ্রুম্েে্টের সাপোর্ট নিয়েছে। তার ওপরে ভাগ্যও ওকে সাহাयা করেছে।

প্রোটনের জায়গায় জিশান থাকলেও ঠিক একইরকম মরিয়া চেষ্টা করত।
আর সুখারাম? ও-ও কি জিশানকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে না? ও কি জিশানদদর ফায়ারিং-এর শব্দ ওনতে পায়নি?

জিশানের নজর মাঝে-মােেই বাপসা হয়ে যাচ্ছিল, কিস্তু ও জোর করে নিজেকে আবার সজাগ করে তুলেছিল। মিনি, শানু...আর সবার জন্য ওকে বে লড়তে হবে! যে করে হোক, লড়তে হবে।

মাট্টিত পড়ে থাকা অবস্থায় শরীরটাকে কয়েক ডিত্রি ঘোরাল জিশান। ডানহাত্র আঙুলুগেলো গুট্ঔুটি ব্নাস্টারের হাতলের দিকে এগোতে লাগল।

প্রোটন চুপচাপ দাঁড়িয়ে জিশানকে দেখছিল। ওর ঠোঁটের রেখাটা সামান্য

চওড়া হল। তারপর ডানহাতে ধরা লং রেঞ্জ মালটিফটার পিস্তলটা জিশানের মাথা লক্ষ করে তাক করল।

আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তই আহত কালো বাঘটা সবাইকে চমকে দিত্রে বিদ্যুতের মতো প্রোটনের ওপরে ঝাঁাপিয়ে পড়ন।

প্রোটন ফায়ার করল বটে，কিন্তু তাতে শেষ রক্ষে হল না। কারণ，বাঘটা মারা যাওয়ার সঙ্গে－সজ্গে প্রোটনকেও ছিঁড়ে－খুঁড়ে রেখে দিত্যে গেল।

গাছপালার গক্ধের সঙ্গে বারুদের গন্ধ মিশে গেল। ফায়ারিং－এর শক্দে অন্ধকরের পশ্পাথিরা চঞ্ধল হয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। কয়েকটা জজ্ট্টান্োয়ারের ছুটোছুটির শদ্দও পাওয়া গেল যেন।

জিশান অতি কষ্টে উঠে বসল। जারপর একটা গাছের জঁড়িতে কোনওরকমে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

বাঘটার দিকে একবার তাকাল। একেবারে নিথর，স্পন্দনহীন।
जারপর জিশান তাকাল প্রোটনের দিকে। পাল্যে－পায়ে সেদিকে এগোল।
প্রোটন চিত হয়ে পড়ে আছে। তবে ওর মাথাটা একপালে ঘুরে গেছে। দু－হাত থেকে অস্স্র খসে পড়েছে। পোশাক ছিঁড়ে গেছে বেশ কয়েক জায়ায়। কোমরের কাছ থেকে বাঁ－পাটা খানিকটা যেন খুলে বেরিয়ে এসেনে। মুখটা অল্প



হঠাৎই জিশান খেয়াল করল，প্রোটনের বাঁ－পায়ের একটা জায়গায় চামড়া উ⿳亠়八রে গেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে চকচকে ধাতু－হয়তো স্টেইনলেস স্টিল কিংবা অन্য কিছু।

ঠিক একই্রকম বাপাপার দেখা গেল ডান াঁধে আর গলে। जা ছাড়া জিশান লক্ষ করল，প্রেটনের ঘাড়ের পালে দুটো ছোট লাল বাতি দপদপ করছে।

জিশানের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছিল। চামড়া，রক্ত，মাংস，মেটাল， লালবাতি．．．এসবের মানে কী？

যম্ত্রণায় মুচড়ে ওঠা গলায় প্রোটন প্রায় ফিসফিস করে বলল，‘ জিশান．．． তুমি জিতে গেলে। আমি．．．আমি．．．।＇

প্রোটনের কথা ভালো করে শোনার জন্য জিশান ওর মাথার কছে উবু হয়ে বসে পড়ল। ब্বাস্টারটা শক্ত মুঠোয় ধরা রইল।
‘আমি．．．আমি．．．লেষ। বোনাস লইফ নিয়ে অনেকদিন টিকে ছিলাম। আর．．．আর এটইই স্যাট্স্ফ্য্যাকশন যে．．．ভে মানুষ্েের হাতে আমাকে মরতে হল ना．．．।＇

সব জ্রালা－যন্ত্রণা ভুলে জিশান প্রোটনের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিত্যে রইল।

প্রোট্ের গলা একেবারে মেয়েদের মতো। চোখ-মুখের আদলটাও সেরকমটটই লাগছে না কি?

এই মেয়েটেই একজন সুপারকিলার! যার আসল পরিচয় মিডিয়া শেয দিন পর্যষ্ত গোপন রেখ্েেে!
'তুমি...হুমি...মেয়ে ?’ জিশান জিগ্যেস করল। বাঁ-হাতের গড়িয়ে পড়া রক্ত মু巨ে নিল।
‘গাঁ, শরুুত তো তাই ছিলাম। খেলাধুলো ভীষণ ভালোবাসতাম...।’
প্রোটনের স্যাটেলাইট 心োন বাজতে খুরু করল। বাজতেই থাকল। প্রোটন ফোন ধরার মতো অবস্থায় নেই। ও মলিন চোথে জিশানের দিকে তাকিয়ে ছিল, আর আস্ঠে-আস্তে কথা বলছিল।

জিশান শুনে লাগল প্রোটনের কথা।
ছৌটেলা থেকেই অ্যাথলেটিক্সে টান ছিল। প্রইজও পেয়েছে অনেক। খানিকটা ডানপিটে গোছের হওয়ায় বেশিরভাগ সময় ছেলেদের দঙ্গলে ভিড়ে থাকত। তা ছাড়া, ছিপছিপে চেহারা, বয়কাট চুল এসব দেণে অনেকে ওকে ছেলে বলেও ভুল করত।

বয়েস বাড়তে লাগল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রেটন আরও বেপরোয়া
 আঠঠরো বছর পেরোতে না পেরোতেই ও প্রথম খুন করে বসল। কিন্তু পুলিশ ঠিকমরো কেস সাজাতে পারেনি বলে ও তিন বছর জেল থেটে রেহাই পায়।

এরপর ও একটা মারাশ্মক গ্যাং ওয়ারে জড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ি এলাকার সেই গ্যাং ওয়ারে প্রুর গোলাঔলি চলে। সেখান থেকে পালানোর সময় প্রোটনদের জিপ একটা বাঁকের মুখে রাস্তা ছেড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায় শূন্যে।

জিপের সবাই মারা গিয়েছিন—একমাত্র প্রেটন ছাড়া।
তবে ওর অবস্থ যা হয়েছিল তাতে ওকে বাঁচনো যাবে বলে কেউ ভবেনি। ওর গোটা শরীরটা দুমড়েমুচড়ে গিয়েছিল। চোখ ঢুকে গিয়েছিল গর্তে, মাথার খুলির খানিকটা অংশ কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় নিউ সিটির বারোজন বিষ্ঞানী একটা কোর রিসার্চ গ্রুপ তৈরি করে রোবোটিক্স আর আ্যানড্রয়েড টেকনোলজি নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের নানান পরীক্ষার জন্য 'সাবজ্রেক' দরকার হয়ে পড়েছিন। তাই প্রোটনকে তাঁরা 'সাবজৌ' হিসেবে চেয়ে বসেন। নিউ সিটির সিভ্ডিকেট সেই অনুরোেে সায় দেয়।

তারপর বছরের পর বছর চিকিৎসা আর গবেষণা চলতে থাকে। রোবোটিক্স, আরটিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্প আর বায়োটেকনোলজি হাত ধরাধরি

করে প্রোটনের ওপরে কাজ করতে থাকে। রক্ত, মাংস, হাড়ের সঙ্গে মিশে যায় স্টিলের প্লেট, ব্যাটারি, তার, সুইচ, অপটিক্যাল সেপর, এল. ই. ডি. বাতি আর অসংখ্য মইজ্রোচিপ।

শেষ পর্যন্ত তিন বহরের চেট্টোয় তৈরি হয় সুপারকিলার প্রোটন। শ্রীধর পাট্টা ওকে ‘সুপারহিউম্যান কিলিং মেশিন’ নাম দিত্যেছিলেন। কিস্তু...।

প্রোটনের কথা ঈনতে-শুনতে খানিকটা আনমনা হয়ে পড়েছিল জিশান। তবে ওর চোখ আর কান সাজাগ ছিল। ও শনতে পেল বেশ কয়েকটা চপারের শব্দ। তার সঙ্গে খটারের শিস।

কাউন্টডাউন রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল জিশান। আর মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট! গত কয়েকটা ঘণ্টা কী করে এত তাড়াতাড়ি পেরিয়ে গেল কে জানে! জিশান অবাক হয়ে ভাবল, সত্যি-সত্যি কি কিল গেমের চব্সিশ ঘণ্টা শেষ হতে চলেছে? ना কি ও স্বপ্ন দেখছে?

একবার প্রোটনের দিকে তাকাল। এখন ওর বুকের কোনও ওঠা-নামা নেই—কালো বাঘটার মতোই স্থির।

কিন্তু জিশান এখন কী করবে? জঙ্গলের মধ্যেই এলোমেলো ছুটে বেড়াবে? না কি খোলা রাস্তায় বেরিয়ে মক সিটিজেনদের আস্তানায় গা-ঢাকা

 কেথথায় আছে? কতদূরে?

আन্দাজে জিশানের মনে হল, বেশি দুরে নয়। সুখারামের ট্ব্যাকারে জিশানের সবুজ ডট দেখা যাচ্ছে না বটে তবে প্রোটনের লাল ডটটা নিশ্য়ই দেখা যাচ্ছে। সুতরাং, এই অবস্থায় সেরা স্ট্রাটেজি হল, যত তাড়াতাড়ি সষ্তব দুজন কিলারের একজোট হয়ে যাওয়া। তার মানে, সুখারাম নিশয়ইই প্রেটনের লাল ডট লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে।

প্রোটনের ফোন আবার বেজে উঠল। বাজতেই থাকল।
জিশানের মনে হল, সুখারাম 《েলে করে প্রোটনের সঙ্গে কথা বলতে চইছছ, আর কথা বলতে না পেরে মরিয়া হয়ে ধেয়ে আসছে প্রোটনের পোঁজেজিশানের ハ্খেজে।

র্কস্যাকে সব গছিয়ে নিয়ে টলতত-টলতে সোজা হয়ে দাঁড়াল। अ४ধু ডানহাতের মুঠোয় ধরা রইল ন্বাস্টার গান। ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে সুখারামের মুখ্যেমুখি হলে কতটা মোকাবিলা করতে পারবে সেটই প্রশ্ন।

পথ চলতে শুরু করল জিশান। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে থিদ্দ আর ঘুম। কিন্তু তা সত্ত্রে আরও কিছুক্ষণ অন্তত ওকে শরীরটাকে সচল রাখতে হবে।

রুকস্যাক থেকে অপটিক্যাল ট্যাবলেট বের করে ফুড ম্যাপ দেখল। তারপর সবচেয়ে কাছের ফুড পয়েন্টে গির্রে চটপট কিছুটা খিদে-তেষ্টা মিটিয়ে নিল। মুথে-ঢোেে জলের ঝাপটা দিল।

অপটিক্যাল ট্যাবলেট দেথে নিজের অবস্থানটা বুঝতে চাইল জিশান। তারপর পুবদিক লক্ষ্য করে ছঁঁট দিল। ও জনে, কিতুটা পথ গেলেই মেটাল রোড পাওয়া যাবে। সেখান থেকে একটা গাড়ি কিংবা মোটরবাইক নিয়ে নেবে। তারপর আবার দেড়...দদৗড়...দৌড়...।

মেটাল রোডের কাছাকাছি আসতেই অনেক আলো দেখতে পেল। সেইসঙ্গে চপারের ইঞ্জিনের শব্দ, শটারের শিস, আর মননুষজনের ইইচই।

ऐঠাৎই পিছন থেকে ফিসফিস করে কে যেন ডেকে উঠল ঃ ‘জিশানদা!’
জিশান চমকে উঠল। এক ঝটটকায় পিছন দিকে ঘুরে গেল। লেজার ভ্বাস্টার তাক করল অন্ধকরের দিকে। দেখল, সেই অন্ধকারের গায়ে সার্চলাইটের টুকরো-টুকরো আলো জোনাকির মতো বিচিত্র নকশা কেটে দিয়েছে।

সেই নকশা গায়ে মেঙে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছ’ফুটের বেশি লম্বা মানুষ—যে দৌড়ে হরিণকে হার মানাতে পারে। যে অনায়াসে পাঁচ-পাঁচটটা খারাপ মানুষকে খতম করতে পরে।

‘शাঁ-সুখারাম, জিশানদা।' জিশানের আরও কাছে এগিয়ে এল ও : ‘আমি তোমাকে কিছুতেই মারতে পারব না। কেন না ভালো মানুষদের আমি মারতে পারি না। তাতে মার্শালের হাতে আমাকে মরতে হয় মরব—।'

জিশান কী বলবে, কী করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে এটুকু বুঝতে পারছিল, সুখারাম নস্কর কেন এতক্ষণ ধরে ওকে 'খুঁজে’ পায়নি।

সুখারাম জিশানের হাত চেপে ধরল : ‘এসো, জিশানদা। জলদি। আর সময় নেই৷’

ওরা ঘুরপথে মেটাল রোডের দিকে এগোল। সুখারাম খুব নীচ গলায় কথা বলছিন। ও জিশানের ওপরে অনেকক্ষণ ধরেই নজর রাখছে, যাতে জিশানের কোনও বিপদ না হয়। জিশানকে বাঁচানোর জন্য খেলার সব নিয়মকানুন ভেঙে প্রোট্নকেও ও শেষ করে দিত। কিন্তু তার আগেই কালো বাঘ সেজে নিয়তি হাতে লাগাম তুলে নিয়েছে।

দুটো আগুনের তির কোথা থেকে যেন ছুটে এল। ওদের কাছাকাছি গাছপালার ওপরে ঠিকরে পড়ে কানফাটাো বিস্মোরণ ঘটাল। কালো পোঁয়া, পোড়া গৰ্ধ।

งso www.banglaboôkedf.biogspot.com
শ্রীষর পাট্টা নিশ্যয়ই এয়ার অ্যাটকের নির্দেশ দিয়েছেন।
কিন্তু হঠাৎ এ-নির্দেশ কেন?
জিশান আর সুখারাম দ্ৗীড়তে শুরু করল.।
একটু পরেই ওরা গাছপালা পেরিয়ে মেটাল রোডে প্পাঁছে গেল। রাস্তার পালে দাঁড় করানো একটা গাড়িতে উঠে বসল। তারপর সুখারাম্মের হাতে গাড়ি চলতে ঔুু করল।

ওদের ছুটন্ত গাড়ি লক্ষ্য করে মিসাইল ছুটে আসছিল বারবার। চোেে পড়ছিল আগুনের রেখা আর শব্দ। কিন্তু সুখারাম কুশলী হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছিল, অ্যাক্সিলারেটরের কন্ট্রোল সুইচ অপারেট করছিল।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পরেই ওদের থামতে হল।
কারণ, সামনের রাস্তা জুড়ে এক অদ্ডুত দৃশ্য!
জায়াটা আলোয় আলো। চওড়া রাস্তার মাঝে চারটে তটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তার ঠিক মাঝখানে একটা চপার—তার ইজ্জিন চলছে। চপারটার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীধর পাট্টা। আর কোনও উপায় না দেশে নিজেই গেম সিট্তিতে চলে এসেছেন।

কিন্ত সবচেফ্যে আশ্চর্বের ব্যাপার হল, রাস্তার দুপাশে বহ্থ মানুষের ভিড়।
 হয়ে গেছে। ওরা ইইচই করছে, জিশানের নাম ধরে চিৎকার করছে।

সব চিৎকার ইইচই ছপিয়ে হঠাৎই শ্রীধরের গলা শোনা গেল। একটা মেগাফোন ব্যবহার করে তিনি কথা বলছেন।
'সব থেল। শেষ, জিশান! আর পালানোর পথ নেই। তুমি কিল গেম্মের নিয়ম ভেঙ্ডেছ-তাই সব খতম। এক্ষুনি নেমে পড়ো গাড়ি থেকে। নইলে আমি শট করার অর্ডার দেব...।

ভিড় করে থাকা জনতা প্রতিবাদের চিৎকার করে উঠল।
জিশান গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। একটা হাত ওপরে তুলে বলন, ‘এটা অন্যায়। এ-অন্যায় আপনি করতে পারেন না, মার্শাল—।

নিজস্ব ঢঙে ব্যঙ্রের হসি হাসলেন শ্রীধর : ‘জিশান, তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, নিউ সিট্টিত আমিই শেষ কथা।’
‘মোটেই না!’ চিৎকার করে বলল জিশান, ‘সবসময় জনগণই শেষ কথা বলবে। সবাই জানে, আমি কোনও দোষ করিনি...।'

জনতা আবার চেঁচিয়ে উঠন। ভিড়ের মধ্যে থেকে কয়েকটা বাক্স, কৌটো আর ইট-পাটকেল ছিটকে গেল শ্রীধরের আটার-বাহিনীর দিকে।

দুজন গার্ড শৃন্যে ফায়ার করে জনতাকে ‘ধমক’ দিল।

জিশান বলল, 'মার্শাল, ভুলে যাবেন না, লাইভ টেলিকাস্ট এখনও চলছে। সবাই আপনার এই অন্যায় দেখছে...।’

হাসলেন শ্রীধর। মাটির দিকে থুতু ছেটালেন। তারপর মুখ থিচিচ্যে বললেন, ‘...ইয়োর লাইভ টেলিকাস্ট! সবাই এবার ডেড টেলিকাস্ট দেখবে।’ ডাইনে-বাঁয়ে একবার ঢোখ বুলিয়ে নিলেন মার্শাল। তারপর ঃ 'নাউ, কাম অন। হাত মাথার ওপরে রেখে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এসো আমাদের কাছে। আমি দশ পর্যন্ত গুনব। ওয়ান...ప....থि...।'

হঠাৎই জিশানকে অবাক করে দিয়ে সুখারাম এক হাঁচকায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল। এবং জিশান বা অন্যান্য কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওর গাড়ি মিসাইলের মতো ধেয়ে গেল শ্রীধর পাট্টার দিকে।

জনতা চিৎকার করে উঠন। গার্ডরা সুখারামকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার ফায়ার করল বটে, কিক্তু ততত কাজ হল না।

সুখারাম্রের গাড়ি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে শ্রীষরের চপারে সরাসরি ধাক্কা মারল।

সংঘর্ষ, বিস্ফেরণণ, আগুন, বেঁয়া।
শ্রীধর পাশের দিকে «াঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেন। আর
 হয়ে গেল দক্ষযষ্ঞ। প্রবল চিৎকার-চেচচামেচির মধ্যে ফায়ারিং-এর শ্দও শোনা গেল।

তখনই লাইভ টেলিকস্টে জানা গেল, জনস্রোতের বন্যা সব প্রতিরোধ ভেঙে গেম সিট্তিতে ঢুকে পড়েছে।

জিশান বুঝতে পারছিল, জনতার রোষে পড়লে শ্রীধর পাট্টা একেবারে চূর্ণ-বিদ্ণ হয়ে যাবেন—ওঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর সেই মৃত্যুা জিশানের চোথে মোটেই ন্যায়বিচার নয়।

সুতরাং, ও শ্রীধরকে লক্ষ্য করে দৌড়ল। ওঁকে আপাতত আগলে রাথা দরকার। পরে ওঁর অন্যায়ের বিচার করা যাবে।

শ্রীধর পাট্টা গায়ের সাদা কোট খুলে ফেলেছিলেন, যাতে কেউ ওঁকে সহজে চিনে ফেনতে না পারে। কিন্তু জিশান ওঁকে চিনতে পারল। রাস্তার পাশের একটা গাছের আড়ালে বসে থরথর করে কাঁপছেন।

একটা খটারকে কোনওরকম্মে দখল করল জিশান। ক্ষিপ্ত জনগণ শটারটাকে ঘিরে ছিল। কিন্তু জিশানকে দেখে ওরা পথ ছেড়ে দিল।

সেই তটারটায় শ্রীধরকে টেনে তুলল জিশান। সঙ্গে উঠল আরও দুজন মানুষ। তা ছাড়া ঈটারের পাইলট তো আছেই!

## www.banglabookpdf.blogspot.com <br> 

-্রীধর কাঁপা-কাঁপা গলায় জিগ্যেস করলেন, 'আমাকে...আমাকে কোকোথায় নিয়ে যাচ্ছ, জিশান?’

শুটারে উঠতে-উঠতে জিশান বলল, ‘এখানে থাকলে আপনি খতম হয়ে যাবেন...।'

শুটার শিস দিয়ে আকাশে উঠল। আদিগন্ত নতুন ভোরের আলো। কিল গেমের চব্বিশ ঘণ্টা শেষ।

শ্রীধর তখনও থরথর করে কাঁপছিলেন। অর্থহীন শব্দ করে গুঙিয়ে উঠছিলেন। ওঁকে দেখিয়ে একজন যাত্রী জিগ্যেস করল, ‘জিশান, এই...এই জানোয়ারটাকে আপনি...আপনি ছেড়ে দেবেন ?'

জিশান তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, ‘হাঁ, ছেড়ে দেব-মানুষের মধ্যে ছেড়ে দেব। যাতে মানুষের মধ্যে থেকে, মানুষের সঙ্গে মিশে, এই জানোয়ারটা আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা শুরু করতে পারে।’

নীচ থেকে আবছাভাবে জনতার স্লোগান শোনা যাচ্ছিল, ‘নিউ সিটি জিন্দাবাদ! ওন্ড সিটি জিন্দাবাদ!'

সামনের ভোরের দিকে চোখ মেলে দিয়ে জিশান আপনমনেই বলল,
 নাম হবে ও আওয়ার সিটি-আমাদের শহর।'

জিশান চোখ মেলে নতুন সূর্य ওঠা দেখতে লাগল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

WNWW, banglabookpdiablogspotacon

$$
\begin{aligned}
& \text { মৃত্যু ঝুলছে সূক্ষ্ম সুতোয়!... } \\
& \text { অসহ টেনশন আর রুদ্ধশ্বাস রহল্যের }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ফিউচারিস্টিক থ্রিলার। } \\
& \text { ‘তেইশ ঘণ্তা যাট মিনিট’ } \\
& \text { উপন্যালের দ্বিতীয় এবং শেষ পর্ব। }
\end{aligned}
$$


[^0]:    
    উপनाल़र দ্ণিত়़
    এवर শেষ পर्ব।

[^1]:    ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

